মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের
জীবনচরিত



শ্রীভবসিন্ধু দত্ত প্রণীত

কলিকাতা।
২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মাঘ, ১৩২১

সূচী।

বিষয়			পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়—উপক্রমণিকা	...	...	১
দ্বিতীয় অধ্যায়—পূর্ব্ব পুরুষদিগের পরিচয়		...	৭
তৃতীয় অধ্যায়—জন্ম ও শৈশবকাল	...	...	১৬
চতুর্থঅধ্যায়—পিতামহীর মৃত্যু	...	...	২১
পঞ্চম অধ্যায়—বৈরাগ্য	...	...	২৮
ষষ্ঠ অধ্যায়—অনন্তের পরিচয়	...	...	৩৫
সপ্তম অধ্যায়—শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ		...	৩৯
অষ্টম অধ্যায়—ব্রাহ্মসমাজের তদানীন্তন অবস্থা		...	৪৭
নবম অধ্যায়—ব্রাহ্মসমাজে যোগদান	...	...	৫২
দশম অধ্যায়—ব্রাহ্মসমাজে যোগদান	...	...	৫৬
একাদশ অধ্যায়—শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত		...	৬১
দ্বাদশ অধ্যায়—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	...	৬৭
ত্রয়োদশ অধ্যায়—খৃষ্টীয়ান্‌দিগের সহিত সংঘর্ষ		...	৭৫
চতুর্দ্দশ অধ্যায়—শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু		...	৮০
পঞ্চদশ অধ্যায়—পিতৃ-বিয়োগ	...	...	৮৮
ষোড়শ অধ্যায়—পিতৃশ্রাদ্ধ	..	...	৯৫
সপ্তদশ অধ্যায়—কাশীযাত্রা	...	...	৯৯
অষ্টাদশ অধ্যায়—অগ্নিপরীক্ষা	...	...	১০৯
ঊনবিংশ অধ্যায়—ঋগ্বেদ প্রকাশ ও সত্যালোচনা		...	১১৮
বিংশ অধ্যায়—বর্দ্ধমানে ও কৃষ্ণনগরে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন		...	১২৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
একবিংশ অধ্যায়—ব্রাহ্ম-ধর্ম্মগ্রন্থ	১৩২
দ্বাবিংশ অধ্যায়—ভ্রমণ ও ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন	১৪০
ত্রয়োবিংশ অধ্যায়—গভীরতার জন্য ব্যাকুলতা ...	১৪৫
চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়—হিমালয় যাত্রা	১৫২
পঞ্চবিংশ অধ্যায়—হিমালয়-বাস ও তপস্যা ...	১৫৯
ষড়বিংশ অধ্যায়—বিধবা বিবাহের আন্দোলন ...	১৭২
সপ্তবিংশ অধ্যায়—সাম্বৎসরিক উৎসব	১৭৮
অষ্টবিংশ অধ্যায়—ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র	১৮৫
ঊনত্রিংশ অধ্যায়—কেশবের সহিত মিলন ও সত্যেন্দ্রনাথ	১৯১
ত্রিংশ অধ্যায়—ব্রাহ্মসমাজে প্রথম ব্যাখ্যান ...	২০১
একত্রিংশ অধ্যায়—উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে দুর্ভিক্ষ ...	২১২
দ্বাত্রিংশ অধ্যায়—ইণ্ডিয়ান মিররের উৎপত্তি ও সংস্কার ...	২২২
ত্রয়োত্রিংশ অধ্যায়—ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার	২২৯
চতুত্রিংশ অধ্যায়—সঙ্গতসভা ও হরদেব চট্টোপাধ্যায় ...	২৩৪
পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়—অনুষ্ঠান পদ্ধতি প্রণয়ণ ও কেশবের সহিত সম্বন্ধ	২৪১
ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়—কর্ম্মজীবন	২৫৫
সপ্তত্রিংশ অধ্যায়—স্ত্রীশিক্ষা ও ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের ব্যবস্থা	২৬১
অষ্টত্রিংশ অধ্যায়—ব্রাহ্মসমাজের বিস্তৃতি ও জ্ঞান প্রচার	২৬৭
ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়—বিরোধের পূর্ব্বাভাস ...	২৮০
চত্বারিংশ অধ্যায়—বিরোধ-ঝটিকা	২৯৪
একচত্বারিশ অধ্যায়—আরও দুইখানি পত্র ...	৩০৩
দ্বাচত্বারিশ অধ্যায়—কয়েকটি অনুষ্ঠান ও ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে মহর্ষির মত	৩১২
ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়—অভিনন্দন পত্র ও তাহার প্রত্যুত্তর	৩২

বিষয়		পৃষ্ঠা
চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়—ব্রাহ্মসম্মিলন সভা	...	৩৩৫
পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়—ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে উপদেশ	...	৩৫৪
ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়—ভ্রমণ ও কয়েকটি পত্র	...	৩৭১
সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়—আত্মীয়বিয়োগ ও অন্তিমকাল	...	৩৮১
অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়—পরিবারে তাঁহার শিক্ষা ও প্রভাব	...	৩৯৩
ঊনপঞ্চাশৎ অধ্যায়—জীবনের আর কয়েকটি বিশেষ ভাব		৪০৪

সূচীপত্র সমাপ্ত।

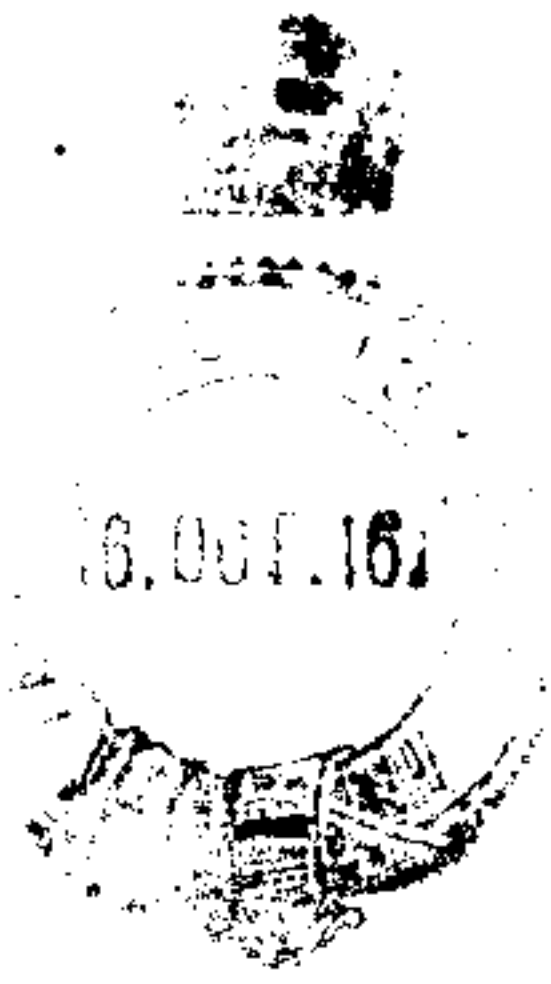
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের
জীবনচরিত



শ্রীভবসিন্ধু দত্ত প্রণীত

কলিকাতা।
২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মাঘ, ১৩২১


16.OCT.16

ভূমিকা।

আমি শ্রীযুক্ত ভবসিন্ধু দত্তের প্রণীত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনচরিত পাঠ করিয়া সুখী হইলাম। ইহাতে মহর্ষি দেবের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি সহজ ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। ইহা পাঠ করিয়া সকলেই উপকৃত হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। অবশ্য এ কথা বলা বাহুল্যমাত্র লেখক যদি মহর্ষিদেবের সহিত সাক্ষাৎভাবে পরিচিত হইতেন, এবং তাঁহার সঙ্গে বসিবার অধিকার পাইতেন তাহা হইলে, হয়ত আরও এরূপ অনেক বিষয় লিপিবদ্ধ করিতে পারিতেন যাহাতে তাঁহার গ্রন্থ আরও অধিক পরিমাণে হৃদয়-গ্রাহী হইত। কিন্তু সাক্ষাৎ ভাবে পরিচিত না হইয়াও যত কথা সংগ্রহ করিয়াছেন তাহাই আশ্চর্য্য।

শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী।

গ্রন্থকারের নিবেদন।

প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে একদিন কোন ভক্তিভাজন ব্যক্তির সহিত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। তখন তিনি কলিকাতায় পার্ক ষ্ট্রীটে বাস করিতেছিলেন। তাঁহার কথা পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম বটে, কিন্তু তখন পর্য্যন্ত তাঁহাকে দর্শন করিবার সৌভাগ্য ঘটিয়া উঠে নাই। প্রথমে যখন তাঁহার সুন্দর গম্ভীর ও সৌম্যমূর্ত্তি দেখিলাম, তখন মনের মধ্যে একপ্রকার শান্তি অনুভব করিলাম। কাদম্বরীতে পাঠ করিয়াছিলাম ঋষিতনয় হারীত যখন বৃক্ষকোটরচ্যুত শুকশিশুকে মহামুনি কণ্বের আশ্রমে আনিয়াছিলেন তখন সেই পক্ষীশিশু মহামুনির এমন এক প্রকার শান্তিপূর্ণ প্রভাব অনুভব করিয়াছিল যে তাহার সমস্ত শারীরিক ও মানসিক ক্লেশ দূর হইয়াছিল। সে কি প্রকার শান্তি তাহা আমি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে দর্শন করিয়া কিঞ্চিৎ পরিমাণে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। সেই দিন হইতে তাঁহাকে মনে মনে গুরুর পদে বরণ করিয়াছি। ইচ্ছা ছিল তাঁহার নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া জীবনকে কৃতার্থ করিব, কিন্তু এ জীবনে বিধাতা তাহা ঘটিবার সুযোগ প্রদান করিলেন না। কিন্তু তাহাতে আমার বিশেষ কোন দুঃখ নাই, কারণ আধ্যাত্মিক জগতের বিচিত্র ও গূঢ় নিয়মানুসারে আত্মার সকল প্রকার অভাব পূর্ণ হইয়া থাকে। জড়জগতে দূরত্বের ব্যবধান অনেক সময়ে যোগের পক্ষে বিষম বাধা উৎপন্ন করিতে পারে বটে, কিন্তু আধ্যাত্মিক জগতে এপ্রকার কোন ব্যবধান দ্বারা যোগের ব্যাঘাত উৎপন্ন হয় না। এরাজ্যে প্রেমই যোগ ও মিলনের ভিত্তি ভূমি।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে প্রথম যেদিন দর্শন করিয়াছিলাম, তখন

হইতে যখনই সুবিধা হইয়াছে, তখনই তাঁহাকে দেখিয়া আসিয়াছি। কখন কখন তাঁহার চরণ স্পর্শ করিয়া পবিত্র হইয়াছি এবং তিনিও আমার মস্তক স্পর্শ করিয়া আশীর্ব্বাদদানে আমাকে ধন্য করিয়াছেন। যতই জীবনপথে অগ্রসর হইতেছি, ততই মনে এই দৃঢ়ধারণা হইতেছে যে এ যুগে এত বড় মহাপুরুষ বোধ হয় জন্মগ্রহণ করেন নাই। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে এরূপ মহাপুরুষের জীবনী এ পর্য্যন্ত এক-খানিও প্রকাশিত হইল না। কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার আত্মজীবনচরিত প্রকাশিত হওয়াতে সেই অভাব অনেক পরিমাণে বিদূরিত হইয়াছে। উক্ত পুস্তকখানি যে কিরূপ অমূল্য বস্তু হইয়াছে তাহা যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই অবগত আছেন। একদিন একজন শিক্ষিতা মহিলা বলিতেছিলেন "আমাকে যদি কেহ নির্ব্বাসন করে এবং জিজ্ঞাসা করে তুমি কি লইয়া নির্ব্বাসনে যাইতে চাও, আমি তখনি কোন প্রকার ইতস্ততঃ না করিয়া বলি মহর্ষির আত্মচরিতখানি সঙ্গে দিয়া আমাকে নির্ব্বাসন দাও।" ইহা অতি সত্য কথা।

প্রায় ৩।৪ বৎসর পূর্ব্বে আমার বন্ধু সিটিবুক সোসাইটির স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের "ভারতগৌরব গ্রন্থাবলী" পর্য্যায়ের জন্য আমাকে মহর্ষির একখানি ছোট জীবনচরিত রচনা করিতে অনুরোধ করেন। তদনুসারে বালক বালিকাদিগের উপযোগী করিয়া একখানি ছোট জীবনী রচনা করিয়া দিয়াছিলাম। কিন্তু তাহা লিখিবার সময়ে বারম্বার আমার মনে এই কথা উদিত হইতেছিল বঙ্গদেশে কি এমন একজনও শক্তিশালী লেখক নাই যিনি মহর্ষি দেবেন্দ্র-নাথের একখানি উৎকৃষ্ট জীবনী লিখিতে প্রবৃত্ত হয়েন। দুর্ভাগ্যবশতঃ এরূপ লোক পাওয়া গেল না। এই অবস্থাতে মনে মনে সঙ্কল্প করিলাম আমিই এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব। আমার ন্যায় অযোগ্য, ক্ষুদ্রশক্তি-

শালী ব্যক্তি মহর্ষির জীবনী লিখিবার যে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত তাহা জানিয়াও কেবল মনের আবেগে ও উৎসাহে এই কঠিন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। নানাপ্রকার অভাব ও অসুবিধার মধ্যে আমাকে এই কঠিন কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইয়াছে। এক্ষণে এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া যদি একজনের ও প্রাণে ভগবদলাভের পিপাসা জাগ্রত হয় অথবা একজন ও সেই অমৃতবস্তুর সন্ধানে গভীররূপে আত্মার রাজ্যে প্রবেশ করিয়া বর্ত্তমান বহির্মুখীন মানবসমাজে সেই অসীম সম্পদের বার্ত্তা প্রচার করেন, তাহা হইলে আমার সকল শ্রম ও চেষ্টা সার্থক হইবে।

এই পুস্তক প্রণয়নে পরমশ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আমাকে নানাপ্রকারে সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহার এ প্রকার সাহায্য না পাইলে আমি এই কার্য্যে অগ্রসর হইতে সাহস করিতে পারিতাম না। তৎপরে পরলোকগত শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী, ভক্তিভাজন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়, ভক্তিভাজন পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়, শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়, নবতি বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ শ্রীযুক্ত শ্রীনাথচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবাসী এবং Modern Review পত্রিকা দ্বয়ের সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এবং স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বন্ধুদিগের নিকট হইতে অনেক প্রকারে সহায়তালাভ করিয়াছি। এই পুস্তক রচনাতে মহর্ষির আত্মজীবন চরিত, রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের আত্মচরিত ও তাঁহার লিখিত অপ্রকাশিত ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা হইতে যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। মহর্ষিদেবের সম্বন্ধে আরও জ্ঞাতব্য বিষয় অনেক রহিয়া গেল, বিধাতা কৃপা করিলে তাহা পরিশিষ্টাকারে প্রকাশ করিয়া

পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত হইবার ইচ্ছা রহিল। যাহা হউক এক্ষণে করুণাময় পরমেশ্বর কৃপা করিয়া, নানাপ্রকার অসুবিধার ব্যাঘাত দূর করিয়া, তাঁহার ভক্তসন্তানের জীবনচরিত প্রকাশ মাদৃশ ক্ষুদ্র ব্যক্তি দ্বারা সম্পন্ন করিলেন, ইহা চিন্তা করিয়া সেই অদ্ভুতকর্ম্মার চরণে বারম্বার প্রণত হইতেছি।

গ্রন্থকার।

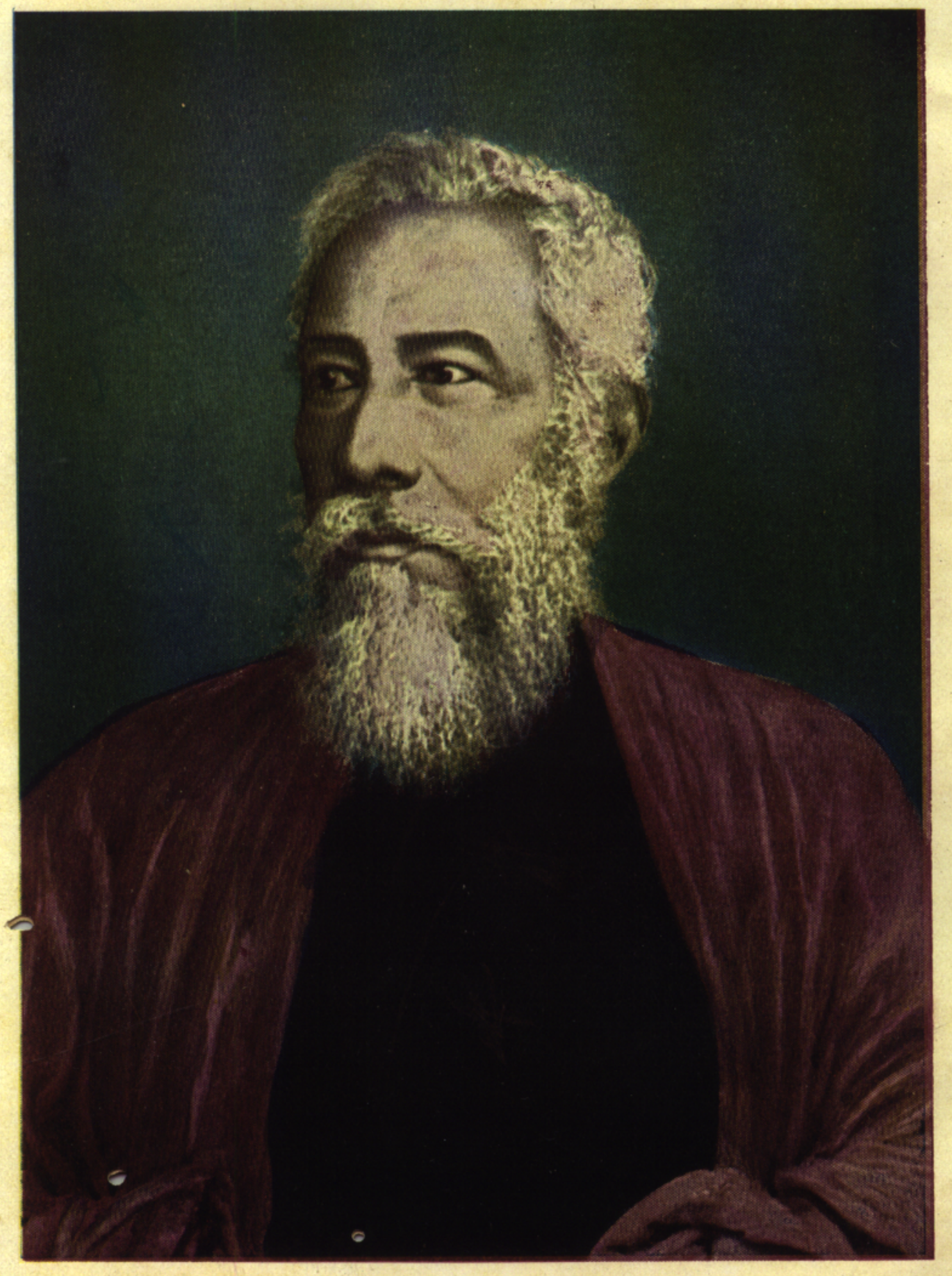
সূচী।

বিষয়			পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়—উপক্রমণিকা	...	...	১
দ্বিতীয় অধ্যায়—পূর্ব্ব পুরুষদিগের পরিচয়		...	৭
তৃতীয় অধ্যায়—জন্ম ও শৈশবকাল	...	...	১৬
চতুর্থঅধ্যায়—পিতামহীর মৃত্যু	...	...	২১
পঞ্চম অধ্যায়—বৈরাগ্য	...	...	২৮
ষষ্ঠ অধ্যায়—অনন্তের পরিচয়	...	...	৩৫
সপ্তম অধ্যায়—শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ		...	৩৯
অষ্টম অধ্যায়—ব্রাহ্মসমাজের তদানীন্তন অবস্থা		...	৪৭
নবম অধ্যায়—ব্রাহ্মসমাজে যোগদান	...	...	৫২
দশম অধ্যায়—ব্রাহ্মসমাজে যোগদান	...	...	৫৬
একাদশ অধ্যায়—শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত		...	৬১
দ্বাদশ অধ্যায়—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	...	৬৭
ত্রয়োদশ অধ্যায়—খৃষ্টীয়ান্‌দিগের সহিত সংঘর্ষ		...	৭৫
চতুর্দ্দশ অধ্যায়—শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু		...	৮০
পঞ্চদশ অধ্যায়—পিতৃ-বিয়োগ	...	...	৮৮
ষোড়শ অধ্যায়—পিতৃশ্রাদ্ধ	..	...	৯৫
সপ্তদশ অধ্যায়—কাশীযাত্রা	...	...	৯৯
অষ্টাদশ অধ্যায়—অগ্নিপরীক্ষা	...	...	১০৯
ঊনবিংশ অধ্যায়—ঋগ্বেদ প্রকাশ ও সত্যালোচনা		...	১১৮
বিংশ অধ্যায়—বর্দ্ধমানে ও কৃষ্ণনগরে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন		...	১২৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
একবিংশ অধ্যায়—ব্রাহ্ম-ধর্ম্মগ্রন্থ	১৩২
দ্বাবিংশ অধ্যায়—ভ্রমণ ও ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন	১৪০
ত্রয়োবিংশ অধ্যায়—গভীরতার জন্য ব্যাকুলতা ...	১৪৫
চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়—হিমালয় যাত্রা	১৫২
পঞ্চবিংশ অধ্যায়—হিমালয়-বাস ও তপস্যা ...	১৫৯
ষড়বিংশ অধ্যায়—বিধবা বিবাহের আন্দোলন ...	১৭২
সপ্তবিংশ অধ্যায়—সাম্বৎসরিক উৎসব	১৭৮
অষ্টবিংশ অধ্যায়—ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র	১৮৫
ঊনত্রিংশ অধ্যায়—কেশবের সহিত মিলন ও সত্যেন্দ্রনাথ	১৯১
ত্রিংশ অধ্যায়—ব্রাহ্মসমাজে প্রথম ব্যাখ্যান ...	২০১
একত্রিংশ অধ্যায়—উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে দুর্ভিক্ষ ...	২১২
দ্বাত্রিংশ অধ্যায়—ইণ্ডিয়ান মিররের উৎপত্তি ও সংস্কার ...	২২২
ত্রয়োত্রিংশ অধ্যায়—ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার	২২৯
চতুত্রিংশ অধ্যায়—সঙ্গতসভা ও হরদেব চট্টোপাধ্যায় ...	২৩৪
পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়—অনুষ্ঠান পদ্ধতি প্রণয়ণ ও কেশবের সহিত সম্বন্ধ	২৪১
ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়—কর্ম্মজীবন	২৫৫
সপ্তত্রিংশ অধ্যায়—স্ত্রীশিক্ষা ও ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের ব্যবস্থা	২৬১
অষ্টত্রিংশ অধ্যায়—ব্রাহ্মসমাজের বিস্তৃতি ও জ্ঞান প্রচার	২৬৭
ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়—বিরোধের পূর্ব্বাভাস ...	২৮০
চত্বারিংশ অধ্যায়—বিরোধ-ঝটিকা	২৯৪
একচত্বারিশ অধ্যায়—আরও দুইখানি পত্র ...	৩০৩
দ্বাচত্বারিশ অধ্যায়—কয়েকটি অনুষ্ঠান ও ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে মহর্ষির মত	৩১২
ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়—অভিনন্দন পত্র ও তাহার প্রত্যুত্তর	৩২

বিষয়		পৃষ্ঠা
চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়—ব্রাহ্মসম্মিলন সভা	...	৩৩৫
পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়—ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে উপদেশ	...	৩৫৪
ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়—ভ্রমণ ও কয়েকটি পত্র	...	৩৭১
সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়—আত্মীয়বিয়োগ ও অন্তিমকাল	...	৩৮১
অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়—পরিবারে তাঁহার শিক্ষা ও প্রভাব	...	৩৯৩
ঊনপঞ্চাশৎ অধ্যায়—জীবনের আর কয়েকটি বিশেষ ভাব		৪০৪

সূচীপত্র সমাপ্ত।



মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

U. RAY & SONS.

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রথম অধ্যায়।

উপক্রমণিকা।

ভারতের তপোবন এখনও নীরব হয় নাই। ভারতের হিমালয় এখনও অনেক সাধুপুরুষদিগের হৃদয়ে ব্রহ্মাণ্ডপতির পরিচয় প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করিতেছে। ভারতের উপনিষদ্ এখনও অমূল্য ব্রহ্মজ্ঞানের রত্নাকর স্বরূপ বর্ত্তমান থাকিয়া অনেক ব্যক্তিকে ব্রহ্মজ্ঞানরূপ সম্পদের অধিকারী করিতেছে। বহুশতাব্দী পূর্ব্বে আর্য্য ঋষিগণ যেপ্রকার অনন্তপ্রসারিত, সুনীল গগনমণ্ডলের নিম্নে দণ্ডায়মান হইয়া তটস্থ হইয়া করযোড়ে "ওঁ পিতা নোঽসি" বলিয়া ব্রহ্মাণ্ডপতিকে সম্বোধন করিয়া কৃতার্থ হইতেন, এখনও সেই প্রকার ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে মহাপুরুষেরা জন্মগ্রহণ করিয়া সেই বিশ্বরাজকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন। যদিও এক্ষণে কালের নিয়মানুসারে নানাপ্রকার পরিবর্ত্তনের স্রোত ভারতের উপর দিয়া নিরন্তর প্রবাহিত হইতেছে, তথাপি ইহা এখনও ব্রহ্মজ্ঞানরূপ গৌরব-কিরীট মস্তকে ধারণ করিয়া জগতের সমক্ষে দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে ভারতের একটি বিশেষ স্থান আছে। আমরা ভারতে বাস করিতেছি, ইহার সুনীল আকাশে প্রস্ফুটিত সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ নক্ষত্রাদি দর্শন করিতেছি, ইহার সুশ্যামল শস্যক্ষেত্র আমাদের হৃদয়ে আনন্দ বিধান করিতেছে, ইহার নানাপ্রকার কুসুমিত উদ্যান-

সমূহ আমাদের নয়নের তৃপ্তিসাধন করিতেছে, ইহার সুরস ফলসমূহ আমাদের রসনার পরিতোষ প্রদান করিতেছে, ইহার বিহঙ্গম-মুখরিত কুঞ্জকাননসমূহ আমাদিগের শ্রবণ-সুখ উৎপন্ন করিতেছে, এ সমস্ত সত্য, কিন্তু ইহার জন্য ভারতের কিয়ৎ পরিমাণ গৌরব থাকিলেও ইহাই যে ভারতের প্রধান গৌরব নয়, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। বাহিরের ঐশ্বর্য্য ভারতের অনেক আছে, কিন্তু যদি কোন ভারতবাসী ইহার জন্য আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে এই কথা বলিব যে তিনি এখনও ভারতকে চিনিতে পারেন নাই। এইজন্য দেখিতে পাইতেছি এক শ্রেণীর লোক পশ্চিমের অনুকরণে ব্যস্ত হইয়া ভারতের আদর্শ হইতে বহুদূরে সরিয়া যাইতেছেন। নব সভ্যতার আলোক তাঁহাদিগের চক্ষুকে এমন করিয়া মোহিত করিতেছে যে তাঁহারা প্রাচীন সভ্যতাকে মনুষ্যত্ব বিকাশের পরিপন্থী জ্ঞান করিয়া, যাহা কিছু নূতন তাহারই উপাসনাতে প্রবৃত্ত হইতেছেন। এরূপ লোকের সংখ্যা বর্ত্তমান সময়ে বিরল নহে। অন্যদিকে আর একদল লোক, যাহা কিছু প্রাচীন তাহাই আর্য্যঋষিদিগের সম্পত্তি জ্ঞান করিয়া অবিচারিত ভাবে সেই সমস্ত গ্রহণ করিতেছেন।

প্রায় এক শতাব্দী পূর্ব্বে যখন ডিরোজিও শিক্ষিত বঙ্গবাসীগণের হৃদয় ও মনের উপর রাজত্ব করিতেছিলেন তখন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, মাইকেল মধুসূদন প্রভৃতি সুবিখ্যাত বাঙ্গালী যুবকগণ ইংরাজী শিক্ষার আলোকে ভারতের যাহা কিছু সমস্তকে অবজ্ঞা করিয়া সমস্ত বঙ্গদেশকে এক নূতন অজ্ঞাত রাজ্যের দিকে লইয়া চলিতেছিলেন। এই সময়ের সামাজিক অবস্থা আলোচনা করিলে দেখা যায় যে দেবেন্দ্রনাথ যখন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তখন তাঁহাকে কি প্রকার প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিতে

হইয়াছিল। হিন্দুকলেজে ডিরোজিও যখন শিক্ষকরূপে প্রবেশ করেন তাঁহার অদ্ভুত প্রতিভা তখনকার যুবকদিগের মনে এমন এক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে তাহা দ্বারা বঙ্গসমাজে ঘোরতর সামাজিক বিপ্লব উপস্থিত হয়। তাঁহার নিয়ম ছিল যে তিনি নিজে ছাত্রদিগের সহিত স্বাধীনভাবে তর্ক বিতর্ক করিতেন এবং তাঁহাদিগকে এই ভাবে তর্ক বিতর্ক করিবার জন্য আহ্বান করিতেন। এইরূপে ছাত্রদিগের মনে স্বাধীন চিন্তা-শক্তির বিকাশ হইতে লাগিল। তাঁহার সহিত মিশিয়া পাশ্চাত্য ভাবসমূহ তাঁহাদের মনে কার্য্য করিতে লাগিল। এই সমস্ত নূতন ভাব তাঁহাদিগের নিকট হিন্দুসমাজের প্রাচীন ভাবসমূহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বোধ হইল। সুতরাং ঐ সমস্ত ভাব অনুকরণ করিতে তাঁহারা প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার ফলস্বরূপ আমরা দেখিতে পাই যে তাঁহারা প্রায় সকলেই সুরাপানের অভ্যাস করিয়াছিলেন। ষোল সতর বৎসরের বালকেরা গোলদিঘির ভিতরে বসিয়া গোমাংস ভক্ষণ ও সুরাপান করিত এবং তাহাতে তাহাদের পুরুষত্বলাভ হইত বলিয়া মনে করিত। এমন কি পিতা স্বহস্তে পুত্রকে সুরাপান করিতে দিতেন। যখন তাহাদের মধ্যে এই প্রকার উচ্ছৃঙ্খলতা প্রবেশ করিল তখন তাহারা যাহা কিছু প্রাচীন, তাহাই অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিল। তখনকার একজন শিক্ষিত ব্যক্তি বলিতেছেন—"If there is anything that we hate from the bottom of our heart, it is Hinduism"—"যদি হৃদয়ের সহিত কিছু ঘৃণা করি তবে তাহা হিন্দু ধর্ম্ম।" এই ব্যক্তি পরে ডেপুটি কলেকটর হইয়া কৃষ্ণনগরে গিয়াছিলেন।

আর একজন অতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তি বলিতেছেন—"আমাদের দেশে বহুকাল হইতে সুরাপান বিশেষ দোষাকর ও পাপজনক বলিয়া কীর্ত্তিত

হইয়াছে ; এবং মদ্য স্পর্শ করিলে শরীর অপবিত্র হয়, এইরূপ বিশ্বাস এদেশের লোকের মনে জন্মিয়াছে। কিন্তু আমাদের মনে এই স্থির হইল যে যখন এমন বুদ্ধিমান, বিদ্বান ও সভ্যজাতীয়েরা ইহা আদর পূর্ব্বক ব্যবহার করিতেছেন, তখন ইহা অহিতজনক কখনই নহে। অতএব ইহা পান না করিলে সভ্যতাই বা কিরূপে হইবে আর পূর্ব্ব কুসংস্কারই বা কিরূপে যাইবে ? হিন্দুকলেজের সুশিক্ষিত ছাত্রগণের মধ্যে যাঁহারা এদেশের সমাজ সংস্কার করিতে ব্রতী হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলে সুরাপান করিতেন। আমরা চারি পাঁচ জন আত্মীয় কখন কখন আহারের সঙ্গে মৃদু মদিরা পান করি এবং বড়ই সুখী হই।"

ডিরোজিও হিন্দু কলেজে প্রবেশ করিয়া অল্পদিনের মধ্যে এক সভা স্থাপন করেন, তাহার নাম Academic Association। তিনি নিজে ইহার সভাপতি ছিলেন। রসিককৃষ্ণ মল্লিক, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রাধানাথ শিকদার, দক্ষিণা-রঞ্জন মুখোপাধ্যায়, হরচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি ঐ সভাতে বক্তৃতা করিতেন। এখানে হিন্দু সমাজের রীতি নীতির সমালোচনা হইত। এ সম্বন্ধে একজন বক্তা বলিতেছেন—"হিন্দুধর্ম্মের আচার ব্যবহার সাধারণের সমক্ষে আলোচিত হইত এবং তাহাদের প্রতি সকলে অত্যন্ত অশ্রদ্ধা ও ঘৃণার ভাব প্রকাশ করিতেন। পাশ্চাত্য দার্শনিক হিউমের মতসমূহ অতি আদরের সহিত গৃহীত হইত। হিন্দুধর্ম্ম অতি ভ্রম- ও কুসংস্কারপূর্ণ, সুতরাং উহা জ্ঞানীদিগের গ্রহণীয় নহে। হিন্দু সমাজের স্ত্রীলোকদিগের অন্তঃকরণ জ্ঞানের দ্বারা আলোকিত করিতে হইবে, নচেৎ আমাদের দেশের অবস্থা কখনও উন্নতি লাভ করিতে পারিবে না।"

আর একজন বলিতেছেন—"ছেলেরা উপনয়নকালে উপবীত লইতে চাহিত না। অনেকে সন্ধ্যা আহ্নিক পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক ঠাকুরঘরে প্রবিষ্ট করাইয়া দিলে তাহারা সন্ধ্যা আহ্নিকের পরিবর্ত্তে হোমারের ইলিয়ড গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত অংশ-সকল আবৃত্তি করিত। অনেক বালক ইহা অপেক্ষা অতিরিক্ত সীমাতে যাইত। তাহারা রাজপথে যাইবার সময়, মুণ্ডিত-মস্তক ফোঁটাধারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দেখিলেই তাঁহাদিগকে বিরক্ত করিবার জন্য আমরা গরু খাই গো, আমরা গরু খাই গো, বলিয়া চীৎকার করিত। কেহ কেহ স্বীয় স্বীয় ভবনের ছাদের উপর উঠিয়া প্রতিবেশী-গণকে ডাকিয়া বলিত, 'এই দেখ মুসলমানের জল মুখে দিতেছি' এই বলিয়া তামাক খাইবার টিকা মুখে দিত।"

হিন্দু সমাজের মধ্যে যখন এইরূপ ঘোরতর বিপ্লবের সূচনা দেখা গেল, সেই সময়ে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারক ডক্‌ সাহেব উৎসাহের সহিত খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার ফলে মহেশচন্দ্র ঘোষ, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুসূদন দত্ত প্রভৃতি অনেক শিক্ষিত যুবক খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। এই সময়ে প্রসন্ন কুমার ঠাকুর মহাশয়ের একমাত্র পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর এবং গুরুদাস মৈত্র প্রভৃতি আরও কয়জন হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ইহাতে দেশের মধ্যে এক তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। সুতরাং বাঙ্গলা দেশের পক্ষে ইহা এক সন্ধিস্থল বলিতে হইবে।

এই সময়ে দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি মহোদয়গণ হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুস্থানের গৌরব অকুতোভয়ে ও দৃঢ়তার সহিত প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। যদি তাঁহারা এই ভাবে দণ্ডায়মান না হইতেন, তাহা হইলে বঙ্গদেশের বহু হিন্দু গৃহস্থের গৃহ

হইতে হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুর আচার ব্যবহার নিষ্কাশিত হইত। একদিকে ইংরাজী শিক্ষাপ্রাপ্ত নব্য যুবকদল বাঙ্গলা দেশকে যেরূপ পাশ্চাত্য সভ্যতার দিকে প্রবলবেগে লইয়া চলিতেছিলেন, অন্যদিকে সেইরূপ রাজা রাধাকান্ত দেব প্রমুখ প্রাচীনপন্থীগণ বাঙ্গালীকে পৌরাণিক যুগের ভারতীয় সভ্যতা ও ধর্ম্মের দিকে আকর্ষণ করিতেছিলেন। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে এই প্রাচীন ও নবীনের সংঘর্ষ আরম্ভ হইয়াছিল। এই সময় হইতে নবযুগের সূত্রপাত হইল। এই যুগসন্ধিস্থলে দেবেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সঙ্কটের মধ্যে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়া নানাপ্রকার পরিবর্ত্তনের প্রবল ব্যাত্যাউদ্বেলিত হিন্দুসমাজ-সমুদ্রে স্থির ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া কেমন করিয়া জীবনের ধ্রুবতারার প্রতি দৃষ্টি স্থির রাখিয়া আপনার লক্ষ্য সাধন করিয়াছিলেন, এই পুস্তকে তাহারই কিঞ্চিৎ আভাস প্রদান করা গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য। যিনি দেবেন্দ্রনাথের বাল্যকাল হইতে তাঁহাকে আপনার উদ্দেশ্য সাধনের যন্ত্রস্বরূপ করিয়া ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাঁহার হস্ত এই মহৎ জীবনের প্রত্যেক ঘটনাতে পাঠকেরা দেখিতে পাইবেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

পূর্ব্বপুরুষদিগের পরিচয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে যখন ইংরাজেরা কলিকাতাতে আপনাদের রাজ্য সংস্থাপনের জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন, তখন জয়রাম ঠাকুর নামক এক ব্যক্তির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহার চারি পুত্র ছিল। আনন্দরাম, নীলমণি, দর্পনারায়ণ ও গোবিন্দরাম ঠাকুর। নীলমণি ঠাকুর চট্টগ্রামে সেরেস্তাদারি কর্ম্ম করিতেন। তাহাতে তাঁহার বিলক্ষণ উপার্জ্জন হইত। তিনি আপনার ব্যয়ের জন্য যৎসামান্য অর্থ রাখিয়া অবশিষ্ট সমুদায় অর্থ তাঁহার ভ্রাতা দর্পনারায়ণ ঠাকুরের নিকট পাঠাইয়া দিতেন। দর্পনারায়ণ কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ বারাণসী ঘোষের সহিত একত্রে তেজারতি করিতেন। তাহাতে তাঁহাদের বিলক্ষণ লাভ হইত। রাণী ভবানীর রংপুরের জমিদারি যখন বিক্রয় হয় তখন তাঁহারা ৯২০০০৲ টাকাতে সেই জমিদারি ক্রয় করেন। কিছুদিন পরে নীলমণি ঠাকুর সেরেস্তাদারি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিলেন। তিনি তাঁহার ভ্রাতা দর্পনারায়ণের নিকট আপনার অংশ চাহিলেন। দর্পনারায়ণ তাঁহাকে টাকা দিতে স্বীকার করিলেন, কিন্তু জমিদারির অংশ দিতে সম্মত হইলেন না। বলা বাহুল্য যে নীলমণি ঠাকুরের টাকাতেই ইনি ঐ জমিদারি ক্রয় করেন। এইরূপে দুই ভ্রাতার মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইল। নীলমণি ঠাকুর অতি ধার্ম্মিক পুরুষ ছিলেন। তিনি এই বিবাদে মনে অত্যন্ত কষ্ট পাইলেন এবং তাঁহার ভ্রাতাকে সমস্ত দান করিয়া বাড়ীর দামোদর বিগ্রহকে লইয়া বাটী হইতে প্রস্থান করিলেন।

এই ঘটনা দ্বারা বুঝা যায় নীলমণি ঠাকুর কেমন ধার্ম্মিক ছিলেন এবং সংসারের প্রতি তাঁহার কেমন বৈরাগ্য ছিল। সমস্ত জীবনে যাহা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহার মমতা পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র ইষ্টদেবতাকে লইয়া প্রস্থান করিলেন এবং তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া বাস করিতে লাগিলেন, এপ্রকার ধর্ম্মে অনুরাগ এবং সংসারে বিরাগ বড় একটা দেখা যায় না। এই ব্যক্তির বংশধর যে একজন অসাধারণ ধার্ম্মিক পুরুষ হইবেন এবং ভারতের মুখ উজ্জ্বল করিবেন, তাহা বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

দুই ভ্রাতার বিবাদের কথা যখন কলিকাতা সহরে রাষ্ট্র হইল, তখন সহরের কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মিলিত হইয়া ইহা মিটাইয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সালিসি করিয়া এই স্থির করিলেন যে দর্পনারায়ণ ঠাকুর, নীলমণি ঠাকুরকে একলক্ষ টাকা প্রদান করিবেন। সেই সময়ে শ্রীযুক্ত বৈষ্ণবদাস শেঠ নামক একজন সম্ভ্রান্ত তন্তুবায় নীলমণি ঠাকুরকে জোড়াসাঁকোতে বাটী নির্ম্মাণের জন্য কয়েক বিঘা জমি প্রদান করেন। নীলমণি ঠাকুর ঐ জমির উপর বাটী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। ঐ জমির উপর এখন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ভদ্রাসন বাটী দণ্ডায়মান রহিয়াছে। নীলমণি ঠাকুরের পাঁচ পুত্র ছিল। রামতনু, রামরতন, রামলোচন, রামমণি ও রামবল্লভ। রামমণি ঠাকুরের তিন পুত্র। রাধানাথ, দ্বারকানাথ, ও গুণানাথ। রামলোচন ঠাকুরের সন্তানাদি ছিল না, সেইজন্য তিনি দ্বারকানাথ ঠাকুরকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করেন।

দ্বারকানাথ ঠাকুর বাল্যকালে শেরবরণ (Mr. Sherbourne) নামক জনৈক ইংরাজের নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। পরে আডামস্ (Rev. William Adams) নামক একজন পাদ্রির নিকটে অধ্যয়ন



"প্রিন্স" দ্বারকানাথ ঠাকুর।

করেন। এই সময়ে তাঁহার সহিত কলিকাতার অনেক ইংরাজের পরিচয় হয়। যৌবনকালে তিনি রাজা রামমোহন রায়ের সহচর এবং বন্ধু ছিলেন। যখন রাজা রামমোহন রায় বিষয়কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া রংপুর হইতে কলিকাতায় আগমন করেন, তখন চব্বিশ-পরগণার অন্তর্গত টাকীর জমিদার কালীনাথ মুন্সী, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতি জনকয়েক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার কার্য্যে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয় সর্ব্বপ্রধান। বাল্যকালে তিনি ইংরাজী প্রভৃতি ভাষা শিক্ষা করিয়া আইন শিক্ষা আরম্ভ করেন এবং সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রভাবে অতি অল্প সময়ের মধ্যে ঐ শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। আইন সম্বন্ধে তিনি এরূপ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন, যে, এ সম্বন্ধে অনেক লোক তাঁহার নিকট হইতে পরামর্শ গ্রহণ করিতে আসিতেন। বাঙ্গালা দেশের, এমন কি উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ তাঁহার নিকট এ বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। ইহাতে তাঁহার প্রচুর অর্থাগম হইতে লাগিল। যখন নিমক বিভাগের সেরেস্তাদারি এবং ২৪ পরগণার কালেকটরের পদ শূন্য হইল, তখন গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে উপযুক্ত মনে করিয়া ঐ পদ প্রদান করেন। তিনি এরূপ দক্ষতার সহিত ঐ কার্য্য সম্পন্ন করেন, যে, ছয় বৎসর পরে যখন শুল্ক, নিমক এবং রাজস্ব বিভাগের (Board of Custom Salt and Revenue) দেওয়ানের পদ শূন্য হয় তখন গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সেই পদ প্রদান করেন।

কিন্তু কিছুদিন পরে অধিক অর্থলাভের আকাঙ্ক্ষাতে তিনি ঐ পদ পরিত্যাগ করিয়া উইলিয়ম কার এবং উইলিয়ম প্রিন্সেপ (Mr. William Carr & Mr. William Princep) সাহেবদ্বয়ের সহিত

মিলিত হইয়া কার ঠাকুর কোং (Carr Tagore & Co.) নামক এক যৌথ ব্যবসা স্থাপন করেন। ইউরোপীয়দিগের সহিত মিলিত হইয়া দেশীয় লোকের কারবার করার এই প্রথম দৃষ্টান্ত। এইরূপ কার্য্যে উৎসাহ প্রদানের জন্য তখনকার গবর্ণর জেনেরাল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক তাঁহার এই কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে এক পত্র লিখেন। এই কোম্পানি স্থাপন করিবার পরে তিনি ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক স্থাপন করেন। এই ব্যাঙ্কে রমানাথ ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং অন্যান্য কয়েক জন সম্ভ্রান্ত ইংরাজ ও বাঙ্গালী অংশীদার ছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। যাহা হউক দ্বারকানাথ ঠাকুর এই সময়ে বাংলা দেশের মধ্যে একজন প্রধান ক্ষমতাশালী ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হয়েন। তাঁহার সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার যশোবৃদ্ধিও হইতে লাগিল। এই সময়ে তিনি রাজসাহী, পাবনা, রংপুর, যশোহর, ও কটকের বৃহৎ বৃহৎ জমিদারী ক্রয় করেন।

তিনি যে কেবল আপনার সাংসারিক উন্নতির জন্য শক্তি ও সময় নিয়োগ করিতেন তাহা নহে, কিন্তু স্বদেশের উন্নতিকামনায় তিনি সকল প্রকার দেশহিতকর কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। হিন্দু কলেজ কমিটির তিনি একজন উৎসাহী সভ্য ছিলেন। কলিকাতা সহরে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হইবার সময়ে তিনি প্রতি বৎসরে ২০০০ টাকা করিয়া তিন বৎসরের জন্য ৬০০০ টাকা সাহায্য করেন। চিকিৎসা-বিদ্যা অধ্যয়নের জন্য দুইটি বাঙ্গালী ছাত্রকে ইংলণ্ডে প্রেরণ করিয়া তাহাদের সমস্ত ব্যয়ভার গ্রহণ করেন। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার জন্য কলিকাতাতে যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সভা হইয়াছিল তাহার প্রত্যেক সভাতে উপস্থিত হইয়া অত্যন্ত সাহসের সহিত তীব্র ভাষাতে স্বাধীনতার পক্ষ সমর্থন করিয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

তাঁহার মধ্যে একাধারে প্রতিভা, বুদ্ধি, তেজস্বিতা ও সংস্কারপ্রিয়তা বর্ত্তমান ছিল। রাজা রামমোহন রায়ের সহিত মিলিত হইয়া তিনি সতীদাহের বিরুদ্ধে মহা আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন। দেশীয় লোক ও ইংরাজদিগের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপনার্থ ইংরাজদিগের ভোজে যোগদান করিতেন এবং তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার বাগানে আনিতেন। লর্ড অকল্যাণ্ড প্রায়ই তাঁহাকে তাঁহার বারাকপুরের প্রাসাদে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যাইতেন। এইরূপে তাঁহার সহিত কলিকাতার সম্ভ্রান্ত ইংরাজদিগের বন্ধুতা হইয়াছিল। তখনকার হিন্দুসমাজ যে প্রকার জাতি সম্বন্ধীয় কঠোর নিয়মসমূহের দ্বারা পরিচালিত হইত, তাহা স্মরণ করিলে দ্বারকানাথের পক্ষে অহিন্দুদিগের ভোজে আহার করা অথবা তাহাদিগকে আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করা কত সাহস ও বীরত্বের কার্য্য তাহা পাঠক বুঝিতে পারিতেছেন। মেডিক্যাল কলেজে শব ব্যবচ্ছেদ, তখনকার দিনে সামাজিক হিসাবে অত্যন্ত কঠিন কার্য্য ছিল। কিন্তু তিনি সে সমস্ত গ্রাহ্য না করিয়া ছাত্রদিগকে উৎসাহ দিবার জন্য নিজে শব-ব্যবচ্ছেদ-গৃহে উপস্থিত থাকিতেন। যখন তাঁহার এইরূপ সম্পদ ও যশের মধ্যাহ্ন কাল, তখন তিনি ইংলণ্ডে গমনের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

তাঁহার বন্ধু এবং অগ্রবর্ত্তী মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের ন্যায় স্বদেশের উন্নতি-কামনা হৃদয়ে ধারণ করিয়া ১৭৬৪ শকে (১৮৪২ খৃঃ অব্দ ৯ই জানুয়ারি) তিনি ইংলণ্ডে গমন করেন। যাত্রার দিনে তাঁহাকে বিদায় দিবার জন্য কলিকাতার প্রায় সমস্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইংলণ্ডে গমনের পথে তিনি রোম পরিদর্শন করেন। তথায় পোপ তাঁহাকে আদরের সহিত অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর লণ্ডনে আগমন করিয়াছেন, এই বার্ত্তা শ্রবণে

তথাকার অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করেন। একবার মহারাণী ভিক্টোরিয়া তাঁহাকে তাঁহার প্রাসাদে নিমন্ত্রণ করেন এবং ভারত সম্বন্ধে তাঁহার সহিত অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা বলেন। এইরূপে তিনি ইংলণ্ডে বহু সম্মান লাভ করিয়া ১৮ অক্টোবর ফ্রান্সে উপস্থিত হয়েন। রাজা লুই ফিলিপ এবং তাঁহার রাণী নিজ ভবনে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান।

যখন তিনি ফ্রান্সে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন একটি হাস্যকর ঘটনা ঘটিয়াছিল। একদিন ফ্রান্সে একটি ভোজে তাঁহার নিমন্ত্রণ হইয়াছিল, সেখানে অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে একজন তাঁহার এই প্রকার আদর অভ্যর্থনা দেখিয়া ঈর্ষাপরবশ হইয়া তাঁহাকে মল্লযুদ্ধে আহ্বান করেন। দ্বারকানাথও পশ্চাৎপদ হইবার লোক ছিলেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ অন্য এক প্রকোষ্ঠে গমন পূর্ব্বক ভারতীয় পালোয়ানের বেশে সজ্জিত হইয়া সংগ্রাম স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সকলে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। তখন তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁহাকে এই প্রকারে সজ্জিত হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন "আমাদের দেশের পালোয়ানেরা এইরূপ মালকাছা দিয়া কুস্তি করে।" তখন সে ব্যক্তি যুদ্ধ হইতে নিরস্ত হইল।

ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে অবস্থান করিবার সময়ে তিনি অপরিমিত ব্যয় করিতেন। এই প্রকার শ্রুত হওয়া যায় তিনি একদিন ফ্রান্সে একটি ভোজে যত মহিলা উপস্থিত হইয়াছিলেন তাঁহাদের সকলকে এক এক-খানি উৎকৃষ্ট শাল উপহার দিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট প্রার্থী হইয়া আসিলেই তিনি অকাতরে দান করিতেন। এইরূপে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে প্রভূত যশ উপার্জ্জন করিয়া দেশে ফিরিলেন। ১৭৮৫ শকের শেষ

ভাগে যখন স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন, তখন হিন্দুসমাজে এক মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল। সকলে তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে বলিল। কিন্তু তিনি তাহা করিতে অস্বীকার করিলেন। হিন্দুসমাজের দলপতিগণ যখন দেখিলেন তিনি কিছুতেই আপনার সঙ্কল্প হইতে বিচলিত হইলেন না, তখন অগত্যা তাঁহাদিগকে নিরস্ত হইতে হইল। এই ঘটনার তিন বৎসর পরে তিনি দ্বিতীয়বার ইংলণ্ড গমন করেন। কিন্তু এবার তাঁহাকে আর স্বদেশে ফিরিতে হইল না। ১৮৪৬ খৃঃ অব্দে ১লা আগষ্ট তারিখে তিনি সেখানে পরলোক গমন করেন। তাঁহার পরলোক গমনের পর বিলাতের অনেক সভাতে তাঁহার জন্য শোক প্রকাশ করা হয় এবং Times প্রভৃতির ন্যায় প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রসমূহে তাঁহার প্রশংসা পূর্ণ অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

দ্বারকানাথ ঠাকুর কি ভাবে ইংলণ্ডে অবস্থান করিতেন তাহা শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিম্নলিখিত বর্ণনা হইতে আমরা বুঝিতে পারি। "দ্বারিকানাথ ঠাকুরের সর্ব্ব সুদ্ধ ১৭ জন অনুচর ছিল। তার মধ্যে দুইজন এ দেশীয় (বিলাতি) ভৃত্য। তা ছাড়া একজন সেক্রেটারি, একজন Interpreter, সঙ্গীত-ওস্তাদ জর্ম্মান একজন, চিকিৎসক Dr. Martin এবং অপর একজন মিলে এই পঞ্চ সহচর সর্ব্বদা কাছে থেকে তাঁর আবশ্যক-মত কাজকর্ম্ম তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত ছিল। আমার ছোট কাকা নগেন্দ্রনাথ আর দূর সম্পর্কীয় পিতৃব্য নবীন বাবু তাঁকে মাঝে মাঝে দেখতে আসতেন। ছোট কাকার গায়ে এক বহুমূল্য সবুজ রংএর শাল ছিল আর তাঁর জ্বলজ্বলে কাল চোখের প্রশংসা সর্ব্বত্র শোনা যেত।" কিছুদিন ইংলণ্ডে থাকিবার পর তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া গেল। এই সময়ে তিনি দেবেন্দ্রনাথকে যে সমস্ত পত্র লেখেন, তাহা হইতে আমরা পরিষ্কার বুঝিতে পারি দেবেন্দ্র-

নাথ যে পথ অবলম্বন করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিলেন তাহা তাঁহার মনোমত ছিল না। তিনি এক পত্রে লিখিতেছেন—"আমার সকল বিষয় সম্পত্তি যে নষ্ট হইয়া যায় নাই ইহাই আমার আশ্চর্য্য বোধ হয়। তুমি পাদ্রিদের সহিত বাদ প্রতিবাদ করিতে ও সংবাদপত্রে লিখিতেই ব্যস্ত, গুরুতর বিষয় রক্ষণ ও পরিদর্শনকার্য্যে তুমি স্বয়ং যথোচিত মনোনিবেশ না করিয়া তাহা তোমার প্রিয়পাত্র আমলাদের হস্তে ফেলিয়া রাখ। ভারতবর্ষের উত্তাপ ও আবহাওয়া সহ্য করিবার শক্তি আমার নাই, যদি থাকিত আমি অবিলম্বে লণ্ডন পরিত্যাগ করিয়া তাহা নিজে পর্য্যবেক্ষণ করিতে যাইতাম।" সত্য সত্যই দেবেন্দ্রনাথ বিষয়ীর সন্তান হইয়া বিষয়কে এমন করিয়া যে অগ্রাহ্য করিতে শিক্ষা করিয়াছেন ইহাতে আমরা সেই বিশ্বনিয়ন্তার হস্ত দেখিতে পাই। তিনি যদি বিষয় রক্ষা ও পরিদর্শনকার্য্যে একটু মনোযোগী হইতেন, তাহা হইলে হয়ত ভবিষ্যতে তাঁহাকে পিতৃ ঋণ হইতে মুক্ত হইবার জন্য এত কষ্ট পাইবার প্রয়োজন হইত না।

১৭৬৮ শকে ফাল্গুন মাসে দ্বারকানাথ ঠাকুর এক উৎকট পীড়ায় আক্রান্ত হয়েন। তাঁহার চিকিৎসক ডাক্তার মার্টিনের পরামর্শে তিনি Sussex জেলার অন্তর্গত সমুদ্রের উপকূলে Worthing নামক বন্দরে গিয়া বাস করেন। তখন কি ভাবে তিনি দিন যাপন করিতেন সে সম্বন্ধে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় লিখিতেছেন—"রোগের যন্ত্রণায় বড়ই অশান্তি ছটফটানি হয়েছিল। ৬টার সময় উঠে গাড়ী করে বেড়িয়ে ফিরে এসে অল্প নিদ্রা যেতেন—তারপর আহার; তাঁর ভৃত্য হলির তয়ের কারি ভাত আর একটু কমলা নেবুর জেলি, এই মাত্র আহার। পরিচ্ছদের মধ্যে একটি সুন্দর কাশ্মীরি শাল তাঁর গায়ে থাকত। তাঁকে দেখবার জন্য মহিলারা দলে দলে দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে থাকতেন।

Duchess of Cleveland প্রত্যহ তাঁকে দেখতে আসতেন, Duchess of Inverness রোজ পত্র দ্বারা তাঁর সংবাদ নিতেন। তিনি তাঁর অমায়িক ব্যবহারের জন্য সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করেছিলেন। এত পীড়ার প্রকোপেও তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি হয়নি। কখনও কোন বিষয়ে ত্রুটি জানিয়ে কারও প্রতি দোষারোপ করতেন না, সর্ব্বদাই সন্তুষ্টচিত্তে, হাসি মুখে থাকতেন। অতি অকর্ম্মা ভৃত্যও তাঁর অনুগ্রহ ও বদান্যতা হতে বঞ্চিত ছিল না। স্বদেশী আচার ব্যবহারের তিনি অনুরক্ত ছিলেন। দেশীয় পরিচ্ছদ পরিধান করতেন। আলবোলার নল সর্ব্বদাই তাঁর হাতে থাকত, তাঁর ভৃত্য হুলি তামাক সেজে দিত। তাঁর একটি কাঁচ-কড়া মসলার ডিবে ছিল। গরম তাঁর আদবে সহ্য হত না, জানালা খুলে শুতেন। প্রত্যহ সকালে স্নান করতেন, আর বরফ-জল ভাল বাসতেন.....তাঁর শরীর ক্রমে দুর্ব্বল হয়ে পড়ল, তিনি আপনার আসন্ন মৃত্যু আপনি বেশ বুঝতে পেরেছিলেন। কেমন আছেন কেহ জিজ্ঞাসা করলে মধুর গম্ভীরস্বরে বলতেন "I am content" আমি শান্তিতে আছি। ক্রমে তাঁর শরীর আরো অবসন্ন হতে লাগল—তাঁকে স্থানান্তরিত করা আবশ্যক হয়ে পড়ল। অবসর বুঝে সেই স্থান হতে জুলাই মাসের ২৭ তারিখে Dr. Martin তাঁকে সঙ্গে করে লণ্ডনে নিয়ে যান এবং ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ১লা আগষ্টে তিনি পরলোক গমন করেন।"

তৃতীয় অধ্যায়।

জন্ম ও শৈশবকাল।

১৭৩৯ শকের ৩রা জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার ভারতের একটি বিশেষ দিন। ঐ দিন প্রভাতে সূর্য্যগ্রহণ হইয়াছে। কলিকাতার জোড়াসাঁকো-নিবাসী সুবিখ্যাত শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের গৃহে গ্রহশান্তি-উদ্দেশে মহাধুম লাগিয়াছে। শঙ্খঘণ্টাধ্বনিতে সমস্ত গৃহ পরিপূর্ণ। পুরোহিত ও ব্রাহ্মণেরা নানা প্রকার দানসামগ্রী দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া গৃহপ্রাঙ্গন পরিপূর্ণ করিয়া সংস্কৃতমন্ত্রোচ্চারণ করিতেছেন। এমন সময়ে দেবেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করিলেন এবং জন্মাশৌচের জন্য সকল প্রকার অনুষ্ঠান বন্ধ হইয়া গেল। ইহা হইতে আমরা বিধাতার এক ইঙ্গিত গ্রহণ করিতে পারি। যিনি ভবিষ্যতে সকল প্রকার পৌত্তলিক ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে বদ্ধপরিকর হইয়া দণ্ডায়মান হইবেন, তাঁহার জন্ম দ্বারা সমস্ত পৌত্তলিক ক্রিয়াকলাপ বন্ধ হইয়া গেল। এই দিন এক বিশেষ দিন। যিনি প্রাচীন কালের ঋষিদিগের বহু সাধন ও তপস্যালব্ধ ব্রহ্মজ্ঞান পুনরায় ভারতে প্রতিষ্ঠিত করিবেন, আজ তাঁহার জন্মদিন। ভারতবর্ষ বহুকাল হইতে নানাবিধ কারণে পৌত্তলিকতার কর্ম্মাড়ম্বরের মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া ছিল এবং আপনার গৌরব বিস্মৃত হইয়া দীনের ন্যায় দিন যাপন করিতেছিল; কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করিয়া ভারতের ঋষিদিগের সাধন পথ অনুসরণ করিয়া বিশুদ্ধ জ্ঞানানুমোদিত ধর্ম্মের উজ্জ্বল আলোক হস্তে ধারণ করিয়াছিলেন এবং নানাপ্রকার প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে সংগ্রাম করিতে করিতে ধীরে ধীরে আপনার জীবনকে সফল করিয়া তুলিয়াছিলেন। তিনি যখন জন্ম-



মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়।

গ্রহণ করিয়াছিলেন তখন তাঁহার পিতার অবস্থা খুব ভাল ছিল না। তখনও তাঁহার গোলপাতার ঘর বর্ত্তমান ছিল। সেই গোলপাতার ঘরে দেবেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করিলেন। অনেকে মনে করেন দেবেন্দ্রনাথ অতুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। তিনি বলিতেন "যখন আমার তিন বৎসর বয়স তখন আমি একটা ছোট মোড়ার উপরে দাঁড়াইয়া ঘরের কপাটের খিল খুলিতাম, আমার বেশ মনে পড়ে। প্রথম যেদিন শাল আমার গাত্রে উঠিল, তাহাও আমার মনে পড়িতেছে।" কিন্তু তাঁহার জন্মগ্রহণের পর হইতে তাঁহার পিতার ঐশ্বর্য্য ও সম্পত্তি, খ্যাতি ও প্রতিপত্তি প্রবল বেগে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

বাল্যকালে তাঁহার জীবনে একটি এমন ঘটনা ঘটিয়াছিল, যাহা ভাবিলে অতি আশ্চর্য্য হইতে হয়। একদিন খেলা করিতে করিতে তিনি ঠাকুরঘরে প্রবেশ করেন। সেখানে শালগ্রাম শিলা দেখিয়া তাহা খেলনা মনে করিয়া বাহির করিয়া আনিলেন এবং খেলা শেষ হইয়া গেলে তাহা দুরে নিক্ষেপ করিয়া দিলেন। যিনি ভবিষ্যতে সকল প্রকার সৃষ্ট ও কল্পিত বস্তুর পূজার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিয়া একমাত্র অনন্তমহিমাময় পরমপুরুষের পূজা জীবনে, সমাজে ও দেশে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিবেন, তিনি এই বাল্যকালেই তাহার পরিচয় প্রদান করিলেন। পুরোহিত আসিয়া শালগ্রাম দেখিতে না পাইয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে এই সংবাদ বাটীর মধ্যে প্রচারিত হইল। সকলে অত্যন্ত ভীত হইলেন এবং ব্যাকুল অন্তরে শালগ্রাম শিলার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। পরে পুনরায় সেই শালগ্রাম শিলা আনিয়া সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

বাল্যকালে দেবেন্দ্রনাথ রাজা রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যা-

লয়ে অধ্যয়ন করেন। এই বিদ্যালয়ে সর্ব্বপ্রথমে যাঁহারা পাঠ করেন তাঁহারা প্রায় সকলেই ভবিষ্যতে বিদ্বান, জ্ঞানী ও যশস্বী হইয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রমাপ্রসাদ রায়, শ্রীনাথ সমাদ্দার, ক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র সরকার, শ্যামাচরণ দে, মহেশচন্দ্র রায়, কাশীনাথ দত্ত এই কয়জন রাজার বিদ্যালয়ে সর্ব্বপ্রথম ছাত্র ছিলেন। কিছুদিন পরে প্রায় ১৭৫২ শকে সুপ্রসিদ্ধ খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারক ডাক্তার ডফ্ সাহেব বিলাত হইতে কলিকাতায় আগমন করেন। তিনি একটি বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য চেষ্টা করেন, কিন্তু কোথাও স্থান না পাইয়া ভবানী-পুরে রেভরেণ্ড ল্যাসিরোই সাহেবের নিকট গমন করেন। তিনি ডফ্ সাহেবকে রাজা রামমোহন রায়ের নিকট যাইতে পরামর্শ দেন। ডফ্ সাহেব রাজার নিকট আসিয়া সমস্ত জ্ঞাপন করিলে, তিনি কমল বসুর নিকট হইতে তাঁহার বাটীর এক অংশ গ্রহণ করিয়া বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য প্রদান করেন। ডাক্তার ডফ্ আনন্দ ও উৎসাহের সহিত বিদ্যালয় খুলিয়া দিলেন। বিদ্যালয় তো খুলিয়া দিলেন, কিন্তু ছাত্র জুটিল না। প্রায় এক সপ্তাহ পরে পুনরায় রাজার সহিত সাক্ষাৎ করাতে রাজা নিজের স্কুল হইতে নিম্নলিখিত কয়েকটি বালককে তাঁহার স্কুলে প্রেরণ করেন। শ্রীনাথ সমাদ্দার, ক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র সরকার, শ্যামাচরণ দে এই পাঁচজন বালক আসিয়া ডফের স্কুলে যোগদান করেন। এই পাঁচটি বালক লইয়া তিনি কার্য্য আরম্ভ করেন। এই একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা রাজার হৃদয়ের বিশালতা ও মহৎ ভাব আমরা সহজেই বুঝিতে পারি।

দেবেন্দ্রনাথ রাজার স্কুলে কিছুকাল অধ্যয়নের পর নৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রমাপ্রসাদ রায়ের সহিত মিলিত হইয়া হিন্দুকলেজে দ্বিতীয়

শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইয়া পাঠ আরম্ভ করেন। এই সময়ে সুবিখ্যাত মহাত্মা ডিরোজিও হিন্দু কলেজে অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি, আশ্চর্য্য চিন্তাশক্তি ও উদারতার কথা প্রায় শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রই অবগত আছেন। হিন্দু কলেজের সে সময়কার ছাত্রেরা প্রায় সকলেই নানাবিষয়ে যশস্বী হইয়া বঙ্গদেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রামগোপাল ঘোষ, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতির নাম কে না জানেন? ইহাঁরা সাক্ষাৎভাবে ডিরোজিওর প্রভাবের মধ্যে থাকিয়া অনেক বিষয়ে তাঁহার অনুকরণ করিয়াছিলেন। তাহা দ্বারা তাঁহাদের চরিত্রে যেমন অনেক সদ্‌গুণরাশি বিকশিত হইয়াছিল, তেমনি আবার কতক-গুলি দোষও স্পর্শ করিয়াছিল। দোষের মধ্যে সুরাপানের অভ্যাস এবং দেশীয় শাস্ত্র ও রীতিনীতির প্রতি ঘৃণা প্রধান। দেবেন্দ্রনাথ যদিও হিন্দুকলেজে কিছুদিন শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, তথাপি বিধাতার আশীর্ব্বাদে এই দুই মহৎ দোষ হইতে তিনি সম্পূর্ণভাবে মুক্ত ছিলেন। তাহার কারণ এই যে তিনি অল্প সময়ের মধ্যে হিন্দুকলেজ পরিত্যাগ করেন। তাঁহার পিতা বাটীতেই তাঁহার সকল প্রকার শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন।

বাল্যকাল হইতেই দেবেন্দ্রনাথের হৃদয় ধর্ম্মপ্রবণ ছিল। তিনি স্কুলে যাইবার সময় প্রতিদিন ঠনঠনিয়ার সিদ্ধেশ্বরীকে প্রণাম করিয়া যাইতেন। তখন সেই মূর্ত্তিকে তিনি জগতের স্রষ্টা, পাতা ও সংহর্ত্তা বলিয়া জানিতেন এবং তজ্জন্য তাঁহাকে ভক্তির সহিত প্রণাম করিতেন। তাঁহার পিতামহী অত্যন্ত সাধ্বী ও ধার্ম্মিকা রমণী ছিলেন। তিনি সমস্ত দিন সাংসারিক কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতেন। পরিবারের সকলের আহারাদি সম্পন্ন হইলে তিনি "স্বপাকে" আহার করিতেন।

দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার সঙ্গে অনেক সময় কাটাইতেন এবং তাঁহার পিতামহীও তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। দেবেন্দ্রনাথ পিতামহীর হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিতেন। তিনি বলিতেছেন "তাঁহার হবিষ্যান্ন আমার যেমন স্বাদু লাগিত এমন নিজের আহার লাগিত না।" শৈশবে তিনি সর্ব্বদা তাঁহার নিকট থাকিতেন। শয়ন, ভোজন ইত্যাদি সকলই তাঁহার নিকট হইত। যখন তাঁহার পিতামহী কালীঘাটে যাইতেন, তখন দেবেন্দ্রনাথও তাঁহার সঙ্গে যাইতেন। তিনি প্রতিদিন প্রত্যুষে গঙ্গাস্নান করিতেন এবং শালগ্রামের জন্য স্বহস্তে পুষ্পমালা রচনা করিতেন। কখন কখন সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত রৌদ্রে বসিয়া সূর্য্যদেবকে অর্ঘ্য প্রদান করিতেন। দেবেন্দ্রনাথও তাঁহার সঙ্গে সমস্ত দিবস ছাদের উপর বসিয়া থাকিতেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

পিতামহীর মৃত্যু।

দ্বারকানাথ ঠাকুর রাজা রামমোহন রায়ের একজন প্রকৃত সহচর ও শিষ্য ছিলেন। রাজা দেবেন্দ্রনাথকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। এ সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথ নিজে বলিতেছেন—"শৈশবকাল অবধি আমার রামমোহন রায়ের সহিত সংস্রব। আমি তাঁহার স্কুলে পড়িতাম। তখন আরও ভাল স্কুল ছিল। হিন্দুকালেজ ছিল। কিন্তু আমার পিতা রামমোহন রায়ের অনুরোধে আমাকে ঐ স্কুলে দেন। স্কুলটি হেদুয়ার পুষ্করিণীর ধারে প্রতিষ্ঠিত। আমি প্রায় প্রতি শনিবার দুইটার সময় ছুটি হইলে রমাপ্রসাদ রায়ের সহিত রামমোহন রায়ের মাণিকতলার বাগানে যাইতাম। অন্য দিনও দেখা করিয়া আসিতাম। কোন কোন দিন আমি তথায় গিয়া বড়ই উপদ্রব করিতাম। বাগানের গাছের নিচু ছিঁড়িয়া, কখনো কড়াইশুঁটি ভাঙ্গিয়া মনের সুখে খাইতাম। রামমোহন রায় একদিন কহিলেন, ব্রাদার! রৌদ্রে ছুটাছুটি করিয়া কেন বেড়াও। এইখানে বোসো। যত নিচু খেতে পার, এখানে বসিয়া খাও। মালিকে বলিলেন, যা, গাছ থেকে নিচু পেড়ে নিয়ে আয়। সে তৎক্ষণাৎ এক থালা ভরিয়া নিচু আনিয়া দিল। তখন রামমোহন রায় বলিলেন, যত ইচ্ছা নিচু খাও। তাঁহার মূর্ত্তি প্রশান্ত ও গম্ভীর। আমি বড় শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত তাঁহাকে দেখিতাম। বাগানে একটা কাঠের দোলা ছিল। রামমোহন রায় অঙ্গচালনার জন্য তাহাতে দোল খাইতেন। আমি বৈকালে বাগানে গেলে তিনি আমাকে সেই দোলায় বসাইয়া আপনি টানিতেন, ক্ষনেক পরে আপনি তাহাতে বসিয়া বলিতেন, ব্রাদার! এখন তুমি টান।"

রাজার একটি গাড়ী ছিল। কখন কখন তিনি সেই গাড়ীতে চড়িয়া দ্বারকানাথ ঠাকুরের বাটীতে গমন করিতেন। দেবেন্দ্রনাথকেও সঙ্গে লইয়া কখন কখন সহর ভ্রমণে বাহির হইতেন। বালক দেবেন্দ্রনাথ অনিমেষ নয়নে সেই স্থির, গম্ভীর প্রশান্ত মুখমণ্ডলের প্রতি চাহিয়া থাকিতেন। কোন কথা তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইত না। তিনি এ সম্বন্ধে বলিতেছেন "আমি প্রায়ই রাজার গাড়ীতে রাজার সহিত যাইতাম। তখন রাজার সহিত আমার প্রায়ই কোন কথাবার্ত্তা হইত না। আমি তাঁহার সম্মুখে বসিয়া তাঁহার সুন্দর মুখ দর্শন করিতাম। তাঁহার মুখের প্রতি আমি আকৃষ্ট হইতাম। রাজার সহিত গাড়ীতে বেড়াইবার সময়ে আমি প্রায়ই রাজার বিষয়ে চিন্তাতে মগ্ন থাকিতাম। রাস্তায় কি হইতেছে, সে বিষয়ে কিছুই জানিতে পারিতাম না। আমি পুত্তলিকার ন্যায় স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতাম। কেবলই রাজাকে দেখিতাম। আমার হৃদয় একপ্রকার গভীর ও অবর্ণনীয় ভাবে পরিপ্লুত হইত। স্পষ্টই বুঝা যায় যে রাজার সহিত আমার কোন নিগূঢ় সম্বন্ধ ছিল। আমি সর্ব্বদাই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতাম।"

দেবেন্দ্রনাথ দ্বারকানাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। তাঁহার আর দুই সহোদর ছিলেন। মধ্যম গিরীন্দ্রনাথ ও কনিষ্ঠ নগেন্দ্রনাথ। বাড়ীতে অনুষ্ঠানাদি উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য দেবেন্দ্রনাথকে সর্ব্বত্র যাইতে হইত। একবার দুর্গোৎসবের নিমন্ত্রণ করিতে তিনি রাজার নিকটে গিয়া বলিলেন—"রামমণি ঠাকুরের নিবেদন, তিন দিন আপনার প্রতিমা দর্শনের নিমন্ত্রণ।" রাজা বলিলেন "ব্রাদার, আমাকে কেন? রাধাপ্রসাদকে বল।" এই কয়েকটি কথা তিনি এমনভাবে বলিলেন যে দেবেন্দ্রনাথ তাহা জীবনে কখনও ভুলিতে পারেন নাই। ইহার প্রত্যেক বাক্য তাঁহার হৃদয়ে

যেন তাড়িতের ন্যায় সঞ্চারিত হইল। এ সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন—"তিনি যখন এই কয়েকটি কথা বলিয়াছিলেন, ভাবেতে তাঁহার মুখ উজ্জ্বল হইয়াছিল! আমার জীবনে চিরকাল উহার আশ্চর্য্য প্রভাব রহিয়াছে। তাঁহার কথাগুলি আমার পক্ষে গুরুমন্ত্রস্বরূপ হইয়াছিল। তাহা হইতেই আমি ক্রমে পৌত্তলিকতা ত্যাগ করিলাম। ঐ কথাগুলি এখনও যেন আমার কানে বাজিতেছে। আমার এই দীর্ঘ জীবনে ঐ কথাগুলি আমার নেতাস্বরূপ হইয়াছে।"

ইহার কিছুদিন পরে রাজা যখন ইংলণ্ডে গমন করেন, তখন তাঁহার বন্ধু দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট বিদায় গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহার যোড়াসাঁকোর বাড়ীতে গমন করেন। সকলের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া তিনি দেবেন্দ্রনাথকে ডাকিয়া তাঁহার হস্ত লইয়া নিজের হস্তের মধ্যে রাখিলেন এবং এপ্রকার স্নেহের সহিত করমর্দ্দন করিলেন যে দেবেন্দ্রনাথ তাহা কখন ভুলিতে পারেন নাই। দেবেন্দ্রনাথ বলিতেছেন—"রাজার সহিত আমার এক নিগূঢ় সম্বন্ধ ছিল। তিনি আমাকে কখনও কথা কহিয়া উপদেশ দেন নাই। তখন আমি বড় ছোট ছিলাম। তাঁহার নিকট হইতে উপদেশ লইবার সময় হয় নাই। তথাচ আমি তোমাদিগকে বলিয়াছি যে আমার উপরে তাঁহার এক নিগূঢ় প্রভাব ছিল। যে কার্য্যের জন্য তিনি পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন, সেই কার্য্যের জন্য পরিশ্রম করিবার উৎসাহ আমি তাঁহার নিকট হইতে পাইয়াছি। ইংলণ্ড গমন করিবার সময়ে রাজা আমার পিতার নিকটে বিদায় লইতে আসিলেন। আমাদের বাড়ীর সকলে এবং আমাদের অনেক প্রতিবাসী রাজাকে দেখিবার জন্য আমাদের সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গনে একত্র হইয়াছিলেন। আমি তখন সেখানে ছিলাম না। তখন আমি সামান্য বালক। তথাচ রাজা আমাকে

দেখিতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি আমার পিতাকে বলিয়াছিলেন যে, আমার হস্তমর্দ্দন না করিয়া তিনি এদেশ পরিত্যাগ করিতে পারেন না। আমার পিতা আমাকে ডাকাইয়া আনিলেন। তখন রাজা আমার হস্তমর্দ্দন করিয়া ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন। রাজা যে সস্নেহে আমার হস্তধারণ করিয়াছিলেন, তাহার প্রভাব ও অর্থ তখন আমি বুঝিতে পারি নাই। বয়স অধিক হইলে উহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছি।" রাজা তাঁহার হস্তধারণ করিয়া যেন ইহাই বলিয়া গেলেন "আমি যে মহৎ কার্য্যের জন্য এখানে আসিয়াছি, এবং যাহার জন্য আমি বাল্যকাল হইতে এ পর্য্যন্ত আমার অর্থ, সামর্থ্য সমস্ত ব্যয় করিয়াছি, সেই কার্য্যের ভার তোমার উপর ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। আমি শরীরের বিন্দু বিন্দু রক্তদান করিয়া তোমাদের জন্য পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়া গেলাম। যাহা পূর্ব্বে অতি দুর্গম ও কণ্টকাকীর্ণ ছিল, তাহাকে অপেক্ষাকৃত অনেক সুগম ও নিষ্কণ্টক করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের বীজ রোপণ করিয়া দিলাম, এখন তুমি প্রেম ও ভক্তির বারি দ্বারা ইহাকে অঙ্কুরিত করিয়া জগতের মঙ্গল সাধন কর।"

বাল্যকাল হইতে দেবেন্দ্রনাথের হৃদয় যেমন ধর্ম্মপ্রবণ ছিল, তেমনি বৈরাগ্যও তাঁহার জীবনকে আশ্রয় করিয়াছিল। তাঁহার পিতামহী যখন তাঁহাদের পুরাতন বাটীতে গোপীনাথ ঠাকুর দর্শন করিতে যাইতেন, তিনিও তাঁহার সঙ্গে গমন করিতেন এবং তাঁহার ক্রোড়ে বসিয়া শান্তভাবে সমস্ত দেখিতেন। তাঁহার পিতামহী মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহাকে বলেন "আমার যাহা কিছু আছে, আমি আর কাহাকেও তাহা দিব না, তোমাকেই দিব।" পরে তাঁহার বাক্স খুলিয়া কতকগুলি টাকা ও মোহর পাইয়া তিনি লোকদিগকে বলিলেন "আমি কতগুলি মুড়ি ও মুড়কি পাইয়াছি।" টাকা ও মোহর তাঁহার নিকটে মুড়ি ও

মুড়কির ন্যায় অকিঞ্চিৎকর বোধ হইল। এই অল্প বয়সেই বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্য কেমন আশ্চর্য্যরূপে তাঁহার জীবনকে অধিকার করিয়াছিল!

১৭৫৭ শক। তাঁহার দিদিমার মৃত্যুকাল উপস্থিত। সকলে তাঁহাকে গঙ্গাতীরে আনিলেন। গঙ্গাতীরে তিনি তিনরাত্রি জীবিত ছিলেন। সেই সময় দেবেন্দ্রনাথের বয়স ১৮ বৎসর। দিদিমাকে তিনি এত ভাল-বাসিতেন যে এই তিন দিন তিন রাত্রি তিনি নিয়ত তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। অতুল ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারী ও বিলাসিতার ক্রোড়ে প্রতি-পালিত বালক দেবেন্দ্রনাথ কি প্রকারে এই ভীষণ স্থানে ক্রমাগত তিন দিন যাপন করিলেন, তাহা ভাবিলে অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইতে হয়।

তাঁহার পিতামহীর মৃত্যুর পূর্ব্বদিন রাত্রিতে পূর্ণিমার চন্দ্র গগনে উদিত হইয়া সমস্ত পৃথিবীকে আলোকিত করিতেছে। নিম্নে প্রসন্নসলিলা ভাগীরথী তরঙ্গলহরী তুলিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে সমুদ্রের অভিমুখে গমন করিতেছে। শ্মশানের মধ্যে মানব দেহ জ্বলন্ত চিতাতে ভস্মীভূত হইতেছে। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ। কেবল মধ্যে মধ্যে শ্মশানস্থিত দুই একজন লোকের কথাবার্ত্তার শব্দ কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেছে। তাঁহার দিদিমার নিকটে হরিনাম-সংকীর্ত্তন হইতেছে। এই সময়ে বালক দেবেন্দ্রনাথ একখান চাঁচের উপর বসিয়া তাঁহার পরম স্নেহময়ী পিতামহীর পরিণাম চিন্তা করিতেছেন। বাতাসের সঙ্গে নাম-সংকীর্ত্তনের শব্দ তাঁহার কর্ণে আসিয়া প্রবেশ করিতেছে। সংসারের প্রতি বৈরাগ্য জন্মিবার এমন শুভ মুহূর্ত্ত বুঝি আর নাই। তাই বালক দেবেন্দ্রনাথ শ্মশানে মানবজীবনের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম দর্শন করিয়া, শান্তিহারা হইয়া উত্তরকালে বাণবিদ্ধ মৃগের ন্যায় অরণ্যে, পর্ব্বতে, সমুদ্রমধ্যে, ভ্রমণ করিয়া অমৃতত্ব লাভের জন্য সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

এই সময়ে তাঁহার মনে এক আশ্চর্য্য উদ্বাস ভাব আসিয়া উপস্থিত হইল। তাঁহার মনে হইল যেন তিনি আর পূর্ব্বের মানুষ নহেন। সংসারের প্রতি, বিলাসিতার অসার মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য্যের প্রতি, তাঁহার ঘোরতর ঘৃণা জন্মিল। প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানের পূর্ব্বাভাস তাঁহার পবিত্র হৃদয়ে প্রকাশিত হইয়া অজ্ঞতার অন্ধকারকে বিনাশ করিল। তিনি বুঝিলেন এ সমস্ত বস্তু অত্যন্ত অসার, সমস্তই মৃত্যুর অধীন। সংসারের প্রত্যেক বস্তুর উপরে মৃত্যুর অন্ধকারময়ী ছায়া সুস্পষ্ট দেখিতে পাইলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিলেন। তিনি বলিতেছেন—"শ্মশানের সেই উদাস আনন্দ, তৎকালের সেই স্বাভাবিক সহজ আনন্দ মনে আর ধরে না। ভাষা সর্ব্বথা দুর্ব্বল, আমি সেই আনন্দ কিরূপে লোককে বুঝাইব? তাহা স্বাভাবিক আনন্দ। তর্ক করিয়া, বুদ্ধি করিয়া সেই আনন্দ কেহ পাইতে পারে না। সেই আনন্দ ঢালিবার জন্য ঈশ্বর অবসর খোঁজেন। সময় বুঝিয়াই তিনি এ আনন্দ আমাকে দিয়াছেন। কে বলে ঈশ্বর নাই? এই তো তাঁর অস্তিত্বের প্রমাণ। আমি তো প্রস্তুত ছিলাম না, তবে কোথা হইতে এ আনন্দ পাইলাম?" বালক দেবেন্দ্রনাথ এই ব্যাপারে ঈশ্বরাস্তিত্বের প্রমাণ পাইলেন। তাঁহার সেই আনন্দ তিনি অন্তঃকরণে ধারণ করিয়া রাত্রিতে বাটী আসিলেন। পরদিন তাঁহার দিদিমাকে দেখিতে পুনরায় গঙ্গাতীরে গমন করিলেন। তখন তাঁহার শেষ মুহূর্ত্ত আসিয়াছে। তিনি হরিনাম বলিয়া অঙ্গুলি ঘুরাইতে ঘুরাইতে ইহলোক হইতে চলিয়া গেলেন। দেবেন্দ্রনাথ বুঝিলেন তাঁহার দিদিমা তাঁহাকে পরলোকের দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া সেই দিকে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। ইহলোকে অবস্থানকালে তিনি যে কেবল তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন তাহা নহে, কিন্তু পরলোকে যাইবার

সময়েও তাঁহার সেই স্নেহপূর্ণ হৃদয় দেবেন্দ্রনাথের মঙ্গলোদ্দেশ্যে ঈশ্বর ও পরকালের অস্তিত্ব সম্বন্ধে পরিচয় প্রদান করিয়া চিরদিনের জন্য তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। তাই দেবেন্দ্রনাথ বলিতেছেন, "দিদিমা যেমন আমার ইহকালের বন্ধু ছিলেন, তেমনি পরকালেরও বন্ধু।"

পঞ্চম অধ্যায়।

বৈরাগ্য।

তাঁহার দিদিমার শ্রাদ্ধ মহা সমারোহে সম্পন্ন হইল। ইহার কিছু দিন পরে দেবেন্দ্রনাথ সেই শ্মশানের আনন্দলাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। কিন্তু তিনি তাহা পাইলেন না। ইহাতে তাঁহার মন বিষাদ-অন্ধকারে পূর্ণ হইয়া উঠিল। তাঁহার আর কিছুই ভাল লাগিত না। তাঁহার হৃদয়ে কঠোর বৈরাগ্যের সঞ্চার হইল। এই অবস্থা হইতে তিনি কি প্রকারে মুক্তিলাভ করিবেন, সে সম্বন্ধে তাঁহাকে পরামর্শ দিবার বা সাহায্য করিবার কেহই ছিল না। তাঁহার পিতার অতুল ঐশ্বর্য্য। বাড়ীতে দাস দাসী ও কর্ম্মচারীগণের সংখ্যা নাই। কলিকাতাতে তখন দ্বারকানাথ ঠাকুরের ন্যায় গণ্য, মান্য ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি অতি অল্পই ছিলেন। একদিকে যেমন তাঁহার অতুল সম্পদ ছিল অন্যদিকে তেমনি আবার তাঁহার বাটীতে গবর্ণর জেনেরালের ন্যায় উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীগণ যাতায়াত করিতেন। তাঁহার বেলগাছিয়ার বাগানে তখন মহাসমারোহে ভোজ হইত এবং সেই সমস্ত ভোজে কলিকাতার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ নিমন্ত্রিত হইয়া যোগদান করিতেন। দেবেন্দ্রনাথ. তাঁহার পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন, সুতরাং নানা প্রকার আমোদ প্রমোদ ও বিলাসিতার মধ্যে তাঁহাকে বাস করিতে হইয়াছিল। এই প্রকার অবস্থা যে ধর্ম্মানুরাগ জন্মিবার একান্ত প্রতিকূল, তাহা সকলে বুঝিতে পারেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এইরূপ বিলাসিতা ও আমোদ প্রমোদের বায়ুর মধ্যেও দেবেন্দ্রনাথের হৃদয়ে বৈরাগ্যের উদয় হইল। তিনি এই সমস্ত ভোজে যোগ দিতেন না।

ইহাতে তাঁহার পিতা তাঁহার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইতেন। তিনি তাঁহাকে সংসারধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য অনেক প্রকার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সকলই বিফল হইল।

দেবেন্দ্রনাথ আপনার জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলেন। তিনি সেই আনন্দ লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। ভগবান্ কৃপা করিয়া তাঁহার হৃদয় হইতে সংসারাসক্তি কাড়িয়া লইলেন এবং স্বীয় আনন্দধারা বর্ষণ করিয়া তাঁহাকে নবজীবন প্রদান করিলেন। দেবেন্দ্রনাথ বলিতেছেন "তাঁহার এ কৃপার কোনও তুলনা হয় না। তিনিই আমার গুরু, তিনিই আমার পিতা।" এই অল্প কালেই তিনি ঈশ্বরের দয়া অনুভব করিয়াছিলেন।

পৃথিবীর প্রায় সমস্ত মহাপুরুষদিগের জীবনে দেখিতে পাওয়া যায়, যে তাঁহারা বাল্যকাল হইতেই ভগবানের প্রতি অনুরক্ত হয়েন। যে সময়ে সাধারণ ব্যক্তিগণ সংসারে আসক্ত হইয়া জীবন অতিবাহিত করিয়া থাকেন, সেই সময় হইতে মহাপুরুষগণ সংসারের প্রতি বিরক্ত হইয়া এক উচ্চতর বিষয়ে লক্ষ্য স্থাপন করিয়া জীবনপথে অগ্রসর হইতে থাকেন। সাংসারিক সকল বস্তু তাঁহাদিগের নিকট অতি অকিঞ্চিৎকর বোধ হয়। সাংসারিক সকল বস্তুর অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়া সংসারাতীত স্থায়ী বস্তুর অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয়েন। অলোকসামান্য প্রতিভাশালী পুরুষসিংহ শাক্যমুনি অতি অল্প বয়সেই দৃশ্যমান জগতের অনিত্যতা বুঝিতে পারিয়া নিত্য বস্তুর অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং রাজপুত্র হইয়াও কঠোর-তপস্যা-জনিত ভীষণ ক্লেশ সহ্য করিয়া নির্ব্বাণরূপ পরমধন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। ভক্তির অবতার শ্রীচৈতন্যও অল্প বয়সে নবপরিণীতা ভার্য্যা ও স্নেহময়ী জননীকে পরিত্যাগ করিয়া ইষ্টদেবতার অন্বেষণে দেশে বিদেশে পর্য্যটন করিয়া-

ছিলেন এবং ভক্তিরূপ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবনকে কৃতার্থ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। প্রায় সকল মহাজনেরা এইরূপ অল্প বয়সে ভগবৎ-কৃপাতে সংসারাসক্তি পরিত্যাগ করিয়া অমৃতধামের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কেবল তাহাই নহে। তাঁহাদিগকে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে বাস করিতে হইয়াছিল। কিন্তু এই সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে বাস করিয়াও যে তাঁহারা আপন আপন জীবনকে সফল করিতে পারিয়াছিলেন, ইহাতেই তাঁহাদের মহত্ত্ব ও অসাধারণত্ব প্রতিপন্ন হইয়া থাকে।

এই প্রকার বৈরাগ্যের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ একদিন বৈঠক-খানাতে বসিয়া আপনার জিনিষপত্র সমস্ত দান করিতে লাগি-লেন। যাহার যাহা প্রয়োজন সে তাহাই লইয়া গেল। বড় বড় আয়না, বহুমূল্য ছবি, উৎকৃষ্ট পোষাক পরিচ্ছদ এবং অন্যান্য অনেক বহুমূল্য গৃহশয্যা তিনি স্বহস্তে দান করিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন এইরূপে সমস্ত বস্তু দান করিলে তাঁহার মনের বিষাদ-অন্ধকার কাটিয়া যাইবে এবং পূর্ব্বের আনন্দ লাভ করিতে পারিবেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। ঈশ্বরলাভের জন্য তাঁহার কি প্রকার ব্যাকুলতা হইয়াছিল, তাহা নিম্নের ঘটনাসমূহ হইতে আমরা কিঞ্চিৎ বুঝিতে পারি। কখন কখন তিনি ঈশ্বরচিন্তা করিতে করিতে এমনি আত্মহারা হইয়া যাইতেন যে কখন ভোজন করিতে যাইতেন এবং কখন ভোজন করিয়া ফিরিয়া আসিয়া কৌচের উপর শয়ন করিয়া থাকিতেন তাহা বুঝিতে পারিতেন না। এই সময়ে তিনি প্রায়ই কোম্পানির বাগানে গমন করিতেন। সেখানে প্রকৃতির নির্জ্জনতার মধ্যে আপনার প্রিয়তম বস্তুর অন্বেষণ করিতেন। তিনি বলিতেছেন—"ঐ বাগানের মধ্যস্থলে যে একটি সমাধি-স্তম্ভ আছে, আমি গিয়া তাহাতে বসিয়া থাকিতাম।

মনে বড় বিষাদ। চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছি। বিষয়ের প্রলোভন আর নাই। কিন্তু ঈশ্বরের ভাবও কিছু পাইতেছি না। পার্থিব ও স্বর্গীয় সকল সুখেরই অভাব। জীবন নীরস, পৃথিবী শ্মশান-তুল্য। কিছুতেই সুখ নাই, কিছুতেই শান্তি নাই। দুই প্রহরের সূর্য্যের কিরণ-রেখা সকল যেন কৃষ্ণবর্ণ বোধ হইত। সেই সময়ে আমার মুখ দিয়া সহসা এই গানটি বাহির হইল, হবে, কি হবে দিবা-আলোকে, জ্ঞান বিনা সব অন্ধকার।"

শুনিয়াছি শ্রীচৈতন্য ঈশ্বর-বিরহে মধ্যে মধ্যে এইরূপ কাতর হইয়া ক্রন্দন করিতেন। যখন অন্তরে তাঁহাকে দেখিতে না পাইতেন, তখন বালিতে মুখ ঘর্ষণ করিতেন এবং "কৃষ্ণরে বাপ কোথায় গেলি, কৃষ্ণরে বাপ কোথায় গেলি" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেন। এ যে কি প্রকার যাতনা, কি প্রকার মর্ম্মবেদনা, তাহা সাধারণ মনুষ্য বুঝিতে পারে না। পুত্রশোকও এপ্রকার তীব্র যাতনা দিতে পারে না। যে প্রকার যাতনাতে দুইপ্রহরের রৌদ্রের কিরণ-সমূহ কৃষ্ণবর্ণ বোধ হয়, তাহা অত্যন্ত গভীর ও তীব্র। ঈশ্বরের জন্য এ প্রকার যাতনা সাধারণ মনুষ্যের বোধগম্য নয়। যাহা হউক এইরূপে দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। তাঁহারও ব্যাকুলতা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তখন সংস্কৃত শিক্ষা করিতে তাঁহার অত্যন্ত ইচ্ছা হইল। তিনি তাঁহাদের বাটীর সভাপণ্ডিত কমলাকান্ত চূড়ামণির নিকট সংস্কৃত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ অধ্যয়ন আরম্ভ করিলেন। কিছুদিন পরে কমলাকান্তের মৃত্যু হইল। তাঁহার পুত্র শ্যামাচরণের নিকটে তিনি মুগ্ধবোধ পাঠ করেন। একদিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঈশ্বরতত্ত্ব কেমন করিয়া জানিতে পারা যায়। তিনি উত্তর করিলেন মহাভারত পাঠ করিলে জানিতে পারা যায়। অমনি দেবেন্দ্রনাথ মহা-

ভারত পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। এক দিকে যেমন সংস্কৃত শাস্ত্রাদি পাঠ করিতে লাগিলেন, অন্যদিকে তেমনি, ইংরাজী দর্শনশাস্ত্র-সমূহ পাঠ আরম্ভ করিলেন। ইহা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়, যদিও স্কুলে তিনি অধিকদিন পাঠ করেন নাই, তথাপি ইংরাজী ভাষাতে তিনি তখন এত ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন যে ইংরাজী দর্শনশাস্ত্রসমূহ পাঠ করিয়া তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেন। কিন্তু এ সমস্ত পাঠ করিয়াও তাঁহার মনের বিষাদ দূরীভূত হইল না। অশান্তির অগ্নি নির্ব্বাপিত হইল না। তিনি অতিমাত্র ব্যথিত হইলেন এবং জ্ঞানলাভের জন্য গভীর চিন্তাসমুদ্রে অবতরণ করিলেন।

চিন্তা করিতে করিতে তিনি দেখিলেন যে "যেমন ফটোগ্রাফের কাচ-পাত্রে সূর্য্যকিরণ দ্বারা বস্তু প্রতিবিম্বিত হয়, সেইরূপ বাহ্য-ইন্দ্রিয় দ্বারা মনের মধ্যে বাহ্যবস্তুর একটা অবভাস হয়। ইহাই তো জ্ঞান। এই পথ ছাড়া জ্ঞান লাভের আর উপায় কি ?" ইউরোপীয় দর্শন শাস্ত্র পাঠ করিয়া তাঁহার মনে জ্ঞানের এই প্রথম আলোক আসিয়া উপস্থিত হইল। যদিও তিনি জ্ঞানলাভের প্রথম সোপনস্বরূপ এই আলোক প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু ইহাতে তাঁহার মনের অশান্তি দূর হইল না। দেবেন্দ্রনাথ চিরজীবনই জ্ঞানের পক্ষপাতী ছিলেন। কেবল অন্ধবিশ্বাস লইয়া তিনি পরিতৃপ্ত হইতেন না, কিন্তু পবিত্র জ্ঞানালোক দ্বারা তিনি সত্যবস্তু লাভ করিবেন, ইহাই তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ছিল। এই জন্যই তিনি পূর্ব্ব ও পশ্চিম দেশীয় পণ্ডিতগণের গ্রন্থসমূহ এত মনোযোগ-সহকারে পাঠ করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার জীবন যতই আলোচনা করিব, ততই দেখিতে পাইব যে তিনি যত প্রকার গ্রন্থপাঠ করিয়াছিলেন সাধারণের পক্ষে তত পাঠ করা অসম্ভব। যাহা হউক এই সমুদয় গ্রন্থ পাঠ করিয়াও তিনি শান্তিলাভ করিতে পারিবেন না। অন্তরের ব্যাকুলতা ক্রমশঃ

বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। জীবন অত্যন্ত ভারবহ বোধ হইতে লাগিল। কখন কখন তিনি মনে করিতেন বুঝি আর বাঁচিবেন না! ঈশ্বর-লাভের জন্য এ প্রকার মানসিক অবস্থা কয়জনের ভাগ্যে ঘটে এবং কয়জনেই বা তাহা প্রকৃতরূপে বুঝিতে পারে?

এই প্রকার অবস্থার মধ্যে থাকিয়া তাঁহার জীবনের দিবসসমূহ অতিবাহিত হইতে লাগিল। চিন্তা করিতে করিতে তিনি ক্রমে আত্ম-জ্ঞান লাভ করিলেন। যে চিন্তাপ্রণালী অবলম্বন করিয়া তিনি আত্ম-তত্ত্বে উপস্থিত হয়েন তাহার কিঞ্চিৎ আভাস আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। প্রত্যেক বস্তু জানিবার সময়ে আর একবস্তুকে সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞাতারূপে জানিতে পারা যায়। সেই বস্তুই আত্মা, তাহাই সমস্ত জ্ঞানের জন্মভূমিস্বরূপ বর্ত্তমান থাকিয়া সমস্ত বস্তুর জ্ঞান সম্ভব করিতেছে। ইহা না থাকিলে কোন প্রকার জ্ঞান অসম্ভব। প্রথমে বুঝিলেন জ্ঞান কি, তৎপরে বুঝিলেন জ্ঞাতা কে। এই দুই সোপানে আরোহণ করিবার পর তিনি আর একটি মহৎ বিষয় উপলব্ধি করিলেন।

প্রতিদিনই দেখিতে পাওয়া যায় সূর্য্যের উদয় ও অস্ত হইতেছে। বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। রজনীতে অনন্ত আকাশ পূর্ণ করিয়া নক্ষত্রাবলী উঠিতেছে এবং অস্ত যাইতেছে। প্রাকৃতিক সমস্ত বস্তুর বিষয় চিন্তা করিলে দেখা যায় ইহারা সকলে মিলিয়া একটি লক্ষ্য সাধনের জন্য কার্য্য করিতেছে। আমাদের জীবনরক্ষার জন্য ইহারা সকলে নিরন্তর কার্য্য করিতেছে। সূর্য্য, চন্দ্র, জল, অগ্নি, বায়ু এ সমস্ত না থাকিলে আমাদের জীবন রক্ষা অসম্ভব হইত। আমাদের জীবনের সঙ্গে ইহাদের একটা যোগ আছে। এই যোগ স্থাপনের কর্ত্তা কে? ইহারা জড়বস্তু। সুতরাং ইহারা নিজে ইচ্ছা করিয়া এই যোগস্থাপন

করিতে পারে না। এই যে জীবের জীবনরক্ষারূপ মহৎ লক্ষ্য সাধনের জন্য ইহারা অবিরাম কার্য্য করিতেছে, এই লক্ষ্য কাহার? ইহা নিশ্চয়ই কোন জ্ঞানময় চৈতন্যের লক্ষ্য। সেই জ্ঞানময়, চৈতন্যময় ও ইচ্ছাময় বস্তু এই জগতে বর্ত্তমান থাকিয়া আপনার লক্ষ্য সাধনের জন্য এই সমুদায় জড়বস্তুকে নিরন্তর আপনার আপনার কার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়াছেন। এই আলোক যখন তাঁহার অন্তরের মধ্যে আসিল, তখন তাঁহার সংশয়ের অন্ধকার কিয়ৎ পরিমাণে কাটিয়া গেল, যাঁহার জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া এতদিন গভীর দুঃখে দিনাতিপাত করিতেছিলেন, তাঁহার অস্তিত্বের প্রমাণ পাইয়া তিনি কিঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিলেন। মহর্ষি ঈশা বলিয়াছেন Knock and it shall be opened unto you, আঘাত কর, দ্বার উদ্ঘাটিত হইবে। দেবেন্দ্রনাথ বহুদিন ধরিয়া এই দ্বারে প্রবেশ করিবার জন্য কায়মনোবাক্যে আঘাত করিতেছিলেন, তাঁহার জন্য দ্বার কিঞ্চিৎ পরিমাণে উদ্ঘাটিত হইয়া গেল। তিনি স্বর্গের প্রবেশ-দ্বার অর্গলমুক্ত দেখিয়া সুখী হইলেন, শান্তিলাভ করিলেন, তাঁহার বিষাদ-অন্ধকার চলিয়া গেল। যিনি সেই শ্মশানের ভীষণ দৃশ্যের মধ্যে বালক দেবেন্দ্রনাথের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া আনন্দ দান করিয়াছিলেন, তিনিই তাঁহাকে এই গভীর বিষাদ ও নিরাশার মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া পুনরায় তাঁহার সমক্ষে আশার উজ্জ্বল আলোক ধারণ করিলেন। দেবেন্দ্রনাথ এই আশাতে বুক বাঁধিয়া দুর্গম জ্ঞানরাজ্যে আরও অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

অনন্তের পরিচয়।

একদিন তিনি একাকী গভীর রজনীতে প্রশস্ত ছাদের উপর উপবেশন করিয়া আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখিলেন, সুদূরপ্রসারিত অনন্তগগনমণ্ডলে ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ অগণ্য জ্যোতিষ্কমণ্ডলী ফুটিয়া রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে কত নক্ষত্র বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইহাদের কোন কোনটি, সূর্য্য অপেক্ষা কতসহস্রগুণে বৃহৎ। কোটি কোটি যোজন দূরে অবস্থান করিয়া ইহারা অনন্ত আকাশপথে নিরন্তর অতি প্রচণ্ড বেগে ধাবিত হইয়া পরিভ্রমণ করিতেছে। এই সমস্ত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু এবং নক্ষত্রমণ্ডলীতে পরিপূর্ণ এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সহিত তুলনা করিলে আমাদের পৃথিবী কীটাণু অপেক্ষাও ক্ষুদ্রতর বোধ হয়। এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড কে সৃজন করিয়াছেন? বাস্তবিকই সুপ্রসিদ্ধ অমর জর্ম্মান দার্শনিক ইমানুয়েল ক্যাণ্ট বলিয়াছিলেন যে অগণ্য নক্ষত্রখচিত অনন্ত আকাশ এবং আত্মজগৎ দেখিয়া কে না মুগ্ধ হয়? জগতের এই দুইটি বস্তু যেমন মানব-প্রাণকে মুগ্ধ ও স্তম্ভিত করে, এমন আর কিছুতেই পারে না। দেবেন্দ্রনাথের সুকোমল হৃদয় এই অনন্ত আকাশ দর্শন করিয়া প্রশ্ন করিল ইহা কি কখন ক্ষুদ্র কোন দেবতার দ্বারা সৃষ্ট হইতে পারে? হস্তপদ-ও-ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট ক্ষুদ্র কোন দেবতা এই অসীম বিশ্ব কখনও সৃজন করিতে পারে না। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা অনন্ত হইবেন। কেবল তাহাই নহে। তিনি নিশ্চয়ই জ্ঞানময়। কারণ এই বিশ্বজগতে আমরা অদ্ভুত জ্ঞানের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া থাকি। যিনি এই অনির্ব্বচনীয় জ্ঞানকৌশলপূর্ণ বিশ্ব সৃষ্টি করেন তিনি অবশ্যই অনন্তজ্ঞানময়। এইরূপে তিনি বিশ্ব

ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে এক সত্য, জ্ঞানময়, অনন্তদেবের পরিচয় প্রাপ্ত হইলেন। দেবেন্দ্রনাথের সরল ও ব্যাকুল হৃদয় যাঁহার জন্য এতদিন পাগলের ন্যায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া অস্থির হইয়া নিরাশ্রয় ও অসহায়ের ন্যায় পথে পথে ভ্রমণ করিতেছিল, তিনি কৃপা করিয়া এই শুভ মুহূর্ত্তে তাঁহার নিকট আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন। তাঁহার চিত্ত শান্ত হইল, হৃদয় স্থির হইল, তিনি ধীরে ধীরে আরও অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

অনন্ত আকাশ দর্শন করিয়া অনন্তদেবের পরিচয় পাওয়াতে তাঁহার মনে পৌত্তলিকতার প্রতি বিরাগ উপস্থিত হইল। তিনি বুঝিলেন এই জগৎ কালীঘাটের কালীর রচিত নহে এবং তাঁহাদের বাটীর শালগ্রাম শিলারও রচিত নহে। যখন তিনি এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার মনে রাজা রামমোহন রায়ের কথা স্মরণ হইল। তাঁহার জীবনের অদ্ভুত ঘটনাসমূহ স্মৃতিপথে আরূঢ় হইল। সেই গম্ভীর সৌম্যমূর্ত্তি, সেই প্রতিভামণ্ডিত, আকর্ণবিস্ফারিত নয়ন-যুগল তাঁহার চিত্তপটে উদিত হইল। দেবেন্দ্রনাথের সরল হৃদয় জাগ্রত হইল, রাজার পদাঙ্ক অনুসরণ করিবার জন্য, তাঁহার ন্যায় সত্য-পালনে ধন জন জীবন বিসর্জ্জন করিবার জন্য, দুর্জ্জয় প্রতিজ্ঞা করিলেন। বালক দেবেন্দ্রনাথ তখন বুঝিলেন না কি প্রকার পরীক্ষার অনল স্বীয় হস্তে প্রজ্বলিত করিয়া তাহাতে ঝম্প প্রদান করিলেন। তিনি সঙ্কল্প করিলেন রাজা রামমোহন রায় যেমন কোনপ্রকার পৌত্তলিক অনুষ্ঠানে যোগদান করিতেন না. তিনিও তেমনি কোন পৌত্তলিক ক্রিয়াকলাপে যোগ দিবেন না। এই স্থির করিয়া তিনি তাঁহার ভ্রাতাদিগকে লইয়া এক দল বাঁধিলেন। তাঁহার পিতা তখন সন্ধ্যাকালে আরতির সময়ে পূজার দালানে যাইতেন। তাঁহারা তাঁহাদের পিতার ভয়ে সকলে দালানে যাইতেন বটে, কিন্তু কেহই

প্রতিমাকে প্রণাম করিতেন না। যখন সকলে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেন, তখন তাঁহারা নিস্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতেন।

ক্রমে ক্রমে পৌত্তলিক শাস্ত্রসমূহের প্রতি দেবেন্দ্রনাথের অশ্রদ্ধা জন্মিল। তাঁহার মনে তখন এই ভ্রম ছিল যে, সকল হিন্দুশাস্ত্রই পৌত্তলিক পূজার উপদেশ দিয়া থাকে, অপৌত্তলিক শাস্ত্র ভারতবর্ষে নাই। এইরূপ ধারণা থাকাতে অনেক হিন্দুসন্তান তখন খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে যেমন একদিকে ডিরোজিওর সংস্পর্শে আসিয়া অনেক বুদ্ধিমান্ হিন্দুসন্তান স্বাধীনভাবে চিন্তা ও কার্য্য করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন, তেমন অন্যদিকে উপনিষদাদির ন্যায় শ্রেষ্ঠ হিন্দু শাস্ত্রসমূহ লোকচক্ষুর অগোচরে থাকাতে তাঁহাদের এই ধারণা হইয়াছিল যে হিন্দুদিগের সকল শাস্ত্রই ভ্রম ও কুসংস্কারে পরিপূর্ণ। বাইবেল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অথবা তাহার সমান কোন গ্রন্থ তাঁহারা দেখিতে পান নাই। তাঁহারা সাহিত্যজগতে যেমন কোন উচ্চ হিন্দুসাহিত্য দেখিতে পাইতেন না, তেমনি ধর্ম্মজগতেও কোন জ্ঞানপূর্ণ উচ্চ গ্রন্থ দেখেন নাই। সেইজন্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমোহন বন্দ্যো ও মাইকেল মধুসূদনের ন্যায় প্রতিভাশালী হিন্দুসন্তানগণ খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ প্রথমে এই প্রকার ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া যখন দিনাতিপাত করিতেছিলেন, তখন একদিন হঠাৎ সংস্কৃত পুস্তকের একখানি ছিন্ন পত্র তাঁহার সম্মুখ দিয়া উড়িয়া যাইতেছিল। ঔৎসুক্যবশতঃ তিনি তাহা ধরিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। পাঠ করিলেন বটে, কিন্তু তাহার অর্থ গ্রহণ করিতে পারিলেন না। তাঁহাদের বাটীর পণ্ডিত শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্যকে ইহার অর্থ ঠিক্ করিতে বলিয়া তিনি আফিসে চলিয়া গেলেন।

সেই শ্লোকটির অর্থ বুঝিবার জন্য তাঁহার এরূপ ব্যগ্রতা হইয়াছিল যে সেদিন তাড়াতাড়ি আফিসের কাজ সারিয়া বাড়ী আসিয়া শ্যামাচরণকে তাহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্যামাচরণ বলিলেন, ব্রহ্মসভার রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ইহার অর্থ করিতে পারিবেন। তৎক্ষণাৎ বিদ্যাবাগীশ মহাশয়কে ডাকিয়া পাঠান হইল। তিনি আসিয়া বলিলেন ইহা ঈশোপনিষৎ। "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাম্ জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য-সিদ্ধনম্।" বিদ্যাবাগীশ যখন ইহার অর্থ ব্যাখ্যা করিলেন, তখন দেবেন্দ্রনাথ আশ্চর্য্য হইলেন। ঈশ্বরকে সর্ব্বত্র দেখিতে হইবে। ইহাই তো তাঁহার বহুদিনের বাসনা। ইহারই জন্য তিনি এতদিন পাগলের ন্যায় শান্তিহারা হইয়া সংসারে ভ্রমণ করিয়াছেন। যখন তিনি এই ব্রহ্মাণ্ডে অনন্তদেবের পরিচয় পাইয়াছিলেন, তখন তাঁহার মীমাংসার সায় পাইবার জন্য তিনি ব্যস্ত হইয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ চিরদিনই সকল বিষয়ে অতি সাবধানতার সহিত চলিতেন। তিনি নিজের জ্ঞানালোকে যে সত্যে উপনীত হইতেন তাহার মধ্যে যে ভ্রম নাই, একথা তাঁহাকে কে বলে? তিনি এতদিন যে সায় পাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন, ভগবান্ স্বয়ং তাঁহাকে এই ঘটনা দ্বারা জানাইলেন যে তাঁহার মীমাংসা অতি সত্য। তিনি মানুষের নিকট সায় চাহিয়াছিলেন, কিন্তু স্বর্গ হইতে তাহা লাভ করিলেন।

সপ্তম অধ্যায়।

শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ।

শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয় রাজা রামমোহন রায়ের সমসাময়িক ব্যক্তি। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে এই সাধু ব্যক্তির একটি বিশেষ স্থান আছে। দেবেন্দ্রনাথের প্রথম জীবনে ইনি তাঁহার গুরু ও আচার্য্যরূপে আপনার প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, সুতরাং ইঁহার জীবন সংক্ষেপে এইস্থানে উল্লেখ করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী নামক একজন অতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের সহিত রাজা রামমোহন রায়ের বন্ধুতা ছিল। তীর্থস্বামীর ন্যায় পণ্ডিত তৎকালে অতি অল্পই ছিলেন। রাজা শাস্ত্রালোচনা করিতে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। এই উপলক্ষে তাঁহার সহিত রাজার আত্মীয়তা হয়। রাজা যখন রংপুরে বৈষয়িক কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন, তখন তীর্থস্বামীর সহিত সর্ব্বদাই শাস্ত্র আলোচনা করিতেন। কিন্তু তীর্থস্বামী সন্ন্যাসী ছিলেন। তিনি অধিকদিন রংপুরে বাস করিতে না পারিয়া দেশ পর্য্যটনে বাহির হয়েন।

বিদ্যাবাগীশ এই তীর্থস্বামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তিনি রাজার হস্তে বিদ্যাবাগীশকে সমর্পণ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া তীর্থপর্য্যটনে বাহির হয়েন। রাজা তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহে ও যত্নে প্রতিপালন করেন এবং শিক্ষাদান করেন। রাজা রংপুরের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মপ্রচারের জন্য যখন কলিকাতাতে আগমন করেন, তখন তীর্থস্বামীর সহিত ধর্ম্মচর্চ্চা করিতে অত্যন্ত ব্যগ্র হয়েন। তীর্থস্বামী তখন বারাণসীতে বাস করিতেছিলেন। রাজা তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিয়া কলিকাতা আসিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি তাঁহার

অনুরোধ রক্ষা করেন নাই। একদিন রাজা বিদ্যাবাগীশের সহিত তাঁহাদের বিষয়সম্পত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন। বিদ্যা-বাগীশ একটি বিষয় সম্বন্ধে বলেন ইহাতে একটু গোলযোগ আছে। রাজা বলেন এই গোলযোগ মিটাইয়া লইলে ভাল হয়। বিদ্যা-বাগীশ বলেন, তাহা হইলে তীর্থস্বামীকে আনিতে হইবে। কিন্তু তিনি এখন সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাকে আসিতে বলিতে পারেন না। রাজা বলিলেন তবে আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করা হউক। তাঁহার পরামর্শে আদালতের সাহায্যে তীর্থস্বামীকে কলিকাতায় আনা হইল ইহাতে তিনি রাজার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন, কিন্তু পরে তাঁহার বিরক্ত ছিল না। যাহা হউক পরিশেষে তিনি রাজার সহিত মাণিকতলার ভবনে বাস করিতে লাগিলেন এবং রাজাও তাঁহার সহিত ধর্ম্মালাপ ও শাস্ত্রালোচনাতে প্রবৃত্ত হইলেন। বলা বাহুল্য যে রাজা তীর্থস্বামীকে কলিকাতায় আনিবার জন্যই এই প্রকার অপ্রীতিকর উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। রাজা ইংলণ্ডে গমন কালে বিদ্যাবাগীশের হস্তে ব্রাহ্মসমাজের ভার অর্পণ করেন। তদবধি তিনি ব্রাহ্মসমাজে আচার্য্য হইয়া নিয়মিতরূপে উপাসনা করিতেন। এই দৃঢ়নিষ্ঠ ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তি যদি সেই সময়ে ব্রাহ্মসমাজে যোগদান না করিতেন এবং শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সহিত সমাজের কার্য্য সম্পন্ন না করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস অন্যরূপ হইত। শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয় ব্রাহ্ম-সমাজের সাহায্যের জন্য মাসিক ৮০ টাকা করিয়া সাহায্য করিতেন এবং বিদ্যাবাগীশ ইহার অন্যান্য কার্য্য সম্পন্ন করিতেন।

বিদ্যাবাগীশ তখন কি ভাবে সমাজের কার্য্য সম্পন্ন করিতেন, তাহার আভাস দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ংই দিয়া গিয়াছেন। দেবেন্দ্রনাথ

বলিতেছেন—"ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার পর, রাজা এক বৎসর মাত্র কলিকাতায় ছিলেন। তিনি যে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয় রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। তিনিও একজন অসাধারণ ব্যক্তি। তিনি পরমেশ্বরকে প্রীতি করিতেন, এবং রাজা রামমোহন রায়কেও প্রীতি করিতেন। ঈশ্বরের প্রতি প্রেম এবং রাজা রামমোহন রায়ের প্রতি প্রেম, তাঁহার হৃদয়ে ও চরিত্রে একত্র জড়িত ছিল। ইহাতেই বুঝা যায় যে, যে সময়ে ব্রাহ্মসমাজ রক্ষা পাইবে বলিয়া কোন আশা ছিল না, সে সময়েও তিনি কেমন অতুলনীয় নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার সহিত ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিয়াছিলেন। সে সময়ে ব্রাহ্মসমাজে উপাসকমণ্ডলী ছিল না বলিলেই হয়। বৃষ্টি বাদল হইলে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয়কে উপাসক এবং আচার্য্য দুইয়ের কার্য্য একাকী করিতে হইত। যে-সকল ধনীলোক রাজার জীবদ্দশায় তাঁহার সহিত যোগ দিয়াছিলেন, রাজার মৃত্যুসংবাদ কলিকাতায় আসিলে পরেই তাঁহারা সমাজের সহিত সংশ্রব ত্যাগ করিলেন। কতকগুলি মধ্যবর্ত্তী লোক সমাজে আসিতেন। সাপ্তাহিক উপাসনার সময়ে পথের লোক আসিয়া বসিত। কেহ কেহ বাজার করিয়া যাইবার সময়ে, বাজারের থামা হস্তে সমাজে প্রবেশ করিত। কেহ কেহ টেরাপাখী হস্তে লইয়া সমাজে আসিত। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয় একখানি তক্তাপোষের উপর বসিতেন। সতরঞ্চের উপর চাদর বিছান থাকিত, তাহাতেই অন্য লোক বসিতেন।"

এইরূপ নিষ্ঠাবান্ সাধু ব্যক্তির উপর ব্রাহ্মসমাজের ভার অর্পণ করিয়া রাজা রামমোহন রায় স্বদেশের উন্নতি ও মঙ্গল-কামনা হৃদয়ে লইয়া প্রিয়তম জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া অকূল জলধির

পরপারে ইংরাজভূমিতে পদার্পণ করিলেন এবং আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য মহাকর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া অকুতোভয়ে বীরের ন্যায় শরীরের বিন্দু বিন্দু রক্তদান করিয়া স্বর্গধামে গমন করিলেন। ভারতের নবযুগের গৌরবরবি পূর্ব্বাকাশে উদিত হইয়া আপনার অসাধারণ প্রতিভার উজ্জ্বল আলোক দ্বারা সমস্ত সভ্যজগৎকে মুগ্ধ করিয়া পশ্চিমে চিরদিনের জন্য অস্তগমন করিলেন!

শুভক্ষণে উপনিষদের ছিন্ন পত্রখণ্ড দেবেন্দ্রনাথের হস্তে পতিত হয়। তাহা না হইলে হয়ত তাঁহার সহিত বিদ্যাবাগীশের মিলন হইত না। এই মিলন হইতে যে কি শুভফল উৎপন্ন হইল, তাহা ক্রমে প্রকাশিত হইবে। যখন দেবেন্দ্রনাথ বুঝিলেন সমস্ত হিন্দুশাস্ত্র পৌত্তলিক উপাসনার শিক্ষা দেয় না, যখন বুঝিলেন উপনিষদে একমাত্র অখণ্ড, অনন্ত, চৈতন্যময় ঈশ্বরের সম্বন্ধে শিক্ষা দেয়, তখন তিনি বিদ্যাবাগীশের নিকট উপনিষদ পাঠ আরম্ভ করিলেন। ক্রমে ক্রমে ঈশ, কেন, কঠ, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ অধ্যয়ন করিয়া অন্যান্য পণ্ডিতগণের সাহায্যে তিনি অবশিষ্ট ছয় উপনিষদ্ পাঠ করিলেন। উপনিষদ পাঠে তাঁহার এত আগ্রহ হইয়াছিল যে যাহা তিনি পাঠ করিতেন, তাহা কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতেন এবং বিদ্যাবাগীশের নিকট তাহা আবৃত্তি করিতেন। বেদের উচ্চারণ কিছু কঠিন বলিয়া তিনি বিশুদ্ধরূপে ইহার উচ্চারণ করিবার জন্য একজন দ্রাবিড়ী বৈদিক ব্রাহ্মণের নিকট বেদ শিক্ষা করিতেন। দেবেন্দ্রনাথের জীবনে একটি বিশেষত্ব এই যে তিনি যখন যাহা করিতেন, তাহা বিশুদ্ধরূপে ও পূর্ণভাবে করিতে চেষ্টা করিতেন। আজীবন এই পূর্ণতা রক্ষা করিবার চেষ্টা তাঁহাকে পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভের পথে অগ্রসর করিয়াছিল। যে-কোন প্রকারে একটা কাজ করিবার প্রবৃত্তি তাঁহার ছিল না,

সেইজন্য তাঁহার জীবন সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় ছিল না। যাহা করিতেন কিংবা করিবার সঙ্কল্প করিতেন, তাহার মধ্যে সৌন্দর্য্য, বিশুদ্ধতা ও পূর্ণতা রক্ষা করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। যাহা হউক এইরূপে যতই তিনি উপনিষদের মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলেন, ততই তাহার গাম্ভীর্য্য, সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। উপনিষদের সাহায্যে যখন সত্যের আলোক তাঁহার অন্তরে প্রকাশিত হইল, তখন এই সত্য ধর্ম্ম প্রচারের জন্য তাঁহার প্রবল ইচ্ছা জন্মিল। সেইজন্য প্রথমে তিনি তাঁহার আত্মীয়, বন্ধু এবং ভ্রাতাদিগকে লইয়া একটি সভা সংস্থাপন করিলেন। তাঁহাদের বাটীর পুষ্করিণীর ধারে একটি ছোট ঘরে প্রথমে এই সভা স্থাপিত হয়। যখন তাঁহাদের বাটীতে দুর্গাপূজার কল্প আরম্ভ হইল, তখন তাঁহারা এই ক্ষুদ্র কুঠরীতে সভার আয়োজন করিতে লাগিলেন। সকলের হৃদয় উৎসাহে পূর্ণ। তাঁহারা প্রাতঃস্নান করিয়া পবিত্র হইয়া নূতন বস্ত্রে সজ্জিত হইয়া ঐ কুঠরীতে প্রবেশ করিয়া স্ব স্ব আসন গ্রহণ করিলেন। দেবেন্দ্রনাথ নিজের আসন গ্রহণ করিয়া কঠোপনিষদ্ হইতে পাঠ করিলেন। "ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালম্ প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ং। অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী পুনঃ পুনর্ব্বশমাপদ্যতে মে।" ইহার ব্যাখ্যা করিতে করিতে দেখিলেন সকলের মুখে শ্রদ্ধা ও অনুরাগ দীপ্তিমান্ হইয়া প্রকাশিত হইতেছে। ব্যাখ্যা সমাপ্ত হইলে দেবেন্দ্রনাথের প্রস্তাবে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই সভার নাম "তত্ত্বরঞ্জিনী" রাখা হইল। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবার জন্য এই সভা প্রতিষ্ঠিত হইল। প্রতি মাসের প্রথম রবিবার সন্ধ্যার সময়ে এই সভার অধিবেশন হইত। দ্বিতীয় অধিবেশনের দিনে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং তিনি এই সভার নাম "তত্ত্ববোধিনী" রাখেন। ১৭৬১

শক, ২১শে আশ্বিন রবিবারে এই তত্ত্ববোধিনী সভা সংস্থাপিত হইল। এই সভা দেশের যে কত মহদুপকার সাধন করিয়াছে, ক্রমে ক্রমে তাহা প্রকাশিত হইবে। ইহার এই উদ্দেশ্য ছিল যে আমাদের দেশের প্রাচীন শাস্ত্রসমূহের আলোচনা দ্বারা সত্য বাহির করা এবং তাহা দেশে প্রচার করা। এ পর্য্যন্ত আমাদের দেশের প্রায় সকলের ধারণা ছিল যে দেশীয় শাস্ত্রসমূহ নানাপ্রকার ভ্রম ও কুসংস্কারে পূর্ণ, সুতরাং তাহা আলোচনার অযোগ্য। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া খৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ তাহা জানিতেন এবং সেইজন্য তিনি দেশীয় শাস্ত্রসমূহ হইতে বিজ্ঞানসম্মত সারসত্য বাহির করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং তাহা প্রচার করিবার জন্য সঙ্কল্প করিলেন।

প্রথমে এই সভার সভ্যসংখ্যা দশজন মাত্র ছিল। যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই ইহার সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এক সময় ইহার সাতশত জন সভ্য হইয়াছিল। ইহাঁদের মধ্যে অনেক গণ্য মান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। কোন কোন রাজা মহারাজা ও ইহার সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন। এই সভা প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে দেশের অনেক কবি ও সাহিত্যিক দেবেন্দ্রনাথের সহযোগী হইয়া এই সভার উদ্দেশ্যসাধনে তাঁহার সহায়তা করিয়াছিলেন। কবিবর ঈশ্বর-চন্দ্র গুপ্ত তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। এবং তিনি শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়কে দেবেন্দ্রনাথের নিকট আনিয়া পরিচয় করিয়া দিয়াছিলেন। প্রায় দুই বৎসরকাল ইহার বিশেষ কোন উন্নতির চিহ্ন দেখা গেল না। ইহাতে তাঁহার মনে এক চিন্তা উপস্থিত হইল। দুই বৎসরকাল কাটিয়া গেল, লোকসংখ্যা ভাল হয় না এবং যে উদ্দেশ্য লইয়া এই সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাও সফল হইতেছে না। এই

জন্য তিনি স্থির করিলেন একটি সাম্বৎসরিক সভা করিয়া যাহাতে বহুলোকের সমাগম হয়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। সভা যখন তৃতীয় বৎসরে পদার্পণ করিল, তখন দেবেন্দ্রনাথ ইহার সাম্বৎসরিকের জন্য আয়োজন করিতে লাগিলেন।

তখন সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিলে তাহা বড় একটা কেহ পাঠ করিত না, সুতরাং কোন সংবাদ প্রচারিত হইত না। এই জন্য দেবেন্দ্রনাথ পত্র লিখিয়া কলিকাতাতে যত আফিস ও কার্য্যালয় ছিল, সকল স্থানের কর্ম্মচারীদিগের নামে এক একখানি পত্র পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহারা ইতঃপূর্ব্বে তত্ত্ববোধিনীর নাম পর্য্যন্ত শুনেন নাই, সুতরাং ঐ দিনে সভাতে আসিবার জন্য তাঁহারা অত্যন্ত ব্যস্ত হইলেন। এ দিকে দেবেন্দ্রনাথ সভাগৃহ সাজাইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন এবং কে কি পাঠ অথবা বক্তৃতা করিবেন, তাহার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। নির্দ্দিষ্ট দিবসে বহুলোক আসিয়া সভাগৃহ পূর্ণ করিয়া স্ব স্ব আসন গ্রহণ করিলেন। অমনি বেদীর দুই পার্শ্বস্থিত বিশ জন দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণ সমস্বরে বেদ গান করিতে লাগিলেন। তৎপরে দেবেন্দ্রনাথ দণ্ডায়মান হইয়া নিম্নলিখিত ভাবে বক্তৃতা করিলেন "এইক্ষণে ইংলণ্ডীয় ভাষার আলোচনায় বিদ্যার বৃদ্ধি হইতেছে তাহার সন্দেহ নাই এবং এতদ্দেশস্থ লোকের মনের অন্ধকারও অনেক দূরীকৃত হইয়াছে। এইক্ষণে মূর্খ লোকদিগের ন্যায় কাষ্ঠে লোষ্ট্রতে ঈশ্বরবুদ্ধি করিয়া তাহাতে পূজা করিতে তাহাদিগের প্রবৃত্তি হয় না। বেদান্তের প্রচার অভাবে ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ, সর্ব্বগত, বাক্য মনের অতীত, ইহা যে আমাদের শাস্ত্রের মর্ম্ম, তাহা তাহারা জানিতে পারে না। সুতরাং আপনার ধর্ম্মে এ প্রকার শুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান না পাইয়া অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের শাস্ত্রে তাহা অনুসন্ধান করিতে যায়। তাহাদিগের মনে এই দৃঢ় আছে যে আমা-

দিগের শাস্ত্রে কেবল সাকার উপাসনা ; অতএব এ প্রকার শাস্ত্র হইতে তাহাদিগের যে শাস্ত্র উত্তম বোধ হয়, সেই শাস্ত্র মান্য করে। কিন্তু যদি এই বেদান্ত ধর্ম্ম প্রচার থাকে, তবে আমাদিগের অন্য ধর্ম্মে কদাপি প্রবৃত্তি হয় না। আমরা এই প্রকারে আমাদিগের হিন্দুধর্ম্ম রক্ষার যত্ন পাইতেছি।" পরে আরও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির বক্তৃতার পরে বিদ্যাবাগীশ একটি ব্যাখ্যান করিলেন। তৎপরে সঙ্গীত হইয়া সভাভঙ্গ হইল। ইহাতে প্রায় রাত্রি ২টা বাজিয়া গেল। এইরূপে তত্ত্ববোধিনী সভার সাম্বৎসরিক উৎসব মহা আড়ম্বরের সহিত সম্পন্ন হইল। বহুলোকের সমাগমে দেবেন্দ্রনাথের হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি আশা ও উৎসাহ লইয়া পুনরায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

অষ্টম অধ্যায়।

ব্রাহ্মসমাজের তদানীন্তন অবস্থা।

দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করিবার পূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজ কি অবস্থার মধ্যে বিদ্যমান ছিল এবং তখন কি প্রকারে সমাজের কার্য্য সম্পন্ন হইত, তাহার একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা নিতান্ত প্রয়োজন। তিনি ব্রাহ্মসমাজে আসিবার পূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজ কি ছিল এবং বৃদ্ধ বয়সে তিনি ব্রাহ্ম সমাজের কার্য্যভার পরিত্যাগ করিবার সময়েই বা ব্রাহ্মসমাজ কি অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল, এতদুভয়ের তুলনা করিলে ব্রাহ্ম সমাজে তাঁহার কার্য্যের কথঞ্চিৎ আভাস আমরা প্রাপ্ত হইতে পারি।

ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে রাজা রামমোহন রায় প্রতি রবিবার একেশ্বরবাদী খ্রীষ্টিয়ানদিগের উপাসনা-গৃহে গমন করিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিতেন। একদিন উপাসনা হইতে গৃহে ফিরিবার সময়ে তাঁহার দুই প্রিয় সহচর চন্দ্রশেখর দেব ও তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী বলিলেন "আমরা পরের সমাজে যাই কেন, আমাদের নিজের ধর্ম্ম ও বিশ্বাসানুযায়ী উপাসনা করিবার জন্য একটি স্বতন্ত্র সমাজ স্থাপন করা উচিত।" রাজার মনে এই কয়েকটি কথা লাগিল। তিনি তখনি স্থির করিলেন সুবিধা হইলেই একটি স্বতন্ত্র সমাজ স্থাপন করিবেন। ইহার কিছু দিন পরে জোড়াসাঁকোস্থ কমল বসুর বাড়ী ভাড়া লইয়া ১৭৫০ শকের ৬ই ভাদ্র দিবসে ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করিলেন। তখন নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে ইহার কার্য্য সম্পন্ন হইত। সূর্য্য অস্ত যাইবার পূর্ব্বে একজন হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ সমাজের পার্শ্ব-গৃহে উপনিষদ্ পাঠ করিতেন। সেখানে কেবল রাজা রাম-

মোহন রায়, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ প্রভৃতি ব্রাহ্মণেরা উপবেশন করিয়া তাহা শ্রবণ করিতে পাইতেন। শূদ্রদিগের সেখানে যাইবার অধিকার ছিল না। সূর্য্য অস্ত হইলে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ও উৎসবানন্দ গোস্বামী সমাজের ঘরে আসিয়া বেদীতে উপবেশন করিতেন। উৎসবানন্দ উপনিষদ্ ব্যাখ্যা করিতেন ও বিদ্যাবাগীশ মহাশয় রাজার রচিত ব্যাখ্যান পাঠ করিতেন ও কখন কখন বেদান্ত দর্শনেরও ব্যাখ্যা করিতেন। তৎপরে সঙ্গীত হইয়া সভা ভঙ্গ হইত। সমাজ-গৃহের মধ্যে মুসলমান, খৃষ্টিয়ান, সকলের যাওয়ার অধিকার ছিল।

তখন যাঁহারা সমাজে যাইতেন, তাঁহারা প্রায় বুঝিতেন না কেন তাঁহারা সমাজে যাইতেছেন। অনেকেই রাজার প্রীত্যর্থে গমন করিতেন বলিয়া বোধ হয়। একদিন রাজা বলিলেন ভাল ভাল গায়ক-সংগ্রহ করিয়া সমাজে গান করাইলে ভাল হয়। অমনি বিখ্যাত গায়ক সকল নিমন্ত্রিত হইল এবং সমাজে নানা ভাবের গান চলিতে লাগিল। রাজা তাহা শ্রবণ করিয়া বলিলেন "ও সব গান কেন, অলখ নিরঞ্জন গাও", সেই অবধি ব্রহ্মসঙ্গীত গীত হইতে লাগিল। তাঁহার বন্ধুরা একথা বুঝিতেন না যে সমাজে সঙ্গীত করিতে বলিলে ব্রহ্মসঙ্গীত বুঝিতে হইবে। এইরূপে একবৎসর কাল অতীত হইল। ১৭৫১ শকে ব্রাহ্ম-সমাজ নূতন স্থানে উঠিয়া আসিল। এবং ঐ শকে রাজার ঐকান্তিক ও প্রাণপণ যত্নে সতীদাহ প্রথা নিবারিত হইল। ইহাতে এক প্রবল আন্দোলন উপস্থিত হইল। রাজা রাধাকান্ত দেব প্রমুখ কলিকাতার ব্যক্তিগণ ধর্ম্মসভা নামে এক সভা স্থাপন করিলেন। তাঁহাদের অর্থ-বল, জনবল একত্র হইয়া ব্রাহ্মসমাজ শিশুকে গ্রাস করিবার জন্য মুখ-ব্যাদান করিল। কেহ কেহ বলিতে লাগিল ব্রাহ্মসমাজ জ্বালাইয়া

দেওয়া হউক, কেহ বা বলিতে লাগিল রামমোহন রায়কে হত্যা করা হউক ইত্যাদি। কিন্তু হায়! মানুষ বুঝিতে পারে না যে যাহা প্রকৃত-ধর্ম্ম-ও-ঈশ্বরানুরাগরূপ অক্ষয় কবচে সংরক্ষিত, জগতের সমস্ত শক্তি একত্রিত হইলেও তাহাকে কেহই বিনাশ করিতে পারে না। ব্রাহ্ম-সমাজ দগ্ধ হইল না এবং রাজা রামমোহন রায়ও বিনষ্ট হইলেন না। বরং ব্রাহ্মসমাজ যুবক দেবেন্দ্রনাথের হস্তে আসাতে নূতন আকার ধারণ করিয়া ক্রমেই নবশক্তি লাভ করিয়া উন্নত ও পরিপুষ্ট হইতে লাগিল, এবং সেই অলোকসামান্য প্রতিভাশালী মহাপুরুষ রাজা রামমোহন রায় আপনার লক্ষ্যসাধনের পথে বাধা প্রাপ্ত হওয়াতে তাঁহার লুক্কায়িত শক্তিসমূহ জাগ্রত হইয়া উঠিল এবং সাগরগামিনী খরস্রোতা কল্লোলিনী আপনার গন্তব্যপথে বাধাপ্রাপ্ত হইলে যে প্রকার সরোষে, সতেজে সেই বাধাকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া অবশেষে মহাসমুদ্রের সহিত মিলিত হয়, সেইরূপ তাঁহার জাগ্রত শক্তিসমূহ ধর্ম্মসভার সকল বাধাকে অতিক্রম করিয়া তাঁহার জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে তাঁহাকে সমর্থ করিয়া এবং জগতে তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া বিধাতার শক্তির জয় ঘোষণা করিল।

১৭৫২ শকে রাজা রামমোহন রায় স্বদেশের উন্নতিকল্পে বিলাত গমন করিলেন। সুতরাং ব্রাহ্মসমাজের ভার তাঁহার পুত্র রাধা-প্রসাদ রায়ের উপর পতিত হইল। এই সময়ে দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয় ইহার কার্য্য পরিচালনার জন্য মাসিক ৬০ টাকা দান করিতেন এবং পরে ৮০ করিয়া দিতেন। রাজার সহচরেরা তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ এই সমাজকে নানারূপ সাহায্য করিতেছিলেন। ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষার জন্য তাঁহাদের মনে যে ব্যাকুলতা হইয়াছিল, তাহা মনে হয় না। কিন্তু পাছে রাজার কীর্ত্তি বিলুপ্ত হয় সেজন্য

তাঁহারা এই সমাজের তত্ত্বাবধারণ করিতেন। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয় কিন্তু এই সমাজের বিশেষত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন এবং ইহার অস্তিত্ব ও উন্নতির উপর ভাবীবংশের ও স্বদেশের কল্যাণ নির্ভর করিতেছে, ইহা সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সেইজন্য তিনি দ্বাদশ বৎসরকাল সকল প্রকার বাধা বিঘ্ন উপেক্ষা করিয়া এই শিশু সমাজকে রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি দরিদ্র ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কোন প্রকারে তাঁহার অন্ন বস্ত্রের সংস্থান হইত। কিন্তু তিনি এই সমাজকে এত স্নেহ করিতেন এবং ইহার উন্নতির জন্য এত ব্যাকুল ছিলেন যে ইহলোক হইতে প্রস্থান করিবার সময় তাহার সঞ্চিত ৫০০ পাঁচ শত টাকা ব্রাহ্মসমাজকে দান করিয়া যান। প্রথমে শনিবার দিবস রাত্রিতে সমাজের কার্য্য হইত, কিন্তু রাজার সহচরেরা ইহাতে সুবিধা বোধ করিলেন না। কারণ তাঁহারা আমোদপ্রিয় ছিলেন এবং শনিবারই তাঁহাদের আমোদ প্রমোদের সুবিধার দিন, এই জন্য শনিবার দিবসের পরিবর্ত্তে বুধবারে সমাজের কার্য্য চলিতে লাগিল এবং এখনও পর্য্যন্ত ঐ দিবসে আদি ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য চলিয়া আসিতেছে।

তত্ত্ববোধিনী সভা স্থাপিত হইবার প্রায় তিন বৎসর পরে একদিন দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজ দেখিতে গেলেন। তিনি ব্রাহ্মসমাজের নাম শুনিয়াছিলেন এবং তাঁহার পিতা যে ইহার একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, তাহা তিনি জানিতেন। তিনি ভাবিলেন ব্রাহ্মসমাজ ব্রহ্মোপাসনার জন্য স্থাপিত হইয়াছে। তত্ত্ববোধিনী সভাও এই উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সুতরাং এই দুই সভা একত্রে মিলিত হইলে তাঁহার উদ্দেশ্য সহজে সিদ্ধ হইবে, এই ভাবিয়া এক দিন তিনি ব্রাহ্মসমাজ দেখিতে গেলেন। সেখানকার কার্য্য দেখিয়া তিনি সন্তুষ্ট হইলেন এবং স্থির করিলেন যে

তত্ত্ববোধিনী সভাকে ব্রাহ্মসমাজের সহিত সংযুক্ত করিয়া তিনি ইহার সকলপ্রকার ভার গ্রহণ করিবেন। সুতরাং ইহা নির্দ্ধারিত হইল যে এখন হইতে তত্ত্ববোধিনী সভা ব্রাহ্মসমাজের তত্ত্বাবধারণ করিবে। ১৭৬৩শক ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে একটি বিশেষ বৎসর, কারণ ঐ বর্ষে ব্রাহ্মসমাজের ভার সাক্ষাৎভাবে যুবক দেবেন্দ্রনাথের হস্তে ন্যস্ত হইল। যদি তত্ত্ব-বোধিনী সভার সহিত ইহার যোগ না হইত এবং দেবেন্দ্রনাথ ইহার সমস্ত ভার গ্রহণ না করিতেন, তাহা হইলে ব্রাহ্মসমাজের যে কি অবস্থা হইত তাহা বলা যায় না। এখন হইতে তত্ত্ববোধিনী সভার মাসিক উপাসনা রহিত হইয়া তাহার পরিবর্ত্তে প্রাতঃকালে ব্রাহ্মসমাজের মাসিক উপাসনা নির্দ্ধারিত হইল এবং ২১শে আশ্বিনের তত্ত্ববোধিনীর সাম্বৎসরিক সভা পরিবর্ত্তিত হইয়া তাহার স্থানে ব্রাহ্মসমাজের গৃহ-প্রতিষ্ঠার দিবস ১১ মাঘে ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব প্রবর্ত্তিত হইল।

নবম অধ্যায়।

ব্রাহ্মসমাজে যোগদান।

যখন দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ যুবকেরা ব্রাহ্মসমাজ পরিচালনের ভার গ্রহণ করিলেন, তখন তাঁহাদের এই চিন্তা হইল কেমন করিয়া ব্রাহ্ম-সমাজে লোকসমাগম হয়। সর্ব্বসিদ্ধিদাতা মঙ্গলময় পরমেশ্বর তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের প্রাণপণ চেষ্টাতে ক্রমশঃ লোক বাড়িতে লাগিল। দেবেন্দ্রনাথও মহা উৎসাহে কার্য্য করিতে লাগিলেন। ক্রমে ব্রাহ্মসমাজের ঘর বাড়িতে লাগিল। অবশেষে তেতালা নির্ম্মিত হইল। তাহাতেও লোক ধরে না। তখন দেবেন্দ্রনাথ ভাবিলেন "লোক বাছা আবশ্যক।" এই চিন্তার পর তিনি স্থির করিলেন যাঁহারা প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন, তাঁহারাই ব্রাহ্ম হইবেন। যাঁহারা পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়া এক অনন্ত নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসনা-ব্রত জীবনে গ্রহণ করিতে পারিবেন, তাঁহারাই প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্ম হইবেন। দেবেন্দ্রনাথ চিরদিনই সরল ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তি ছিলেন। এই সরলতা এবং দৃঢ় নিষ্ঠার জন্যই তিনি সাধন-রাজ্যের এত উচ্চতম প্রদেশে আরোহণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। বাস্তবিকই সাধকের পক্ষে এই দুইটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়। দর্শন শাস্ত্রের গভীর জ্ঞান অথবা চিত্তের অপরাজিত শক্তি ঈশ্বরের পথে অগ্রসর হইবার পক্ষে পরম সহায়, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু এ-সমস্ত উচ্চ ভাব এবং অবস্থা কয়জন লাভ করিতে পারে? সেইজন্য দয়াময় পরমেশ্বর কৃপা করিয়া সকলের পক্ষে যাহাতে তিনি বোধগম্য এবং সহজলভ্য হয়েন, তাহার বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছেন। অকপট ভাবে এবং নিষ্ঠার সহিত

তাঁহাকে ডাকিতে পারিলে কৃপা করিয়া তিনি অন্তরে প্রকাশিত হয়েন। দেবেন্দ্রনাথ বাল্যকাল হইতে যে এইরূপ সরল ছিলেন তাহার আভাস পাঠকেরা ইতঃপূর্ব্বে পাইয়াছেন। মনের মধ্যে যখন যে ভাব উদয় হয়, অনেকে তাহা ধরিয়া রাখিতে পারেন না, এমন কি তাহা যে বিশ্বরাজের দুর্জ্ঞেয় এবং গূঢ়-মঙ্গলনিয়ম-প্রসূত, তাহা বিশ্বাসই করিতে পারেন না। দেবেন্দ্রনাথ প্রথম বয়স হইতেই এমন এক শক্তি লাভ করিয়াছিলেন যে-শক্তি তাঁহাকে সরল এবং নিষ্ঠাবান্ করিয়াছিল।

যখন তিনি বুঝিলেন যে যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হইবেন তাঁহাদিগকে সরলভাবে বিশ্বাসানুযায়ী কার্য্য করিতে হইবে, তখনি তিনি এক প্রতিজ্ঞা-পত্র রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজা রামমোহন রায় গায়ত্রী মন্ত্র দ্বারা উপাসনা করিতেন। দেবেন্দ্রনাথও গায়ত্রী মন্ত্র দ্বারা ব্রহ্মোপাসনার বিধি ঐ প্রতিজ্ঞাপত্রে সন্নিবিষ্ট করিলেন। তিনি এই নিয়ম করিলেন যাঁহারা ব্রাহ্ম হইবেন তাঁহারা প্রতিদিন প্রাতে নিয়মপূর্ব্বক অভুক্ত অবস্থায় ব্রহ্মের উপাসনা করিবেন। এই প্রতিজ্ঞা-পত্র রচনা করিয়া স্থির করিলেন যে আচার্য্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের নিকটে তাঁহারা ২১ জন বিধিপূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন। ১৭৬৫ শকের ৭ই পৌষ ভারতের পক্ষে একটি বিশেষ দিন। ভারতবাসী বহুদিন আর্য্যঋষিগণের বহুসাধনলব্ধ ব্রহ্মের নাম ভুলিয়া গিয়াছিল। পৌরাণিক যুগের বাহ্যিক কার্য্যাড়ম্বরের মধ্যে পড়িয়া এবং পৌত্তলিকতার বাহিরের পূজা ও সাধনের নিষ্ফলতার মধ্যে ভারতবাসী বহুদিন হইতে দিনপাত করিতেছিল, এমন সময়ে ভারত-ভাগ্যবিধাতা কৃপা করিয়া দেবেন্দ্রনাথপ্রমুখ একবিংশতি যুবককে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবার জন্য আশা ও উৎসাহে উদ্দীপ্ত করিয়া পুনরায় যাহাতে ভারতবর্ষে সেই প্রাচীন ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মসাধনা প্রচারিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিলেন।

যেদিন তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মব্রত গ্রহণ করেন, সেদিন দেবেন্দ্রনাথের মনে যে কি আনন্দ, উৎসাহ ও স্ফূর্ত্তি, তাহা তাঁহার নিজের ভাষাতে নিম্নে প্রকাশিত হইল। সেদিনকার অনুষ্ঠানের বৃত্তান্ত তিনি নিজে যে প্রকার লিখিয়াছেন তাহাই লিপিবদ্ধ হইল। "১৭৬৫ শকের ৭ই পৌষ আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মব্রত গ্রহণ করিবার দিন স্থির করিলাম। সমাজের যে নিভৃত কুঠরীতে বেদপাঠ হইত, তাহা একটা যবনিকা দিয়া আবৃত করিলাম। বাহিরের লোক কেহ সেখানে না আসিতে পারে এই প্রকার বিধান করিলাম। সেখানে একটি বেদী স্থাপিত হইল, সেই বেদীতে বিদ্যাবাগীশ আসন গ্রহণ করিলেন। আমরা সকলে তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া বসিলাম। আমাদের মনে এক নূতন উৎসাহ জন্মিল। অদ্য আমাদের প্রতি-হৃদয়ে ব্রাহ্মধর্ম্মবীজ রোপিত হইবে! আশা হইল এই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া কালে ইহা অক্ষয় বৃক্ষ হইবে এবং যখন ইহা ফলবান্ হইবে, তখন ইহা হইতে আমরা নিশ্চয় অমৃত লাভ করিব। 'নিশ্চয় অমৃতলাভ সে ফল ফলিলে।' এই আশা ও উৎসাহে পূর্ণ হইয়া বিদ্যাবাগীশের সম্মুখে আমি বিনীত ভাবে দাঁড়াইয়া একটি বক্তৃতা করিলাম। 'অদ্য এই শুভক্ষণে এই পবিত্র ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্মব্রত গ্রহণ করিবার জন্য আমরা সকলে আপনার নিকট উপনীত হইয়াছি। যাহাতে পরিমিত দেবতার উপাসনা হইতে বিরত হইয়া এক অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের উপাসনা করিতে পারি, যাহাতে সৎকর্ম্মে আমাদের প্রবৃত্তি হয় এবং পাপমোহে মুগ্ধ না হই, এইরূপ উপদেশ দিয়া আমাদের সকলকে মুক্তির পথে উন্মুখ করুন।' আমার এই বক্তৃতা শুনিয়া ও আমার হৃদয়ের একাগ্রতা দেখিয়া তিনি অশ্রুপাত করিলেন এবং বলিলেন যে, রামমোহন রায়ের এইরূপ উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু তিনি তাহা কার্য্যে

পরিণত করিতে পারেন নাই। এতদিন পরে তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইল। প্রথমে শ্রীধর ভট্টাচার্য্য উঠিয়া বেদীর সম্মুখে প্রতিজ্ঞা পাঠ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। পরে শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য, পরে আমি। তাহার পরে পরে ব্রজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আনন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, তারকনাথ ভট্টাচার্য্য, হরদেব চট্টোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, হরিশ্চন্দ্র নন্দী, লালা হাজারীলাল, শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়, ভবানীচরণ সেন, চন্দ্রনাথ রায়, রামনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, শশীভূষণ মুখোপাধ্যায়, জগচ্চন্দ্র রায়, লোকনাথ রায় প্রভৃতি ২১ জন ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। তত্ত্ববোধিনী সভা যখন প্রথম সংস্থাপিত হয়, তখন সেই একদিন, আর অদ্য ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের এই আর একদিন। ১৭৬১ শক হইতে ক্রমে ক্রমে আমরা এতদূর অগ্রসর হইলাম যে, অদ্য ব্রহ্মের শরণাপন্ন হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলাম। এই ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আমরা নূতন জীবন লাভ করিলাম। আমাদের উৎসাহ ও আনন্দ দেখে কে? ব্রাহ্মসমাজের এ একটা নূতন ব্যাপার। পূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজ ছিল, এখন ব্রাহ্মধর্ম্ম হইল। ব্রহ্ম ব্যতীত ধর্ম্ম থাকিতে পারে না, এবং ধর্ম্ম ব্যতীতও ব্রহ্মলাভ হয় না। ধর্ম্মেতে ব্রহ্মেতে নিত্য সংযোগ, সেই সংযোগ বুঝিতে পারিয়া আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলাম।" দেবেন্দ্রনাথ ঈশ্বরের নিকটে এবং ধর্ম্মবন্ধুদিগের সাক্ষাতে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। অর্থাৎ তিনি স্বহস্তে অগ্নি জ্বালাইয়া আপনাকে পবিত্র ও বিশুদ্ধ করিয়া ঈশ্বরের পবিত্র সহবাসের উপযুক্ত হইবার জন্য তাহার মধ্যে ঝম্প প্রদান করিলেন।

দশম অধ্যায়।

ব্রাহ্মসমাজে যোগদান।

এই সময়ে দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের সম্পদের মধ্যাহ্নকাল। তিনি আপনার সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিপ্রভাবে ও প্রভূত অধ্যবসায়ের বলে অতুল যশ ও সম্পদ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সুখ্যাতির আলোক তখন ইউরোপের প্রায় সমস্ত দেশে বিকীর্ণ হইয়াছিল। "তখন তাঁহার হাতে হুগলি, পাবনা, রাজসাহী, কটক, মেদিনীপুর, রঙ্গপুর, ত্রিপুরা প্রভৃতি জেলার বৃহৎ বৃহৎ জমিদারী এবং নীলের কুঠী, সোরা, চিনি, চা প্রভৃতি বাণিজ্যের বিস্তৃত ব্যাপার। ইহার সঙ্গে আবার রাণীগঞ্জে কয়লার খনির কাজও চলিতেছে।" তখন কার ঠাকুর কোম্পানি নামে যে বাণিজ্য ব্যবসায় ছিল, তাহার অর্দ্ধেক অংশ তাঁহার অধিকারে ছিল। তাহার এক আনা অংশ দেবেন্দ্রনাথকে তিনি দিয়াছিলেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয় সর্ব্বদাই এই ইচ্ছা করিতেন যে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবেন্দ্রনাথ এই-সমস্ত বিষয়ের অধিকারী হইয়া তাঁহার ন্যায় সুখে স্বচ্ছন্দে দিনাতিপাত করেন এবং সমাজের মধ্যে তাঁহার যে প্রতিপত্তি ছিল, দেবেন্দ্রনাথও সেই প্রতিপত্তি ও সুখ্যাতি লাভ করিয়া সংসারে বাস করেন। এইজন্য তিনি তাঁহাকে বড় বড় সাহেবের সহিত পরিচয় করাইয়া দিতেন। বেলগাছিয়াতে তাঁহাদের একটি সুন্দর উদ্যান ছিল। এখানে মধ্যে মধ্যে তিনি উচ্চপদস্থ সাহেবদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজ দিতেন। একবার গবর্ণর জেনেরাল লর্ড অকলণ্ড এবং তাঁহার ভগিনী কুমারী ইডেন প্রমুখ বহু ইংরাজ পুরুষ ও রমণীকে নিমন্ত্রণ করিয়া তিনি এক ভোজ দিয়াছিলেন। "রূপে, গুণে, পদে, সৌন্দর্য্যে, নৃত্যে, মদ্যে,

আলোকে আলোকে বাগান একেবারে ইন্দ্রপুরী হইয়া গিয়াছিল।" ইংরাজদের মহাভোজ দেখিয়া কোন কোন বিখ্যাত বাঙ্গালী বলিয়াছিলেন "ইনি কেবল সাহেবদের লইয়া আমোদ করেন, কিন্তু কোন বাঙ্গালীকে ডাকেন না।" এই কথা দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের কর্ণগোচর হইল। তিনি ইহার কিছুদিন পরে ঐ বাগানে কলিকাতার সমস্ত প্রধান প্রধান বাঙ্গালীদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া বাইনাচ, গান বাজনা দিয়া একটা মজলিস্ করিলেন। সেইদিনে দেবেন্দ্রনাথের প্রতি তাঁহার পিতার এই আদেশ ছিল যে তিনি নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগকে অভ্যর্থনা ও তাঁহাদের পরিচর্য্যা করিবেন। কিন্তু সেদিন তত্ত্ববোধিনী সভার অধিবেশনের দিন ছিল। সুতরাং দেবেন্দ্রনাথ ঐ সভার কার্য্যে ব্যস্ত থাকাতে তাঁহার পিতার আদেশ প্রতিপালন করিতে পারিলেন না। একবার মাত্র বাগানে গিয়া তাড়াতাড়ি সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া সভার কার্য্যে যোগ দিবার জন্য ফিরিয়া আসিলেন। ইহাতে তাঁহার পিতা অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিয়া তাঁহার ন্যায় সংসারে মান, সম্ভ্রম, সম্পদ, ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া সকলের সম্মান-ভাজন হইয়া দিনযাপন করেন, কিন্তু এই ঘটনাতে তিনি জানিতে পারিলেন দেবেন্দ্রনাথ এই অল্প বয়সেই বিষয়ের প্রতি একান্ত উদাসীন। তাহা ছাড়া তিনি জানিতেন দেবেন্দ্রনাথ বিদ্যাবাগীশের নিকট উপনিষদ্ প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। এই ব্যাপারে তিনি একদিকে যেমন দেবেন্দ্রনাথের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, অন্যদিকে তেমনি বিদ্যাবাগীশের প্রতি বিরক্ত হইয়াছিলেন, একদিন তিনি বলিয়াছিলেন বিদ্যাবাগীশকে আমি ভাল লোক বলিয়া জানিতাম, কিন্তু এখন দেখিতেছি তিনি দেবেন্দ্রের কানে ব্রহ্মমন্ত্র দিয়া তাহাকে

খারাপ করিয়া দিতেছেন। একে তাহার বিষয়বুদ্ধি অল্প, এখন সে ব্রহ্ম ব্রহ্ম করিয়া আর বিষয়কর্ম্মে মনোযোগ দেয় না।"

এই কথা বিদ্যাবাগীশ জানিতে পারিয়া অত্যন্ত ভয় পাইলেন এবং দেবেন্দ্রনাথকে বলিলেন "কর্ত্তার মত নাই, অতএব আমি আর তোমাকে পড়াইতে পারিব না।" সেইদিন হইতে তিনি তাঁহার বাড়ীতে আসা বন্ধ করিয়া দিলেন। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ ইহাতে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া হেদুয়াতে তত্ত্ববোধিনীর যন্ত্রালয়গৃহে বসিয়া তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিতেন। ঐ গৃহে পূর্ব্বে রামমোহন রায়ের স্কুল ছিল এবং ইহাতে দেবেন্দ্রনাথ বাল্যকালে কিছুদিন পাঠ করিয়াছিলেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয় দেখিলেন তাঁহার পুত্র আর বিদ্যাবাগীশের নিকট হইতে শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছেন না, সুতরাং তিনি অনেক পরিমাণে নিশ্চিন্ত হইলেন বটে কিন্তু তাঁহার পুত্র যে সর্ব্বদা ভাবিতেছেন "ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ," এবং "তোমা বিহনে আমার জীবনে কাজ কি," তাহা তিনি জানিতেন না। মানবের ভাগ্যবিধাতা লোকচক্ষুর অন্তরালে বসিয়া প্রত্যেক মানুষের প্রাণে যে কি ভাব সঞ্চার করিতেছেন এবং কি প্রকারে প্রত্যেক মানবকে অজ্ঞাতভাবে আপনার কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া নিজের ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া লইতেছেন, তাহা মানববুদ্ধির অগম্য। দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয় ইচ্ছা করিলেন, তাঁহার পুত্র সংসারধর্ম্মে দীক্ষিত হউন; বিধাতা বলিলেন তাঁহাকে সংসারাতীত ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে হইবে। বঙ্গের সর্ব্বলোকবিদিত, অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর দ্বারকানাথ ইচ্ছা করিলেন, পুত্র বিষয়ের পূজাতে আপনাকে নিযুক্ত করিয়া সংসারে যশোলাভ করুন; অনন্তব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর বলিলেন, দেবেন্দ্রনাথকে বাল্যকাল হইতে বিষয়ের ক্ষণস্থায়িত্ব বুঝাইয়া দিয়া সাংসারিক সকল বস্তুর উপর আপনার আসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া এবং

বিষয়াতীত বস্তুর সাধনে নিযুক্ত করিয়া স্বর্গীয় যশোলাভের উপযুক্ত করিতে হইবে। দ্বারকানাথ ইচ্ছা করিলেন, তাঁহার পুত্র তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বঙ্গদেশের উপর আপনার বিস্তৃত জমিদারী প্রতিষ্ঠিত করুন; শুভদাতা পরমপিতা পরমেশ্বর বলিলেন, দেবেন্দ্রনাথকে তাঁহার নিজের কার্য্যে বরণ করিয়া ভবিষ্যদ্‌বংশীয়গণের আধ্যাত্মিক জীবনের উপর যাহাতে তিনি আপনার মহৎ জীবন ও গম্ভীর চরিত্রের প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। দ্বারকা-নাথ ঠাকুর মহাশয়ের ইচ্ছা অপূর্ণ রহিয়া গেল. কিন্তু বিধাতার শুভ ইচ্ছা দেবেন্দ্রনাথের জীবনে পূর্ণ হইল!

দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী সভা স্থাপন করিবার পর ইচ্ছা করিলেন যে এই সভা হইতে একখানি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। উপনিষদ আলোচনা করিয়া তিনি যে-সমস্ত সত্যরত্ন লাভ করিতেছেন, তাহা একাকী সম্ভোগ করিয়া তৃপ্ত হইতে পারিলেন না। যাহাতে এই সত্যরত্নসমূহ তাঁহার স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণ লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়েন, তাহার জন্য তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল হইল। তিনি আরও ভাবিলেন রাজা রামমোহন রায় যে-সমস্ত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রচার হওয়া আবশ্যক। এতদ্ব্যতীত যাহাতে লোকের জ্ঞান ও চরিত্র উন্নত হইতে পারে, এমন সমস্ত বিষয় প্রচারিত হইলে অনেক শুভফল হইবে। এই উদ্দেশ্যে তিনি একখানি পত্রিকা প্রকাশের সঙ্কল্প করিলেন। ইহার একজন উপযুক্ত সম্পাদক আবশ্যক। সেজন্য তিনি অনেক সভ্যের রচনা পরীক্ষা করিলেন। সকলের মধ্যে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত মহা-শয়ের রচনা তাঁহার মনোমত হইল। যদিও তাঁহার রচনার সমস্ত ভাবের সহিত তাঁহার নিজের মিল হইল না, তথাপি তিনি ভাবিলেন যদি তিনি নিজে অক্ষয় বাবুর সমস্ত রচনা পরিদর্শন করিয়া দেন, তাহা

হইলে পত্রিকা-সম্পাদন-কার্য্য তাঁহার দ্বারা ভালরূপে চলিবে। এই স্থির করিয়া তিনি ঐ কার্য্যে অক্ষয় বাবুকেই নিযুক্ত করিলেন।

অক্ষয় বাবু যাহা লিখিতেন, দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ং তাহা পরীক্ষা করিতেন এবং যদি তাহাতে তাঁহার মতবিরুদ্ধ কোন ভাষা অথবা ভাব থাকিত, তাহা পরিবর্ত্তন করিয়া দিতেন এবং অক্ষয় বাবুকে তাঁহার মতে আনিবার চেষ্টা করিতেন। কিন্তু তাহা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার ছিল, কারণ দেবেন্দ্রনাথ অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মানব প্রকৃতির সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ অনুসন্ধান করিতেন, আর অক্ষয় বাবু বাহ্য বস্তুর সহিত মানবের সম্বন্ধ বিচারে ও অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতেন। সংক্ষেপে বলিতে গেলে বলিতে হয় একজন ছিলেন দার্শনিক, ও আর একজন ছিলেন বৈজ্ঞানিক। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই দুই বিভিন্ন প্রকৃতির মনুষ্যদ্বয় একত্রে মিলিত হইয়া দীর্ঘকাল স্বদেশের সেবাতে আপনাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই দুই ব্যক্তির সম্মিলন দেশের মধ্যে যে কি পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছিল এবং কি শুভফল উৎপাদন করিয়াছিল, পরে তাহা প্রকাশিত হইতেছে। এজন্য সমগ্র বঙ্গদেশ তাঁহাদের নিকট বিশেষ ভাবে ঋণী।

একাদশ অধ্যায়।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত।

১৭৬৫ শকের ভাদ্র মাসে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ক্রমে ক্রমে গ্রাহকসংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল এবং তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যসংখ্যাও বাড়িতে লাগিল। দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ জানিতে পারিলেন যে সত্যধর্ম্ম এবং কুসংস্কার-মুক্ত পবিত্র নীতি-সমুদায় আমাদের দেশের শাস্ত্রেও প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে। তজ্জন্য বাহিরে যাইতে হইবে না এবং অন্যধর্ম্মাবলম্বীগণের শাস্ত্র অন্বেষণ করিতে হইবে না। বিশেষতঃ তখন শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় যেরূপ অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিয়া জ্ঞান ও বিজ্ঞানের উচ্চ তত্ত্ব-সমূহ তাঁহার প্রাণময়ী ভাষাতে বিবৃত করিতেন, তাহাতে প্রায় দুই বৎসরের মধ্যে তত্ত্ববোধিনী সভাতে ৫০ জন সভ্য যোগদান করিলেন এবং প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্মব্রত গ্রহণ করিলেন। তখন দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমারের মধ্যে কি প্রকার বন্ধুতা ও সৌহৃদ্য জন্মিয়াছিল, তাহা ভাবিলেও প্রাণ আনন্দে পূর্ণ হয়। দেবেন্দ্রনাথও অত্যন্ত উৎসাহ সহকারে এই আত্মীয়তা রক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন যদি এই-সমস্ত ব্রাহ্মদিগের মিলিত হইবার জন্য একটি স্থান পাওয়া যায়, তাহা হইলে পরস্পরের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ যতই হইবে, ততই সদ্ভাব বৃদ্ধি হইবে ও ধর্ম্মালোচনা দ্বারা পরস্পরের উন্নতি হইবে। এই চিন্তা করিয়া তিনি একদিন পলতার পরপারে তাঁহাদের গোরিটির বাগানে একত্রিত হইবার জন্য সকলকে নিমন্ত্রণ করিলেন। দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ং সমস্ত নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে ৮।৯ টা বোটে লইয়া ১৭৬৭ শকের ৭ই পৌষ ঐ বাগানে উপস্থিত হয়েন। এতগুলি ব্রাহ্ম পরস্পরকে

একত্রিত দেখিয়া সকলেই অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। বিশেষতঃ যখন তাঁহারা স্মরণ করিলেন যে এতগুলি লোক কোন স্বার্থ সাধনের জন্য একত্রিত হয়েন নাই, কিন্তু তাঁহারা সকলে সেই একই অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতির সন্তান এবং তাঁহার সত্য ধর্ম্মের আলোক দেশে বিদেশে প্রচার করিবার জন্য সকলে একত্রিত হইয়াছেন, তখন তাঁহাদের মধ্যে এক মহোৎসবের ভাব চলিতে লাগিল। প্রাতঃকালের সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সকলে মিলিয়া ব্রহ্মের মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন এবং প্রকৃতির মনোরম নির্জ্জন শোভা ও সৌন্দর্য্যের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া সকল সৌন্দর্য্যের আকর সেই পরম সুন্দরকে অনুভব করিয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন। এই দিনে তাঁহারা কেমন জলন্ত ভাবে ঈশ্বরের উপাসনা সম্ভোগ করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নলিখিত ঘটনা দ্বারা কথঞ্চিৎ পরিষ্কার হইতে পারে। যখন সকলে সেই পরম পিতার উপাসনা করিলেন এবং বুঝিতে পারিলেন তাঁহারা সকলে এক পবিত্র ভ্রাতৃত্ব-সূত্রে আবদ্ধ, তখন তাঁহাদের মন দেশপ্রচলিত কুসংস্কার ও সমাজের ক্ষুদ্র গণ্ডী হইতে মুক্ত হইল এবং এক নির্ম্মল প্রেমবারি দ্বারা তাঁহাদের হৃদয় সিক্ত হইয়া উঠিল। তাঁহারা বুঝিলেন, এই যে জাতিভেদ, ইহা বৈষম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহাতে মানুষ মানুষকে দূরে রাখে এবং পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হইতে দেয় না। ইহা প্রেম-বস্তুকে চিনিতে দেয় না, মানবকে এক কৃত্রিম গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়া তাহাকে সংকীর্ণ করিয়া তোলে, সুতরাং ইহা সাধনপথের বিরোধী। ইহা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। এই সত্য যখন তাঁহারা উপলব্ধি করিলেন, তখন জগদ্দলের রাখালদাস হালদার প্রস্তাব করিলেন যে "ব্রাহ্মদিগের উপবীত পরিত্যাগ করা বিধেয়। যখন আমরা এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মের উপাসক হইয়াছি, তখন বর্ণ প্রভেদ না থাকাই শ্রেয়ঃ।" প্রায় ৭০

বৎসর পূর্ব্বে ব্রাহ্মণসন্তানের উপবীত ত্যাগের প্রস্তাব করা এবং সমগ্র হিন্দুসমাজকে মহাসিন্ধুজলে নিক্ষেপ করা একই কথা। রাখালদাস হালদারের পিতা এই কথা শুনিয়া আপনার বক্ষে ছুরী মারিতে উদ্যত হইয়াছিলেন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে হুগলিজেলার অন্তর্গত বাঁশবেড়ে গ্রামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহার নাম তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা ছিল। এখানে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়নের ব্যবস্থা ছিল এবং যাহাতে ছাত্রেরা বিশদরূপে ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে পারে, তাহার বন্দোবস্ত ছিল। ব্রাহ্মসমাজে যাহাতে বেদপাঠ শুদ্ধরূপে হইতে পারে এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ সুন্দররূপে বিবৃত হইতে পারে, তাহার জন্য দেবেন্দ্রনাথ চিন্তা করিতে লাগিলেন। তখন বেদ প্রভৃতি প্রাচীন শাস্ত্রের আলোচনা বঙ্গদেশ হইতে এক প্রকার উঠিয়া গিয়াছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং এই-সমস্ত শাস্ত্র শিক্ষা দিবার জন্য তিনি বিজ্ঞাপন দিলেন—"যিনি সংস্কৃত ভাষায় নির্দ্দিষ্ট পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইবেন, তিনি তত্ত্ববোধিনী সভায় থাকিয়া শিক্ষালাভের জন্য ছাত্রবৃত্তি পাইবেন।" তদনুসারে ৫।৬ জন ছাত্র বিদ্যাবাগীশের নিকট পরীক্ষা দিলেন। তন্মধ্যে আনন্দচন্দ্র ও তারকনাথ উত্তীর্ণ হইলেন। ইঁহারা সভাতে থাকিয়া শাস্ত্র-পাঠে মনোনিবেশ করিলেন।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে দেবেন্দ্রনাথ বেদ প্রভৃতি প্রাচীন শাস্ত্রের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছিলেন এবং রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের নিকটে গোপনে অধ্যয়ন করিতেছিলেন। কিন্তু ইহাতে তাঁহার তৃপ্তি হইল না। তিনি বিশেষরূপে বেদের তত্ত্বসমূহ জানিবার

ভালরূপ আলোচনা হইত। সুতরাং বেদ শিক্ষার জন্য তিনি নিজব্যয়ে কাশীতে কয়েকটি ছাত্র প্রেরণ করিতে সংকল্প করিলেন। ১৭৬৬ শকে একজন ছাত্রকে কাশী প্রেরণ করিলেন। পর বৎসর আর তিন জনকে পাঠাইলেন। তাঁহাদের নাম আনন্দচন্দ্র, তারকনাথ, বাণেশ্বর এবং রমানাথ। ইঁহারা কাশীতে চারিবেদ অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা এই শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া প্রত্যাগমন করেন এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে বেদের অনুবাদ রীতিমত প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। তৎপূর্ব্বে বাংলা দেশে বেদের চর্চ্চা প্রায় ছিলই না, কিন্তু ইঁহারা স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া এই বেদের প্রতি দেশবাসীর মনোযোগ আকর্ষণ করিলেন। তদবধি বাংলা দেশে বেদচর্চ্চা পুনরায় আরম্ভ হইল। এ বিষয়ে সমস্ত বাংলা দেশ দেবেন্দ্রনাথের নিকট বিশেষভাবে ঋণী, কারণ এই বেদালোচনা বাংলা দেশে তিনিই পুনরুজ্জীবিত করিলেন। বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালীরা যে সত্যালোক লাভ করিবার জন্য প্রাচীন শাস্ত্রসমূহের দিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়াছেন, ইহার জন্য কি তাঁহারা দেবেন্দ্রনাথ ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবেন না?

এই সময়ে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে বিবিধ উচ্চ বিষয়ের আলোচনা হইত। ইহার প্রথম সম্পাদক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়। ইঁহার পিতার নাম পীতাম্বর দত্ত। ইনি নবদ্বীপের সন্নিহিত চুপী নামক গ্রামে ১৭৪৬ শকে জন্মগ্রহণ করেন। অক্ষয়কুমার কিছুদিন গুরু মহাশয়ের পাঠশালাতে অধ্যয়ন করেন। তৎপরে খিদিরপুরে আসিয়া পিতার সহিত বাস করেন ও তাঁহার নিকট থাকিয়া পারসী ভাষা শিক্ষা করেন। ইহাতে তাঁহার তাদৃশ মনোযোগ ছিল না। তিনি ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য খিদিরপুরে এক অবৈতনিক



স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত



খ্রীষ্টীয় বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইলেন। তৎপরে ১৬ বৎসর বয়সে "ওরিএণ্ট্যাল সেমিনারিতে" ভর্ত্তি হয়েন। তাঁহার জ্ঞানপিপাসা এত বলবতী ছিল যে স্কুলের পাঠ্য ব্যতীত আরও অনেক গ্রন্থ পাঠ করিতেন। বাল্যকাল হইতে তিনি দারিদ্র্যের মধ্যে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহার জন্য পাঠে তিনি কখনও অবহেলা করেন নাই। ওরিএণ্ট্যাল সেমিনারিতে ভর্ত্তি হইবার কিছুদিন পরে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়, সুতরাং তাঁহাকে তাঁহার জননী দেবীর ও নিজের ভরণপোষণের জন্য অর্থোপার্জ্জন করিতে হইল। এই দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে তিনি জ্ঞানোপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন।

তত্ত্ববোধিনীসভা কর্ত্তৃক 'স্থাপিত তত্ত্ববোধিনী' পাঠশালাতে তিনি কিছুদিন ভূগোল ও পদার্থ বিদ্যার শিক্ষকতা করেন। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁহাকে দেবেন্দ্রনাথের নিকটে লইয়া গিয়া পরিচয় করাইয়া দেন। অক্ষয়কুমার তত্ত্ববোধিনী পাঠশালাতে প্রথম মাসে ৮৲ তৃতীয় মাসে ১০৲ ও তৎপরে ১৪৲ করিয়া মাসিক বেতন পাইতেন। তৎপরে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হইলে ইনি তাহার প্রথম সম্পাদক হয়েন। এই সময়ে তিনি কিছুদিন মেডিক্যাল কলেজে উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণীতত্ত্ববিদ্যা, রসায়নবিদ্যা ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান অধ্যয়ন করেন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদকত্ব গ্রহণ করিয়া তিনি অক্লান্তভাবে ইহার উন্নতির জন্য পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। একদিকে তিনি ইহাতে নূতন নূতন প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, অন্যদিকে রাশি রাশি জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থসমূহ পাঠ করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্বাস্থ্য বাল্যকাল হইতে ভাল ছিল না বটে, কিন্তু তাহার জন্য তিনি জ্ঞানলাভ অথবা জ্ঞানপ্রচারে কখনও ত্রুটি করেন নাই। এই কার্য্যে তিনি প্রায় দ্বাদশ

বৎসরকাল নিযুক্ত ছিলেন। অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রমে তাঁহার শরীর ভগ্ন হইতে লাগিল। অবশেষে ১৭৭৭ শকের আষাঢ় মাসে এক-দিন ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাতে উপস্থিত আছেন, এমন সময়ে হঠাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। অনেক যত্নে তাঁহার চৈতন্য লাভ হইল বটে, কিন্তু ইহার পর হইতে মস্তিষ্কের পীড়াতে অত্যন্ত কষ্ট পাইতে লাগি-লেন। তাহাতে তাঁহাকে লেখনী পরিত্যাগ করিতে হইল। লেখনী পরিত্যাগ করিলেন বটে, কিন্তু গ্রন্থ রচনা বন্ধ হইল না। প্রাতে সুস্নিগ্ধ সময়ে এক ঘণ্টা কি দেড় ঘণ্টা কাল তিনি মুখে বলিতেন আর-একজন তাহা লিখিয়া লইতেন। এইরূপে জীবনের অবসান-কাল পর্য্যন্ত তিনি কার্য্য করিয়াছেন।

শেষ জীবনে তিনি বালি গ্রামের নিকটবর্ত্তী গঙ্গাতীরস্থ এক উদ্যান-বাটীতে বাস করিতেছিলেন। এই সময়েও তিনি জ্ঞানলাভের চেষ্টা করিতেন এবং সমাগত ব্যক্তিদিগের সহিত জ্ঞানানুশীলন করিয়া সময় অতিবাহিত করিতেন। সেখানে ১৮০৮ শকের ১৪ই জ্যৈষ্ঠ তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁহার শক্তি ও উৎসাহ বাংলা ভাষাকে কি প্রকার সুসজ্জিত ও অলঙ্কৃত করিয়াছে, তাহা প্রায় সকলেই জানেন। তাঁহার জ্ঞানানুশীলনের প্রবৃত্তি সেই অন্ধকার-যুগে বাংলা দেশে জ্ঞানের বর্ত্তিকা প্রজ্বলিত করিয়া বাঙ্গালী পাঠকদিগের মনের অন্ধকার অনেক পরিমাণে বিদূরিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। তাঁহার লিখিত চারুপাঠ, বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার এবং ভারতবর্ষের উপাসক সম্প্রদায় চিরকালই তাঁহার কীর্ত্তি ঘোষণা করিবে এবং বাংলা সাহিত্যে স্বর্ণাক্ষরে তাঁহার নাম লিখিয়া রাখিয়া তাঁহাকে অমর করিবে।

দ্বাদশ অধ্যায়।

তত্ত্ববোধনী পত্রিকা।

এই অধ্যায়ে আমরা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। এই পত্রিকা সম্বন্ধে বর্ত্তমান সময়ের একজন সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক যাহা লিখিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করা যাইতেছে। "তত্ত্ববোধিনী বঙ্গদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পত্রিকা হইয়া দাঁড়াইল। তৎপূর্ব্বে বঙ্গসাহিত্যের বিশেষতঃ দেশীয় সংবাদপত্রসমূহের অবস্থা কি ছিল, এবং অক্ষয়কুমার দত্ত সেই সাহিত্যজগতে কি পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছিলেন তাহা যখন স্মরণ করি, তখন তাঁহাকে দেশের মহোপকারী বন্ধু না বলিয়া থাকিতে পারি না। 'রসরাজ', 'যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল' প্রভৃতি অশ্লীলভাষী কাগজগুলি ছাড়িয়া দিলেও 'প্রভাকর' ও 'ভাস্করের' ন্যায় ভদ্র ও শিক্ষিত সমাজের জন্য লিখিত পত্রসকলেও এমন-সকল ব্রীড়াজনক বিষয় বাহির হইত, যাহা ভদ্রলোকে ভদ্রলোকের নিকট পাঠ করিতে পারিত না। এই কারণে রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি ডিরোজিওর শিষ্যগণ ঘৃণাতে দেশীয় সংবাদপত্র স্পর্শও করিতেন না। কিন্তু অক্ষয়কুমার দত্ত-সম্পাদিত তত্ত্ববোধিনী যখন দেখা দিল, তখন তাঁহারা পুলকিত হইয়া উঠিলেন। রামগোপাল ঘোষ একদিন রামতনু লাহিড়ী মহাশয়কে বলিলেন— 'রামতনু! রামতনু! বাঙ্গলা ভাষায় গম্ভীর ভাবের রচনা দেখেছ? এই দেখ।' বলিয়া তত্ত্ববোধিনী পাঠ করিতে দিলেন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হইবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বের বাংলা সাহিত্যের ভাষা এবং তত্ত্ববোধিনীর ভাষা তুলনা করিয়া পাঠকেরা সহজেই বুঝিতে পারিবেন এ বিষয়ে পত্রিকা দেশের কত উপকার করিয়াছে।

মহাপণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় তাঁহার "প্রবোধচন্দ্রিকাতে" লিখিয়াছিলেন—"কোকিল-কলালাপ-বাচাল যে মলয়াচলানিল সে উচ্ছলচ্ছীকরাত্যচ্ছ নির্ঝরাম্ভঃ-কণাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে।"

"প্রফুল্ল জ্ঞাননেত্র" নামক পুস্তকে আছে—"আপনার সাহায্যতরণী কত্তৃক গভীর-তিমির-দুস্তার অজ্ঞানার্ণব হইতে নিস্তার পাইয়া।"

১৭৭২ শকে "সর্ব্বামোদতরঙ্গিণী" রচিত হয়। তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়—"সর্ব্বোপাস্য সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বান্তর্য্যামী সর্ব্বস্বামী সর্ব্বভূতের কর্ত্তা পাতা বিধাতাকে সর্ব্বতোভাবে প্রণামপূর্ব্বক সর্ব্বামোদতরঙ্গিণী নামক গ্রন্থ প্রকাশ করিতেছি।"

যখন ইউরোপীয় বাংলা লেখকেরা বাঙ্গলাতে পত্রিকা ও গ্রন্থ প্রচার আরম্ভ করেন তখন তাঁহারা অপেক্ষাকৃত সরল ও সুবোধ্য ভাষা ব্যবহার করেন। তাহার একটি দৃষ্টান্ত নিম্নে লিখিত হইতেছে।—"স্ত্রী কহিল, গুড় হইলেই কি রাঁধা হয়? তৈল নাই, নুন নাই, চাউল নাই, তরকারিপাতি কিছুই নাই। কাঠগুলি সকলি ভিজা, বেসাতি বা কিরূপে হবে? * * * কুটনা বা কে কুটিবে, বাটনা বা কে বাটিবে? তৎপতি কহিল, আজ কি ঘরে কিছুই নাই, দেখ দেখি খুদ কুঁড়া যদি কিছু থাকে, তবে তার পিঠা কর, এই গুড় দিয়া খাইব। ইহাতে তাহার স্ত্রী কহিল, বটে, পিঠা করা বুঝি বড় সহজ? জান না, পিঠা আঠা; যেমন আঠা লাগিলে শীঘ্র ছাড়ে না, তেমনি পিঠার লেঠা বড় লেঠা, শীঘ্র ছাড়ে না। কখনো ত রাঁধিয়া খাও নাই।"

অতঃপর রাজা রামমোহন রায় বাঙ্গলাতে অনেক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার ভাষা কিরূপ ছিল, তাহার দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে:—"প্রথমতঃ এই যাহাকে ব্রহ্ম জগৎকর্ত্তা কহ তিহোঁ বাক্য মনের অগোচর সুতরাং তাহার উপাসনা অসম্ভব হয়।

এই নিমিত্ত কোন রূপগুণবিশিষ্টকে জগতের কর্ত্তা জানিয়া উপাসনা না করিলে নির্ব্বাহ হইতে পারে নাই অতএব রূপগুণবিশিষ্টের উপাসনা আবশ্যক হয়। ইহার সামান্য উত্তর এই। যে কোন ব্যক্তি বাল্য-কালে শত্রুগ্রস্ত এবং দেশান্তর হইয়া আপনার পিতার নিরূপণ কিছু জানে নাই এ নিমিত্ত সে ব্যক্তি যুবা হইলে পরে যে কোন বস্তু সম্মুখে পাইবেক তাহাকে পিতারূপে গ্রহণ করিবেক এমত নহে, বরঞ্চ সেই ব্যক্তি পিতার উদ্দেশে কোন ক্রিয়া করিবার সময়ে অথবা পিতার মঙ্গল প্রার্থনা করিবার কালে এই কহে যে যেজন জন্মদাতা তাঁহার শ্রেয়ঃ হউক।"

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয় তখনকার একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার ভাষা কি প্রকার ছিল, তাহা লিখিত হইতেছে—"এই আত্মা জন্মরহিত সর্ব্বদা একরূপ হয়েন এবং পূর্ব্ব হইতেই নূতন আছেন, যেমন কুণ্ডল বিকার দ্বারা হার হইয়া নূতন হয় তদ্রূপ আত্মা বিকার দ্বারা রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া যে নূতন হয়েন এমত নহে এবং শরীর হন্যমান হইলেও তিনি হন্যমান হয়েন না। তিনি প্রাপ্য নহেন যে গ্রাম নগরের ন্যায় গমন ক্রিয়ার ব্যাপ্য হইবেন, যেহেতু তাঁহার সর্ব্বগতত্বপ্রযুক্ত আকাশের ন্যায় সর্ব্বদাই তিনি প্রাপ্ত আছেন। বস্তুতঃ জীবাত্মা পরব্রহ্মস্বরূপ হয়েন, কেবল স্বরূপের অজ্ঞান দ্বারা জনন মরণাদি সংসারধর্ম্ম আরোপিত হইতেছে, সুতরাং স্বরূপের জ্ঞান হইলে অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় মাত্র, গ্রামাদির ন্যায় স্থানান্তরে যাইয়া ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইতে হয় এমত নহে। যদি বল ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন ইত্যাদি শ্রুতিতে পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন এরূপ নির্দ্দেশ কি প্রকারে সঙ্গত হয়, উত্তর, যেমন কণ্ঠস্থিত হারকে বিস্মৃত হইলে ঐ হার

হইলে ঐ হার যথাস্থানস্থিত হইয়াও যেন প্রাপ্ত হইল এমত প্রতীত হইয়া থাকে সেইরূপ অজ্ঞানে আবৃত আত্মার জ্ঞান দ্বারা আবরণ নিবৃত্তি হইলে আত্মা প্রাপ্ত হইলেন এরূপ প্রতীতি হয়।”

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৭৬৭ শকের ভাদ্র মাস হইতে প্রকাশিত হয়। প্রথম সংখ্যা পত্রিকা পাওয়া যাইতেছে না। দ্বিতীয় সংখ্যা পত্রিকাতে যে ভাষা দ্বারা একটি রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল,তাহার সহিত পূর্ব্বোক্ত ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থকারের রচিত পুস্তকাদি হইতে উদ্ধৃত অংশসমূহের ভাষার তুলনা করিয়া দেখিলে পাঠক সহজেই বুঝিতে পারিবেন পত্রিকার ভাষা কেমন মার্জ্জিত, স্বাভাবিক এবং সরল। ইহা সেই অমর অক্ষয়কুমারের লেখনীবিনিঃসৃত। “অদ্য কি সুখের দিবস! এ সময়ে আর কতিপয় মনের অভিপ্রায় ব্যক্ত না করিয়া ক্ষান্ত হইতে পারি না। উৎসাহ অদ্য আমার সম্মুখে নৃত্য করিতেছে, দেশের হিতাভিলাষ অন্তঃকরণে সমুদায় স্থান অধিকার করিয়াছে, আশা সাহসকে আশ্রয় করিয়া গগন পর্য্যন্ত উড্ডীয়মান হইয়াছে; পৃথিবী অদ্য যেন এক নূতন মনোহর বেশ পরিধান করিয়াছে এবং আনন্দ সাগরস্বরূপ হইয়া আমার মানস-ক্ষেত্রে প্লাবিত হইয়াছে। আমি নিঃসন্দেহে অনুমান করি যে এই সমাজস্থ সমুদয় মহাশয় আমার সহিত সমান আহ্লাদে মগ্ন হইয়াছেন। যেরূপ কৃষকেরা যত্নের সহিত বীজ বপনপূর্ব্বক ভাবি উৎপন্ন শস্যের আশায় আসক্ত হইয়া পুলকে পরিপুর্ণ হয়, এবং মনোমধ্যে পুনঃ পুনঃ তাহার আলোচনা করিয়া সুখী হইতে থাকে, সেইরূপ আমরা অদ্য এই পাঠশালারূপ বৃক্ষের অঙ্কুর রোপণ করিয়া ইহার উন্নতিপ্রত্যাশায় হর্ষযুক্ত হইতেছি, এবং ইহার সদবস্থার প্রতি প্রতীক্ষাপূর্ব্বক অন্তঃকরণে নানারূপ ভাবের আন্দোলন করিতেছি।”

চতুর্থ সংখ্যার পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়াছে “পূর্ণজ্ঞানস্বরূপ

পরমেশ্বরের অনন্ত স্বভাব, যেহেতু তিনি অনন্ত বিশ্বের রচনা-কর্ত্তা। জ্যোতির্ব্বেত্তারা নির্ণয় করিয়াছেন যে, যে অসংখ্য নক্ষত্র অতি ক্ষুদ্ররূপে দৃষ্ট হইতেছে, তাহাদিগের প্রত্যেকে এক এক প্রকাণ্ড সূর্য্য, এবং পৃথিবীর ন্যায় বৃহৎ বৃহৎ গ্রহশ্রেণী সেই প্রত্যেক সূর্য্যকে অবিশ্রান্ত প্রদক্ষিণ করিতেছে, এবং আমরা অতি নিকটস্থ তারাকে যতদূরে স্থাপিত জ্ঞান করি সমুদয় নক্ষত্র পরস্পর তদপেক্ষা অধিকতর দূরদেশে স্থায়ী রহিয়াছে। অধিক কি কহিব, আকাশের সীমা এবং নক্ষত্রের গণনা হইবার সম্ভাবনাও নাই, যেহেতু যে পরিমাণে দৃষ্টিযন্ত্র পরিষ্কৃত এবং উৎকৃষ্ট হইতেছে, সেই পরিমাণে নক্ষত্রের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া আসিতেছে। তবে আর কি প্রকারে জগতের সীমা নির্দ্ধার্য্য করা যাইতে পারে? বিশেষতঃ ইহা কি অসম্ভব যে, যে জ্ঞান দ্বারা এই এক সৃষ্টির রচনা হইয়াছে, তদ্দ্বারা এবম্প্রকার কোটি জগৎ উৎপন্ন হইতে পারে।"

"যিনি এইরূপে ব্রহ্মজ্ঞানের আলোচনা করেন, তিনিই পরমেশ্বরের যথার্থ উপাসক, যেহেতু ঈশ্বরকে জানিবার নিমিত্তে তাঁহার কার্য্য ব্যতীত আর অন্য উপায় নাই, কেননা কেবল কার্য্যের দ্বারাই কারণের জ্ঞান হয়। তিনি প্রত্যক্ষ দেখেন যে ঈশ্বর কেবল সাধারণ সুখের জন্য অপরিমিত দয়া প্রচার করিয়াছেন; এ প্রকার কোন বস্তু সৃষ্টি করেন নাই যাহা কোন একরূপে হিতজনক না হয়। অতএব তাঁহার অন্তঃকরণে ঈশ্বরের প্রেম সঞ্চার হয়, এবং তাহার সঙ্গে যে আশ্চর্য্য-মিশ্রিত এক প্রকার বিমল আনন্দের উদয় হয়, যাহা সংসারের সকল আহ্লাদ হইতে উৎকৃষ্ট তাহা ব্রহ্মোপাসকের চিত্ত ব্যতীত আর কেহই অনুভব করিতে সমর্থ হয় না। সুতরাং ঈশ্বর-উপাসনার ফল সেই উপাসনার সঙ্গে সঙ্গেই হইতে থাকে, ভবিষ্যৎ ফ
তাঁহার উপাসনা করিতে হয় না।"

ঐ বৎসরে দেবেন্দ্রনাথের এক বক্তৃতা পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার ভাষা কেমন প্রাঞ্জল এবং ধর্ম্মভাবে পরিপূর্ণ! "আমাদিগের এই পৃথিবীতে আসিবার পূর্ব্বে যিনি নানাবিধ সুখের উপযোগী সামগ্রী সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহার নিকটে আমরা কি প্রার্থনা করিব? বালক ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র অতি যত্নপূর্ব্বক রক্ষিত হইবেক, এ নিমিত্ত তিনি মাতার মনে সুখজনক স্নেহের সৃষ্টি করিয়াছেন। সংসারের নিয়ম এই যে যাহা হইতে কোন ক্লেশ পাওয়া যায় তাহার প্রতি স্নেহ করা দুরে থাকুক তাহাকে শত্রুজ্ঞানে তৎপ্রতিফল ততোধিক ক্লেশ দিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু মাতার মনের ভাব এস্থানে সম্পূর্ণরূপে তাহার বিপরীত দৃষ্ট হইতেছে। দশমাস পর্য্যন্ত যাহার দ্বারা সমূহ যন্ত্রণা প্রাপ্ত হয়েন এবং যাহার ভূমিষ্ঠ হইবার কালীন জীবনের আশা পর্য্যন্ত লুপ্ত হয়, তাহাকে কোন যন্ত্রণা দেওয়া দূরে থাকুক মাতা আপনার প্রাণ হইতেও তাহাকে অধিকতর স্নেহ করেন। সেই বালকের পীড়া হইলে তাঁহার পীড়া হয় এবং সেই বালকের সুস্থ শরীর হইলে তাঁহার সুস্থ শরীর হয়, সুতরাং সেই বালক অতি পরিপাটীরূপে রক্ষিত হয়।"

এইরূপ প্রবন্ধ ও বক্তৃতা দ্বারা যখন পত্রিকার কলেবর সজ্জিত হইতে লাগিল, তখন নব্য দলেরা বাঙ্গালা ভাষার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন এবং পত্রিকা বাহির হইবার দিনের জন্য তাঁহারা প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতেন। এ সম্বন্ধে বঙ্গের অমর লেখক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিতেছেন—*

---

* It is scarcely possible in the present day when journals have multiplied all over the country to describe adequately how eagerly the moral instructions and earnest teachings of Aksay Kumar conveyed in that famous paper, were perused by a large circle of thinking and enlightened readers. People all over

"বর্ত্তমান সময়ে সংবাদপত্র এবং মাসিক সাহিত্য সমস্ত দেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বে অক্ষয়কুমার দত্ত যখন পত্রিকাতে জ্ঞান- ও নীতিপূর্ণ প্রবন্ধসমূহ প্রকাশ করিতেন, তখন কি প্রকার আগ্রহের সহিত তখনকার চিন্তাশীল এবং শিক্ষিত পাঠকেরা তাহা পাঠ করিতেন, তাহা ভাষা দ্বারা বর্ণনা করা যাইতে পারে না। সমস্ত বাঙ্গলা দেশের লোকেরা অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে পত্রিকার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতেন। শীর্ণ দেহ লইয়া অক্ষয়কুমার নিঃশব্দে এবং অক্লান্ত ভাবে পত্রিকাতে লিখিয়া অনেক বৎসর বাঙ্গালা দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের চিন্তা ও মনের উপর রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন।"

এইরূপে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশ করিয়া দেবেন্দ্রনাথ বাঙ্গলা ভাষার উন্নতির পক্ষে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। এই পত্রিকাতে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ং এবং সেই সময়ের অনেক শিক্ষিত এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ রীতিমত লিখিতেন। ক্রমে পাঠকেরা দেখিলেন যে পত্রিকার যতই বয়োবৃদ্ধি হইতে লাগিল ততই ইহার ভাষা আরও মার্জ্জিত এবং প্রবন্ধাদি আরও গভীর জ্ঞানপূর্ণ হইয়া প্রকাশিত হইতে লাগিল। ইহাতে যে-সমস্ত প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইত, তাহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে—১৭৬৯ শকে যে সমস্ত বিষয় প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে ঋগ্বেদ সংহিতা ও তাহার অনুবাদ, Immortality of the soul, জ্যোতিষ, খ্রীষ্টান

Bengal awaited every issue of the paper with eagerness ; and the silent and sickly, but indefatiguable, worker at his desk swayed for a number of years the thought and opinions of the thinking portion of Bengal.

শাস্ত্রের অন্তর্গত প্রলয়-বৃত্তান্ত, ভারতবর্ষমধ্যে হিন্দুসন্তানদিগের বসতি বিস্তার এবং অন্যান্য দেখিতে পাওয়া যায়।

১৭৭০ শকে যে-সমস্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে আমরা দেখিতে পাই ঋগ্বেদ সংহিতা ও তাহার অনুবাদ, জ্যোতিষ-গ্রহণ, পরমেশ্বরের কৌশল বর্ণনা, ভারতবর্ষীয় লোকের স্বজাতীয় ভাষানুশীলনের বিষয়, বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার, বৈষ্ণব সম্প্রদায়—রামানুজ, রামানন্দী, কবীরপন্থী, খাটি, মলূকদাসী, দাদুপন্থী, রাইদাসী, সেনপন্থী, রামসনেহী ইত্যাদি।

১৭৭২ শকের পত্রিকাতে আত্মতত্ত্ববিদ্যা, ঋগ্বেদ সংহিতা, পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদিগের দুরবস্থা, হিন্দু কলেজের শিক্ষাপ্রণালী, ভারতবর্ষের সহিত অন্যান্য দেশের পূর্ব্বকালীন বাণিজ্য বিবরণ, মহাভারত, সৌর, বৈষ্ণব সম্প্রদায় এবং অন্যান্য বিষয় প্রকাশিত হইয়াছে। এই শক হইতে দেবেন্দ্রনাথ, জীবাত্মা-পরমাত্মাতত্ত্ব, জগৎতত্ত্ব এবং অন্যান্য তত্ত্ব সম্বন্ধে দার্শনিক বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই-সমস্ত প্রবন্ধ "আত্মতত্ত্ববিদ্যা" নামক পুস্তকে সংকলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। পরে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা যাইবে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

খৃষ্টীয়ানদিগের সহিত সংঘর্ষ।

পাঠকেরা দেখিয়াছেন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হইবার পরে ইহাতে নানাবিধ প্রবন্ধ বাহির হইত। যেমন একদিকে হিন্দুশাস্ত্র আলোচিত হইত তেমন অন্যদিকে খৃষ্টীয়ান শাস্ত্র ও মত রীতিমত আলোচিত হইতে লাগিল। ইহাতে খৃষ্টীয়ান পাদরীগণ অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। তাঁহারা এতদিন শিক্ষিত বঙ্গীয় যুবকগণের হৃদয়ে একাধিপত্য করিতেছিলেন, এবং অনেক যুবককে তাঁহাদের ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন, এমন সময়ে ব্রাহ্মসমাজ তাঁহাদের পথে বিষম কণ্টক-স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহারা অযথা ব্রাহ্মসমাজকে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজকে অত্যন্ত ঘৃণা ও অবজ্ঞার সহিত দেখিতেন। যখন ইংলণ্ডে রাজার মৃত্যু হয়, তখন তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন যে তাঁহাদের ধর্ম্মপ্রচারের পথ নিষ্কণ্টক হইল, কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার প্রভৃতি সে পথে বিষম বাধাস্বরূপ হওয়াতে তাঁহাদের কষ্টের সীমা রহিল না। তাঁহারা নূতন উদ্যম ও উৎসাহের সহিত আপনাদের ধর্ম্মপ্রচারে মনোযোগী হইলেন।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে খৃষ্টীয় প্রচারকদিগের চেষ্টাতে কতিপয় শিক্ষিত যুবক খৃষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে মহেশচন্দ্র ঘোষ, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাশয়ের একমাত্র পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, গুরুদাস মৈত্র প্রধান। ১৭৬৭ শকের বৈশাখ মাসে একদিন ঠাকুর বাবুদের সরকার

বলিলেন "গত রবিবারে আমার স্ত্রী ও আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা উমেশচন্দ্রের স্ত্রী দুইজনে একখানা গাড়ীতে চড়িয়া নিমন্ত্রণে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে উমেশচন্দ্র আসিয়া তাহার আপনার স্ত্রীকে গাড়ী হইতে জোর করিয়া নামাইয়া লয় এবং উভয়ে খৃষ্টান হইবার জন্য ডফ সাহেবের বাড়ীতে চলিয়া যায়। আমার পিতা অনেক চেষ্টা করিয়া তাহাদিগকে সেখান হইতে ফিরিয়া আনিতে না পারিয়া অবশেষে সুপ্রীম কোর্টে নালিশ করেন। নালিশে সেবার আমাদের হার হয়। কিন্তু আমি ডফ্ সাহেবের নিকটে গিয়া অনুনয় বিনয় করিয়া বলিলাম যে আমরা আবার কোর্টে নালিশ করিব। দ্বিতীয়বার বিচারের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত আমার ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূকে খৃষ্টান করিবেন না। কিন্তু তিনি তাহা না শুনিয়া গত কল্যই সন্ধ্যার সময়ে তাহাদিগকে খৃষ্টান করিয়া ফেলিয়াছেন।" স্ত্রী লোককে জোর করিয়া খৃষ্টান করার চেষ্টা শুনিয়া দেবেন্দ্রনাথ অত্যন্ত কুপিত ও বিরক্ত হইলেন। তিনি বলিতেছেন—"ইহা শুনিয়া আমার বড়ই রাগ হইল ও দুঃখ হইল। অন্তঃপুরের স্ত্রীলোক পর্য্যন্ত খৃষ্টান করিতে লাগিল! তবে রোস্, আমি ইহার প্রতিবিধান করিতেছি। এই বলিয়া আমি উঠিয়া পড়িলাম। আমি তখনি শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্তের লেখনীকে চালাইলাম। এবং একটি তেজস্বী প্রবন্ধ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশ হইল।" দেবেন্দ্রনাথের চরিত্রে এই একটি মহৎগুণ ছিল যে তিনি যাহা চিন্তা করিয়া স্থির করিতেন, তাহা সাধনের জন্য কোন বাধাই তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিত না। অযুত হস্তীর বলে বলীয়ান্ হইয়া তাহা সাধন করিতেন। একদিকে তিনি পত্রিকাতে অগ্নিময় প্রবন্ধ বাহির করিবার জন্য অক্ষয়কুমারকে

প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কলিকাতার সমস্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের গৃহে গৃহে ফিরিয়া যাহাতে হিন্দুসন্তানেরা পাদ্রিদিগের স্কুলে না যায়, তাহার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। দেবেন্দ্রনাথ, রাজা রাধাকান্ত দেব, রাজা সত্যচরণ ঘোষাল, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি সকলকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। রাজা রাধাকান্ত দেব তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন। এবং ধর্ম্মসভা ও ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে যে একটা মনোমালিন্য ছিল, তাহা যেন মুছিয়া গেল।

ঐ শকের ১৩ই জ্যৈষ্ঠ একটি মহাসভার আয়োজন হইল। কলিকাতার সমস্ত সম্ভ্রান্ত ধনীগণ এবং শিক্ষিত হিন্দু যুবকগণ একত্রিত হইলেন। সকলে মিলিয়া এই স্থির করিলেন যে হিন্দু সন্তানদিগের জন্য একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইবে তাহাতে বিনা ব্যয়ে তাহারা শিক্ষালাভ করিতে পারিবে। পাদ্রিদিগের বিদ্যালয়ে যাইবার আর প্রয়োজন থাকিবে না। সেই সভাতে চল্লিশ সহস্র টাকা স্বাক্ষরিত হইল। আশুতোষ দেব এবং প্রমথনাথ দেব দশ হাজার, রাজা সত্যচরণ ঘোষাল তিন হাজার, ব্রজনাথ ধর দুই হাজার ও রাজা রাধাকান্ত দেব এক হাজার টাকা স্বাক্ষর করিলেন। অন্যান্য উপস্থিত সভ্যগণও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ স্বাক্ষর করাতে প্রায় চল্লিশ সহস্র টাকার সংস্থান হইল। শীঘ্রই হিন্দুহিতার্থী নামে একটি বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইল। রাজা রাধাকান্ত দেব তাহার সভাপতি, দেবেন্দ্রনাথ ও হরিমোহন সেন সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাহার প্রথম শিক্ষক হইলেন। দেবেন্দ্রনাথের পরিশ্রম সার্থক হইল, তিনি এই বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। খ্রীষ্টীয়ান পাদ্রিগণ বুঝিলেন রামমোহন রায়ের অমর আত্মা এখনও যুবক দেবেন্দ্রনাথের

ব্যক্তিদিগের মধ্যে খৃষ্টান ধর্ম্মপ্রচারের স্রোত মন্দীভূত হইতে লাগিল।

এই ঘটনা দ্বারা কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, দেবেন্দ্রনাথ খৃষ্টীয়ান ধর্ম্মের বিরোধী ছিলেন। ইহার পরে মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের সময়ে কোন ঘটনা-বিশেষের দ্বারা এই ধারণা দৃঢ়ীভূত হইতে পারে। এখনও পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজের অনেকে বিশ্বাস করেন দেবেন্দ্রনাথ খৃষ্টীয়ান ধর্ম্মের বিরোধী ছিলেন। বস্তুতঃ তাহা নহে। দেবেন্দ্রনাথ চিরদিনই অন্যায়ের ঘোর শত্রু ছিলেন। যাহা ন্যায় এবং ধর্ম্মসঙ্গত, তাহার জন্য তিনি চিরদিনই সংগ্রাম করিয়াছেন। এইজন্য তিনি লোকভয় বা সমাজভয় করিতেন না। যাহা তিনি সত্য বলিয়া বুঝিয়াছেন, তাহার জন্য তিনি প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে কখনই কুণ্ঠিত হন নাই। খৃষ্টীয়ানেরা যে সময়ে আপনাদের ধর্ম্ম প্রচারে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন সে সময়ে তাঁহারা পাত্রাপাত্র, অধিকারী বা অনধিকারী কিছুই বিচার না করিয়া সকলকে ঐ ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতেছিলেন। কোন প্রকারে তাঁহাদের ধর্ম্মে অধিক ব্যক্তিকে আনয়ন করা প্রয়োজন, সুতরাং সে বিষয়ে তাঁহারা আপনাদিগের অবলম্বিত পথ সম্বন্ধে কোন বিচার করিতেন না। অবশ্য যাঁহারা নিজে বুঝিয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে কোন কথাই নাই, কারণ এ বিষয়ে সকলেই স্বাধীন। কিন্তু এ বিষয়ে যাঁহারা কিছুই বুঝেন না, যে ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছেন, তাহার কোনটার সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান নাই, তাহাদিগকে এক ধর্ম্ম হইতে অন্য এক ধর্ম্মে আনিলে কোন লাভ নাই, বরং ক্ষতিরই সম্ভাবনা। বিশেষতঃ আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদিগের সম্বন্ধে একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। তাঁহারা কোন প্রকার শিক্ষা লাভ করেন

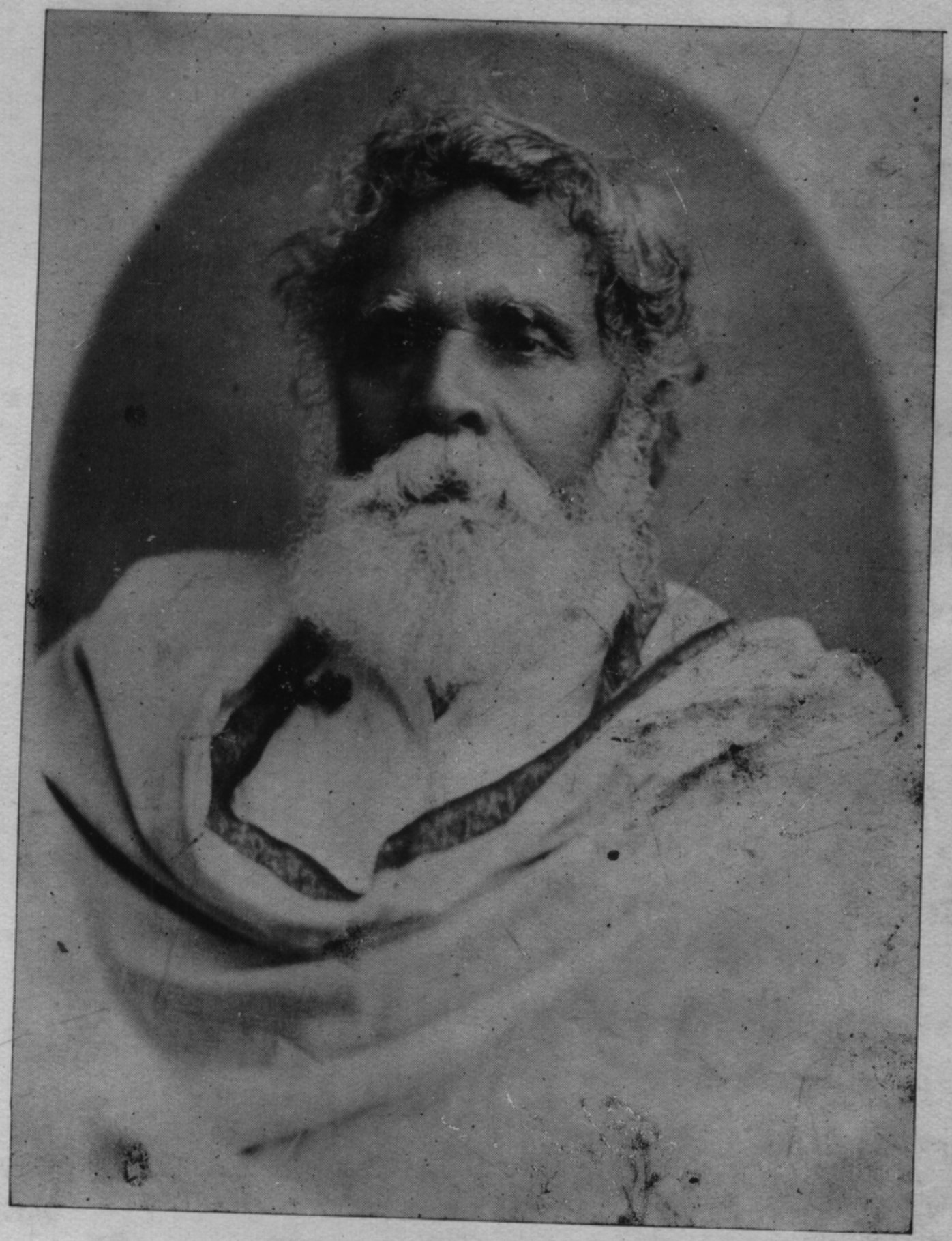
নাই, খৃষ্টীয়ান ধর্ম্ম কি, তাহার বিশেষত্বই বা কি এবং কেন তাহা গ্রহণ করা উচিত, সে সম্বন্ধে তাঁহাদের কোন জ্ঞান নাই, এমত স্থলে কোন ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তি ইচ্ছা করিতে পারেন না, তাঁহাদিগকে নূতন ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। কেহ কেহ হয়ত এইরূপ তর্ক করিতে পারেন, যদি কোন স্ত্রীলোক আপনার স্বামীর ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার জন্য এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী হইবার জন্য ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে নূতন ধর্ম্ম দেওয়াতে কি আপত্তি হইতে পারে? তাহাতে কোন আপত্তি নাই বটে, কিন্তু তাঁহাকে গোপন ভাবে বাটী হইতে বাহির করিয়া আনিয়া আপনাদের গৃহে বদ্ধ করিয়া রাখা এবং তাঁহার আত্মীয় স্বজনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে না দেওয়া কি প্রকার ধর্ম্মসঙ্গত কার্য্য তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। এই প্রকার ব্যবহার দেখিয়া দেবেন্দ্রনাথ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন এবং তাহার প্রতিবিধানের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু।

১৭৬৭ শক, দেবেন্দ্রনাথের জীবনের একটি বিশেষ বৎসর। কারণ এই শকে শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয় ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হয়েন। এই দুই মহাত্মার যোগে তখন ব্রাহ্ম-সমাজ নবজীবন লাভ করিয়াছিল। বহুদিবস পরে দেবেন্দ্রনাথ একজন প্রকৃত সহযোগী পাইয়া অধিকতর উৎসাহে আপনার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। এ কথা সাহসের সহিত বলা যাইতে পারে যে যদিও অক্ষয়-কুমার দত্ত মহাশয় প্রভৃতি দেবেন্দ্রনাথের কার্য্যে অনেক সহায়তা করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা সহায় না হইলে এত কার্য্য করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইত, তথাপি রাজনারায়ণ বাবুর সহিত তাঁহার যে-প্রকার প্রাণের যোগ হইয়াছিল এমন আর কাহারও সহিত হয় নাই। এই যোগ এমন ব্যাপক ও গভীর হইয়াছিল যে তাঁহারা যতদিন এ পৃথিবীতে জীবন ধারণ করিয়াছিলেন, ততদিন তাঁহাদের হৃদয়ের মধ্যে এই যোগ উভয়ের জীবনকে মধুময় করিয়া তুলিয়াছিল। এই মহাত্মার জীবনী অতি সংক্ষেপে আমরা নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

১৭৪৮ শকের ২৩এ ভাদ্র দিবসে চব্বিশ পরগণা জেলার মাগুড়া পরগণায় বোড়াল গ্রামে শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের জন্ম হয়। ইহাঁর পিতার নাম শ্রীযুক্ত নন্দকিশোর বসু। নন্দকিশোর বসু, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের একজন অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং সহচর ছিলেন। নন্দকিশোর বসু মহাশয় বিশুদ্ধ ইংরাজী লিখিতে পারিতেন, ইঁহার পুত্রও এই গুণের অধিকারী হইয়াছিলেন। ইহাঁর সৎপ্রকৃতি ও অমায়িকতার জন্য সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিত ও সম্মান করিত।



ঋষি রাজনারায়ণ।

IMPERIAL
LIBRARY

ইনি বেদান্ত ধর্ম্ম বিশ্বাস করিতেন। যখন ইঁহার মৃত্যু হয় তখন বেদান্তের শঙ্কর ভাষ্য আনিয়া পড়িতে বলেন ও ওঁকার জপ করিতে করিতে পরলোকগমন করেন।

রাজনারায়ণ বসু মহাশয় বাল্যকালে এক গুরুমহাশয়ের পাঠশালাতে কিছুদিন অধ্যয়ন করিয়া বহুবাজারে শম্ভু মাষ্টারের স্কুলে অধ্যয়ন করেন। তৎপরে হেয়ার সাহেবের স্কুলে ভর্ত্তি হয়েন। হেয়ার স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে পাঠ করিবার সময়ে তিনি হস্তলিখিত একখানি সংবাদপত্র প্রতি সোমবারে বাহির করিতেন। হেয়ার স্কুলের অধ্যয়নের পর হিন্দু কলেজে প্রবেশ করেন। দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠিবার সময় ত্রিশ টাকার বৃত্তি প্রাপ্ত হয়েন। তাহার পর চল্লিশ টাকার বৃত্তিলাভ করিয়া দুই বৎসর তাহা ভোগ করিয়া কলেজ পরিত্যাগ করেন। এই শেষ পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইবার সময় তিনি এরূপ বুদ্ধির সহিত সমস্ত প্রশ্নের উত্তর করিয়াছিলেন যে Bengal Herald নামক ইংরাজী সংবাদপত্র তাঁহার অত্যন্ত প্রশংসা করেন। ইনি যে-সমস্ত প্রতিভাশালী যুবকদিগের সহিত কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত, প্যারীচরণ সরকার, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, আনন্দকৃষ্ণ বসু, ঈশ্বরচন্দ্র দেব, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, গোবিন্দচন্দ্র দত্ত প্রধান ছিলেন।

উনিশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ইনি দেবেন্দ্রনাথের সহিত পরিচিত হয়েন এবং ১৭৬৭ শকে তাঁহার নিকট ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। দেবেন্দ্রনাথ ইঁহার সম্বন্ধে বলিতেছেন—"তাঁহার পিতার মৃত্যু হইলে রাজনারায়ণ বাবু সেই অশৌচ অবস্থায় আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে সেই সময়েই বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিলাম। তখনকার ইংরাজী শিক্ষিতদিগের মধ্যে তাঁহার বেশ

প্রতিষ্ঠা ছিল। তখন তিনি একজন কৃতবিদ্য বলিয়া গণ্য। তাঁহার বিদ্যা, বিনয় এবং ধর্ম্মভাব দেখিয়া দিন দিন তাঁহার প্রতি আমার অনুরাগ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। অবশেষে তিনি ১৭৬৭ শকে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। ধর্ম্মভাবে তাঁহার সহিত আমার হৃদয়ের খুব মিল হইয়া গেল। তাঁহাকে আমি উৎসাহী সহযোগী পাইলাম। তখন ধর্ম্মপ্রচারের জন্য যে কিছু ইংরাজী লেখাপড়ার প্রয়োজন, তাহার বিশেষ ভার তাঁহার উপরে দিলাম।"

১৭৬৮ শকে রাজনারায়ণ বাবু উপনিষদের ইংরাজী অনুবাদকের কর্ম্মে ৬০ টাকা বেতনে নিযুক্ত হয়েন। ইতিপূর্ব্বে বিখ্যাত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পিতা ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইংরাজিতে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রবন্ধ সকল প্রকাশ করিতেন। তাঁহার স্থানে রাজনারায়ণ বসু মহাশয় নিযুক্ত হইলেন। এই সময়ে ইনি দেবেন্দ্রনাথের নিকট উপনিষদ পাঠ করেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে ক্রমে ক্রমে কঠ, ঈশ, কেন, মুণ্ডক ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের অনুবাদ প্রকাশ করেন এবং তাহার জন্য অনেক প্রশংসা লাভ করেন। ইনি পারস্য ভাষাতে সুপণ্ডিত ছিলেন। বাঙ্গলাও ভালরূপ জানিতেন।

তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া কিছুদিনের জন্য ইনি সংস্কৃত কলেজে কার্য্য করেন এবং তৎপরে ১৭৭৩ শকে মেদিনীপুর জেলাস্কুলের প্রধান শিক্ষক হইয়া সেখানে গমন করেন। প্রায় পনর বৎসর কাল মেদিনীপুরে অবস্থিতি করেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি মেদিনীপুরের উন্নতিসাধনের জন্য যে কি প্রকার চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনা করা যায় না। মেদিনীপুর পরিত্যাগের পর মেদিনীপুরবাসীরা তাঁহাকে যে অভিনন্দন পত্র প্রদান করিয়া-

ছিলেন, তাহা পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় তাঁহারা রাজনারায়ণ বাবুকে কি চক্ষে দর্শন করিতেন। তিনি সেখানে অবস্থানকালে নিম্নলিখিত কার্য্য করেন। (১) মেদিনীপুর জেলাস্কুলের উন্নতিসাধন (২) মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজের পুনঃসংশোধন ও উন্নতিসাধন (৩) জাতীয়-গৌরব-সম্পাদনী সভা সংস্থাপন (৪) সুরাপান-নিবারিণী সভা সংস্থাপন (৫) বালিকা-বিদ্যালয় সংস্থাপন (৬) ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা ও ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন নামক পুস্তক রচনা (৭) Defence of Brahmoism and the Brahmo Samaj নামক বক্তৃতা প্রণয়ন।

মেদিনীপুরে এখনও পর্য্যন্ত তাঁহার এমনি প্রভাব যে কোন প্রাচীন শিক্ষিত ব্যক্তির নিকট রাজনারায়ণ বাবুর নাম করিলে তিনি করজোড়ে তাঁহার উদ্দেশ্যে নমস্কার করিয়া থাকেন। মেদিনীপুরের উন্নতির জন্য তিনি আপনার সাংসারিক অবস্থার উন্নতি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে ডেপুটি কালেকটরের পদ দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু তিনি চলিয়া গেলে পাছে মেদিনীপুরের উন্নতির ব্যাঘাত হয় সেই জন্য তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই। এইজন্য তাঁহাকে কোন কোন সাহেব পাগল বলিত।

মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজের উন্নতিকল্পে তিনি একটি ধর্ম্মালোচনা সভা স্থাপন করেন। তাহাতে প্রায় সমস্ত শিক্ষিত ব্যক্তি যোগদান করিতেন। তাঁহার পবিত্র ও উন্নত জীবনের সংস্পর্শে আসিয়া কয়েক জন শিক্ষিত ব্যক্তি গার্হস্থ্য ক্রিয়াকলাপে পৌত্তলিকতার সংস্রব পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এই-সকল অনুষ্ঠানকারীদের মধ্যে জমিদার নবীনচন্দ্র নাগ, অখিলচন্দ্র দত্ত ও নীলকমল দে ছিলেন। এই অখিল-চন্দ্র দত্ত মহাশয় এক সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের মানস করিয়া দেবেন্দ্র-নাথের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহার সহিত ভ্রমণ করিতে বাহির

হয়েন। ইনি 'মেদিনা' নামক সংবাদপত্রের নির্ভীক ও তেজস্বী সম্পাদক ছিলেন। রাজনারায়ণ বাবু এই সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য মেদিনীপুরের অনেক গ্রামে গমন করেন এবং সেই-সকল স্থানের সকলের শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করেন। মেদিনীপুরে অবস্থানকালে ইঁহার পরিবারে ব্রাহ্মধর্ম্মানুমোদিত প্রথম অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত প্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন ঘোষের বিবাহ হয়। এই বিবাহে দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ প্রভৃতি অনেক ব্রাহ্ম কলিকাতা হইতে গমন করেন এবং স্থানীয় অনেক ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যোগদান করেন। রাজনারায়ণ বাবু চিরদিনই প্রকৃতির মনোহর নির্জ্জন ক্রোড়ে বসিয়া ভগবানের উপাসনা করিতে ভালবাসিতেন। এইজন্য তিনি মধ্যে মধ্যে ঐ নগরের প্রান্তস্থিত গোপগিরি নামক একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ে বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত উপাসনা করিতেন। সেখানে যে-সমস্ত বক্তৃতা করিতেন, তাহা শ্রবণ করিয়া শ্রোতারা অশ্রুজল সংবরণ করিতে পারিতেন না। প্রতি বৎসর বসন্তকালে এখানে ঐরূপ উৎসব হইত। এই সময়ে তিনি যে-সমস্ত বক্তৃতা প্রদান করিতেন তাহার অধিকাংশ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশিত হইত।

ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা একখানি দার্শনিক গ্রন্থ। তখন এ প্রকার গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষাতে ছিল না। একমাত্র তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ব্যতীত আর কোথাও দেখা যাইত না। রাজনারায়ণ বাবু এই পুস্তকখানি রচনা করিয়া তাঁহার গভীর চিন্তা, গবেষণা, পাণ্ডিত্য ও অসাধারণ শ্রমশীলতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু এই পুস্তকখানি রচনা করিতে তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইল। তাঁহার পূর্ব্ব হইতেই মস্তিষ্কের পীড়া ছিল, এক্ষণে ঐ গ্রন্থখানি রচনা করিতে

করিতে তাঁহার পীড়া বাড়িয়া গেল। অবশেষে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে কিছুদিনের বিদায় লইয়া পশ্চিমে বাস করিতে হইয়াছিল। তাঁহার এই রোগের সময়ও তিনি কাজ করিতেন। তিনি লিখিয়াছেন—"মাথাও ঘুরিতেছে, কার্য্যও করিতেছি।"

স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য তিনি এলাহাবাদ, কানপুর, ভাগলপুর প্রভৃতি স্থানে দীর্ঘকাল বাস করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতে তাঁহার কোন উপকার হইল না। এই-সমস্ত স্থানে অবস্থান কালে তিনি রীতিমত বক্তৃতা প্রদান করিতেন, সমাগত ভদ্রব্যক্তিদিগের সহিত আলোচনা করিতেন এবং ব্রাহ্মসমাজে রীতিমত উপাসনা ও উপদেশ প্রদান করিতেন। ভাগলপুরে তাঁহার রোগ বৃদ্ধি হওয়াতে তিনি কলিকাতা ফিরিয়া আসেন এবং বিখ্যাত কবিরাজ শ্রীযুক্ত রমানাথ সেনের চিকিৎসাধীনে থাকাতে তাঁহার রোগের কথঞ্চিৎ উপশম হয়। মেদিনীপুর পরিত্যাগ করার পর কলিকাতাতে তিনি যে দশ বৎসর কাল বাস করেন সেই সময়ের মধ্যে তিনি নিম্নলিখিত কার্য্য করেন। (১) A Lecture in reply to the Query, what is Brahmoism. (২) হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে বক্তৃতা (৩) সেকাল একাল বিষয়ে বক্তৃতা, (৪) ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ ও আমাদিগের বর্ত্তমান আধ্যাত্মিক অভাব বিষয়ে বক্তৃতা (৫) বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে বক্তৃতা (৬) The Adi Brahmo Samaj, its views and principles. (৭) Theistic Toleration and Diffusion of Theism. (৮) Adi Brahmo Samaj as a church (৯) Science of Religion (১০) ব্রাহ্মদিগের নরপূজা নিবারণ। যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন, ততদিন তিনি জ্ঞানের আলোচনা করিয়া নিজে জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন এবং অন্য ব্যক্তিদিগেরও এবিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিয়া

গিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতা ও পুস্তকসমূহ তখনকার সংবাদপত্র-সমূহে যথেষ্ট প্রশংসিত হইত।

বসু মহাশয় যখন কানপুরে বাস করিতেছিলেন, তখন মেদিনীপুর-বাসীরা জানিতে পারিয়াছিলেন যে তাঁহার আর মেদিনীপুর ফিরিয়া যাইবার সম্ভাবনা ছিল না। ইহা জানিতে পারিয়া তাঁহারা সভা করিয়া তাঁহাকে যে অভিনন্দনপত্র প্রেরণ করেন, তাহার কোন কোন অংশ প্রকাশ করা যাইতেছে।

মহাত্মন্—

আপনি ১৮৫১ খৃঃ অব্দে অত্রত্য গবর্ণমেণ্ট ইংরাজী স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইয়া আইসেন। তদবধি প্রায় ১৭।১৮ বৎসর ঐ কার্য্যোপলক্ষে এখানে অবস্থান করেন। আপনি এই দীর্ঘকাল মেদিনীপুর উজ্জ্বল ও অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

আপনি এ প্রদেশের যে উপকার, যাদৃশী উন্নতি এবং তন্নিমিত্ত যতদূর যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা আমরা গণনা করিয়া শেষ করিতে পারিব না। * * * * যতপ্রকার মেদিনীপুরের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন হইতে পারে, তৎসমুদায়ের উপায় উদ্ভাবনে আপনি নিয়ত যত্নশীল থাকিতেন। * * * * * আপনি মেদিনীপুরে ব্রাহ্মধর্ম্মের আলোচনা করিয়া কতই কষ্ট সহ্য করিয়াছেন। * * * মেদিনীপুরের সমুদায় শুভকর কার্য্যে আপনি মূল ও মস্তকস্বরূপ ছিলেন। * * * আপনি মেদিনীপুরে একপ্রকার নূতন জীবন দান করিয়াছেন। * * * এস্থান পরিত্যাগ করিতে হইবে বলিয়া আপনি উৎকৃষ্টতর পদলাভের চেষ্টা করেন নাই। অনেক সময় উপস্থিত পদোন্নতি ত্যাগ করিয়াছেন।

* * * * * *

এক্ষণে আপনি মেদিনীপুর পরিত্যাগ করিয়াছেন। হায়! এমন

সুহৃদ—এমন হিতৈষীর সমাগমে বঞ্চিত হওয়া কি দুর্ভাগ্যের বিষয়! আপনার অভাবে মেদিনীপুর গৌরবের বস্তুবিহীন হইতেছে।

আজ যদি আপনি সুস্থশরীরে কোন উন্নতপদে গমন করিতেন, তাহা হইলে আমাদের কথঞ্চিৎ ক্ষোভ ও দুঃখের শান্তি হইত। আপনি পীড়াবশতঃ কার্য্যে অক্ষম হইয়া কর্ম্ম হইতে একেবারে অবসর লইতেছেন, ইহাতে আমাদের যারপরনাই ক্ষোভ ও পরিতাপ হইতেছে।

আপনি এদেশের যাদৃশ উপকার ও উন্নতি সাধন করিয়াছেন, আমরা তাহার কি প্রতিশোধ দিব? তাদৃশ ঋণের কিছুতেই পরিশোধ নাই। আজ আমাদের হৃদয় সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত আপনাকে প্রীতি-উপহার প্রদান করিতেছে। আপনি আমাদের এই কৃতজ্ঞতাসূচক পত্রখানি গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে চরিতার্থ করুন।

আমরা কখন আপনাকে ভুলিতে পারিব না। আপনার সৌম্যমূর্ত্তি ও অমায়িক মধুর স্বভাব আমাদের অন্তরে জাগরূক রহিল।

জগদীশ্বর আপনাকে নীরোগ ও সুখী করুন। মেদিনীপুর ১৭ই চৈত্র, ১৭৯০ শক।

উপরোক্ত পত্রখানি ১৭৫ জন লোকের দ্বারা স্বাক্ষরিত হইয়া তাঁহার নিকটে প্রেরিত হইয়াছিল। ইহা হইতে বুঝা যায় মেদিনীপুর-বাসীরা তাঁহাকে কি চক্ষে দর্শন করিতেন এবং এখনও দর্শন করিয়া থাকেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

পিতৃবিয়োগ।

দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয় যখন দ্বিতীয় বার ইংলণ্ডে গমন করেন, তখন তাঁহার সমস্ত কার্য্যের ভার যুবক দেবেন্দ্রনাথের উপর নিপতিত হইল। তখন তাঁহার সম্পদের মধ্যাহ্ন সময়। একদিকে বিস্তীর্ণ জমিদারি, অন্যদিকে রেশম ও লবণের ব্যবসা। ইহার সঙ্গে রাণীগঞ্জে কয়লার খনির অংশ। এই-সমস্ত কার্য্য পরিদর্শন ও পরিচালনের ভার দেবেন্দ্রনাথের উপর পতিত হইল। ইহা তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর বোধ হইতে লাগিল। তাঁহার প্রকৃতি অন্তর্মুখীন। বাহিরে বাহিরে বিষয় বিভবের মধ্যে ভ্রমণ করা তাঁহার একান্ত প্রকৃতিবিরুদ্ধ, কিন্তু তাঁহার পিতার ইংলণ্ড গমনের জন্য তাঁহাকে এমন অবস্থার মধ্যে পড়িতে হইল, যাহা তাঁহার পক্ষে অপ্রীতিকর হইয়া উঠিল। তিনি যেভাব এতদিন অন্তরের মধ্যে লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন এক্ষণে তাহা বাহিরে স্বদেশবাসীগণের নিকট নানা উপায়ে প্রচার করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। অক্ষয়কুমার দত্ত ও রাজনারায়ণ বাবুর ন্যায় বন্ধুদিগের জ্ঞান, বুদ্ধি ও শক্তির সাহায্যে তিনি মনের আনন্দে ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য কত আয়োজন করিতেছিলেন, এমন সময়ে দ্বারকানাথ ঠাকুরের বৃহৎ সম্পত্তি রক্ষার ভার তাঁহার উপর পতিত হওয়াতে তাঁহার উদাস ভাব অত্যন্ত বাধিত হইল। তিনি বলিতেছেন—"তাঁহার বিস্তীর্ণ কার্য্যের ভার সমস্তই আমার উপরে পড়িল। কিন্তু আমি কোন কাজ কর্ম্ম ভাল করিয়া দেখিয়া উঠিতে পারিতাম না। কর্ম্মচারীরাই সকল কাজ চালাইত। আমি

কেবল বেদ, বেদান্ত, ধর্ম্ম ও ঈশ্বর ও চরমগতিরই অনুসন্ধানে থাকিতাম। বাড়ীতে যে একটু স্থির হইয়া বসিয়া থাকি, তাহাও পারিয়া উঠিতাম না। এত কর্ম্ম কাজের প্রতিঘাতে আমার উদাস ভাব আরও গভীর হইয়া উঠিয়াছিল। এত ঐশ্বর্য্যের প্রভু হইয়া থাকিতে আমার ইচ্ছা করিত না। সব ছাড়িয়া ছুড়িয়া একা একা বেড়াইবার ইচ্ছাই আমার হৃদয়ে রাজত্ব করিতে লাগিল। তাঁহার প্রেমে মগ্ন হইয়া একাকী এমন নির্জ্জনে বেড়াইব যে, তাহা কেহ জানিতেও পারিবে না। জলে স্থলে তাঁহার মহিমা প্রত্যক্ষ করিব, দেশভেদে তাঁহার করুণার পরিচয় লইব; বিদেশে, বিপদে, শঙ্কটে পড়িয়া তাঁহার পালনী-শক্তি অনুভব করিব—এই উৎসাহে আমি আর বাড়ীতে থাকিতে পারিলাম না।"

১৭৬৮ শকের শ্রাবণ মাসে তাঁহার পত্নী, তিন পুত্র এবং রাজনারায়ণ বাবুকে সঙ্গে লইয়া ঘোর বর্ষাকালে গঙ্গাতে বেড়াইতে বাহির হইলেন। তিনি ও রাজনারায়ণ বাবু বোটে এবং পরিবারেরা একটি পানসীতে থাকিতেন। হুগলি, কালনা প্রভৃতি স্থান অতিক্রম করিয়া তাঁহারা চলিয়া গেলেন। এক দিন অপরাহ্ণ সময়ে তাঁহারা দুইজনে বোটের ছাদের উপর বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, এমন সময়ে এক প্রবল ঝড়ের আশঙ্কা করিয়া তাঁহারা পানসীতে যাইবার উপক্রম করিলেন। ঠিক্ সেই সময়ে অন্য একটা নৌকার গুণ তাঁহাদের বোটের মাস্তলে লাগিয়া গেল। একজন মাঝী বাঁশ দিয়া সেই গুণ ছাড়াইতে ছিল, কিন্তু সে বাঁশের ভার সামলাইতে না পারাতে বাঁশটা পড়িয়া গেল এবং সেই বাঁশের কোণ দেবেন্দ্রনাথের চক্ষুর উপর আসিয়া পড়িল। তাঁহার চক্ষুর কোন ক্ষতি হইল না বটে কিন্তু চশমার তার লাগিয়া নাসিকা আহত হওয়াতে দরদর করিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল।

এমন সময়ে একটা দম্‌কা বাতাস আসিয়া পানসীতে লাগাতে পানসী তীরবেগে ছুটিতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে বোটকেও টানিয়া লইয়া চলিল। বোটখানি তখন একপেশে হইয়া চলিতেছে। বোটের একটা দিক জল হইতে প্রায় এক আঙ্গুল উপরে ছিল। কোনক্রমে দাঁড়ীরা বোটকে পানসী হইতে মুক্ত করিবামাত্র বোট তীরবেগে ওপারে ছুটিয়া গেল, পানসীও ছুটিতে লাগিল। বোট তীরে লাগিবামাত্র দেবেন্দ্রনাথ ও রাজনারায়ণ বাবু তীরে উঠিলেন। কিন্তু পানসী তখনও ছুটিতেছে, কেহ থামাইতে পারিতেছে না। এমন সময়ে সকলে দেখিতে পাইলেন একটা ছোট নৌকা তাঁহাদিগের নিকট আসিল। তাহাতে তাঁহাদের পুরাতন ভৃত্য, স্বরূপ খানসামা। সে দেবেন্দ্রনাথকে একখানি চিঠি দিল। অন্ধকারে তিনি ভাল করিয়া পড়িতে পারিলেন না, কিন্তু যাহা পড়িলেন, তাহাতে তিনি বুঝিলেন তাঁহার পিতার মৃত্যু হইয়াছে। এই সংবাদ তাঁহার নিকটে বজ্রাঘাতের ন্যায় বোধ হইল। তিনি অবিলম্বে নিজের বোটে পরিবারদিগকে লইয়া কলিকাতাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। রাত্রি ৮টার সময়ে পলতায় আসিয়া পৌঁছিলেন। তখন নৌকার খোলে প্রায় এক হাঁটু জল দাঁড়াইয়াছে। তিনি তীরে উঠিয়াই দেখেন একখানি গাড়ী তাঁহার জন্য প্রস্তুত আছে। তিনি স্ত্রীপুত্রদিগকে লইয়া তাহাতে উঠিলেন এবং রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময়ে বাড়ী আসিয়া পৌঁছিলেন। তাঁহার পিতার মৃত্যু হইল এবং দেবেন্দ্রনাথেরও জীবনে অগ্নিপরীক্ষা আরম্ভ হইল। এতদিন তিনি সুখ ও সম্পদের মধ্যে ব্রহ্মের অন্বেষণ করিয়াছিলেন; এবং তাঁহার পরিচয় পাইয়া আপনাকে ধন্য মনে করিতেছিলেন, কিন্তু এবারে তাঁহার জীবনে এমন কঠোর সংগ্রাম ও পরীক্ষা আসিল যে তাহাতে জয়লাভ করা সাধারণ মানবের পক্ষে

দুঃসাধ্য। এই সংসার ভীষণ সংগ্রামক্ষেত্র। এ স্থানে মানবের শক্তিলাভ হয় এবং তাহার জীবনের পরীক্ষা হয়। প্রত্যেক মানবজীবনে এই প্রকার সংগ্রাম নিয়ত চলিতেছে। যাঁহারা ঘটনাসমূহের সহিত সংগ্রাম করিয়া আপনাদের জীবনের লক্ষ্য সাধন করেন, তাঁহারাই প্রকৃত শক্তিলাভ করিয়া আপনাদের জীবনকে সার্থক করিয়া চলিয়া যান। কিন্তু যাঁহারা এই-সমস্ত ঘটনার সহিত সংগ্রামে পরাস্ত হইয়া ইহাদিগকে জীবনের পথে বাধা ও বিঘ্ন বলিয়া পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা চিরদিন দুর্ব্বল থাকিয়া যান এবং এই দুর্ব্বলতার বীজ অন্তরের মধ্যে লুক্কায়িত থাকাতে তাঁহারা পদে পদে বিপথগামী হইয়া মানবজীবনের উচ্চ আদর্শ সাধনে অসমর্থ হইয়া থাকেন।

তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর যথারীতি তিনি অশৌচ ধারণ পূর্ব্বক হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিতেন এবং নগ্নপদে প্রাতঃকাল হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত আত্মীয় বন্ধুদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। তাঁহার পিতৃব্য রমানাথ ঠাকুর মহাশয় এই সময়ে তাঁহাকে সকল বিষয়ে পরামর্শ দিতেন এবং কি প্রকারে পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিতে হইবে, সে বিষয়ে তাঁহার সহিত আলাপ করিতেন। যদিও রমানাথ ঠাকুর মহাশয় রাজা রামমোহন রায়ের সহিত যোগদান করিয়া ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য সম্বন্ধে তাঁহার অনেক সহায়তা করিয়াছিলেন এবং যদিও তত্ত্ববোধিনী সভার সহিত তাঁহার সংশ্রব ছিল, তথাপি দেবেন্দ্রনাথের মত তিনি কোন দিন এত অগ্রসর ছিলেন না। তিনি জানিতেন বেদান্তশাস্ত্রসম্মত ব্রহ্ম ও ব্রহ্মজ্ঞান দেশের মধ্যে প্রচলিত হইলে তাহাতে দেশের মঙ্গল হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাই বলিয়া সামাজিক ক্রিয়াকলাপে যে প্রাচীন রীতি পরিত্যাগ করিতে হইবে, তাহার কোন প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন নাই। সুতরাং তিনি দেবেন্দ্রনাথকে এই পরামর্শ দিতে লাগিলেন

"দাদার বড় নাম, দেখো ব্রহ্ম ব্রহ্ম করে এ সময়ে কোন গোলমাল তুলিও না। যেমন আমাদের রীতি আছে, সেই ভাবে সমস্ত কাজ কর্ম্ম সম্পন্ন করিবে।" রাজা রাধাকান্ত দেব প্রভৃতি তাঁহার পিতার বন্ধুগণ সকলে তাঁহাকে এইরূপই পরামর্শ দিলেন। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ এখন বুঝিয়াছিলেন ধর্ম্মই চিরসহায়, চিরবন্ধু ও পরম সম্পদ। ধর্ম্মকে অক্ষুণ্ণ, অটুট রাখাই মনুষ্যত্ব। এই ধর্ম্মকে জীবনে রক্ষা করিতে হইলে যদি কৃত্রিম দেশাচার এবং সমাজের সংকীর্ণ গণ্ডীর বাঁধ ভাঙ্গিতে হয়, এবং তজ্জন্য সমাজের অত্যাচার, নির্য্যাতন সহ্য করিতে হয়, তাহাও ভাল, তথাপি ধর্ম্মহীন হইয়া সমাজের প্রিয়পাত্র ও সম্মান-ভাজন হওয়া উচিত নয়। এই স্থির করিয়া তিনি একদিন তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা গিরীন্দ্রনাথকে বলিলেন "আমরা যখন ব্রাহ্মধর্ম্মব্রত গ্রহণ করিয়াছি, তখন শালগ্রাম শিলা আনিয়া কেমন করিয়া শ্রাদ্ধ করিব? তাহা হইলে আমরা ধর্ম্মভ্রষ্ট হইব।" তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন "যদি তাহা না করেন, তাহা হইলে সকলে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবে, সকলে আমাদের বিপক্ষ হইবে, আমাদের সংসার কি করিয়া চলিবে, আমরা মহাবিপদে পড়িব।" দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন "কিন্তু তাই বলিয়া তো পৌত্তলিকতাতে যোগ দেওয়া যায় না।" এ বিষয়ে তিনি কাহারও নিকট উৎসাহ পাইলেন না। কিন্তু তিনি প্রতিজ্ঞাতে অটল, সঙ্কল্পে দৃঢ়চিত্ত। কেহই তাঁহাকে সঙ্কল্প হইতে বিচলিত করিতে পারিল না। এই সময়ে তাঁহার জীবনে কি প্রকার সংগ্রাম চলিতেছে, তাহা বোধ হয় আমরা ঠিক্ কল্পনাও করিতে পারি না।

অশীতি বৎসর পূর্ব্বে হিন্দু সমাজের কি প্রকার অবস্থা ছিল, তাহা যখন আমরা চিন্তা করি, তখন দেবেন্দ্রনাথের এই অসীম সাহসের কথা ভাবিয়া তাঁহাকে বীরপুরুষ না বলিয়া থাকিতে পারি না। তখন

এখনকার মত ইংরাজী শিক্ষা ছিলনা। কেবলমাত্র কয়েকজন ইংরাজী-শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবক প্রাচীন সমাজের কুসংস্কার দেখিয়া তাহা বিনষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে ডিরোজিও, হেয়ার প্রভৃতি ইংরাজদিগের সহিত আহার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এ বিষয়ে যদিও দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয় অগ্রণী ছিলেন, তথাপি তিনিও কখনও প্রাচীন পৌত্তলিক ক্রিয়াকলাপ ভঙ্গ করিয়া সামাজিক অনুষ্ঠান করিতে সাহস করেন। নাই। বাহিরে আহার বিহারে জাতিভেদের নিয়ম ভঙ্গ করিতে অথবা পৌত্তলিকতা-বর্জ্জিত ধর্ম্ম প্রচার করিতে বা সেই অনুসারে উপাসনা করিতে তখন অনেকেই প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু পিতৃশ্রাদ্ধের ন্যায় গুরুতর অনুষ্ঠানে প্রাচীন সমাজের কুলক্রমাগত রীতিনীতি ভঙ্গ করিয়া নূতন প্রণালীতে সম্পন্ন করিবার সাহস কোন হিন্দুসন্তানের ভিতরে দেখা যাইত না। বিশেষতঃ দ্বারকানাথ ঠাকুরের ন্যায় অতুল ঐশ্বর্য্য ও প্রতিপত্তিশালী এবং সমাজের অগ্রণী ব্যক্তির পরলোকগমনে যুবক দেবেন্দ্রনাথ যে সেই-সমস্ত নিয়ম ভঙ্গ করিয়া আপনার ধর্ম্মানুমোদিত কার্য্য করিতে সাহস করিলেন, ইহা ভাবিলে কোন্ ব্যক্তি তাঁহার ধর্ম্ম-প্রাণতা ও অসাধারণ নৈতিক সাহসের প্রশংসা না করিবেন? তাঁহার সামাজিক বিপদ একদিকে আর তাঁহার আধ্যাত্মিক বিপদ অন্যদিকে—এই অবস্থাতে তিনি আপনার ধর্ম্মরক্ষার জন্য সামাজিক বিপদ ও নির্য্যাতন বরণ করিয়া লইলেন। যদিও তাঁহার ভ্রাতা তাঁহাকে এ বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করিলেন না, তথাপি তাহাতে তিনি পশ্চাৎপদ না হইয়া তাঁহার সঙ্কল্পকে দৃঢ় করিয়া ধরিলেন এবং যিনি বাল্যকাল হইতে তাঁহার কোমল প্রাণকে আপনার দিকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন, তাঁহার পালনী শক্তির উপর নির্ভর করিয়া এই অগ্নির মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

এই সময়ে তাঁহার মনের অবস্থা কিপ্রকার হইয়াছিল, তাহা

তাঁহার নিজের বর্ণিত কয়েক পংক্তি উদ্ধার করিয়া পাঠকদিগকে পাঠ করিতে অনুরোধ করি। "সকলেই আমার মতের বিরোধী। এমনি বিরুদ্ধ ভাব দাঁড়াইল, যেন আমি সকলকে রসাতলে ডুবাইতে যাইতেছি। আমি একা একদিকে, আর সকলেই আমার আর এক-দিকে। কাহার কাছে একটি আশ্বাস বাক্য পাই না, সাহাসের কথা পাই না। যখন আমার চারিদিকে কেবল এইপ্রকার বাধা, সেই অসহায় বন্ধুহীন অবস্থায় কেবল একজন ব্রহ্মনিষ্ঠ আমার সহায় হইলেন এবং প্রাণের কথা বলিয়া উঠিলেন—'লোক-ভয় আবার ভয়! ভয় করিলে যাঁরে না থাকে অন্যের ভয়' তাঁহাকে ভয় কর। ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দেওয়া যায়, তাহার কাছে লোকনিন্দা কি? প্রাণ গেলেও আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম ছাড়িব না।' ইঁহার নাম লালা হাজারীলাল * * * * আমি তাঁহার বাক্যে সাহস ও উৎসাহ পাইলাম। আমার হৃদয়ে ব্রহ্মাগ্নি আরো জ্বলিয়া উঠিল। এই আলোচনা ও শোচনাতে রাত্রিতে আমার ভাল নিদ্রা হয় না। একে পিতৃবিয়োগ, তাহাতে এই লৌকিকতাতে সারাদিন পরিশ্রম ও কষ্ট, তাহার উপরে আমার এই আন্তরিক ধর্ম্মযুদ্ধ। ধর্ম্মের জয় কি সংসারের জয়। কি হয় বলা যায় না, এই ভাবনা। এই-সকল চিন্তাতে শোচনাতে রাত্রিতে নিদ্রা হয় না। বালিসের উপর মাথা ঘুরিতে থাকে। রাত্রিতে একবার তন্দ্রা আসিতেছে, আবার জাগিয়া উঠিতেছি। নিদ্রা-জাগরণের যেন সন্ধিস্থলে রহিয়াছি।" এই প্রকার সংগ্রামের মধ্যে তাঁহার দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল।

ষোড়শ অধ্যায়।

পিতৃশ্রাদ্ধ।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে এই সংগ্রামের মধ্যে একব্যক্তি তাঁহাকে ধর্ম্মপথে থাকিবার জন্য, আপনার বিশ্বাসানুযায়ী কার্য্য করিবার জন্য উৎসাহিত করিয়াছিলেন। ইনি লালা হাজারীলাল। দেবেন্দ্রনাথের পিতামহ যখন বৃন্দাবন তীর্থে গমন করিয়াছিলেন, তখন তিনি হাজারী-লালকে পিতৃমাতৃহীন দেখিয়া দয়া করিয়া তাঁহাকে কলিকাতাতে আনিয়া আপনার বাটাতে আশ্রয় দেন ও প্রতিপালন করেন। কিন্তু কলিকাতায় থাকিতে থাকিতে তাঁহার দুর্গতি হয় এবং কুসংসর্গে পড়িয়া পাপের পথ আশ্রয় করেন। এই অবস্থাতে ভগবানের কৃপাতে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের আস্বাদন পাইয়া তাহা গ্রহণ করেন। সেই অবধি দেবেন্দ্রনাথের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার কার্য্যের অনেক সহায়তা করেন। পাপপথ পরিত্যাগ করিয়া পুণ্যের আস্বাদন লাভ করাতে তাঁহার জীবন নূতন বলে বলীয়ান হইয়া দেবত্ব লাভ করিতে লাগিল। একে পশ্চিমদেশীয় হিন্দুস্থানী, তাহাতে সত্যধর্ম্মের আলোক লাভ, এই উভয়ে একত্রিত হওয়াতে তাঁহার স্বাভাবিক সাহস ও ধর্ম্মনিষ্ঠা বর্দ্ধিত হইল। এক সময়ে তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যসংখ্যা ৫৪০ জন হইয়াছিল। এত অল্প সময়ে ব্রাহ্মসমাজের সভ্যসংখ্যার এত বৃদ্ধি তাঁহারই যত্নে সম্পন্ন হইয়াছিল। তিনি নিজে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ইহার সত্য ও মঙ্গলভাব সকলের নিকট প্রচার করিবার জন্য কলি-কাতায় সর্ব্বসাধারণের নিকট গমন করিতেন। এক সময়ে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারক হইয়া উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে গমন করিয়া জলন্ত

উৎসাহের সহিত এই ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন এবং তিনিই প্রথমে লাহোর পর্য্যন্ত গমন করিয়া এই নূতন ধর্ম্মের সংবাদ প্রদান করেন।

১৭৬৯ শকে যখন দেবেন্দ্রনাথ কাশী গমন করেন, তখন হাজারী-লালকে সঙ্গে লইয়া যান। হাজারীলাল ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য দূর দূরান্তরে বাহির হয়েন। তাঁহার নিকট একটি অঙ্গুরীমাত্র সম্বল ছিল তাহাতে খোদিত ছিল "ইহ ভি নেহী রহে গা"। যে প্রকার অসহায় অবস্থায় তিনি কলিকাতা আসিয়াছিলেন, সেই প্রকার সকল সাংসারিক সহায়তা পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া তিনি যে কাশী হইতে চলিয়া গেলেন, আর ফিরিলেন না।

এই সাহসী এবং ধর্ম্মনিষ্ঠ যুবক দেবেন্দ্রনাথের সেই অগ্নিপরীক্ষার দিনে তাঁহাকে সাহস দিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের জীবনের দিন-গুলি যখন এইরূপ সংগ্রামের মধ্যে কাটিতেছিল, যখন তিনি চতুর্দ্দিকে কেবল বিপদ, নির্য্যাতন, অপমানের অন্ধকার দেখিতেছিলেন, তখন ঈশ্বরের বিশেষ কৃপাতে তিনি এমন এক স্বপ্ন দেখিলেন যাহাতে তাঁহার হৃদয়ে বল ও সাহস আসিল এবং তিনি এই পরীক্ষা হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া ধর্ম্মের জয় জীবনে ঘোষণা করিলেন। এই আশ্চর্য্য স্বপ্ন তাঁহার নিজের প্রাঞ্জল ও সরল ভাষাতে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। "এই সময়ে সেই অন্ধকারে একজন আসিয়া বলিল—'উঠ'। আমি অমনি উঠিয়া বসিলাম। সে বলিল 'বিছানা হইতে নাম'। আমি বিছানা হইতে নামিলাম। সে বলিল 'আমার পশ্চাতে পশ্চাতে এসো'। আমি তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে চলিলাম। বাড়ীর ভিতরের যে সিঁড়ি তাহা দিয়া সে নামিল; আমিও সেইপথে নামিলাম—নামিয়া তাহার সঙ্গে উঠানে আসিলাম। সদর দেউড়ীর দরজায় দাঁড়াইলাম। দরওয়ানেরা নিদ্রিত। সে সেই দরজা ছুঁইল, অমনি তাহার দুই কপাট খুলিয়া

গেল। আমি তাহার সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইয়া বাড়ীর সম্মুখে রাস্তায় আসিলাম, ছায়াপুরুষের ন্যায় তাহাকে বোধ হইল। আমি তাহাকে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি না, কিন্তু সে আমাকে যাহা বলিতেছে, তৎক্ষণাৎ আমাকে তাহা বাধিত হইয়া করিতে হইতেছে। এখান হইতে সে ঊর্দ্ধে আকাশে উঠিল, আমিও তাহার পশ্চাতে আকাশে উঠিলাম। পুঞ্জ পুঞ্জ গ্রহ নক্ষত্র, তারকাসকল দক্ষিণে, বামে, সম্মুখে, সমুজ্জ্বল হইয়া আলোক দিতেছে, আমি তাহার মধ্য দিয়া চলিতেছি। যাইতে যাইতে একটা বাষ্প-সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। সেখানে আর তারা নক্ষত্র কিছুই দেখিতে পাই না। বাষ্পের মধ্যে খানিক দূর যাইয়া দেখি যে, সেই বাষ্প-সমুদ্রের উপদ্বীপের ন্যায় একটি পূর্ণচন্দ্র স্থির হইয়া রহিয়াছে। তাহার যত নিকটে যাইতে লাগিলাম সেই চন্দ্র তত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আর তাহাকে গোলাকার বলিয়া বোধ হইল না। দেখিলাম, তাহা আমাদের পৃথিবীর ন্যায় চেটাল। সেই ছায়া-পুরুষ গিয়া সেই পৃথিবীতে দাঁড়াইল, আমিও সেই পৃথিবীতে দাঁড়াইলাম। সে সমুদায় ভূমি শ্বেত প্রস্তরের। একটি তৃণ নাই। না ফুল আছে না ফল আছে। শ্বেত মাঠ ধূ ধূ করিতেছে। তাহার যে জ্যোৎস্না তাহা সে সূর্য্য হইতে পায় নাই। সে আপনার জ্যোতিতে আপনি আলোকিত। তাহার চারিদিকে যে বাষ্প তাহা ভেদ করিয়া সূর্য্যরশ্মি আসিতে পারে না। তাহার নিজের সে রশ্মি অতি স্নিগ্ধ। এখানকার দিনের ছায়ার ন্যায় সেখানকার সে আলোক। সেখানকার বায়ু সুখস্পর্শ। মাঠ দিয়া যাইতে যাইতে সেখানকার একটা নগরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। সকল বাড়ী, সকল পথ শ্বেত প্রস্তরের, স্বচ্ছ ও পরিষ্কার রাস্তায় একটি লোকও দেখিলাম না, কোন কোলাহল নাই, সকলই প্রশান্ত। রাস্তার পার্শ্বে একটা বাড়ীতে আমার নেতা প্রবেশ করিয়া

তাহার দোতালায় সে উঠিল, আমিও তাহার সঙ্গে উঠিলাম। দেখি যে, একটা প্রশস্ত ঘর। ঘরে শ্বেত পাথরের টেবিল ও শ্বেত পাথরের কতকগুলা চৌকি রহিয়াছে। সে আমাকে বলিল 'বসো।' আমি। একটা চৌকিতে বসিলাম। সে ছায়া বিলীন হইয়া গেল, আর সেখানে কেহই নাই। আমি সেই নিস্তব্ধ গৃহে নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছি; খানিক পরে দেখি যে, সেই ঘরের সম্মুখের একটা দরজার পর্দ্দা খুলিয়া উপস্থিত হইলেন আমার মা। মৃত্যুর দিবস তাঁহার যেমন চুল এলোনো দেখিয়াছিলাম সেইরূপ তাঁহার চুল এলোনোই রহিয়াছে। আমি তো তাঁহার মৃত্যুর সময় মনে করিতে পারি নাই যে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর যখন শ্মশান হইতে ফিরিয়া আসিলাম তখনো মনে করিতে পারি নাই যে, তিনি মরিয়াছেন। আমার নিশ্চয় যে, তিনি বাঁচিয়াই আছেন। এখন দেখিলাম আমার সেই জীবন্ত মা আমার সম্মুখে। তিনি বলিলেন—'তোকে দেখিবার ইচ্ছা হইয়াছিল, তাই তোকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছি। তুই নাকি ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়াছিস্? 'কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা'। তাঁহাকে দেখিয়া, তাঁহার এই মিষ্ট কথা শুনিয়া আনন্দপ্রবাহে আমার তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। দেখি যে, আমি সেই বিছানাতে ছট্‌ফট্ করিতেছি।" এই অদ্ভুত স্বপ্ন অনেকে অনেক ভাবে গ্রহণ করিবেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাতে দেবেন্দ্রনাথ যে হৃদয়ে বললাভ করিলেন সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। তিনি আপনার ধর্ম্মমতানুযায়ী শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন।

ক্রমে শ্রাদ্ধের দিন উপস্থিত হইল। বাড়ীতে আত্মীয় স্বজন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দ্বারকানাথ ঠাকুরের আদ্যশ্রাদ্ধ উপলক্ষে নানা প্রকার দ্রব্যে গৃহ পূর্ণ হইতে লাগিল এবং সকলেই আশা করিতে

লাগিলেন এই ব্যাপার অতি আড়ম্বরের সহিত সম্পন্ন হইবে। এদিকে দেবেন্দ্রনাথ, শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্যের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছেন শ্রাদ্ধদিবসে তিনি অপৌত্তলিক ভাবে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিবেন। যখন পুরোহিত, আত্মীয় স্বজনেরা শালগ্রাম ও দানসামগ্রী লইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন, তখন দেবেন্দ্রনাথ শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্যকে লইয়া এক প্রান্তে পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট মন্ত্র দ্বারা দানসামগ্রী উৎসর্গ করিতে লাগিলেন। ইহা জানিতে পারিয়া সকলে অত্যন্ত গোলমাল করিয়া উঠিলেন। সকলেই ভাবিলেন দেবেন্দ্রনাথ কি অন্যায় করিতেছেন! হিন্দুসন্তান হইয়া অহিন্দু ভাবে এই পুণ্য অনুষ্ঠান করিলেন, যাহা ইতিপূর্ব্বে কেহ কখন করিতে সাহস করে নাই, তাহা এই যুবক সম্পন্ন করিলেন, ইহাতে জ্ঞাতি কুটুম্বেরা সকলে অত্যন্ত বিরক্ত ও কুপিত হইলেন; সে দিন আহার করিয়া সকলে চলিয়া গেলেন, কিন্তু পরদিন ভোজের নিমন্ত্রণে আর কেহ আসিলেন না। সকলে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন। প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাশয় বলিয়া পাঠাইলেন "যদি দেবেন্দ্র আর এরূপ না করেন, তাহা হইলে আমরা সকলে তাঁহার নিমন্ত্রণে যাইব।" কিন্তু তিনি তাহার উত্তরে এই বলিয়া পাঠাইলেন "যদি তাই হবে তবে এতটা কাণ্ড করিলাম কেন? আমি আর পৌত্তলিকতার সহিত মিলিত হইতে পারিব না।" ঐ দিনে দেবেন্দ্রনাথ জগতের সমক্ষে আপনার বিশ্বাস ও ধর্ম্মের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেন। ঈশ্বর তাঁহার প্রিয় সন্তানকে কঠোর অগ্নি-পরীক্ষার মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার জীবনকে আরও পবিত্র করিয়া আপনার পুণ্য-সহবাসের উপযোগী করিয়া লইলেন এবং তাঁহাকে ঐ পরীক্ষার অগ্নি হইতে অক্ষত শরীরে পরিত্রাণ দিয়া আপনার প্রেম ও মহিমার বার্ত্তা জগতে ঘোষণা করিলেন। দেবেন্দ্রনাথ বলিতেছেন "জ্ঞাতি বন্ধুরা

আমাকে ত্যাগ করিলেন, কিন্তু ঈশ্বর আমাকে আরো গ্রহণ করিলেন। ধর্ম্মের জয়ে আমি আত্মপ্রসাদ লাভ করিলাম। এছাড়া আর আমি কিছুই চাহি না।" কি গভীর ঈশ্বরপ্রেম ও ধর্ম্মপ্রাণতা!

সপ্তদশ অধ্যায়।

কাশীযাত্রা।

দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় পাঠকেরা ইতঃপূর্ব্বে প্রাপ্ত হইয়াছেন। পৈতৃক সম্পত্তি তিনি অতি অল্পই পাইয়াছিলেন, কিন্তু নিজের পরিশ্রম ও অসাধারণ বুদ্ধি বলে তিনি কলিকাতাতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জমিদার হইয়াছিলেন এবং বাঙ্গালী ও ইংরাজদিগের নিকটে তাঁহার এত প্রতিপত্তি হইয়াছিল যে সেই সময়ে এ বিষয়ে কেহই তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। তিনি ১৭৬২ শকে ইউরোপে যাইবার পূর্ব্বে তাঁহার সন্তানদিগের জন্য একটি বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছিলেন যাহাতে ভবিষ্যতে তাঁহাদের কষ্ট না হয়। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন তাঁহার এই বিস্তৃত ব্যবসা ও জমিদারি তাঁহার সন্তানেরা রক্ষা করিতে পারিবেন না। সেইজন্য পৈতৃক বিষয় বিরাহিমপুর ও কটকের জমিদারির সঙ্গে তাঁহার স্বোপার্জ্জিত ডিহি সাহাজাদপুর ও পরগণা কালীগ্রাম একত্র করিয়া এই চারিটি সম্পত্তির উপরে একটি ট্রষ্ট্ ডিড লিখিয়া তিনজন ট্রষ্টি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ট্রষ্টিরা ঐ সম্পত্তির অধিকারী রহিলেন, কিন্তু তাঁহার সন্তানেরা উহার উপস্বত্ব ভোগ করিবেন মাত্র। দেবেন্দ্রনাথ বলিতেছেন "প্রথমবার ইউরোপ হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাহার ছয়মাস পরে ১৭৬৬ শকের ভাদ্রমাসে এক উইল করিলেন। তাহাতে তাঁহার সমুদায় বিষয় আমাদের তিন ভাইকে সমান ভাগে বিভাগ করিয়া লিখিয়া দিয়াছিলেন। ভদ্রাসন বাড়ী আমাকে, তেতলার বৈঠকখানার বাড়ী আমার মধ্যম ভ্রাতা গিরীন্দ্রনাথকে এবং বাড়ী নির্ম্মাণের জন্য ২৭০০০৲ বিশ হাজার টাকার সহিত ভদ্রাসন বাড়ীর পশ্চিম প্রাঙ্গণের ভূমি সমুদায়টা আমার কনিষ্ঠ

ভ্রাতা নগেন্দ্রনাথকে দিয়া গিয়াছিলেন।" কার ঠাকুর কোম্পানির অর্দ্ধেক অংশ দ্বারকানাথ ঠাকুরের নিজের এবং অবশিষ্ট অর্দ্ধেক অংশ ইংরাজ সাহেবদিগের ছিল। ইহার এক আনা অংশ দেবেন্দ্রনাথের নিজের ছিল। দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁহার অর্দ্ধাংশ দেবেন্দ্রনাথকে দিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু ভ্রাতৃবৎসল দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর এই অর্দ্ধাংশ তিন সহোদরে সমান ভাগে ভাগ করিয়া লইলেন। ইহাতে তাঁহার আশ্চর্য্য উদারতা ও ভ্রাতৃপ্রেম প্রকাশ পাইতেছে।

গিরীন্দ্রনাথের বিষয়বুদ্ধি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ছিল। তাঁহার পরামর্শে কার ঠাকুর কোম্পানির সাহেব অংশীদারদিগকে মাসিক বেতনে নিযুক্ত করিয়া দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার মধ্যম ভ্রাতার উপর হাউসের কর্ত্তৃত্বভার অর্পণ করিয়া ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে আপনাকে নিযুক্ত করিলেন।

এই সময়ে দেবেন্দ্রনাথ বেদ অধ্যয়ন ও আলোচনা করিবার অভিপ্রায়ে ১৭৬৯ শকের আশ্বিন মাসে পাল্কীর ডাকে কাশী যাত্রা করিলেন। যে অবধি দেবেন্দ্রনাথ রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের নিকট ব্রাহ্মধর্ম্মব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই অবধি তিনি প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে পূজার সময় বাটী পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে বাহিরে ভ্রমণ করিতেন। পূজার সময় তাঁহাদের বাটীতে অত্যন্ত আড়ম্বরের সহিত দুর্গোৎসব হইত। তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিবার পর আর সেই উৎসবে যোগদান করিতেন না। আবার বাটী হইতে সেই দুর্গোৎসব উঠাইয়া দিতে ইচ্ছা করিতেন না। কারণ যে ধর্ম্মে তাঁহার পরিবার পরিজনদিগের বিশ্বাস, যে দেবতার পূজা করিয়া তাঁহারা এতদিন যাপন করিয়াছেন, তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ধর্ম্ম ও দেবতা তাঁহারা যতদিন প্রাপ্ত না হইতেছেন, যতদিন পর্য্যন্ত তাঁহারা সত্যের আলোক দর্শন না করিতেছেন, ততদিন তাঁহাদের বিশ্বাস ও মতের মূলে কখনও কুঠারাঘাত করা উচিত নহে। তাহাতে

তাঁহাদের জীবনের অত্যন্ত ক্ষতি হইয়া থাকে। একথা দেবেন্দ্রনাথ বিশেষরূপে জানিতেন, সেইজন্য তিনি নিজে যদিও ঐ সমস্ত বাহিরের পূজা ও অনুষ্ঠান হইতে বিরত হইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার পরিবার পরিজনেরা প্রাচীন বিশ্বাসানুযায়ী কার্য্য করিতেছেন দেখিয়া তাঁহাদের এই-সমস্ত ক্রিয়াকলাপের উপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করেন নাই। জগতে দুই প্রকারে সংস্কার হইয়া থাকে। এক প্রকার সংস্কার বল-প্রয়োগে, সাংসারিক প্রলোভন দেখাইয়া অথবা প্রাচীন রীতিনীতির উপর অযথা আক্রমণ করিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিরা এইরূপ উপায়ে সংস্কার করিয়া থাকে। কিন্তু ইহাতে কার্য্যসিদ্ধি অতি অল্পই হইয়া থাকে। যদিও অনেক সময়ে দেখা যায় এই সমস্ত উপায় দ্বারা মানুষ নূতন ধর্ম্ম বা মত গ্রহণ করে, কিন্তু তাহা দ্বারা সংস্কারের উদ্দেশ্য যে হৃদয়পরিবর্ত্তন তাহা অসম্পন্নই থাকিয়া যায়। সুতরাং এই প্রকার সংস্কার জীবনের মধ্যে প্রবেশ করে না কাজেই তাহা ক্ষণস্থায়ী হয়। আর একপ্রকার সংস্কারের পথ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা প্রাচীন অপেক্ষা নূতনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিয়া থাকে। নূতন মত বা ধর্ম্ম পুরাতন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ও কল্যাণকর, ইহা জ্ঞান ও যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়া তাহা সমাজের সমক্ষে ধারণ করিলে যে সংস্কার হয়, তাহাই প্রকৃত সংস্কার, তাহাতে হৃদয়ের পরিবর্ত্তন আনয়ন করে এবং তাহা দ্বারা যথার্থ সমাজের কল্যাণ হইয়া থাকে। দেবেন্দ্রনাথ শেষোক্ত দলের সংস্কারক ছিলেন। সেইজন্য তিনি বলপূর্ব্বক বাটী হইতে দুর্গোৎসব প্রভৃতি পৌত্তলিক অনুষ্ঠান উঠাইয়া দেন নাই। প্রথমতঃ জ্ঞানের আলোক দ্বারা সকলকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যে ব্রাহ্মধর্ম্মই সত্যধর্ম্ম এবং ইহার দ্বারাই আত্মার প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হয়। যখন তাঁহার পরিবারস্থ ব্যক্তিরা এই সত্য ধারণ ও হৃদয়ঙ্গম করিতে

সক্ষম হইলেন, তখন তিনি দেবপূজা ও পৌত্তলিক অনুষ্ঠানাদি পরিবার হইতে উঠাইয়া দিয়াছিলেন। এইটি তাঁহার জীবনের একটি নিগূঢ় ও মহৎ ভাব। তিনি সমস্ত সংস্কারকার্য্যে এই ভাবে হস্তক্ষেপ করিতেন। তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনে তিনি এমন কোন কোন কার্য্য করিয়াছেন, যাহা এই আলোক দ্বারা দেখিতে চেষ্টা না করিলে এবং তাঁহার প্রকৃতিগত এই বিশেষত্ব স্মরণ না করিলে তাঁহাকে ঠিক্ ভাবে বিচার করা যাইবে না। তাঁহার কার্য্যবিশেষকে বিচার করিতে গিয়া তাঁহাকে অবিচার করিলে তাঁহার ক্ষতি অপেক্ষা পাঠকেরই ক্ষতি অধিক হইবার সম্ভাবনা, এইজন্য তিনি কোন্ প্রকার সংস্কারক ছিলেন তাহার একটু আভাস দেওয়া হইল।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম্মব্রত গ্রহণ করিবার পর হইতে প্রত্যেক বৎসর পূজার সময় বাটীর বাহিরে বাহিরে থাকিতেন। এই সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন—"সেই অবধি আমাদের বাটীর দুর্গোৎসবের সময়ে প্রতিবৎসরে আমি বাহিরে বাহিরে ভ্রমণ করিতাম। আশ্বিন মাসের রৌদ্র ও কার্ত্তিক মাসের ঝড় আমার মস্তকের উপর দিয়া কতবার চলিয়া গিয়াছে। কতবার আমি ঈশ্বরের নিকটে অশ্রুপূর্ণ নয়নে প্রার্থনা করিয়াছি যে, কবে পরিমিত দেবতার উপাসনা উঠিয়া গিয়া আমাদের বাটীতে অনন্তদেবের উপাসনা আরম্ভ হইবে। দেখ করুণানিধানের কেমন করুণা! তিনি আমার মনোগত প্রার্থনা ও সাধু ইচ্ছা কেমন পূর্ণ করিলেন। আমি হিমালয়ে থাকিয়া মনে করিয়াছিলাম যে, আমাদের বাটী হইতে যে অবধি প্রতিমা পূজা রহিত না হয়, সে অবধি আমি গৃহে ফিরিয়া যাইব না। আমি এখানে ফিরিয়া আসিবা মাত্র কেমন সহজে আমাদের গৃহে প্রতিমাপূজা বিলুপ্ত হইল। শালগ্রামশিলার নিত্যপূজা, সম্বৎসরের

দুর্গাপূজা, পৌত্তলিকতার কোলাহল যেমন আমাদের বাটী হইতে অন্তরিত হইল, অমনি সেখানে অনন্তদেবের পবিত্র নিশ্বাস সমীরিত হইল। যেখানে পরিমিত দেবতার উপাসনা ছিল, সেখানে এখন প্রতিদিন আমরা সপরিবারে একত্র হইয়া বিমল মনে, আনন্দ হৃদয়ে, সত্যস্বরূপ প্রেমস্বরূপের উপাসনা করি। ইহাতে আমি কৃতার্থ হইয়াছি। আমাদের পরিবারে এখন ব্রাহ্মধর্ম্মের পদ্ধতি-মত গৃহধর্ম্মের অনুষ্ঠান কেমন সহজ হইয়া উঠিয়াছে। ভদ্রাসন বাটী স্থাপনাবধি যে-গৃহে পরিমিত দেবতার উপাসনা হইয়া আসিতেছে, সে-গৃহে যে ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান প্রচলিত হওয়া আমি এই চক্ষে দেখিব, এমত আমার আশা ছিল না। ঈশ্বরপ্রসাদে তাহাও আমার জীবনে ঘটিল।" ঈশ্বর-কৃপাতে ও জ্ঞানালোক বিতরণের দ্বারা তাঁহার পরিবার হইতে প্রতিমাপূজারহিত হইল এবং অনন্তের উপাসনা প্রতিষ্ঠিত হইল। এই সংস্কারকার্য্য তিনি ইচ্ছা করিলে বলপ্রয়োগ দ্বারা করিতে পারিতেন। বিশেষতঃ তাঁহার পিতার মৃত্যুর পরে যখন তিনি নিজে কর্ত্তা হইলেন, তখন ইচ্ছা করিলেই বাটী হইতে এই-সমস্ত পৌত্তলিক অনুষ্ঠান অনায়াসে উঠাইয়া দিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি তাহা করিলেন না। তিনি জানিতেন যে আলোক প্রকাশিত হইলে যেমন অন্ধকার আপনা হইতে বিদূরিত হয়, তেমনি মানবমনে সত্যের আলোক আসিলে সহজভাবে অসত্য ও কুসংস্কার চলিয়া যাইবে। এ সম্বন্ধে তিনি একস্থলে বলিতেছেন "ব্রাহ্মসমাজের প্রতি প্রথমে সকল হিন্দুদিগের মনে একটি দ্বেষ ছিল। কিন্তু যখন তাঁহারা সমাজের প্রসন্ন ও পবিত্র ভাব প্রত্যক্ষ করিলেন—মৈথিলী ব্রাহ্মণের মুখ হইতে বেদ শ্রবণ করিলেন, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট হইতে উপনিষদের অর্থ ও মর্ম্ম অবগত হইলেন, বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের

অপূর্ব্ব যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যান-সকল মনে ধারণ করিলেন—তখনি তাঁহাদের হৃদয় ব্রাহ্মসমাজের অনুরাগে আকৃষ্ট হইল। হিন্দুসমাজের অনেকে ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা করিতে আসিতে লাগিলেন। দেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা, মৈথিলী ও মহারাষ্ট্রীয়েরা, দাক্ষিণাত্য দ্রাবিড়ী ও ত্রৈলঙ্গীয়রা পাঞ্জাব-বাসী শিখেরা সকলেই এখানে আসিয়া অশ্রুপাত করিতেন।" এই ভাবে তিনি সংস্কারকার্য্য করিতেন।

তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর উত্তমরূপে বেদ আলোচনা করিবার উদ্দেশ্যে তিনি কাশী যাত্রা করিলেন। সেখানে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া বেদপাঠ শ্রবণ করিলেন এবং তাঁহাদিগকে উপযুক্তরূপে আদর অভ্যর্থনা করিয়া প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে একখানি কাপড় ও দুইটি টাকা দান করিয়া বিদায় দিলেন। তাঁহারা সকলে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া গেলেন। ইহাতে কাশীর মধ্যে একটা জনরব হইল যে কলিকাতা হইতে একজন শ্রদ্ধাবান বাঙ্গালী আসিয়াছেন। একদিন তিনি মানমন্দিরে কয়েকজন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের সহিত আলোচনা করিতেছেন, এমন সময়ে কাশীর রাজার জনৈক ভ্রাতা আসিয়া বলিলেন—"মহারাজের ইচ্ছা যে আপনার সহিত তাঁহার একবার সাক্ষাৎ হয়।" দেবেন্দ্রনাথ ঐ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন এবং রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। রাজার সহিত সাক্ষাৎ হইবার পরে রাজা তাঁহাকে একটি হীরার অঙ্গুরী উপহার প্রদান করিলেন এবং বলিলেন "আপকা সাথ মিলনেসে হমারা বড়া আনন্দ হুয়া। দশমী কি রামলীলামে আপকা জরুর আনা।" তাঁহার অনুরোধে কাশীতে রামলীলা দর্শন করিয়া দেবেন্দ্রনাথ নৌকাপথে বিন্ধ্যাচল দেখিয়া মৃজাপুর গেলেন। সেখানে বিন্ধ্যাচলের পুত্র পর্ব্বতশ্রেণী দর্শন করিয়া তাঁহার মনে কত আনন্দ! একদিন তিনি প্রাতঃকালে ভ্রমণ

করিতে বাহির হইয়াছিলেন। পর্ব্বতের নির্জ্জন মনোহর সৌন্দর্য্যরাশি সম্ভোগ করিতে করিতে দুই প্রহর পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিলেন। ক্ষুধা তৃষ্ণার কথা কিছুই মনে ছিল না। অবশেষে ক্লান্ত হইয়া নৌকাতে ফিরিয়া আসিয়া একটু দুগ্ধ পান করিলেন। পরে মৃজাপুর হইতে এক ষ্টীমারে কুমারখালী পর্য্যন্ত আসিলেন এবং সেখানকার জমিদারী পরিদর্শন করিয়া কলিকাতাতে প্রত্যাগমন করিলেন। সঙ্গে কাশীর ছাত্র আনন্দচন্দ্রকে আনিলেন। কাশী যাইবার সময়ে লালা হাজারী-লাল তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য তিনি লাহোর গমন করিলেন। তাঁহার সঙ্গে কিছুই ছিল না, কেবল একটি অঙ্গুরী ছিল এবং তাহাতে খোদিত ছিল "ইহ ভি নেহী রহে গা"। সেই যে তিনি গেলেন তাহার পর আর দেবেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই।

লালা হাজারীলাল সম্বন্ধে ১৭৭৫ শক ফাল্গুন সংখ্যার তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে এইরূপ লিখিত আছে—"অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া অবগত করিতেছি শ্রীযুক্ত লালা হাজারীলাল মহাশয়ের গত ১২ পৌষ রাত্রি দ্বিপ্রহর চারি ঘণ্টার সময়ে ইন্দোর নগরে প্রাণত্যাগ হইয়াছে। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে অনেকে তাঁহাকে অবগত আছেন, এবং তন্মধ্যে অনেকের সহিত তাঁহার বিশেষ আত্মীয়তা ও বাধ্যবাধকতাও ছিল; তাঁহারা সকলে এই সংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত পরিতপ্ত হইবেন, তাহার সন্দেহ নাই। তিনি যাবৎ এ প্রদেশে অবস্থিতি করিতেন তাবৎ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারার্থে বিশিষ্টরূপ যত্নবান্ ও চেষ্টান্বিত ছিলেন। কয়েক বৎসর হইল, এখান হইতে যাত্রা করিয়া কাশী, কানপুর, আগ্রা, লাহোর, পেশোয়ার, কেরাচী, বোম্বাই প্রভৃতি নানা স্থানে ভ্রমণ করেন, তাহাতেও যখন যেস্থানে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, তখন তথায় ব্রাহ্ম-

ধর্ম্মের আন্দোলন করিতে এবং যোগ্যপাত্র প্রাপ্ত হইলে তাঁহাকে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে ত্রুটি করেন নাই। তিনি ইন্দোরে শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র দত্ত নামে এক ধর্ম্মোৎসাহী সুশীল ব্যক্তিকে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণে প্রবৃত্ত করেন, তাঁহারই পত্রে আমরা এই দারুণ দুঃখজনক সমাচার পাঠ করিয়া পরিতাপ প্রাপ্ত হইলাম।"

যখন ভারতবর্ষে যাতায়াতের সুবিধা ছিল না, যখন একস্থান হইতে অন্যস্থানে গমন করিতে হইলে শঙ্কিত চিত্তে যাইতে হইত, তখন এই মহাত্মা সকল প্রকার কষ্ট ও দুঃখ মস্তকে ধারণ করিয়া দূর দূরান্তরে গমন করিয়া ব্রহ্মনাম প্রচার করিয়াছিলেন। এই ঘটনা হইতে অতি পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারা যায় যে তাঁহার হৃদয় ঈশ্বরানুরাগে পূর্ণ ছিল এবং মনও অসাধারণ সাহস ও বীর্য্যের আধারস্বরূপ ছিল। যাহাহউক দেবেন্দ্রনাথের পবিত্র সহবাসে থাকিয়া হাজারীলাল আপনার পূর্ব্ব কু-অভ্যাসসমূহ পরিত্যাগ করিয়া দেবচরিত্র লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ হইয়া সকল প্রকার কার্য্যের সহায়তা করিয়া অবশেষে পবিত্র ব্রহ্মনাম দেশে বিদেশে প্রচার করিয়া আপনার জীবন ধন্য করিয়া গিয়াছেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

অগ্নিপরীক্ষা!

দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার পিতার মৃত্যুর পরে যে এত ভয়ঙ্কর পরীক্ষার মধ্যে পড়িবেন, তাহা তিনি জানিতেন না। তাঁহার পিতার আদ্য শ্রাদ্ধের সময়ে তিনি যে সাহস ও ধর্ম্মনিষ্ঠা দেখাইয়াছেন, তাহা জগতে বিরল। কিন্তু ইহা অপেক্ষা আরও এক কঠোরতর পরীক্ষার মধ্যে তাঁহাকে পতিত হইতে হইয়াছিল, যাহার বিষয় চিন্তা করিলে অত্যন্ত বীরের হৃদয়ও কম্পিত হয়। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয় একদিকে ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তি ছিলেন বটে, কিন্তু অন্যদিকে অতিরিক্ত ব্যয় করিতেন। কোন ব্যক্তি প্রার্থী হইয়া তাঁহার নিকটে আসিলে তিনি কিছুতেই তাহাকে বিমুখ করিতেন না। যখন তিনি ইউরোপ ভ্রমণে গিয়াছিলেন, তখন সেখানে রাজার ন্যায় মহা আড়ম্বরের সহিত বাস করিতেন। তখন তাঁহার এইরূপ চাল চলনের জন্য তিনি প্রিন্স উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। সেখানে অবস্থান করিবার সময়ে তিনি অতিরিক্ত ব্যয় করিতেন এবং তজ্জন্য তাঁহাকে ঋণগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার সন্তানদিগের উপরে এই ঋণভার নিপতিত হইল। দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন বলিয়া বিশেষভাবে তাঁহাকে এই ভয়ঙ্কর ঋণভারের ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছিল।

দেবেন্দ্রনাথের এই বিপদের সময়ে তাঁহার আত্মীয় স্বজনেরা তাঁহার সহিত সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। বিশেষতঃ তাঁহারা যখন এই ঋণের জন্য বিন্দুমাত্রও দায়ী নহেন, অথচ তাঁহাদের উপর এই ঋণ-ভার পতিত হইল, তখন তাঁহার বন্ধু বান্ধবেরা তাঁহাদের জন্য অত্যন্ত

চিন্তিত হইলেন। এই বিপদের হস্ত হইতে উদ্ধার লাভ করিবার জন্য তাঁহারা নানা প্রকার পরামর্শ দিতে লাগিলেন। অনেকে বিষয় বুদ্ধির সাহায্য গ্রহণ করিতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ এ বিষয়ে সাধুতার পথ হইতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইয়া কোন কার্য্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। বিশেষতঃ নিম্নলিখিত একটি ঘটনা তাঁহাদের পক্ষে বিশেষ অনুকূল ছিল, তাহাতে আইনের সাহায্য গ্রহণ করিলেও মহাজনেরা তাঁহাদের বিশেষ কোন ক্ষতি করিতে পারিতেন না। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ কোন প্রকারে ধর্ম্মপথ অতিক্রম করিবেন না, ইহা পূর্ব্ব হইতে স্থির করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার এই মহাবিপদের সময়ে তিনি তাঁহার বন্ধু বান্ধবের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিলেন এবং সকল প্রকার দুঃখ ও কষ্ট অবনত মস্তকে গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

দেবেন্দ্রনাথ কাশী হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন যে তাঁহাদের হাউস কার ঠাকুর কোম্পানির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়াছে। অর্থের অভাবপ্রযুক্ত হুণ্ডীওয়ালারা যথাসময়ে টাকা পাইতেছে না। অতি কষ্টে, অনেক চেষ্টাতে তাহাদিগকে টাকা দেওয়া হইতেছে। এই সময়ে একদিন একটা ত্রিশ হাজার টাকার হুণ্ডী আসিল। কিন্তু সে দিন আর কিছুতেই টাকা দিতে পারা গেল না। সুতরাং সে দিন হাউসের প্রতিপত্তি নষ্ট হইল। পরদিন বাধ্য হইয়া তাঁহারা আফিসের দরজা বন্ধ করিলেন। ১৭৬৯ শকের ফাল্গুন মাসে তাঁহাদের ব্যবসা, বাণিজ্য সমুদায় বিনষ্ট হইল। কেবল যে বাণিজ্য ব্যবসায়ের পতন হইল, তাহা নহে, পিতৃঋণের জন্য হয়ত তাঁহাদের সমুদয় জমিদারিও যাইতে পারে। কারণ ব্যবসাপতনের তিন দিন পরে তাঁহাদের কর্ম্মচারী ডি, এম, গর্ডন দেনা পাওনার এক হিসাব প্রস্তুত করিলেন এবং সমস্ত পাওনাদারগণকে ডাকিয়া এক সভা করিলেন। তাহাতে

তিনি এই দেখাইলেন যে হাউসের মোট দেনা এক কোটি টাকা এবং পাওনা সোত্তর লক্ষ টাকা। ত্রিশ লক্ষ টাকার অসংস্থান। এই ত্রিশ লক্ষ টাকা পরিশোধ করিতে হইলে তাঁহাদের জমিদারিও বিক্রয় করিতে হইবে।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয় আপনার সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিবলে বুঝিতে পারিয়াছিলেন তাঁহার বিষয় সম্পত্তির এই অবস্থা হইবে, সেই জন্য তিনি তাঁহার সন্তানদিগকে এই বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য কতকগুলি সম্পত্তি একত্র করিয়া তাহার উপর তিনজন ট্রষ্টী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই সম্পত্তির উপর তাঁহার সন্তানদের কোন হাত থাকিবে না, কিন্তু তাঁহারা ইহার উপস্বত্ব ভোগ করিবেন। গর্ডন সাহেব সভাতে বলিলেন "হাউসের অধিকারীরা এই হাউসের পাওনা ও সম্পত্তি এবং নিজেদের জমিদারীর সত্ব সকলি আপনাদের হস্তে দিয়া পিতৃঋণ শোধ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। আপনারা তাহা গ্রহণ করিয়া আপন আপন প্রাপ্য পরিশোধ করিয়া লউন। কিন্তু একটি ট্রষ্ট সম্পত্তি আছে, তাহার অধিকারী ইঁহারা নহেন, সুতরাং তাহার উপর আপনারা কোনপ্রকার দাবী করিতে পারিবেন না।" বাস্তবিকই আইন অনুসারে এই প্রকার ট্রষ্ট-সম্পত্তির উপর হস্তক্ষেপ করিবার কাহারও অধিকার নাই। গর্ডন সাহেব যখন সভাতে এই প্রকার বক্তৃতা করিতেছিলেন, তখন পাওনাদারেরা এই সম্পত্তির কথা শুনিয়া একটু অসন্তুষ্ট হইতেছিলেন। এমন সময়ে ত্রিংশ বৎসর বয়স্ক যুবক দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার মধ্যম সহোদর গিরীন্দ্রনাথকে বলিলেন "গর্ডন সাহেব তো বলিতেছেন যে আমাদের ট্রষ্ট-সম্পত্তির উপর তাঁহাদের কোন অধিকার নাই, কিন্তু যাহাতে আমরা পিতৃ-ঋণ হইতে একেবারে মুক্ত হইতে পারি, সেই পথ অবলম্বন করা উচিত। যতক্ষণ পর্য্যন্ত

আমাদের এক কপর্দ্দক থাকিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা এই ঋণ শোধ করিবার জন্য চেষ্টা করিব। অতএব আমাদের নিজেদের অগ্রসর হইয়া বলা উচিত যে আমরা এই ট্রষ্ট-সম্পত্তিও ঋণ পরিশোধের জন্য ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত আছি।" গিরীন্দ্রনাথ এই প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন। তখন দেবেন্দ্রনাথ গর্ডন সাহেবকে বলিলেন তাঁহারা পিতৃ-ঋণ শোধের জন্য এই ট্রষ্ট-সম্পত্তিও মহাজনদিগের হস্তে অর্পণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। ধন্য সাধুতা! ধন্য অকপট ঈশ্বরানুরাগ! ধন্য দেবেন্দ্রনাথ! ধর্ম্মরক্ষার জন্য সাধুপথ অবলম্বনের জন্য আজ জগতে তুমি যে দৃষ্টান্ত দেখাইলে, তাহার জন্য জগতের ইতিহাসে তোমার নাম চিরকাল জ্বলন্ত স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত হইয়া থাকিবে। তুমি ধর্ম্মরক্ষার জন্য আজ যে পথ অবলম্বন করিলে, তাহার জন্য হয়ত তোমাকে কাল পথের ভিখারী হইতে হইবে। প্রিন্স দ্বারকানাথের পুত্র হইয়া তুমি কেমন করিয়া এই অতুল ঐশ্বর্য্যের মায়া মমতা পরিত্যাগ করিলে! আজ অগণ্যদাসদাসীপরিপূর্ণ রাজ-অট্টালিকার অধীশ্বর হইয়া তুমি বর্ত্তমান আছ, কিন্তু কাল হয়ত তোমাকে এই সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া এই অল্প বয়সে সন্তানসন্ততি সহ দরিদ্রের ন্যায় পর্ণকুটীরে বাস করিয়া দিনযাপন করিতে হইবে!

গর্ডন সাহেব তাঁহাদের এই প্রস্তাব পাওনাদারদিগকে জ্ঞাপন করিলেন। তিনি বলিলেন "হাউসের অধিকারীরা নিজেদের সর্ব্বস্ব দিয়া আপনাদের ঋণ পরিশোধ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, তাহা আপনারা শুনিয়াছেন, এখন আবার তাঁহারা এই ট্রষ্ট-সম্পত্তিও আপনাদের হস্তে দিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।" পাওনাদারেরা জানিতেন এ বিষয়ে দ্বারকানাথ ঠাকুরের সন্তানেরা নির্দ্দোষী, হাউসের উত্থান ও পতনের সহিত তাঁহাদের কোন সম্বন্ধ নাই। তাঁহারা ইহার জন্য বিন্দুমাত্র ও

দায়ী নহেন। অথচ তাঁহারা পিতৃ-ঋণ শোধের জন্য আপনাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন প্রকার চিন্তা করিয়া সর্ব্বস্ব অর্পণ করিলেন, ইহা ভাবিয়া তাঁহারা অত্যন্ত দয়ার্দ্র হইলেন। কাহারও কাহারও চক্ষু হইতে অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। তাঁহারা এই প্রকার সাধুতা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন।

এই সময়ে আর একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথের অঙ্গুলীতে একটি বহুমূল্য অঙ্গুরী ছিল। তাঁহার বিষয় সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুত করিবার সময়ে তিনি এই অঙ্গুরীটি সেই তালিকাভুক্ত করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। যখন গর্ডন সাহেব সভার মধ্যে তাঁহাদের বিষয় সম্পত্তির তালিকা পাঠ করিতেছিলেন তখন দেবেন্দ্রনাথ সভাতে গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন "আমার অঙ্গুলিতে একটি বহুমূল্য অঙ্গুরী আছে, তালিকা-প্রস্তুতের সময়ে আমি তাহার উল্লেখ করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। এই অঙ্গুরীও তালিকাভুক্ত করুন।" এই বলিয়া তিনি উপবেশন করিলেন। তাঁহার এই কথা শুনিয়া সমস্ত সভা নিস্তব্ধ হইল। সকলের চক্ষু অশ্রুতে পূর্ণ হইল। তাঁহারা বুঝিলেন এ যুবক মানুষ নয়। ইনি দেবতা! সাধুতার এ প্রকার দৃষ্টান্ত জগতে অতি বিরল। গর্ডন সাহেব প্রস্তাব করিলেন "আপনারা দেখিতেছেন এই যুবক কি প্রকারে পিতৃ-ঋণ শোধ করিবার জন্য আপনার সর্ব্বস্ব অর্পণ করিতেছেন। আপনার হস্তের অঙ্গুরী পর্য্যন্ত আপনার জন্য রাখিতে প্রস্তুত নহেন, অতএব আমি প্রস্তাব করি ইঁহার সাধুতার পুরস্কার-স্বরূপ আপনারা ইঁহাকে এই অঙ্গুরী প্রদান করুন।" মহাজনেরা তৎক্ষণাৎ ইহাতে সম্মত হইলেন। তৎপরে পাওনাদারেরা এই প্রস্তাব করিলেন যে যখন ইঁহারা সকলি ছাড়িয়া দিলেন তখন ইঁহাদের ভরণ-পোষণের জন্য এই সম্পত্তি হইতে প্রতি বৎসর ২৫০০৲ পঁচিশ হাজার

টাকা করিয়া পাইবেন। এইরূপে আদালতের সাহায্য গ্রহণ না করিয়া সমস্ত মীমাংসা হইয়া গেল। ইহাতে দেনাদার ও পাওনাদার-দিগের মধ্যে সদ্ভাব রহিয়া গেল। তাঁহারা সকল সম্পত্তি নিজেদের হস্তে গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের মধ্যে প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগকে লইয়া এক কমিটি গঠন করিলেন এবং এক হাজার টাকা বেতনে একজন সম্পাদক নিযুক্ত করিয়া কার্য্য চালাইতে লাগিলেন।

যুবক দেবেন্দ্রনাথ ইচ্ছা করিয়াই দারিদ্র্যকে বরণ করিয়া লইলেন। ধর্ম্মের জন্য, ঈশ্বরের জন্য, কর্ত্তব্য পালনের জন্য মানুষ কখন কখন এ প্রকার করিয়া থাকে সত্য, কিন্তু তাহাতে যে ব্যক্তি আনন্দলাভ করে, আপনার সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া যে ব্যক্তি অন্তরে বাস্তবিকই পুলকিত হয়, তিনিই প্রকৃত ধার্ম্মিক। দেবেন্দ্রনাথ সেদিনকার সভাতে আপনার সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি পাওনাদারদিগের হস্তে সমর্পণ করিয়া অন্তরে কি প্রকার আনন্দ-লাভ করিলেন, তাহা তাঁহার স্বরচিত জীবনচরিত হইতে আমরা বুঝিতে পারি। তিনি বলিতেছেন "আমাদের সকল সম্পত্তির উপরে পাওনা-দারেরা আপন কর্ত্তৃত্ব স্থাপন করিয়া সভাভঙ্গ করিলেন। আমরা দুই ভাই বাড়ী চলিলাম। গাড়ীতে যাইতে যাইতে আমি গিরীন্দ্রনাথকে বলিলাম—'আমরা তো বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করিয়া সকলি দিলাম'। তিনি বলিলেন—হাঁ এখন লোকে জানুক, আমাদের জন্য আমরা কিছুই রাখি নাই—তাহারা বলুক যে ইঁহারা সকল ধন দিলেন 'সর্ব্ববেদসং দদৌ'। আমি বলিলাম যে 'লোকে বলিলে কি হইবে? আদালত তো শুনিবে না। আদালতে যে কেহ একজন নালিস করিলেই আমাদের শপথ করিয়া বলিতে হইবে যে, আমরা সকলি দিলাম, আমাদের আর কিছুই নাই। নতুবা আদালত আমাদিগকে ছাড়িবে না। কিন্তু যাবৎ অঙ্গে একটি চীর পর্য্যন্ত থাকিবে, তাবৎ রাজদ্বারে দাঁড়াইয়া শপথ

করিয়া বলিতে পারিব না যে, সব দিলাম। এমনি সকলি দিব, কিন্তু শপথ করিতে পারিব না। ঈশ্বর ও ধর্ম্ম আমাদিগকে রক্ষা করুন। যেন, ইনসলভেণ্ট আইনে আমাকে মস্তক দিতে না হয়। এই-সকল কথাবার্ত্তায় আমরা বাড়ী পৌঁছিলাম।"

দেবেন্দ্রনাথের সকলি গেল। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে পরিবারসহ হয়ত পরদিবস হইতে শাকান্ন ভোজন করিয়া জীবন ধারণ করিতে হইবে। যাঁহার পিতার প্রমোদ-কাননে রাজপ্রতিনিধি আপন বন্ধু-বান্ধবের সহিত নিমন্ত্রিত হইয়া ষোড়শোপচারে আহার করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেন, যাঁহার পিতার রাজপ্রাসাদের ন্যায় প্রকাণ্ড অট্টালিকা দাসদাসীতে সর্ব্বদা পরিপূর্ণ থাকিত, তাঁহাকে হয়ত কল্য হইতে সমস্ত দাসদাসীকে বিদায় দিতে হইবে এবং একজন সাধারণ গৃহস্থের ন্যায় আপনার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে। তাহাতে দেবেন্দ্রনাথের কোন কষ্ট নাই, চিন্তা নাই, উদ্বেগ নাই, বরং তাহাতে তাঁহার অপার আনন্দ! তিনি বলিতেছেন—"আমি যা চাই তাই হইল—বিষয় সম্পত্তি সকলি হাত হইতে চলিয়া গেল। যেমন আমার মনে বিষয়ের অভিলাষ নাই, তেমনি বিষয়ও নাই, বেশ মিলে গেল—বিদ্যুৎ পড়ুক, বিদ্যুৎ পড়ুক, বলিতে বলিতে যদি বিদ্যুৎ পড়িয়া সব জ্বলিয়া যায়, তবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? আমি বলি যে 'হে ঈশ্বর আমি তোমা ছাড়া আর কিছু চাই না।' তিনি প্রসন্ন হইয়া এ প্রার্থনা গ্রহণ করিলেন। গ্রহণ করিয়া আমার নিকটে প্রকাশ হইলেন এবং আর সব কাড়িয়া লইলেন। 'ছুমড়ীকি ঠুড্ডিয়া ময়েস্‌সর নহী কে চিবাকের পানি পিয়ুঁ'। আমার হাতে এক দামড়িও (সিকি পয়সার অর্দ্ধেক) নাই যে কিছু খাইয়া একটু জলপান করি।

"যাহা প্রার্থনাতে ছিল, তাহা পূর্ণ হইয়া এখন কার্য্যে পরিণত হইল। সে শ্মশানের সেই একদিন, আর অদ্যকার এই আর একদিন। আমি আর-এক সোপানে উঠিলাম। চাকরের ভিড় কমাইয়া দিলাম, গাড়ী ঘোড়া সব নিলামে দিলাম—খাওয়া পরা খুব পরিমিত করিলাম—ঘরে থাকিয়া সন্ন্যাসী হইলাম। কল্য কি খাইব, কি পরিব, তাহার আর ভাবনা নাই। কাল এ বাড়ীতে থাকিব, কি এ বাড়ী ছাড়িতে হইবে, তাহার ভাবনা নাই। একেবারে নিষ্কাম হইলাম। নিষ্কাম পুরুষের যে সুখ ও শান্তি, তাহা উপনিষদে পড়িয়াছিলাম, এখন তাহা জীবনে ভোগ করিলাম। চন্দ্র যেমন রাহু হইতে মুক্ত হয়, আমার আত্মা তেমনি বিষয় হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোককে অনুভব করিল। 'হে ঈশ্বর অতুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যে তোমাকে না পাইয়া প্রাণ আমার ওষ্ঠাগত হইয়াছিল—এখন তোমাকে পাইয়া আমি সব পাইয়াছি।"

দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে দেবেন্দ্রনাথ যখন ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল হইয়া ক্রন্দন করিয়া বেড়াইতেছিলেন, তখন দৈবাৎ উপনিষদের একখণ্ড ছিন্ন পত্র তাঁহার সম্মুখ দিয়া উড়িয়া যাইতেছিল। তাহাতে লেখা ছিল "ঈশাবাস্যম্ ইদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥" "জগতে যাহা কিছু প্রপঞ্চভূত চঞ্চল বিষয় আছে, সেই সমুদায়কে পরমেশ্বর দ্বারা আচ্ছাদন করিতে হইবে, অর্থাৎ সমস্তই ব্রহ্মময় এরূপ জানিয়া বিষয়বুদ্ধি ত্যাগ করিতে হইবে। সেই ত্যাগ দ্বারা অর্থাৎ বিষয়বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া পরমাত্মাকে সম্ভোগ কর; কাহারও ধনে আকাঙ্ক্ষা করিও না।" ইহা তিনি যেদিন পাঠ করিয়া তাহার অর্থ গ্রহণ করিলেন, সেইদিন হইতে ধনের প্রতি তাঁহার বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছিল। বিষয়বুদ্ধি ত্যাগের দ্বারা এই সংসারকে

ভোগ করিতে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। এখন উপনিষদের ঐ অমূল্য শ্লোকটি জীবনে প্রতিপালন করিয়া নিজে ধন্য হইলেন এবং তাঁহার জীবনের দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া আমরাও ধন্য হইতেছি।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

ঋগ্বেদ প্রকাশ ও সত্যালোচনা।

দেবেন্দ্রনাথ যাহা অকপটে ভিক্ষা করিয়াছিলেন, বিধাতা তাঁহার প্রতি কৃপা করিয়া তাহা দান করিলেন। ইহাতে তিনি বিষয়ের হস্ত হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া ব্রাহ্মসমাজ, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ও দেশের সেবাতে আরও অধিকতর উৎসাহের সহিত আপনাকে নিযুক্ত করিলেন। এইপ্রকার ভীষণ ঝটিকার প্রকোপ তাঁহার উপর দিয়া চলিতেছে, অথচ তাঁহার হৃদয় শান্ত ও সমাহিত।

এই অবস্থার মধ্যে তাঁহার জ্ঞানলাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষা ও স্বদেশ-সেবার জন্য জ্বলন্ত উৎসাহ আরও জাগ্রত হইয়া উঠিল। মহাপুরুষ-দিগের এই এক প্রধান লক্ষণ। যেখানে সাধারণ লোক নিরাশার অন্ধকার দেখিয়া ভীত ও মুহ্যমান হয়, সেখানে মহাপুরুষেরা অন্তর্নিহিত এক নিগূঢ় প্রবল শক্তি লাভ করিয়া অযুত হস্তীর ন্যায় সতেজে দণ্ডায়মান হইয়া থাকেন।

এই সময়ে তাঁহাকে অনেক ব্যয় সংক্ষেপ করিতে হইয়াছিল। এই প্রকার শ্রুত হওয়া যায়, তিনি একবারে চারি আনা মূল্যের অধিক সামগ্রী আহার করিতেন না। যাঁহার পিতার ডিনার তিন শত টাকার কমে হইত না, তিনি চারি আনা মূল্যের ডিনার খাইয়া তৃপ্ত হইতেন। এই পিতৃ-ঋণ শোধ করিবার জন্য তাঁহাকে ব্রাহ্মসমাজের ও অন্যান্য বিভাগের ব্যয় সংক্ষেপ করিতে হইয়াছিল। পাঠকেরা জানেন তত্ত্ববোধিনী সভা হইতে হুগলির অন্তর্গত বংশবাটী গ্রামে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এক্ষণে সেই পাঠশালা

উঠিয়া গেল। সেই জমি ও বাটী বিক্রয়ের জন্য ১৭৬৯ শকের আশ্বিনের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল "তত্ত্ববোধিনী সভার অধীনে বংশবাটী গ্রামের উত্তরাংশে ভাগীরথীর সন্নিধানে এক খণ্ড ৪৮২ চারি বিঘা সতের কাঠা ভূমি আছে এবং ঐ ভূমির উপর এক উত্তম বৃহৎ আটচালা প্রস্তুত আছে; তাহা উচিত মূল্যে বিক্রয় হইবেক। যদি কেহ লইবার মানস করেন তবে সম্পাদককে জানাইয়া তাহার বিশেষ অবগত হইতে পারিবেন।"* দেবেন্দ্রনাথ ইতঃপূর্ব্বে যে চারিজন ছাত্রকে বেদ অধ্যয়নের জন্য কাশীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহাদিগকে ফিরাইয়া আনিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে আনন্দচন্দ্রকে "শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন এবং শ্রদ্ধাবান ও নিষ্ঠাবান দেখিয়া 'বেদান্তবাগীশ' উপাধি দিয়া ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্যের পদে" নিযুক্ত করিলেন। এই চারিজন ছাত্রকে কাশীতে প্রেরণ করা ও তাঁহাদের সমুদয় ব্যয়ভার গ্রহণ করা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র দেব মহাশয় দেবেন্দ্রনাথের বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন।

এই সময়ে দেবেন্দ্রনাথ বিষয়-জাল হইতে মুক্তি লাভ করিয়া ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে অধিকতর মনোনিবেশ করিলেন। প্রতিদিন সকালে দুই প্রহর পর্য্যন্ত গভীর দর্শনশাস্ত্রের অধ্যয়নে নিযুক্ত থাকিতেন। তৎপরে আহারান্তে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বেদ, বেদান্ত, মহাভারত প্রভৃতি শাস্ত্রের আলোচনা করিতেন। সন্ধ্যার সময়ে ছাদের উপরে কম্বল পাতিয়া বসিতেন। তখন অনেক অনুরাগী ও জিজ্ঞাসুগণ আসিয়া ঈশ্বর সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আলোচনা করিতেন। এই আলোচনা ও প্রসঙ্গ মধ্যে মধ্যে এমন জমিয়া যাইত যে রাত্রি দুই প্রহরও অতিবাহিত

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৭৬৯ শক পৌষ মাস।

হইত। কাহারও সে জ্ঞান থাকিত না। এই সময়ে তিনি আর এক কঠিন কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। সেই সময়ে বেদের আলোচনা বাঙ্গালা দেশ হইতে প্রায় উঠিয়া গিয়াছিল। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে বেদ বেদান্ত বিশেষরূপে অবগত হইয়া তাহা সাধারণের মধ্যে প্রচার করিবার অভিপ্রায়ে দেবেন্দ্রনাথ চারিজন ছাত্রকে কাশীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহাদের সাহায্যে সর্ব্বপ্রধান ঋগ্বেদের অনুবাদ করিয়া রীতিমত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তিনি কি উদ্দেশ্য লইয়া ও কিপ্রকার ঈশ্বরগত-চিত্ত হইয়া এই কঠিন কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা নিম্নলিখিত কয়েক পংক্তি হইতে আমরা বুঝিতে পারি। "এখন বেদ আলোচনা করিয়া আমার আরও বোধ হইল, ঋষিরা যে কেবল প্রকৃত চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু ও অগ্নিকে উপাসনা করিতেন তাহা নহে। তাঁহারা সেই এক পরমেশ্বরকেই অগ্নি-বায়ুরূপে বহুপ্রকারে উপাসনা করিতেন। তাই ঋগ্বেদে দেখা যায়—'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ'। ঋষিরা সেই এক পরমেশ্বরকে অগ্নি, যম, বায়ুরূপে বহুপ্রকারে বলেন। যজুর্ব্বেদেও আছে—"এষ উহ্যেব সর্ব্বে দেবাঃ।' ইনিই সকল দেবতা। তন্ত্র পুরাণের দেবতা, আর বেদের দেবতা, ইঁহাদের অনেক প্রভেদ। কিন্তু এদেশের সাধারণ লোকদের মধ্যে এ ভেদজ্ঞান নাই। ইহাদের বিশ্বাস যে বেদের মধ্যেই কালী, দুর্গা পূজার বিধি আছে। এই-সকল ভ্রম দূরীকরণের জন্য এবং আমাদের পূর্ব্বকালের আচার ব্যবহার ও ধর্ম্মের ক্রম-অভিব্যক্তি জানিবার জন্য ঋগ্বেদ অনুবাদে প্রবৃত্ত হইলাম। এই ঋগ্বেদের সংহিতাতে দশ সহস্রেরও অধিক ঋক্ আছে সুতরাং ইহা অল্পদিনে ও অল্প পরিশ্রমে সমাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নহে। সম্প্রতি আশাকে অবলম্বন করিয়া এই কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করি-

লাম, ইহার শেষ করিবার ভার পরমেশ্বরের প্রতিই আছে। যিনি তাবৎ শুভাশুভের বিধানকর্ত্তা তাঁহার নিকট হইতে শুভবস্তু প্রার্থনা করা এবং তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা সমুদয় বেদের তাৎপর্য্য হইয়াছে। ইন্দ্রিয়ের অগোচর পরব্রহ্ম যে ক্রমাগত আমাদিগের মঙ্গলবিধান করিতেছেন ইহা সাধারণরূপে প্রত্যক্ষ প্রতীতি করাইবার জন্য সূর্য্য, ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি দেবতাদিগের উপাসনা বেদে বাহুল্যরূপে বিধান হইয়াছে। সূর্য্যের অন্তর্যামী যে কোন পুরুষ তিনি সূর্য্যদেবতা, বায়ুর অন্তর্যামী যে কোন পুরুষ তিনি বায়ুদেবতা, অগ্নির অন্তর্যামী যে কোন পুরুষ তিনি অগ্নিদেবতা, ইহাতে বৈদিকেরা বাহ্য জড় সূর্য্য প্রভৃতিকে উপাসনা করেন না, কিন্তু তাহার অন্তর্যামী যে চৈতন্যপুরুষ তাঁহারই উপাসনা করেন।" এইরূপ ভূমিকা করিয়া ১৭৬৯ শকের ফাল্গুন মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে ঋগ্বেদের অনুবাদ আরম্ভ করিলেন।

প্রায় তিন চারি মাস গত হইল, কিন্তু ঋণ পরিশোধের বিশেষ কিছুই হইল না। তখন তাঁহার মধ্যম সহোদর গিরিন্দ্রনাথ তাঁহার নিকট প্রস্তাব করিলেন "এতদিন চলিয়া গেল কিন্তু ঋণের তো কিছুই পরিশোধ হয় না। কেবল সাহেবেরা বসিয়া মাহিয়ানা খাইতেছে। এ প্রকার ব্যবস্থাতে ঋণ যে পরিশোধ হইবে, তাহা তো আশা করা যায় না। এরূপ করিয়া চলিলে আমাদের ঘরবাড়ী বিক্রয় করিয়াও ঋণ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারিব না। অতএব আমি পাওনাদারদের কমিটিতে এই প্রস্তাব করিতে চাহি যে যদি তাঁহারা সমুদায় কার্য্যের ভার আমাদের হাতে দেন, তবে আমরা আপনারা চেষ্টা করিয়া অল্পব্যয়ে অনতি-দীর্ঘকালে ঋণ পরিশোধের একটা উপায় করিতে পারি।" দেবেন্দ্রনাথ এই প্রস্তাবে

সম্মত হইয়া পাওনাদারদিগের সভাতে ইহা উত্থাপন করিলেন। তাঁহারা পূর্ব্ব হইতে দেবেন্দ্রনাথকে বুঝিতেন, তাঁহারা ইহা স্থিররূপে জানিতেন যে তিনি যাহা কিছু করেন তাহার মধ্যে প্রতারণার ইচ্ছা বা চেষ্টা কিছুমাত্রও নাই। সুতরাং পাওনাদারেরা এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং তাঁহাদের উপর সমস্ত ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। তাহার পর দেবেন্দ্রনাথ নিজের বাড়ীতে আফিস উঠাইয়া আনিয়া একজন সাহেব ও একজন কেরাণী নিযুক্ত করিয়া কাজ চালাইতে লাগিলেন।

এই সময়ে তিনি কি প্রকার ব্যয়সংক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহা শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। সমস্ত গাড়ী ঘোড়া বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন কেবল বাটীর মহিলাদিগের যাতায়াতের জন্য একটিমাত্র পাল্কী রাখিলেন। কখন কখন বাড়ীর মহিলাদিগের নির্ম্মিত দাঁড়া-সেলাই দেওয়া জামা পরিয়া ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা করিতেন এবং উপদেশ প্রদান করিতেন। এই সময়ে তিনি অসাধারণ পরিশ্রম করিতেন—সমস্ত বিষয়কার্য্য পরিচালন, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে ঋগ্বেদের অনুবাদ প্রকাশ, ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা ও বক্তৃতা, বন্ধুদিগের সহিত গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত ঈশ্বরপ্রসঙ্গ ও ধর্ম্মালোচনা। এই প্রকারে তাঁহার দিন চলিতে লাগিল।

এত কঠোর পরিশ্রমের মধ্যে—এই প্রকার পরীক্ষার ভীষণ অনলের মধ্যে বাস করিয়াও তিনি কি প্রকার গভীরভাবে চিন্তা করিতেন ও সাধন ভজন করিতেন তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় আমরা নিম্নলিখিত কয়েক পংক্তি পাঠ করিলে বুঝিতে পারি। তিনি বলিতেছেন—"এতদিন ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্মোপাসনাতে 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।' এই দুই মহাবাক্য ছিল। ইহা অপূর্ণ

ছিল। এখন তাহাতে 'শান্তং শিবমদ্বৈতং' যোগ হওয়ায় তাহা পূর্ণ হইল। সমাজের উপাসনাপ্রণালী প্রথম প্রবর্ত্তিত হইবার তিন বৎসর পরে ১৭৬০ শকে আমি তাহাতে 'শান্তং শিবমদ্বৈতং' যোগ করিয়া দিই। যিনি আত্মার অন্তর্যামী ব্রহ্ম এবং তাহাতে নিয়ত জ্ঞানধর্ম্ম প্রেরণ করিতেছেন তিনি সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। তাঁহাকে অন্তরে উপলব্ধি করি। যখন সেই সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্মকে এই অসীম আকাশস্থিত জগতের শোভা-সৌন্দর্য্যের মধ্যে দেখি, তখন দেখি যে আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি, তিনি আনন্দরূপে অমৃতরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। 'স বাহ্যাভ্যন্তরোহ্যজঃ।' সেই জন্মবিহীন পরমাত্মা বাহিরেও আছেন অন্তরেও আছেন। আবার তিনি 'অনন্তরমবাহ্যং। নিত্যমেবাত্মসংস্থং।' তিনি অন্তরে বাহিরে থাকিয়াও আপনাতে আপনি আছেন এবং আপনার মঙ্গল-ইচ্ছায় নিত্যই জানিতেছেন যে, জ্ঞান, ধর্ম্ম, প্রেম, মঙ্গলে সকলে উন্নত হউক—'তিনি শান্তং শিবমদ্বৈতং'।

একদিকে বিষয় রক্ষার জন্য অসাধারণ পরিশ্রম ও উৎকট চিন্তা, অপরদিকে গভীর অধ্যাত্ম যোগের চেষ্টা ও সাধনতত্ত্বের আলোচনা। একসঙ্গে এই দুই পরস্পর-বিসম্বাদীভাব তাঁহার জীবনকে অধিকার করিয়াছে। সাধারণতঃ সকলের মনে এইপ্রকার ধারণা আছে যে ব্রহ্ম-জ্ঞান ও ব্রহ্মসাধন অতি উচ্চ বস্তু। সাধনভজনের নানাপ্রকার প্রতি-কূল অবস্থায় পরিপূর্ণ সংসারে বাস করিয়া ব্রহ্মসাধনাতে সিদ্ধিলাভ করা যায় না। ইহার মধ্যে যে সত্য আছে, তাহার কোন সংশয় নাই। সংসারক্ষেত্রে থাকিয়া নানাপ্রকার সংগ্রামে লিপ্ত থাকিয়া ব্রহ্মেতে চিত্ত সমাধান করিয়া যোগযুক্ত থাকা যে কত কঠিন, তাহা এই পথের প্রত্যেক পথিক অবগত আছেন। দেবেন্দ্রনাথের জীবন এই

জন্যই অতি অমূল্যরত্ন এবং ইহাই তাঁহার জীবনের বিশেষত্ব। এই কঠোর পরীক্ষার অনলের মধ্যে তিনি নিক্ষিপ্ত হইয়াও কি প্রকার শান্তভাবে উচ্চ সাধনতত্ত্বের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন ও তাহা প্রচার করিয়াছেন, তাহা ভাবিলে অতি আশ্চর্য্য হইতে হয়। তিনি পুনরায় বলিতেছেন—"সাধকদিগের এই তিনস্থানে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিতে হইবে। অন্তরে তাঁহাকে দেখিবেন, বাহিরে তাঁহাকে দেখিবেন এবং আপনাতে আপনি যে আছেন, সেই ব্রহ্মপুরে তাঁহাকে দেখিবেন। যখন তাঁহাকে অন্তরে আমার আত্মাতে দেখি তখন বলি—'তুমি অন্তরতর অন্তরতম, তুমি আমার পিতা, তুমি আমার বন্ধু, তুমি আমার সখা'। যখন তাঁহাকে বাহিরে দেখি তখন বলি—'তব রাজসিংহাসন অসীম আকাশে'। যখন তাঁহাকে তাঁহার আপনাতে দেখি—তাঁহার স্বীয় ধামে সেই পরমসত্যকে দেখি, তখন বলি—'তুমি শান্তং শিবমদ্বৈতং. তুমি শান্তভাবে আপনার মঙ্গল-ইচ্ছা নিত্যই জানিতেছ'। আমরা একই সময়ে সব ভাবিয়া উঠিতে পারি না। কখনো তাঁহাকে আমরা আমাদের অন্তরে ভাবি, কখনো তাঁহাকে আমরা আমাদের বাহিরে ভাবি, কখনও ভাবি যে তিনি আপনাতে আপনি রহিয়াছেন। কিন্তু একই সময়ে সেই অবাত প্রাণিত নিত্য জাগ্রত পুরুষ আপনাতে আপনি শান্তভাবে অবস্থিতি করিয়া আপনার মঙ্গল-ইচ্ছা নিত্যই জানিতেছেন, আমাদের অন্তরে জ্ঞান ধর্ম্ম প্রেরণ করিতেছেন এবং বহির্জ্জগতে জীবের কাম্যবস্তু-সকল বিধান করিতেছেন'। তাঁর যুগযুগ একোবেশ। কে করিবে তাঁহার অপার মহিমা বর্ণন! করিতে যাঁহার স্তুতি, অবসন্ন হয় শ্রুতি, স্মৃতি, দরশন। তাঁহার প্রসাদে আমার এখন এই বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, যে যোগী সেই একই সময়ে তাঁহার এই ত্রিত্ব দেখিতে পান— দেখিতে পান যে, তিনি

আপনাতে আপনি থাকিয়া সকলের অন্তরে আছেন, আপনাতে আপনি থাকিয়া সকলের বাহিরে আছেন, এবং আপনাতে আপনি থাকিয়া আপনার মঙ্গল-ইচ্ছা নিত্যই জানিতেছেন, তিনি পরম যোগী। তিনি তাঁহার প্রেম উপলব্ধি করিয়া আপনার প্রাণ, মন, প্রীতি, ভক্তি সকলি তাঁহাতে অর্পণ করেন এবং অপরাজিত চিত্তে তাঁহার শাসন বহন করিয়া তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করেন। তিনিই ব্রহ্মোপাসক-দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।"

বিংশ অধ্যায়।

বর্দ্ধমান রাজবাটীতে ও কৃষ্ণনগরে ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন।

দেবেন্দ্রনাথ প্রায় প্রত্যেক বৎসর আশ্বিন মাসে ভ্রমণে বহির্গত হইতেন। চিরকাল তিনি প্রকৃতির মধ্যে অনন্তদেবের মহিমা দর্শন করিতে ভাল বাসিতেন। বর্ষার নূতন জলধারা প্রাপ্ত হইয়া বৃক্ষলতাসকল যখন সতেজে বর্দ্ধিত হইয়া শ্যামল বর্ণে বসুন্ধরাকে সুসজ্জিত করিত, তখন তিনি ভ্রমণ করিতে বাহির হইতেন। তাঁহার এই ভ্রমণের আকাঙ্ক্ষা জীবনের শেষ সময় পর্য্যন্ত প্রবল ছিল। পাঠকেরা দেখিতে পাইবেন যখন তিনি ব্যাধিগ্রস্থ হইয়া শয্যাগত হইয়া থাকিতেন, তখনও তাঁহার এই ভ্রমণের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করিবার জন্য তাঁহার বন্ধু বান্ধবদিগকে অনেক ক্লেশ সহ্য করিতে হইত। ইহার জন্য কত সময়ে তাঁহার জীবনসংশয় উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি তাহা একেবারে গ্রাহ্য করিতেন না। যথারীতি এবং স্বেচ্ছাতে তিনি বহুদূরদেশে ভ্রমণ করিতে বাহির হইতেন। ১৭৭০ শকের আশ্বিন মাসে ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয় প্রমুখ কতকগুলি বন্ধুর সমভিব্যাহারে তিনি দামোদর নদীতে বেড়াইতে গেলেন। সাতদিন পরে এক চড়ায় নৌকা লাগাইয়া তিনি ও রাজনারায়ণ বাবু বর্দ্ধমান সহর দেখিতে গেলেন। সহর দেখিয়া নৌকায় ফিরিয়া আসিতে অনেক রাত্রি হইল। রাজনারায়ণ বাবুর অতিরিক্ত পরিশ্রমে জ্বর হইল। পরদিন দেবেন্দ্রনাথ দামোদর নদীতে অবগাহন করিয়া উপাসনান্তে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে বর্দ্ধমানাধিপতির একজন কর্ম্মচারী সেখানে উপস্থিত হইলেন। তিনি

তাঁহাকে বলিলেন "বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে নিতান্ত ইচ্ছুক হইয়া এই গাড়ী পাঠাইয়াছেন। আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করুন।" দেবেন্দ্রনাথ যদিও ধনীর সন্তান ছিলেন তথাপি ধনীদিগের সহিত পরিচিত হইতে তাঁহার একেবারে ইচ্ছা ছিল না। তিনি উত্তর করিলেন "এখন আমি নদী, বন, পাহাড়, পর্ব্বত দেখিতে বাহির হইয়াছি; এখন আমি কোথায় রাজদর্শন করিতে যাইব? আমি এই নদী দিয়া আসিয়াছি, এই নদী দিয়াই ফিরিয়া যাইব। আমি আর ডাঙ্গায় উঠিব না।" সে ব্যক্তি বলিল "আমি আপনাকে লইয়া যাইতে না পারিলে মহারাজের কাছে অত্যন্ত অপরাধী হইব। আপনি আমার প্রতি সদয় হউন। একবার রাজাকে দর্শন দিন। আপনার প্রতি তাঁহার অনুরাগ দেখিলে আপনি অবশ্যই পরিতৃপ্ত হইবেন। আমি আপনাকে না লইয়া যাইব না।" তাঁহার এই প্রকার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে দেবেন্দ্রনাথ অবশেষে সহরে যাইতে বাধ্য হইলেন। সেখানে পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার অবস্থানের জন্য একটি সুন্দর অট্টালিকা প্রস্তুত ছিল। তিনি যখন সেই বাটীতে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহার আহারের জন্য গরুর গাড়ী বোঝাই করিয়া চাউল আটা ঘৃত প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য আসিতে লাগিল। ইহার তাৎপর্য্য জিজ্ঞাসা করাতে রাজকর্ম্মচারী উত্তর করিল "রাজগুরুর জন্য যে প্রকার সিদার বন্দোবস্ত আছে, আপনার জন্যও তাহাই হইল।" এইরূপে তিনি রাজগুরুর সম্মান লাভ করিয়া পরদিন রাজার প্রেরিত গাড়ীতে চড়িয়া রাজবাড়ীতে গমন করিলেন। সেখানে পৌঁছিবামাত্র রাজা মাহাতাবচাঁদ তাঁহাকে ধরিয়া এক উচ্চ আসনে বসাইয়া দিলেন। তাঁহার বিনয়, অনুরাগ এবং সৌজন্য দেখিয়া দেবেন্দ্রনাথের হৃদয় তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইল। তাঁহার সহিত ব্রাহ্ম-

ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইল। এই প্রকারে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি রাজা মহাতাবচাঁদের অনুরাগ বর্দ্ধিত হইল।

দেবেন্দ্রনাথও মধ্যে মধ্যে বর্দ্ধমানে গিয়া তাঁহার সহিত ধর্ম্মালোচনা করিয়া তাঁহার মনে ধর্ম্মভাব উদ্দীপ্ত করিতে লাগিলেন। রাজার জন্মোৎসবে তাঁহার বনভোজনে যখন দেবেন্দ্রনাথ সেখানে গমন করিতেন তখনি তাঁহার সঙ্গে ব্রহ্মোপাসনা করিতেন। ইহাতে রাজার হৃদয় পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। যথার্থই শঙ্কর বলিয়াছেন "ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা, ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা।" একদিন ব্রহ্মোপাসনার পর রাজা এই বলিয়া প্রার্থনা করিলেন—"আমি কি অকৃতজ্ঞ! তিনি আমাকে এত সম্পদ দিয়াছেন আমি তাহার জন্য তাঁহার কাছে যথোচিত কৃতজ্ঞ হই না, তাঁহাকে স্মরণ করি না। কিন্তু কত দীন দরিদ্র তাঁহার নিকট হইতে অতি অল্প পাইয়াও তাঁহার কাছে কতই কৃতজ্ঞ হয় তাঁহাকে পূজা করে। আমি কি অকৃতজ্ঞ! কি অধম!" এই বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

অবশেষে দেবেন্দ্রনাথের পরামর্শে রাজবাড়ীতে এক ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল। ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য পরিচালনের জন্য এবং রাজাকে উপদেশ দিবার জন্য তিনি তিন জন উপাচার্য্যকে বর্দ্ধমানে প্রেরণ করিলেন। এ সম্বন্ধে আমরা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে এই দেখিতে পাই—"পরমানন্দপূর্ব্বক প্রকাশ করা যাইতেছে যে গত ৩০এ আষাঢ় (১৭৭৩ শক) রবিবারে বর্দ্ধমানাধিপতি শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ মহতাবচাঁদ বাহাদুর নিজ বাটীতে এক ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের পক্ষে এই অনুষ্ঠানকে শুভসূচক বলিতে হইবেক। সমাজ-গৃহ উত্তমরূপে সজ্জিত হইয়াছে এবং যাহাতে তাহার কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদিত হয় তাহারও উপায়সমূহ ধার্য্য হইয়াছে।

তদর্থে তিনজন উপাচার্য্য নিযুক্ত হইয়াছেন—শ্রীযুক্ত শ্রীধর বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ তত্ত্ববাগীশ এবং শ্রীযুক্ত তারকনাথ তত্ত্বরত্ন।"

"যদিও মহারাজ স্বয়ং পারিষদ্‌বর্গের সহিত একত্র হইয়া পরব্রহ্মের উপাসনা করণার্থে এই সমাজ সংস্থাপন করিয়াছেন, তথাপি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বা অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের তথায় গমন করিবার নিতান্ত নিষেধ নাই; কেবল প্রথম বারে তাঁহাদিগকে উপাচার্য্যের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবেক। মহারাজের এক সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করিবারও মানস আছে। তাহা হইলে বর্দ্ধমানের সর্ব্বসাধারণ লোকে সমাজস্থ হইয়া পরব্রহ্মের শ্রবণ মনন করিতে পারিবেন। ব্রাহ্মধর্ম্মে তাঁহার শ্রদ্ধা ও যত্ন আছে। ক্রমশঃ উৎসাহ বৃদ্ধি হইলে তাঁহার দ্বারা এ ধর্ম্মের বিশিষ্টরূপ উন্নতি হইতে পারিবে, তাহার সন্দেহ নাই।"

এইরূপে বর্দ্ধমানের রাজবাড়ীতে একমেবাদ্বিতীয়মের পতাকা উড্ডীন হইল। এই সমাজ অনেক বৎসর পর্য্যন্ত চলিয়াছিল, কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইতেছে যে তাহা এখন উঠিয়া গিয়াছে। মহারাজাধিরাজ মহাতাবচাঁদ দেবেন্দ্রনাথের চরিত্রে এমনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে এক দিন তিনি তাঁহাকে বলিলেন—"আপনার কাছে আমার এক প্রার্থনা আছে তাহা আপনাকে পূর্ণ করিতেই হইবে। আপনাকে একটু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া বসিতে হইবে—আপনার একটা ছবি লইব।" তখন একজন ইংরাজ চিত্রকর দ্বারা তাঁহার এক সুন্দর ছবি তুলাইয়া লইলেন।

দেবেন্দ্রনাথের অসাধারণ স্বার্থত্যাগ ও তাঁহার পুণ্যকাহিনী তখন বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। যাঁহারা তাঁহার সাধুতার কথা শুনিয়াছিলেন তাঁহারাই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন একদিন তিনি পথিমধ্যে ভ্রমণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে একজন

লোক তাঁহার হস্তে একখানি পত্র দিল। তিনি তাহা খুলিয়া দেখিলেন পত্রখানি কৃষ্ণনগরের রাজা শ্রীশচন্দ্রের লিখিত। তিনি পরদিন টাউন-হলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিলাষ জ্ঞাপন করিয়া পত্রখানি লিখিয়াছেন। পরদিন দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার সহিত টাউনহলে সাক্ষাৎ করিলেন। সেখানে কেবলই ধর্ম্মালোচনা হইল। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন "এখানে এত অল্পক্ষণ আলাপ করিয়া মনের পরিতৃপ্ত হইল না। আমি এখনও কলিকাতায় তিনচারি দিন আছি, যদি ইহার মধ্যে কোনদিন সন্ধ্যার সময় আমার বাসায় যাইয়া আলাপ করেন তবে বড় সুখী হই।" দেবেন্দ্রনাথ তখন ব্রাহ্মসমাজের নেতা, আর নবদ্বীপাধিপতি শ্রীশচন্দ্র প্রাচীন হিন্দুসমাজের কর্ত্তা। উভয়ের মধ্যে এ প্রকার সম্মিলন আশ্চর্য্যের ব্যাপার সন্দেহ নাই। এই উভয় ব্যক্তির সম্মিলনে কৃষ্ণনগরে এক ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইল। ইহার পর হইতে দেবেন্দ্রনাথ সর্ব্বদাই সেখানে গমন করিতেন। শ্রীশচন্দ্র তাঁহার বক্তৃতাদি পাঠ করিয়া এবং লোকমুখে তাঁহার দেবচরিত্রের কথা শুনিয়া তাঁহার প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। এসম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথ বলিতেছেন—"একদিন সন্ধ্যার সময় আমি তাঁহার সহিত দেখা করিতে তাঁহার বাসাতে গেলাম। আমাকে তিনি তাঁহার দোতলার ছাদের উপর নির্জ্জনে লইয়া গেলেন। সেখানে একটি দীপও নাই। গিয়াই তিনি অমনি মাটিতে বসিয়া পড়িলেন। আমিও তাঁহার সঙ্গে সেখানে মাটিতে বসিলাম। বেশ! ফকিরীভাব হইয়া গেল। তিনি বলিলেন—"একোদেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা। কর্ম্মাধ্যক্ষ্যঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী-চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ।" তাঁহার অমায়িকতা ও সরলতা দেখিয়া তাঁহার সহিত আমার বড়ই সদ্ভাব জন্মিয়া গেল—আমরা এক-হৃদয়

হইয়া গেলাম। বিদায় লইবার সময় তিনি আমাকে বলিলেন যে এবারে কৃষ্ণনগরে যখন যাইবেন, তখন একরাত্রি আমার বাড়ীতে গিয়া থাকিতে হইবে—থাকিবেন কি? আমি বলিলাম যে, ইহা হইতে আহ্লাদ ও সৌভাগ্য আর কি আছে? আমাকে আপনি যখনি ডাকিবেন তখনি যাইব। তাহার পরে আমি কৃষ্ণনগরে গেলে তিনি আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। আমি সন্ধ্যার সময় রাজবাটীতে গেলাম। তিনি আমাকে একটি নিভৃত সুন্দর কুঠরিতে লইয়া বসাইলেন। সেখানে আর কেহ নাই। কেবল তাঁহার পুত্র সতীশচন্দ্র আছেন। আমাদের আমোদের জন্য তাঁহার ধ্রুপদসকল শুনাইলেন। দুইপ্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত গানই চলিল। ষাটপ্রকার ব্যঞ্জন দিয়া আমাকে ভোজন করাইলেন। তাঁহার বাড়ীতে শয়ন করিলাম। খুব ভোরে রাজা আপনি আসিয়া আমাকে জাগাইলেন এবং তাঁহার পূজার বাড়ী দেখাইয়া প্রভাতেই আমাকে বিদায় দিলেন।"

যদিও এক্ষণে দেবেন্দ্রনাথকে বিষয়রক্ষার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল, তথাপি তিনি ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য একদিনের জন্যও অবহেলা করেন নাই। এই সময়ে তিনি কলিকাতার নিকট-বর্ত্তী বেহালা, খিদিরপুর ও ভবানীপুরে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন এবং সেই-সমস্ত সমাজের কার্য্য পরিচালনের বন্দোবস্ত করেন। এতদ্ব্যতীত পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে বর্দ্ধমান ও কৃষ্ণনগরে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়া তিনি নিজে গমন করিতেন এবং উপাসনা ও বক্তৃতা করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে পরিতৃপ্ত করিতেন।

একবিংশ অধ্যায়।

ব্রাহ্ম-ধর্ম্মগ্রন্থ।

অতঃপর দেবেন্দ্রনাথ একটি গুরুতর এবং অত্যাবশ্যকীয় কর্ম্মে মনোযোগী হইলেন। ব্রাহ্মসমাজে এখন অনেক গণ্যমান্য ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যোগদান করিয়াছেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার কলেবর এখন বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক প্রবন্ধসকলে পরিপূর্ণ হইয়া প্রকাশিত হইতে লাগিল। ব্রাহ্মসমাজের প্রতি শিক্ষিতদিগের অনুরাগের সঞ্চার হইল। তাঁহারা ইহার সাপ্তাহিক উপাসনাতে ও বক্তৃতাদিতে আগ্রহের সহিত যোগদান করিতে লাগিলেন। যতই ব্রাহ্মসমাজের সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল ততই দেবেন্দ্রনাথের মনে আনন্দ হইতে লাগিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন ব্রাহ্মদিগের ঐক্যস্থল কোথায়, ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিত্তিভূমি কি। এই চিন্তা ও আলোচনাতে প্রবৃত্ত হইলেন।

তিনি উপনিষদ আলোচনা করিয়া দেখিলেন তাহার মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিত্তিভূমি পাওয়া গেল না। উপনিষদ অদ্বৈতবাদ প্রচার করেন এবং কোন কোন উপনিষদ নির্ব্বাণমুক্তির মত পোষণ করেন। আবার কোন কোন উপনিষদ কতকগুলি কাল্পনিক মতে পূর্ণ। ইহা দেখিয়া তিনি বুঝিলেন উপনিষদকে ব্রাহ্মধর্ম্মের পত্তনভূমি করা যায় না। বেদেও তাহা পাইলেন না। পুরাণ ও তন্ত্রসমূহ আলোচনা করিয়া দেখিলেন সে সকলও নানাপ্রকার বিপরীত মত ও উপদেশসমূহে পরিপূর্ণ। সুতরাং সে-সমস্তও বর্জ্জন করিলেন। তৎপরে উপাসনাদ্বারা ব্রহ্মযোগে যুক্ত হইয়া তিনি বুঝিলেন "আত্ম-

প্রত্যয়সিদ্ধ—জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়ই ব্রাহ্মধর্ম্মের পত্তনভূমি।" এবিষয়ে তাঁহার স্বলিখিত জীবনচরিতে দেখিতে পাই—"পবিত্র হৃদয়েতেই ব্রহ্মের অধিষ্ঠান। পবিত্র হৃদয়ই ব্রাহ্মধর্ম্মের পত্তনভূমি। সেই হৃদয়ের সঙ্গে যেখানে উপনিষদের মিল, উপনিষদের সেই বাক্যই আমরা গ্রহণ করিতে পারি। আর হৃদয়ের সঙ্গে যাহার মিল নাই, সে বাক্য আমরা গ্রহণ করিতে পারি না। সকল শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ যে উপনিষদ তাহার সঙ্গে এখন আমাদের এই সম্বন্ধ হইল। উপনিষদেও আছে "হৃদা মনীষা মনসা ভিক্লপ্তঃ।" হৃদয়ের সহিত নিঃসংশয় বুদ্ধির যোগে মনের আলোচনা দ্বারা ঈশ্বর অভিপ্রকাশিত হয়েন, * * * আমারও হৃদয়ের পরীক্ষার সঙ্গে এই কথার মিল হইল। অতএব আমি এই কথা গ্রহণ করিলাম।"

এইরূপে ব্রাহ্মধর্ম্মের পত্তনভূমি অন্বেষণ করিতে করিতে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের বীজমন্ত্র লাভ করিবার প্রয়াসী হইয়া প্রার্থনাপূর্ণ অন্তরে ভগবানের নিকট হৃদয়ের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দিলেন। অমনি ঈশ্বর-কৃপাতে তাঁহার হৃদয় আলোকিত হইল। সেই আলোকের সাহায্যে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের একটি বীজ দেখিতে পাইয়া একটি পেন্সিল দিয়া কাগজে লিখিলেন এবং তাহা একটা বাক্সে রাখিয়া বন্ধ করিয়া রাখিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ লাভ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন ব্রাহ্মদিগের জন্য একটি ধর্ম্মগ্রন্থ আবশ্যক। তখন তিনি অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়কে কাগজ লইয়া লিখিতে বলিলেন এবং নিজে একাগ্রচিত্ত হইয়া ঈশ্বরের নিকটে হৃদয় পাতিয়া দিলেন। তাঁহার যোগযুক্ত-হৃদয়ে ঈশ্বরের আলোক আসিয়া পতিত হইল এবং সেই আলোকের সাহায্যে উচ্চ আধ্যাত্মিক সত্যসমূহ প্রকাশিত হইতে লাগিল। যাহা প্রকাশিত হইল, তাহা তিনি "উপনিষদের মুখে নদীর স্রোতের ন্যায় সহজে

সতেজে বলিতে” লাগিলেন এবং দত্তমহাশয় তাহা লিখিতে লাগিলেন। এইরূপে “তিনঘণ্টার মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ হইয়া গেল।”

দেবেন্দ্রনাথের জীবনের এই এক চিরস্থায়ী কীর্ত্তি। যখন সংসারের অবস্থাসমূহ দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার প্রতিকূলতাচরণ করিতেছিল, যখন পিতৃঋণ শোধ করিবার জন্য তাঁহাকে অসাধারণ পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল, তখন সেই চিত্তবিক্ষেপকারী অবস্থার মধ্যে তিনি কিপ্রকারে এইরূপ মনঃসংযম করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে তাঁহাকে দেবতা ভিন্ন আর কিছুই মনে হয় না। যাঁহারা এই ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রন্থ মনোনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন ইহার মধ্যে কিপ্রকার গভীর আধ্যাত্মিকতত্ত্বসমূহ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই বৃহৎ এবং গভীর তত্ত্বপূর্ণ গ্রন্থ তিনঘণ্টার মধ্যে লিখিত হইল, অথচ ইহাতে তাঁহার “পরিশ্রমের ঘর্ম্মবিন্দু নাই, কেবলই হৃদয়ের উচ্ছ্বাস।” তিনি বলিতেছেন—“কে আমার হৃদয়ে এই সত্যসকল প্রেরণ করিলেন? “ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ” যিনি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি পুনঃ পুনঃ প্রেরণ করেন, সেই জাগ্রত জীবন্ত দেবতাই আমার হৃদয়ে এই-সকল সত্য প্রেরণ করিলেন। ইহা আমার দুর্ব্বল বুদ্ধির সিদ্ধান্ত নহে, ইহা মোহবাক্যও নহে, প্রলাপবাক্যও নহে। ইহা আমার হৃদয়ে উচ্ছ্বসিত তাঁহারই প্রেরিত সত্য।”

ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ এইরূপে রচিত হইল। তৎপরে তাঁহার মনে হইল ধর্ম্মের মত কেবল স্থির হইলে চলিবে না, কিন্তু ইহার অনুষ্ঠান করা আবশ্যক। কারণ ধর্ম্ম কেবল মতে থাকিলে তাহাতে জীবনে কোন উপকার হয় না। তাহাতে প্রকৃত উপাসনাও হইতে পারে না। ধর্ম্মমত যখন জীবনে অনুষ্ঠিত হয়, তখনই কেবল তাহার দ্বারা চরিত্র উন্নত হয় এবং জীবন ক্রমশঃ উন্নতি হইতে উন্নতির পথে উঠিতে

থাকে। ইহা স্থির করিয়া তিনি পুনরায় মহাভারত, গীতা, মনু প্রভৃতি প্রাচীন শাস্ত্রসমূহ অধ্যয়ন ও আলোচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎপরে 'ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুশাসন' এই নামে ব্রাহ্মধর্ম্মের দ্বিতীয় খণ্ড রচনাতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহাতে তাঁহাকে অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। এই দুইখণ্ড রচনা করিয়া তিনি রীতিমত পত্রিকাতে প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাহাতে ইহার মূল, ভাষ্য এবং অনুবাদ প্রকাশিত হইতে লাগিল। সাধারণ লোকে তখন জানিতে পারিলেন ব্রহ্মধর্ম্ম কি উদার, উচ্চ ও আধ্যাত্মিক।

ব্রাহ্মেরা এই গ্রন্থ লাভ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাতে পূর্ব্বে বেদপাঠ হইত, এখন তাহার স্থানে ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ পঠিত হইতে লাগিল। এই সময়ে ব্রাহ্মসমাজে আর এক নূতন ভাব প্রবেশ করাতে উপাসনা আরও মধুর হইয়া উঠিল। শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয়, দেবেন্দ্রনাথের সহিত ব্রহ্মোপাসনাতে ভক্তি সম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বে অনেক আলোচনা করিয়াছিলেন। তিনি উপাসনাতে কেবল জ্ঞানের আধিক্য দেখিয়া দেবেন্দ্রনাথের সহিত এবিষয়ে আলোচনা করিয়া স্থির করিলেন যে সেই বৎসর সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজের উৎসবের সময় ভক্ত ফেনেলনের প্রার্থনা অনুবাদ করিয়া পাঠ করিতে হইবে। দেবেন্দ্রনাথ ইহাতে সম্মত হইলেন।

সেই বৎসরে ব্রাহ্মসমাজ-গৃহের তেতালা নির্ম্মিত হইয়াছিল। ১১ই মাঘের পূর্ব্বে যাহাতে ঐ কার্য্য সমাপ্ত হয়, তাহার জন্য সকলে উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে তাহাই হইল এবং ১১ই মাঘে ব্রাহ্মেরা সমবেত হইয়া যেপ্রকার উৎসাহ, আনন্দ ও প্রেমে বিগলিত হইয়া উৎসবের কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথ বলিতেছেন—"এই গৃহ সেই ১১ই মাঘেই প্রস্তুত হইল, সমাজগৃহ

নূতন বেশ ধারণ করিল। শ্বেত প্রস্তরের বেদী, তাহার সম্মুখে সুসজ্জিত গীতমঞ্চ, পূর্ব্ব পশ্চিমে ক্রমোন্নত কাষ্ঠাসন—সকলি নূতন, সকলি সুন্দর এবং শুভ্র। ঝাড় লণ্ঠনের আলোকে সমস্ত আলোকিত হইল। আমরা বাড়ীর দল-বল লইয়া সন্ধ্যার সময় সমাজে উপস্থিত হইলাম। সকলের মুখে নূতন উৎসাহ ও নূতন অনুরাগ, সকলেই আনন্দে পূর্ণ। বিষ্ণু সঙ্গীতমঞ্চ হইতে গান ধরিলেন 'পরিপূর্ণমানন্দম্', তাহার পরে ব্রহ্মোপাসনা আরম্ভ হইল। আমরা সকলে মিলিত হইয়া সমস্বরে স্বাধ্যায় পাঠ করিলাম। ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ হইতে শ্লোকের আবৃত্তি হইল। সকলের শেষে শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরি ওঁ বলিয়া উপাসনা সমাপ্ত হইল। সকলে স্তব্ধ হইল, তখন আমি বেদীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রহৃষ্টমনে ভক্তিভরে এই স্তোত্র পাঠ করিলাম।"

এই স্তোত্রটি এত সুন্দর এবং ঈশ্বর-প্রেম উদ্দীপক যে পাঠকেরা তাহা পাঠ করিয়া নিশ্চয়ই আনন্দিত হইবেন। বিশেষতঃ ইহার ভাষা এমন প্রাঞ্জল ও চিত্তাকর্ষক যে প্রায় ৬০ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গভাষা এত উন্নতিলাভ করিয়াছিল, তাহা চিন্তা করিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। ফরাসী দেশীয় ব্রহ্মবাদী মহাত্মা ফেনেলন এই স্তোত্রটি রচনা করিয়াছিলেন ও রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তাহা বঙ্গভাষাতে অনুবাদ করিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ তাহা শুদ্ধ করিয়া ও তাহার মধ্যে মধ্যে উপনিষদের বাক্যসমূহ সংযোগ করিয়া ইহাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়াছিলেন। সেই স্তোত্রটি এই—"হে জগদীশ্বর! সুশোভনদৃশ্য এই বিশ্বতুমি আমাদিগের চতুর্দ্দিকে যে বিস্তার করিয়াছ, তাহার দ্বারা যদ্যপি অধিকাংশ মনুষ্য তোমাকে উপলব্ধি না করে তাহা একারণে নহে যে তুমি আমাদিগের কাহারও নিকট হইতে দূরে রহিয়াছ। যে কোন বস্তু আমরা হস্ত দ্বারা স্পর্শ করি, তাহা হইতেও

আমাদিগের সমীপে তুমি জাজ্বল্যতর আছ; কিন্তু বাহ্যবস্তুতে প্রবৃত্ত ইন্দ্রিয়সকল আমাদিগকে মহামোহে মুগ্ধ করিয়া তোমা হইতে বিমুখ রাখিয়াছে। অন্ধকার-মধ্যে তোমার জ্যোতি প্রকাশ পাইতেছে কিন্তু অন্ধকার তোমাকে জানে না। "তমসি তিষ্ঠন্ তমসোঽন্তরো যং তমো না বেদ।" তুমি যেমন অন্ধকারে আছ, সেইরূপ তুমি তেজেতেও আছ। তুমি বায়ুতে আছ, তুমি শূন্যেতে আছ, তুমি মেঘেতে আছ, তুমি পুষ্পেতে আছ, তুমি গন্ধেতে আছ; হে জগদীশ্বর! তুমি সম্যক্ প্রকারে আপনাকে সর্ব্বত্র প্রকাশ করিতেছ, তুমি তোমার সকল কার্য্যে দীপ্যমান রহিয়াছ। কিন্তু প্রমাদী ও অবিবেকী মনুষ্য তোমাকে একবারও স্মরণ করে না। সকল বিশ্ব তোমাকেই ব্যাখ্যা করিতেছে, তোমার পবিত্র নাম উচ্চৈঃস্বরে পুনঃপুনঃ ধ্বনিত করিতেছে, কিন্তু আমাদিগের এপ্রকার অচেতন স্বভাব যে বিশ্বনিঃসৃত এতদ্রূপ মহান্-নাদের প্রতি আমরা বধির হইয়া রহিয়াছি। তুমি আমাদিগের চতুর্দ্দিকে আছ, তুমি আমাদিগের অন্তরে আছ, কিন্তু আমরা আমা-দিগের অন্তর হইতে দূরে ভ্রমণ করি; স্বীয় আত্মাকে আমরা দর্শন করি না এবং তাহাতে তোমার অধিষ্ঠানকে অনুভব করি না। হে পরমাত্মন! হে জ্যোতি ও সৌন্দর্য্যের অনন্ত উৎস! হে পুরাণ অনাদি অনন্ত, সকল জীবনের জীবন! যাহারা আপনাদিগের অন্তরে তোমাকে অনুসন্ধান করে, তোমাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত তাহাদিগের যত্ন কখন বিফল হয় না। কিন্তু হায় কয় ব্যক্তি তোমাকে অনুসন্ধান করে! যে-সকল বস্তু তুমি আমাদিগকে প্রদান করিয়াছ, তাহারা আমাদিগের মনকে এতদ্রূপ আকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছে যে, প্রদাতার হস্তকে স্মরণ করিতে দেয় না। বিষয়ভোগ হইতে বিরত হইয়া ক্ষণকালের নিমিত্ত তোমাকে যে স্মরণ করে, মন এমত অবকাশ-কাল

পায় না। তোমাকে অবলম্বন করিয়া আমরা জীবিতবান রহিয়াছি। কিন্তু তোমাকে বিস্মৃত হইয়া আমরা জীবন যাপন করিতেছি। হে জগদীশ! তোমার জ্ঞান অভাবে জীবন কি পদার্থ? এ জগৎ কি পদার্থ? এই সংসারের নিরর্থক পদার্থসকল—অস্থায়ী পুষ্প, হ্রসমান স্রোতভঙ্গুর প্রাসাদ, ক্ষয়শীল বর্ণের চিত্র, দীপ্তিমান ধাতুর রাশি আমাদিগের মনে প্রতীতি হয়, আমাদিগের চিত্তকে আকর্ষণ করে, আমরা তাহাদিগকে সুখদায়ক বস্তু জ্ঞান করি, কিন্তু ইহা বিবেচনা করি না যে, তাহারা আমাদিগকে যে সুখ প্রদান করে, তাহা তুমিই তাহাদিগের দ্বারা প্রদান কর। যে সৌন্দর্য্য তুমি তোমার সৃষ্টির উপর বর্ষণ করিয়াছ, সে সৌন্দর্য্য আমাদিগের দৃষ্টি হইতে তোমাকে আবরণ করিয়া রাখিয়াছে। তুমি এতদ্রূপ পরিশুদ্ধ ও মহৎ পদার্থ যে ইন্দ্রিয়ের গম্য নহ, তুমি "সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম" তুমি "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম তথারসন্নিত্যমগন্ধবচ্চ"। এই নিমিত্ত যাহারা পশুবৎ আচরণ করিয়া আপনাদিগের স্বভাবকে অতি জঘন্য করিয়াছে, তাহারা তোমাকে দেখিতে পায় না—হায়! কেহ কেহ তোমার অস্তিত্বের প্রতিও সন্দেহ করে! আমরা কি দুর্ভাগ্য! আমরা সত্যকে ছায়াজ্ঞান করি, আর ছায়াকে সত্যজ্ঞান করি। যাহা কিছুই নহে, তাহা আমাদিগের সর্ব্বস্ব, আর যাহা আমাদিগের সর্ব্বস্ব, তাহা আমাদিগের নিকটে কিছুই নহে। এই বৃথা ও শূন্য পদার্থ-সকল অধস্থায়ী এই অধম মনেরই উপযুক্ত। হে পরমাত্মন! আমি কি দেখিতেছি! তোমাকে যে, সকল বস্তুতে প্রকাশমান দেখিতেছি! যে তোমাকে দেখে নাই, সে কিছুই দেখে নাই, যাহার তোমাতে আস্বাদ নাই, সে কোন বস্তুরই আস্বাদ পায় নাই, তাহার জীবন স্বপ্নস্বরূপ, তাহার অস্তিত্ব বৃথা। আহা! সেই

আত্মা কি অসুখী তোমার জ্ঞান অভাবে যাহার সুহৃৎ নাই, যাহার আশা নাই, যাহার বিশ্রামস্থান নাই। কি সুখী সেই আত্মা যে তোমাকে অনুসন্ধান করে, যে তোমাকে পাইবার নিমিত্ত ব্যাকুল রহিয়াছে। কিন্তু সেই পূর্ণ সুখী যাহার প্রতি তোমার মুখজ্যোতি সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিয়াছ, তোমার হস্ত যাহার অশ্রুসকল মোচন করিয়াছে, তোমার প্রীতিপূর্ণ কৃপাতে তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া যে আপ্তকাম হইয়াছে। হা! কতদিন, আর কতদিন আমি সেই দিনের নিমিত্ত অপেক্ষা করিব, যেদিন তোমার সম্মুখে আমি পরিপূর্ণ আনন্দময় হইব এবং বিমল কামনা-সকল তোমার সহিত উপভোগ করিব। এই আশাতে আমার আত্মা আনন্দ-স্রোতে প্লাবিত হইয়া কহিতেছে যে, হে জগদীশ্বর তোমার সমান আর কে আছে। এই সময় আমার শরীর অবসন্ন হইতেছে, জগৎ লুপ্ত হইতেছে, যখন তোমাকে দেখিতেছি —যিনি আমার জীবনের ঈশ্বর এবং আমার চিরকালের উপজীব্য।"

এই স্তোত্র পাঠের পর দেখা গেল অনেকেই ভাবে মগ্ন হইয়া অশ্রুপাত করিতেছেন। এই দিন ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে এক বিশেষ দিন। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে এই দিন বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে ব্রাহ্মসমাজে ভগবানের পূজা কেবল জ্ঞানের দ্বারা সম্পন্ন হইত। এই দিন হইতে জ্ঞান ও প্রেমের দ্বারা তাঁহার পূজা আরম্ভ হইল। "পূর্ব্বে কেবল কঠোর জ্ঞানাগ্নিতেই ব্রহ্মের হোম হইত। এখন হৃদয়ের প্রেম-পুষ্পে তাঁহার পূজা হইল।"

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

ভ্রমণ ও ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন।

দেবেন্দ্রনাথ বাহিরে একমেবাদ্বিতীয়মের পূজা প্রচার করিতেছেন এবং বাঙ্গালার অনেক স্থানে ব্রহ্মের উপাসনার জন্য মন্দির প্রতিষ্ঠা করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার নিজের বাটীতে তখনও দুর্গাপূজা ও জগদ্ধাত্রী পূজা চলিতেছে। ইহা দেখিয়া তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন কি উপায়ে এই মূর্ত্তিপূজা নিজের বাটী হইতে উঠিয়া যায়। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে বলপূর্ব্বক প্রাচীন সংস্কার অথবা অনুষ্ঠানসমূহ বন্ধ করা দেবেন্দ্রনাথ কখন যুক্তিসঙ্গত মনে করিতেন না। সুতরাং এই প্রতিমাপূজা একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া তাঁহার ভাল বোধ হইল না। ইচ্ছা করিলে তিনি তাহা করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা না করিয়া বিলাতপ্রত্যাগত তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নগেন্দ্রনাথের সহিত এ বিষয়ে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই বিশ্বাস ছিল নগেন্দ্রনাথ এ বিষয়ে তাঁহার সহিত সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে পারেন, কিন্তু তিনি বলিলেন "দুর্গোৎসব আমাদের সমাজ-বন্ধন, বন্ধু-মিলন ও সকলের সঙ্গে সদ্ভাব-স্থাপনের একটি উৎকৃষ্ট ও প্রশস্ত উপায়। ইহার উপরে হস্তক্ষেপ করিলে সকলের মনে আঘাত লাগিবে।" সুতরাং এ বিষয়ে তাঁহার সম্মতি পাইলেন না, কিন্তু তিন ভ্রাতা মিলিত ও একমত হইয়া জগদ্ধাত্রী পূজা বাটী হইতে উঠাইয়া দিলেন। সেই অবধি জগদ্ধাত্রী পূজা তাঁহাদের বাটী হইতে রহিত হইল, কিন্তু দুর্গা পূজা চলিতে লাগিল।

পাঠকেরা জানেন দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রহণের সময় হইতে প্রত্যেক

বৎসর আশ্বিন মাসে ভ্রমণার্থ বহির্গত হইতেন। এ বৎসরও অর্থাৎ ১৭৭১ শকে আশ্বিন মাসে আসাম দর্শন করিবার জন্য বহির্গত হইলেন এবং কামাখ্যার মন্দির দর্শন করিয়া কলিকাতাতে প্রত্যাগমন করিলেন। পরবৎসর তিনি স্থির করিলেন চট্টগ্রাম দর্শন করিবেন। তখন সমুদ্রপথে চট্টগ্রাম যাইতে হইত। তিনি পূর্ব্বে কখনও সমুদ্র দেখেন নাই, সুতরাং সমুদ্র দর্শনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে ধারণ করিয়া দিন যাপন করিতে লাগিলেন। নির্দ্দিষ্ট দিবসে তিনি বহির্গত হইলেন এবং অকূল সমুদ্রবক্ষে ভাসিতে ভাসিতে "তরঙ্গায়িত অনন্ত নীলোজ্জ্বল সমুদ্রে দিন-রাত্রির বিভিন্ন বিচিত্র শোভা দেখিয়া অনন্ত পুরুষের মহিমায় নিমগ্ন" হইলেন। চট্টগ্রাম হইতে মুলমীনে গিয়া সেখানকার একজন গবর্ণমেণ্টের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। তিনি তাঁহাকে সেখানে একটি প্রকাণ্ড ও সুন্দর পর্ব্বতগুহা দেখাইলেন। তৎপরে দেবেন্দ্রনাথ কলিকাতা প্রত্যাগমন করিলেন। সেই বৎসর ফাল্গুন মাসে তিনি কটক যাত্রা করেন এবং তথা হইতে পুরী গমন করিলেন। পুরীতে জগন্নাথের মন্দির দর্শন করিয়া কটকে ফিরিয়া আইসেন। কটকে আসিয়া সংবাদ পাইলেন তাঁহাদের জমিদারীর দেওয়ান রাম চন্দ্র গাঙ্গুলীর মৃত্যু হইয়াছে। সেই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া ১৭৭৩ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসে কলিকাতা ফিরিয়া আসিয়া জমিদারীর নূতন বন্দোবস্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই সময়ে তাঁহার ইচ্ছা হয় যে কয়েক জন যুবককে ব্রাহ্মধর্ম্ম শিক্ষা দিতে হইবে। নিয়মিত সামাজিক উপাসনাতে যোগদান করিলে এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশাদি শ্রবণ করিলে ব্যক্তিগত জীবনে উপকার হয় বটে, কিন্তু বিশেষ ভাবে কোন ব্যক্তিকে রীতিমত ব্রাহ্মধর্ম্ম শিক্ষা দিয়া জীবনে তাহা প্রতিপালন করিবার সুবিধা প্রদান করিলে তাহা

অপেক্ষা অধিকতর উপকার ও মঙ্গল সাধিত হইবার সম্ভাবনা। এই জন্য তিনি ১৭৭৩ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে নিম্নলিখিতরূপে এক বিজ্ঞাপন বাহির করিবার আদেশ প্রদান করেন। "দুইজন ছাত্রকে ব্রাহ্মধর্ম্ম অধ্যয়ন করান যাইবেক, তাঁহারা প্রত্যেকে মাসিক বৃত্তি দশ টাকা করিয়া পাইবেন। যাঁহার বয়ঃক্রম বিংশতি বৎসরের ন্যূন না হয় এবং পঞ্চবিংশতি বৎসরের অধিক না হয় ও ব্যাকরণে বিশেষ ব্যুৎপত্তি থাকে, তিনি এইরূপ ছাত্র হইবার যোগ্য হইবেন। যিনি এইরূপে অধ্যয়ন করিতে প্রার্থনা করেন, তিনি আগামী ১লা শ্রাবণের মধ্যে আমার নিকটে আবেদনপত্র প্রদান করিবেন।"

দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা আদ্যোপান্ত দেখিয়া সংশোধন করিয়া দিতেন এবং তৎপরে তাহা প্রকাশিত হইত। এই সময়ে তিনি আত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপ এবং তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ দার্শনিক ভাবে আলোচনা করিয়া তাহা রীতিমত পত্রিকাতে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। এই সমস্ত প্রবন্ধ "আত্মতত্ত্ববোধ" নামক প্রবন্ধাবলীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইত। এই-সমস্ত পাঠ করিলে সহজেই বুঝা যায় তিনি কোন বিষয়ের আলোচনাতে প্রবৃত্ত হইলে তাহার মধ্যে কেমন গভীর ভাবে প্রবেশ করিতেন। তাঁহার সমস্ত প্রকৃতি, চরিত্র ও জীবন এই গভীরতার বিশেষ পরিচায়ক।

১৭৭৪ শকের ৯ই আষাঢ় তারিখে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী ভবানীপুরে 'জ্ঞানপ্রকাশিকা' নামক এক সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। সুবিখ্যাত শম্ভুনাথ পণ্ডিত, কাশীশ্বর মিত্র, অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায়, গোবিন্দপ্রসাদ পণ্ডিত, শিবচন্দ্র দেব, জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি ভবানীপুরের শিক্ষিত যুবকেরা মিলিত

হইয়া এই সভা প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমে ইহাতে গীতা ও বেদ পাঠ হইত, পরে সঙ্গীত হইয়া ঈশ্বরোপাসনা হইয়া সভার কার্য্য শেষ হইত। এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া ঐ শকের কার্ত্তিক মাসে দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়-কুমার ও কয়েক জন পণ্ডিত সমভিব্যাহারে ঐ সভা দর্শন করিতে গমন করেন। ফিরিয়া আসিবার সময় তিনি সভ্যদিগের নিকট এই প্রস্তাব করেন যে এই সভার কার্য্য ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা প্রভৃতির নিয়মানু-সারে সম্পন্ন করিলে ভাল হয়। তাহাতে অধিকাংশের মতে ঐ প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং তদনুসারে কার্য্য চলিতে থাকে। ইহা হইতে বর্ত্তমান ভবানীপুর আদি ব্রাহ্মসমাজের সূত্রপাত হয়। দেবেন্দ্রনাথ নিজে অনেক সময় ঐ স্থানে আসিয়া উপাসনা করিয়া যাইতেন এবং অন্য সময়ে অন্য কোন উপাচার্য্যকে কলিকাতা হইতে প্রেরণ করিতেন। এই বিষয়ে তাঁহার এরূপ উৎসাহ ছিল যে উপাসনা করিতে যাইবার সময় তিনি পদব্রজে ভবানীপুরে গমন করিতেন। তাঁহার সাংসারিক অবস্থা যখন পুনরায় স্বচ্ছল হইয়াছিল এবং দাস, দাসী, অশ্বশকটে যখন তাঁহার গৃহ পরিপূর্ণ, তখনও তিনি এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিতেন না। বলা বাহুল্য তাঁহার সাহায্যে ও উৎসাহে ভবানীপুরে ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মিত হইল, তাহা এখনও ব্রহ্মের নাম ও মহিমা কীর্ত্তন করিবার জন্য দণ্ডায়-মান রহিয়াছে।

দেবেন্দ্রনাথ এই সময়ে যদিও পিতৃঋণ শোধ করিবার জন্য অবিশ্রান্ত অক্লান্ত দেহ ও মন লইয়া অসাধারণ পরিশ্রম করিতেছিলেন, তথাপি ব্রাহ্মসমাজের সেবার কার্য্য তাহার জন্য বিন্দুমাত্রও ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। ভবানীপুরের ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া জগদ্দলে আর এক মন্দির নির্ম্মা-ণের জন্য তত্রস্থ উৎসাহী ব্যক্তিদিগকে উৎসাহ প্রদান করিতে লাগি-লেন। জগদ্দল একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। উক্ত গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত রাখালদাস

হালদারের বিষয় পাঠকেরা ইতঃপূর্ব্বে শুনিয়াছেন। তিনি একদিন গোরিটির বাগানে উপাসনার পর যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া তাঁহার পিতা আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। উক্ত রাখালদাস হালদার এবং অন্যান্য কয়েকজন যুবক মিলিত হইয়া ১৭৭৪ শক, ২০ আষাঢ় এক ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতি রবিবারে সন্ধ্যার পর তথায় ব্রহ্মোপাসনা হইত। পত্রিকা লিখিতেছেন—"তৎকালে ন্যূনাধিক বিংশতি ব্যক্তি তথায় উপস্থিত থাকিয়া পরব্রহ্মের শ্রবণ মননাদি করিয়া থাকেন। কতকগুলি প্রবীণ মান্য ব্যক্তি তথায় অধিষ্ঠিত হইয়া এ বিষয়ে আপনাদের যত্ন প্রকাশ করিয়া থাকেন। কেবল তিন মাস মাত্র হইল এই সমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে; অবগত হওয়া গেল ইতিমধ্যেই উক্ত গ্রামের কতিপয় ব্যক্তি বিহিত বিধানে ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিবার মানস করিয়াছেন।" এই স্থানে দেবেন্দ্রনাথ গমন করিয়া যুবকদিগকে উৎসাহ প্রদান করিতেন ও ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ দিতেন। এ পর্য্যন্ত তাঁহার যত্নে, সাহায্যে ও উৎসাহে বর্দ্ধমান, কৃষ্ণনগর, বেহালা, ভবানীপুর, জগদ্দল, খিদিরপুর প্রভৃতি স্থানে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই-সমস্ত স্থানে তিনি অনেক সময় নিজে গমন করিতেন অথবা কলিকাতা সমাজ হইতে উপাচার্য্য প্রেরণ করিয়া সমাজের কার্য্যে সাহায্য করিতেন।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

গভীরতার জন্য ব্যাকুলতা।

যখন দেবেন্দ্রনাথ এই প্রকারে ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন ও ব্রাহ্মসমাজের সেবাতে আপনাকে অর্পণ করিয়া কার্য্য করিতেছিলেন, তখন হঠাৎ আর এক বিপদের কৃষ্ণবর্ণ মেঘ তাঁহার মস্তকের উপর আবির্ভূত হইল। তাঁহার পিতৃঋণ অল্পে অল্পে তিনি শোধ করিয়া আসিতেছিলেন, বিশেষতঃ তাঁহার মধ্যম সহোদর গিরীন্দ্রনাথের তীক্ষ্ণ বিষয়বুদ্ধির সাহায্যে এই ঋণ শীঘ্র অনেক পরিমাণে শোধ হইয়া যাইবে, এই আশা করিতেছিলেন, এমন সময়ে ১৭৭৬ শকে গিরীন্দ্রনাথের মৃত্যু হইল। "এতদিনে অনেক ঋণ পরিশোধও হইয়াছে, অনেক অবশিষ্টও আছে। কোন কোন পাওনাদারেরা টাকা পাইবার বিলম্ব আর সহ্য করিতে না পারিয়া নালিশও করিয়াছে এবং ডিক্রীও পাইয়াছে।" এই সময়ে তিনি প্রতিদিন মধ্যাহ্ন ভোজনের পর তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্য পরিদর্শনের জন্য ব্রাহ্মসমাজগৃহের কার্য্যালয়ে থাকিতেন। একদিন আহারের পর সভাতে যাইবার জন্য বাহির হইয়াছেন, এমন সময়ে বাড়ীর লোকেরা বলিল "আজ সভায় যাবেন না, একটা ওয়ারিনের আশঙ্কা আছে।" তিনি তাহা অগ্রাহ্য করিয়া চলিয়া গেলেন। যখন তিনি কার্য্য করিতেছেন, তখন একজন বাঙ্গালী কেরাণী আসিয়া ধীরে ধীরে তাঁহাকে বলিল "আমি আজ আপনাকে বাহির হইতে নিষেধ করিয়াছিলাম, আপনি কেন বাহির হইলেন।" এই বলিয়া সে বেলিফকে বলিল "ইনি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।" তখন সেই বেলিফ ১৪০০০৲ টাকা তখনি দিতে বলিল। দেবেন্দ্রনাথ তখন এত টাকা কোথায় পাইবেন,

সুতরাং তাঁহাকে সেরিফের নিকট লইয়া গেল। এদিকে বাড়ীতে মহা গোলমাল উপস্থিত—দেবেন্দ্রনাথকে ওয়ারেণ্ট দিয়া ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। তখন তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নগেন্দ্রনাথ জজ কলবিনের পরামর্শে জামিন দিয়া তাঁহার মুক্তির ব্যবস্থা করিলেন। তাহা না হইলে হয়ত তাঁহাকে কারাবাস করিতে হইত।

তাঁহার পিতৃব্য শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাশয় এই বিপদের কথা শুনিয়া বলিলেন "দেবেন্দ্র আমাকে কিছুই জিজ্ঞাসা কার না, কিছুই বলে না, আমাকে জানাইলেই তো আমি তার ঋণের সব বন্দো-বস্ত করিয়া দিতে পারি।" এই কথা শুনিয়া পরদিন দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হওয়াতে প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাশয় বলিলেন "দেখ তোমাকে আর কিছুই করিতে হইবে না, তুমি তোমার জমি-দারীর সকল টাকা আমার নিকট জমা দিবে, আমি উপস্থিতমত তোমার দেনা পরিশোধ করিব। কেহ আর তোমাকে উৎপাত করিতে পারিবে না।" প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাশয়ের এই সান্ত্বনা- ও আশ্বাস-বাক্যে দেবেন্দ্রনাথ অতি আনন্দিত হইলেন। যদিও গিরীন্দ্রনাথ পর-লোকে গমন করিয়াছেন তথাপি প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাশয়ের ন্যায় একজন বিচক্ষণ ও প্রবীণ ব্যক্তি এখন হইতে তাঁহার পরামর্শদাতা হই-লেন, ইহাতে তিনি একটু নিশ্চিন্ত হইয়া পুনরায় আপনার কার্য্যে মনো-নিবেশ করিলেন। এই সময়ে দেবেন্দ্রনাথ প্রতিদিন প্রসন্নকুমার ঠাকুরের নিকট গমন করিতেন এবং তাঁহাকে হিসাবপত্র দেখাইতেন ও দেনা পাওনা সম্বন্ধে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। নব বাঁড়ুয্যে নামক এক ব্যক্তি প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাশয়ের নিকট প্রায় সর্ব্বদা থাকিতেন। তিনি তাঁহার সহিত সকল বিষয়ে আলাপ করিতেন, এমন কি বৈষয়িক কার্য্যেও তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। একদিন নব বাঁড়ুয্যে

দেবেন্দ্রনাথকে বলিলেন "তত্ত্ববোধিনী বড় ভাল কাগজ, আমি ইহা প্রতিদিন পড়িয়া থাকি, ইহা পড়িলে জ্ঞান হয়, চৈতন্য হয়।" দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন "এমন কাজ করিও না। তত্ত্ববোধিনী কাগজ পড়িও না।" প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাশয় তাহা শুনিয়া বলিলেন "কেন, তত্ত্ববোধিনী পড়িলে কি হয়?" দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন "আমার যা দশা তাই হয়।" অমনি তিনি বলিলেন "আরে, দেবেন্দ্র কোব্‌লে জবাব দিলে, একেবারে যে কোবলে জবাব দিলে।" এই বলিয়া তিনি হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন "আচ্ছা, ঈশ্বর যে আছেন, তাহা আমাকে বুঝাইয়া দাও দেখি?" অমনি দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন "আচ্ছা ঐ দেওয়ালটা যে আছে, তাহা আমাকে বুঝাইয়া দেন দেখি।" তিনি বলিলেন "আরে, দেওয়াল যে ঐ রহিয়াছে আমি দেখিতেছি, ইহার আর আমি বুঝাইব কি?" দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন 'ঈশ্বর যে সর্ব্বত্র রহিয়াছেন আমি দেখিতেছি, ইহা আর বুঝাইব কি?" তিনি বলিলেন "ঈশ্বর আর দেওয়াল বুঝি সমান হইল? হাঃ দেবেন্দ্র বলে কি?" দেবেন্দ্রনাথ উত্তর করিলেন "এই দেওয়াল হইতেও ঈশ্বর আমার নিকটের বস্তু, তিনি আমার অন্তরে আছেন, আমার আত্মাতে আছেন।" কি জ্বলন্ত বিশ্বাস! এইরূপ বিশ্বাস না হইলে কি মানুষ এরূপ কঠোর পরীক্ষার মধ্যে হিমালয়ের ন্যায় অটলভাবে দণ্ডায়মান হইয়া আপনার সমস্ত কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে?

দেবেন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে আপনার বুদ্ধি ও পরিশ্রমের বলে পিতৃঋণ শোধ করিতে লাগিলেন। বিগত দশ বৎসরে তাঁহার অনেক ঋণ পরিশোধ হইয়াছে বটে, কিন্তু আর একপ্রকার বিপদের ভার তাঁহার উপর পতিত হইল। তাঁহার মধ্যম সহোদর গিরীন্দ্রনাথ যখন জীবিত ছিলেন তখন তিনি নিজের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য অনেক টাকা ঋণ করিয়া

যান। দেবেন্দ্রনাথ পিতৃঋণের সহিত এই ঋণ শোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নগেন্দ্রনাথ আমার অনেক ঋণ করিতে লাগিলেন। নগেন্দ্রনাথ কেবল যে নিজব্যয়ের জন্য এত ঋণ করিতেছিলেন তাহা নয়, কিন্তু তাঁহার হৃদয় এত উন্নত ছিল যে এক সময়ে ঋণ করিয়া একজনকে ১০০০০৲ দশ হাজার টাকা সাহায্য করিয়াছিলেন। এই প্রকার দয়া ও পরদুঃখকাতরতার জন্য তিনি সকলের অতি প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। একদিন একজন উত্তমর্ণ তাঁহাকে ঋণ শোধ করিবার জন্য একটু কঠোর বাক্য প্রয়োগ করাতে তিনি দেবেন্দ্রনাথের নিকট আসিয়া কাঁদিয়া পড়িলেন এবং বলিলেন যে "ঋণদাতাকে আমি যে নোট দিয়াছি, তাহাতে আপনি আমার সহিত স্বাক্ষর না করিলে সে আমাকে ছাড়িতেছে না।" দেবেন্দ্রনাথ মহা সঙ্কটে পড়িলেন। তাঁহার ভ্রাতার দুঃখে হৃদয় বিগলিত হইল। এক পিতৃঋণ পরিশোধ করিবার জন্য তিনি কি প্রকার কষ্টই না সহ্য করিতেছেন, তাহার উপর আবার ঋণ! তিনি বলিলেন "আমার যাহা আছে তাহা তোমাকে দিতে পারি, কিন্তু নোটে কি খতে আমি সহি দিতে পারি না। আমি একে এই উপস্থিত ঋণই পরিশোধ করিতে পারিতেছি না, আমি আবার কোথায় তোমাদের এই নূতন ঋণে আবদ্ধ হইতে যাইব? জানিয়া শুনিয়া আমি আর এই ঋণের পাপানলে ঝাঁপ দিতে পারিব না।" ইহা শুনিয়া নগেন্দ্রনাথ একটা দেওয়ালে ঠেশ দিয়া তিন ঘণ্টা কাঁদিলেন। তাঁহার ক্রন্দনে ভ্রাতৃবৎসল দেবেন্দ্রনাথের বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তাঁহার কোমল হৃদয় আর সহ্য করিতে পারিল না। তিনি বলিলেন "আমাদের গালিমপুরের রেশমের কুঠী ইজারা দিয়া যে টাকা পাওয়া যাইবে এবং আমাদের যত পুস্তক আছে তাহা বিক্রয় করিয়া যত টাকা হইবে সব তুমি লও, আমি দিতেছি,

কিন্তু পরিশোধ করিবার উপায় না জানিয়া আমি ধর্ম্মের বিরুদ্ধে কর্জ্জা নোটে সহি দিতে পারিব না।" ইহাতে নগেন্দ্রনাথ অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া নিজেদের বাড়ী ছাড়িয়া তাঁহার পিতৃব্য রমানাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাড়ীতে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। অবশেষে দেবেন্দ্রনাথ বাধ্য হইয়া তাঁহার আট হাজার টাকার নোটে সহি দিলেন। এই-সমস্ত ঘটনাতে তাঁহার মন অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল। সংসারে থাকিলে নিয়ত এইরূপ ঘটনা ঘটিবে এবং তাহা হইলে তাঁহার জীবনের লক্ষ্যসাধনের অনেক ব্যাঘাত হইবে, এইজন্য তিনি স্থির করিলেন বাটী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন।

এই সময়ে আর এক নূতন ঘটনা ঘটিল। পাঠকেরা জানেন অক্ষয়-কুমার দত্ত জ্ঞান-প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। বিজ্ঞান ও দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন, আলোচনা এবং প্রচার করিয়া তিনি তাঁহার জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। অক্ষয়কুমারের জ্ঞান ও যুক্তির সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রের সমক্ষে যাহা দাঁড়াইতে না পারিত, তাহা তিনি গ্রহণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। যদিও দেবেন্দ্রনাথ অক্ষয়কুমারের সহিত মিলিত হইয়া ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য করিতেছিলেন, তথাপি উভয়ের সাধন, লক্ষ্য ও আদর্শের মধ্যে কিঞ্চিৎ পার্থক্য ছিল, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। অক্ষয়কুমার তাঁহার যুবক বন্ধুদিগকে লইয়া "আত্মীয় সভা" স্থাপন করিলেন। তাহাতে অনেক গভীর বিষয়ের আলোচনা হইত। যখন কোন বিষয়ে তাঁহারা একমত হইতে পারিতেন না, তখন হস্তোত্তলন দ্বারা তাঁহারা মীমাংসা করিতেন। এমন কি ঈশ্বরের স্বরূপও তাঁহারা এই প্রকারে মীমাংসা করিতেন। ইহা দেখিয়া দেবেন্দ্রনাথের স্বাভাবিক মহত্ত্ব- ও গাম্ভীর্য্যপূর্ণ হৃদয় বিচলিত হইল। একে সাধন-বিরোধী সাংসারিক ঘটনার স্রোতসমূহ তাঁহার উপর দিয়া প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছিল,

তাহাতে আবার তাঁহার বন্ধু ও সহচরদিগের ধর্ম্ম ও ঈশ্বর সম্বন্ধে সত্য নির্দ্ধারণ করিবার এই প্রকার হাস্যজনক প্রয়াস—এই-সমস্ত দেখিয়া তিনি স্থির করিলেন আর বাটীতে থাকিয়া বৃথা জীবনকাল অতিবাহিত করিবেন না, আত্মার গভীরতর স্থানে প্রবেশ করিয়া আত্মতত্ত্ব ও ঈশ্বরতত্ত্বের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। এই সময়ের মনের অবস্থা তিনি এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। "হৃদয়ের উচ্ছ্বাস-স্রোতে যে-সকল সত্য ঈশ্বরের প্রসাদে আমার নিকট ভাসিয়া আসিয়াছে, তাহা জ্ঞানালোকে পরীক্ষা করিতে এবং তাহার নিগূঢ় অর্থসকল আবিষ্কার করিয়া তাহা জীবনে পরিণত করিতে দৃঢ় যত্নবান হইলাম।"

"প্রকাশ হলো না যে কোথায় ছিলাম এখানে কেন আইলাম। দুঃখ ও পরিতাপ যে আপনার কাজ আপনি ভুলিয়া রয়েছি। কোথায় ছিলাম, কেন এখানে আইলাম, আবার কোথায় যাইব, অদ্যাপি আমার নিকটে প্রকাশ হইল না। অদ্যাপি এখানে থাকিয়া ব্রহ্মকে যতটা জানা যায়, তাহা আমার জানা হইল না। আর আমি লোকদের সঙ্গে হো হো করিয়া বেড়াইব না, বৃথা কল্পনা করিয়া আর সময় নষ্ট করিব না। একাগ্রচিত্ত হইয়া একান্তে তাঁহার জন্য কঠোর তপস্যা করিব। আমি বাড়ী হইতে চলিয়া যাইব, আর ফিরিব না। এই সময়ে ১৭৭৮ শকের শ্রাবণ মাসে আমি বরাহনগরে শ্রীযুক্ত গোপাললাল ঠাকুরের বাগানে ছিলাম। এখানে শ্রীমদ্ভাগবৎ পড়িতাম। পড়িতে পড়িতে তাহার এই শ্লোকটা আমার মনে লাগিয়া গেল—"আময়ো যশ্চ ভূতানাং জায়তে যেন সুব্রত। তদেব হ্যাময়ং দ্রব্যং ন পুনাতি চিকিৎসিতং। হে সুব্রত! জীবদিগের যে রোগ যে দ্রব্যের দ্বারা জন্মে, সে দ্রব্য কখনও রোগীকে আরাম করিতে

অতএব এ সংসার আর আমাকে এ বিপদ হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না। অতএব এখান হইতে পলাও। সন্ধ্যার সময়ে আমি এই বাগানে গঙ্গাতীরে বন্ধুদিগের সহিত বসিতাম। বর্ষার ঘনমেঘ আমার মাথার উপরে আকাশ দিয়া উড়িয়া উড়িয়া চলিয়া যাইত। সেই নীল নীরদ আমাকে তখন বড়ই সুখ দিত, বড়ই শান্তি দিত, মনে করিতাম ইহারা কেমন কামচার। কেমন মুক্তভাবে যেখানে-সেখানে ইচ্ছামত চলিয়া যাইতেছে। আমি যদি ইহাদের মত কামচর হইতে পারি, ইচ্ছামত যেখানে-সেখানে চলিয়া যাইতে পারি, তবে আমার বড়ই আনন্দ হয়। * * * * যখন শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ভাষ্যে দেখিলাম—'ন ধনেন ন প্রজয়া ন কর্ম্মণা ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্বমানশুঃ' না ধনের দ্বারা, না পুত্রের দ্বারা, না কর্ম্মের দ্বারা, কিন্তু কেবল এক ত্যাগের দ্বারাই সেই অমৃতত্বকে ভোগ করা যায় তখন আর এ পৃথিবী আমার মনকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। সংসারের মোহ-গ্রন্থিসকল আমার ভাঙ্গিয়া গেল। তখন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম, কখন আশ্বিনমাস আসিবে—আমি এখান হইতে পলাইব, সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইব, আর ফিরিব না।

"সপ্তম স্বর্গ হইতে তোমার আহ্বান আসিতেছে, না জানি, এই পৃথিবীর মোহপাশে তোমার কি কাজ আটকাইয়াছে।'

অতুল ঐশ্বর্য্য ও সম্পদের অধীশ্বর প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ-পুত্র দেবেন্দ্রনাথ পূর্ণযৌবনে ধন, মান, সম্ভ্রম, ইন্দ্রিয়সুখ সকলের মস্তকে পদাঘাত করিয়া, সপ্তম স্বর্গের আহ্বানধ্বনি শ্রবণ করিয়া অমৃতের সন্ধানে যোগীঋষিদিগের চিরকাঙ্ক্ষিত নগাধিপতি হিমালয়ের নির্জ্জন প্রদেশে কঠোর তপস্যাতে নিযুক্ত হইবার জন্য সংসার পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন।

চতুর্বিংশ অধ্যায়।

হিমালয় যাত্রা।

১৭৭৮ শকের ১৯শে আশ্বিন বেলা ১১টার সময় গঙ্গায় জোয়ার আসিল, অমনি দেবেন্দ্রনাথ নব উৎসাহে ও নব আনন্দে নৌকাতে আরোহণ করিলেন। বোট চলিতে আরম্ভ করিল, তখন তিনি ঈশ্বরের দিকে চাহিয়া প্রেমিকপ্রবর হাফেজের ভাষাতে বলিলেন—

"আমরা এখন নৌকাতে চলিয়াছি, হে অনুকূল বায়ু! তুমি উঠ। হয়তো আবার আমাদের দর্শনীয় বন্ধুকে দেখিতে পাইব।"

নবদ্বীপ পৌঁছিতে ছয়দিন লাগিল। এখানে অত্যন্ত ঝড় বৃষ্টির জন্য দুইদিন থাকিতে হইল। তৎপরে মুঙ্গেরে পৌঁছিলেন। সেখানে সীতাকুণ্ড দেখিয়া ফতুয়ায় গঙ্গাবক্ষ দিয়া যাইতেছেন, এমন সময়ে ভীষণ ঝড় উঠিল। নৌকা যেন আর কিছুতেই রক্ষা হয় না। সুতরাং নৌকা তীরের নিকটে লইয়া যাওয়া হইল। দেবেন্দ্রনাথ লম্ফপ্রদান করিয়া তীরে উঠিলেন বটে কিন্তু প্রবলবায়ু-তাড়িত বালুকাসকল তাঁহার শরীরে লাগাতে অত্যন্ত কষ্টবোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেদিকে তাঁহার দৃক্‌পাত নাই। বোটের সঙ্গে যে পানসিখানা আহার্য্য বস্তু লইয়া সঙ্গে আসিতেছিল, তাহা জলগর্ভে ডুবিয়া গেল। তিনি তীরে দাঁড়াইয়া সেই মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং পরমেশ্বরের ভীম মহিমা দর্শন করিয়া ধন্য হইতে লাগিলেন। তৎপরে পাটনা ছাড়িয়া ৬ই অগ্রহায়ণে কাশীতে পৌঁছিলেন। সেখানে একটা বাগানের মধ্যে একটা ভগ্ন বাড়ীতে গিয়া আশ্রয় লইলেন। তাহার পরদিন গুরুদাস সিং নামক জনৈক ব্যক্তি অনেক শিষ্টাচারে তাঁহাকে আপ্যায়িত করিয়া সেই

গৃহ তাঁহার বাসোপযোগী করিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। কাশীতে দশদিন থাকিয়া সমস্ত ভৃত্যদিগকে বাড়ী ফিরাইয়া দিলেন, কেবলমাত্র কিশোরীনাথ চাটুর্য্যে ও একজন কৃষ্ণনগরের গোয়ালাকে সঙ্গে করিয়া এক ডাকগাড়ী ভাড়া করিয়া এলাহাবাদে গমন করিলেন। এলাহাবাদে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থান দর্শন করিয়া ২২শে অগ্রহায়ণ আগ্রাতে পৌঁছিলেন। আগ্রার সুবিখ্যাত তাজমহল দেখিয়া অত্যন্ত পুলকিত হইলেন। তৎপরে জলপথে যুমনা নদীর উপর দিয়া দিল্লী যাইবার জন্য এক বজরা ভাড়া করিলেন। বজরা জলপথ দিয়া চলিয়া যাইত, কিন্তু তিনি নিজে যমুনার ধারে ধারে শস্যক্ষেত্রের, গ্রাম ও উদ্যানের মধ্য দিয়া প্রকৃতির সৌন্দর্য্য সম্ভোগ করিতে করিতে অগ্রসর হইতেন। তাহাতে তাঁহার বড়ই শান্তি হইত। কোন কোন দিন পৌষ মাসে যমুনার শীতল জলে অবগাহন করিতেন। ১১ দিন পরে মথুরাতে পৌঁছিলেন। সেখান হইতে বৃন্দাবনে গিয়া লালাবাবুর কীর্ত্তি এবং গোবিন্দজীর মন্দির প্রভৃতি দর্শন করিয়া ২৭শে পৌষ দিল্লীতে পৌঁছিলেন। এখানে সুখানন্দ স্বামীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সুখানন্দ স্বামী বলিলেন তিনি এবং রামমোহন রায় উভয়ে হরিহরানন্দ তীর্থস্বামীর শিষ্য ছিলেন। এখানে শুনিলেন যে তাঁহার ভ্রাতা নগেন্দ্রনাথ তাঁহাকে বাড়ীতে ফিরাইবার জন্য আসিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ না হওয়াতে বিফলমনোরথ হইয়া কলিকাতাতে ফিরিয়া গিয়াছেন। দিল্লীর কুতবমিনার দর্শন করিয়া ডাকের গাড়ী করিয়া অম্বালা পৌঁছিলেন। সেখান হইতে লাহোরে পরে ৪ঠা ফাল্গুন অমৃতসরে পৌঁছিলেন।

অমৃতসরে কিছুকাল অবস্থান করিয়া শিখদিগের মন্দির ও তাহাদের উপাসনা প্রভৃতি দেখিলেন এবং গুরুমুখী ভাষা ও শিখধর্ম্ম শিক্ষা

করিতে লাগিলেন। ক্রমে যখন গ্রীষ্মের উত্তাপ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, তখন তিনি অমৃতসর পরিত্যাগ করিয়া শিমলা পাহাড়ে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। ১৭৭৯ শকের ৯ই বৈশাখ সিমলার অভিমুখে প্রস্থান করিলেন, ১২ই কালকাতে পৌঁছিলেন। সেখান হইতে হিমালয়ের বিচিত্র শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। নূতন উৎসাহে ও নূতন আনন্দে তাঁহার মনপ্রাণ পূর্ণ হইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন "কাল আমি ইহার উপরে উঠিব, **পৃথিবী ছাড়িয়া স্বর্গের প্রথম সোপানে আরোহণ করিব।**" এই আনন্দে সেই রাত্রি অতিবাহিত করিলাম। সুখে নিদ্রা হইল—পথের পরিশ্রম দূর হইল।"

১৬ই বৈশাখ প্রাতঃকালে তিনি পর্ব্বতে আরোহণ করিতে লাগিলেন। পরদিন সন্ধ্যার সময়ে সিমলার বাজারে উপস্থিত হইলেন। সেখানে তখন অনেক বাঙ্গালী কার্য্যোপলক্ষে বাস করিতেন। তাঁহাদের সহিত তাঁহার পরিচয় হইল। প্যারীমোহন বাঁড়ুয্যে নামক একব্যক্তি তাঁহার নিকট প্রায়ই আসিতেন। একদিন তাঁহার সঙ্গে নিম্নে একটি সুন্দর জলপ্রপাত দেখিতে গেলেন। সেখানে একটি শিলাতলে বসিয়া জলক্রীড়া দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু জলপ্রপাতের শীতল জলকণাসমূহ তাঁহার শরীরে লাগাতে তিনি অচেতন হইয়া পড়িলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার চৈতন্য হইল বটে; কিন্তু পরদিনে তাঁহার বামচক্ষুতে অত্যন্ত বেদনা হইল। সেই বেদনা উপশমে তিনি অত্যন্ত প্রসন্নচিত্তে পর্ব্বতে পর্ব্বতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে সিমলাতে গুর্খা সৈন্যদের বিদ্রোহ আশঙ্কা করিয়া তত্রত্য সকলেই ভয়ে ভয়ে বাস করিতেছিলেন। সকলেই প্রাণভয়ে সুবিধামত স্থানে গমন করিতে লাগিলেন। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ এস্থানে

একাকী বিদেশী। তাঁহার সাহায্য করিবার কেহ ছিল না, বিশেষতঃ কোন্ স্থানে গেলে তিনি নিরাপদে বাস করিতে পারিবেন, তাহাও জানিতেন না। অগত্যা করুণাময় পরমেশ্বরের কৃপার উপর নির্ভর করিয়া নির্ভীকচিত্তে বাস করিতে লাগিলেন। কয়েকদিন পরে যখন সিমলা প্রায় জনশূন্য হইল, তখন তিনি ডগসাহী নামক এক পর্ব্বতে চলিয়া গেলেন। সেখানে একটা ভাঙ্গাঘরে বাস করিতে লাগিলেন। যে রাত্রিতে সেখানে উপস্থিত হয়েন, সেই রাত্রিতে বৃষ্টি হওয়াতে ভাঙ্গা ছাদ দিয়া ঘরের মধ্যে জল পড়িয়া তাঁহার ক্লেশ হইতে লাগিল। এইস্থানে প্রায় এগার দিন কাটাইয়া সিমলাতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

ইহার প্রায় এক সপ্তাহ পরে তিনি কিশোরী চাটুর্য্যেকে বলিলেন, "আমি আরও উপরে উঠিব, তুমি তাহার বন্দোবস্ত কর।" বেচারা একেবারে ভয়ে অস্থির। কিন্তু কি করে, বাধ্য হইয়া তাঁহার জন্য সমস্ত আয়োজন করিয়া দিল, কিন্তু তাহার নিজের যাইবার ইচ্ছা ছিল না। দেবেন্দ্রনাথ তাহা জানিতে পারিয়া তাহাকে সেখানে রাখিয়া ঝাঁপানে চড়িয়া একাকী পর্ব্বতে উঠিতে লাগিলেন। ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল হইলে মানুষের প্রাণে যে কি নির্ভীকতা এবং শক্তি আসে, তাহা দেবেন্দ্রনাথের সিমলাবাসের কালে নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে কিছু বুঝিতে পারা যায়। তিনি লিখিতেছেন—"দুই ঘণ্টা চলিয়া একটা পর্ব্বতে যাইয়া দেখি, তাহার পার্শ্বপর্ব্বতে যাইবার সেতু ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, আর চলিবার পথ নাই। ঝাঁপানীরা ঝাঁপান রাখিল। আমায় কি তবে এখান হইতে ফিরিয়া যাইতে হইবে? ঝাঁপানীরা বলিল, 'যদি এই ভাঙ্গা পুলের কার্ণিস দিয়া একা একা চলিয়া এই পুল পার হইতে পারেন, তবে আমরা খালি ঝাঁপান লইয়া খদ দিয়া ওপারে যাইয়া আপনাকে ধরিতে পারি।" যাইবার পথ এইরূপ দুর্গম

ও বিপদজ্জনক। তাহা দেখিয়াও তিনি ভীত বা পশ্চাৎপদ হইলেন না, কারণ বিরহী জীবন তাহার প্রেমাস্পদকে লাভ করিবার জন্য জগতে এমন কি অসাধ্য কাজ আছে যাহা না করিতে পারে? তাহার নিকটে হিমালয় সমতলভূমি হয়, মহাসমুদ্র গোষ্পদের আকার ধারণ করে এবং প্রজ্বলিত হুতাশন সুখস্পর্শ সুশীতল বারির ন্যায় প্রতীয়মান হয়। দেবেন্দ্রনাথ কি করিলেন? "কার্ণিসের উপরে একটি মাত্র পা রাখিবার স্থান, হাতে ধরিবার কোন দিকে কোন অবলম্বন নাই, নীচে ভয়ানক গভীর খদ"—ঈশ্বরপ্রসাদে তাহা তিনি নির্ব্বিঘ্নে পার হইলেন। সেখান হইতে ক্রমে আরো উচ্চ পর্ব্বতে আরোহণ করিতে লাগিলেন। যাঁহারা কখনও পর্ব্বতে আরোহণ করিয়াছেন তাঁহারা জানেন পর্ব্বতে আরোহণ করা কত কষ্টসাধ্য। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ তাহা গ্রাহ্য না করিয়া অক্লান্ত দেহে বেলা দুইপ্রহর পর্য্যন্ত হাঁটিয়া এক শূন্য পান্থশালাতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন তিনি ক্ষুৎপিপাসাতে অত্যন্ত কাতর হইয়াছেন। সঙ্গে কেহ নাই। কেবা রন্ধন করে আর কেবা তাঁহার জন্য একটু জল আনিয়া দেয়। এমন সময়ে একজন ঝাঁপানী তাঁহাকে বলিল "বাবু সাহেব, আপনার তো এইরূপ কষ্ট দেখিতেছি। এখানে নিকটে কোন গ্রাম নাই যে সেখান হইতে আপনার জন্য কিছু আহারসামগ্রী আনিয়া দিই। আপনি যদি আমাদের এই মোটা রুটি খাইতে পারেন, তবে তাহা দিতে পারি।" যাঁহার প্রাণ সেই অমৃত বস্তুর সন্ধানে এত ক্লেশ সহ্য করিয়া এই সুদূর স্থানে আগমন করিয়াছে, তিনি কি আর এখন মোটা সরুর বিচার করিতে পারেন। দেবেন্দ্রনাথ তাহাতেই সম্মত হইলেন এবং ঝাঁপানীদের প্রদত্ত শুষ্ক, মোটা, মক্কা-ও-যব-মিশ্রিত একখানি রুটি আনন্দচিত্তে আহার করিয়া সেইদিন অতি-

বাহিত করিলেন, আর 'রুখা শুখা গমকি টুকরা, লোনা বা আলোনা ক্যা, শির দিয়া তো রোনা ক্যা'—এই কথা বলিয়া কলিকাতা মহানগরীর যোড়াসাঁকোর প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠপুত্র, বিস্তীর্ণ জমীদারী ও বিপুল বিভবের অধিকারী দেবেন্দ্রনাথ আপনার নীরব ধর্ম্মজীবনের গৌরবকাহিনী জগতের সমক্ষে রাখিয়া গেলেন।

সেই রাত্রি সেই পর্ব্বতচূড়াতে অতিবাহিত করিয়া পরদিন নারকাণ্ডাতে উপস্থিত হইলেন। পরদিন প্রাতঃকালে দুগ্ধপান করিয়া পদব্রজে চলিলেন। যাইতে যাইতে পথিমধ্যে অসংখ্য বৃক্ষ ভীষণ দাবানলে দগ্ধ হইয়াছে দেখিলেন। সেস্থান হইতে আরও নিবিড় অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া নানাপ্রকার বৃক্ষ, লতা ও পুষ্পসকলের সৌন্দর্য্য ও তাহার মধ্যে সেই পরমসুন্দরের হস্ত দেখিতে দেখিতে হাফেজের একটি কবিতা উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

সন্ধ্যার সময় সুজ্ঘ্রী নামক এক উচ্চ পর্ব্বতচূড়াতে উপস্থিত হইলেন। সমস্ত দিবস কি প্রকারে চলিয়া গেল তাহা বুঝিতে পারিলেন না। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত রূপরাজ্যের মধ্যে এক অরূপ রূপ সম্ভোগ করিতে করিতে পথক্লেশ ও পথশ্রম সমস্তই বিস্মৃত হইয়া সেই রাত্রি সেস্থানে যাপন করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে এক প্রস্রবণের শীতল জলে স্নান করিয়া উপাসনান্তে কিঞ্চিৎ দুগ্ধপান করিয়া চলিতে আরম্ভ করেন এবং বোয়ালিতে উপস্থিত হইয়া অপরাহ্ণে নগরী নদীতীরে আসিলেন। সেখানে নদীর উপরিস্থিত এক সেতু পার হইয়া পরপারে একটি সুন্দর বাঙ্গালাতে বিশ্রাম করিলেন; পরদিন প্রাতঃকালে পুনরায় পর্ব্বতে আরোহণ করিতে লাগিলেন এবং দারুণ ঘাট নামক এক অত্যুচ্চ পর্ব্বতশিখরে উপস্থিত হইলেন।

২রা আষাঢ় এই পর্ব্বত হইতে আরোহণ করিয়া সিরাহন নামক পর্ব্বতে আসিয়া দুই দিন অবস্থান করেন। পরে ৪ঠা আষাঢ় এখান হইতে অবতরণ করিয়া ১৩ই আষাঢ় নির্ব্বিঘ্নে তাঁহার সিমলার বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই কয়েকদিনের পর্য্যটন তাঁহার জীবনে কি প্রকার ফলপ্রদ হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন—"এই বিংশতি দিবসের পর্ব্বতভ্রমণে ঈশ্বর আমার শরীরকে আধিভৌতিক কত বিপদ হইতে রক্ষা করিলেন, আমার মনকে ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা, বিবেক ও বৈরাগ্যের কত উচ্চশিক্ষা দিলেন, তাঁহার সহবাসসুখে আমার আত্মাকে কত উন্নত ও পবিত্র করিলেন, ইহার জন্য কৃতজ্ঞতা আমার হৃদয়ে ধরিল না: আমি তাঁহাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া ঘরে গিয়া তাঁহার প্রেমগান করিতে লাগিলাম।"

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

হিমালয়ে বাস ও তপস্যা।

একদিন মাঘমাসের শেষে দেবেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচিন্তাতে মগ্ন, এমন সময়ে একজন সম্ভ্রান্ত লোক আসিয়া বলিল "আমি ভজ্জীর রাণার উজীর। রাণা সাহেব আপনাকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য আমাকে পাঠাইয়াছেন, তাঁহার ইচ্ছা যে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। ভজ্জি এখান হইতে অধিক দূর নয়, আর যাহাতে আপনার সেখানে যাইতে কোন কষ্ট না হয়, আমি তাহার উপযুক্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিব।" দেবেন্দ্রনাথ এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন এবং ঝাঁপানে চড়িয়া উপত্য-কায় নামিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার সময় রাণার রাজধানী সোহিনী নগরে প্রবেশ করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে রাজ-গুরুর আশ্রমে গিয়া দেখিলেন তাঁহার পূর্ব্বপরিচিত সুখানন্দ নাথ। তিনি তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া উপরে লইয়া গেলেন এবং তাঁহার আহারের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। পরদিন রাণার সহিত সাক্ষাৎ হইল এবং তাঁহার সহিত অনেক ধর্ম্মালাপ হইল। এইরূপে এইস্থানে তিনি এক সপ্তাহকাল অতিবাহিত করিলেন। পরে রাণা ও রাজগুরুর নিকট বিদায় লইয়া তিনি সিমলা ফিরিয়া আসিলেন। গভীর চিন্তা ও সাধন ভজনের মধ্যে এই স্থানে একবৎসর কাটিয়া গেল।

পর বৎসর বৈশাখ মাসে তাঁহার পুরাতন বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া পর্ব্বতের আরও উচ্চস্থানে এক সুরম্য নির্জ্জন স্থানে একটি বাঙ্গালা ভাড়া লইলেন। এইস্থান তাঁহার অত্যন্ত প্রীতিকর হইয়াছিল। মনের আনন্দে সংসারের সকলপ্রকার চিন্তা দূর করিয়া এইস্থানে তিনি

দিনযাপন করিতে লাগিলেন। কিপ্রকারে তিনি সেখানে বাস করিতেছিলেন, তাহা জানিবার জন্য পাঠকের কৌতূহল হইতে পারে। সেইজন্য তাঁহার বিবৃত আত্মচরিত হইতে কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল। ইহা হইতে পাঠকেরা সহজে বুঝিতে পারিবেন দেবেন্দ্রনাথ প্রাচীনকালের ভারতের ঋষির ন্যায় শমদমাদি সাধনে এবং ব্রহ্ম-যোগে হিমালয়ের নিভৃত প্রদেশে বাস করিয়া অতুলনীয় আধ্যাত্মিক সম্পদে সম্পদবান হইতেছিলেন। "প্রতিদিন প্রাতঃকালেই আমি আনন্দে বহুদূর ভ্রমণ করিয়া আসিতাম এবং পরে চা ও দুগ্ধপান করিতাম। তৎপরে প্রতিদিন দুই প্রহর পর্য্যন্ত আমি দৃঢ় আসনবদ্ধ হইয়া একাগ্রচিত্তে আত্মার মূলতত্ত্বের আলোচনা ও অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত থাকিতাম। দুই প্রহরের সময়ে স্নানে বসিয়া বরফমিশ্রিত জল আপনাপনি মস্তকে ঢালিয়া দিতাম। নিমেষের জন্য আমার হৃদয়ের শোণিত চলা বন্ধ হইত এবং পরক্ষণেই তাহা দ্বিগুণ বেগে চলিয়া আমার শরীরে সমধিক স্ফূর্ত্তি ও তেজের সঞ্চার করিত। পৌষ মাঘ মাসের শীতেতেও আমি গৃহে আগুন জ্বালাইতে দিতাম না। শীত কতদূর সহ্য হয়, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য এবং তিতিক্ষা ও সহিষ্ণুতা অভ্যাস করিবার জন্য, আমি এইরূপ নিয়ম অবলম্বন করিয়াছিলাম। রাত্রিতে আমি আমার শয়নঘরের দরজা খুলিয়া রাখিতাম; রাত্রির সেই শীতের বাতাস আমার বড়ই ভাল লাগিত। আমি কম্বল জড়াইয়া বিছানায় বসিয়া সকল ভুলিয়া অর্দ্ধেক রাত্রি পর্য্যন্ত ব্রহ্মসঙ্গীত ও হাফেজের কবিতা গান করিতাম—"যোগী জাগে—ভোগী রোগী কোথায় জাগে। ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মানন্দ-রসপান, প্রীতি ব্রহ্ম যাঁর সেই জাগে।"

'যে দীপ রাত্রিকে দিন করে, সে দীপ কাহার ঘরে? আমার তো

তাতে প্রাণ দগ্ধ হইল, জিজ্ঞাসা করি তাহা প্রিয় হ'লো কার ?' যে রাত্রিতে তাঁহার ঘনিষ্ঠ সহবাস অনুভব করিতাম, মত্ত হইয়া অতি উচ্চৈঃস্বরে বলিতাম—আজ আমার এ সভাতে দীপ আনিও না। আজিকার রাত্রিতে সেই পূর্ণচন্দ্র আমার বন্ধু এখানে বিরাজমান।"

এইরূপে হিমালয়ের সেই নিভৃত প্রদেশে বাস করিয়া তিনি গভীর হইতে গভীরতর স্থানে অবতরণ করিতে লাগিলেন। নির্জ্জন সাধন ভজনে নিমগ্ন হইয়া যতই সংসারের কোলাহল হইতে তাঁহার অন্তরাত্মা মুক্তিলাভ করিতে লাগিল, ততই সত্যের আলোকে তাঁহার হৃদয় উদ্ভাসিত হইতে লাগিল। সত্যের উজ্জ্বল আলোকে যতই তাঁহার মোহের অন্ধকার বিনষ্ট হইতে লাগিল, ততই তিনি জ্ঞানের গভীরতম সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মহামূল্য জ্ঞানরত্নসমূহ আহরণ করিয়া আত্মাকে অবিনশ্বর জ্ঞানে ভূষিত করিতে লাগিলেন। অনন্ত আকাশের নিম্নে জনকোলাহল-শূন্য হিমালয়ের নিভৃত প্রদেশে, প্রকৃতির বিচিত্র লীলাভূমিতে তিনি দিবানিশি যাপন করিতে করিতে তাঁহার স্বাভাবিক নির্ম্মল হৃদয়াকাশে সেই প্রেমচন্দ্রের প্রকাশ হইতে লাগিল। তাহার স্নিগ্ধ, সুবিমল আলোকে জ্যোৎস্নাবিধৌত গভীর রজনীর নীরবতাজনিত এক সুনির্ম্মলা শান্তির ন্যায় পবিত্র শান্তিতে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইল। এতদিন তিনি সংসারের নানাপ্রকার ঘটনাচক্রে পতিত হইয়া যেপ্রকার অশান্তির জ্বালাময়ী অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছিলেন এবং যাহার শান্তির জন্য তিনি সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া এই বন্ধুবান্ধববিহীন অতি দুর্গম স্থানে আসিয়া বাস করিতে-ছিলেন, সেই অশান্তির অগ্নি চিরদিনের জন্য নির্ব্বাপিত হইল। তিনি এই সময় হইতে তাঁহার হৃদয়ের গভীর স্থানে এমন একটি মনোহর শান্তি-

তাঁহার ভবিষ্যৎ দীর্ঘ জীবনের সকল প্রকার বিপদ ও অশান্তির ক্লেশ নিবারণ করিতেন। আমরা যত তাঁহার জীবন আলোচনা করিতে করিতে অগ্রসর হইব, ততই দেখিব তাঁহার দীর্ঘ জীবনে কত প্রকার পরীক্ষা, বিপদ, উপদ্রব ও অত্যাচার আসিয়াছিল, কিন্তু সকল অবস্থাতে তিনি ইংরাজ কবি গোল্‌ডস্মিথের বর্ণিত সেই পর্ব্বতের ন্যায় নীরবে দণ্ডায়মান থাকিয়া সকল প্রকার ঝঞ্ঝা ঝটিকাকে পরাস্ত করিয়া, গভীর ধর্ম্মলাভজনিত শান্তির গৌরব-মুকুট মস্তকে ধারণ করিয়া, স্তিমিত নেত্রে সেই মঙ্গলময়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অপরাজিত চিত্তে সকল প্রকার ক্লেশ সহ্য করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

তাঁহার হৃদয় যখন এইরূপে শান্তির রাজ্যে বিচরণ করিতে লাগিল, অমনি ধর্ম্মের উচ্চ উচ্চ সত্য-সকল তাঁহার প্রাণকে অধিকার করিল। তিনি সেই-সমস্ত সত্যের সাহায্যে আপনার জীবনের কার্য্য, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পরিষ্কাররূপে হৃদয়ঙ্গম করিলেন। তিনি বুঝিলেন তাঁহার জীবন ঈশ্বরের দাসত্ব করিবার জন্য এ সংসারে প্রেরিত হইয়াছে। বিষয়ের মধ্যে যদিও তিনি জন্মগ্রহণ করিয়া বিষয়ের মধ্যে প্রতিপালিত হইয়াছেন তথাপি বিষয়ের সেবা করা তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু এই অতুল বিষয়ের দ্বারা সেই পরমপুরুষের সেবা করাই তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য। যৌবনে প্রথম পদার্পণ করিবার সময়ে সেই যে অনন্ত দেবের পরিচয় লাভ করিয়া তাঁহাকে জীবনে দর্শন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন সেই একদিন, আর আজ এই হিমগিরির অভ্রভেদী শিখরসমূহের মধ্যে প্রকৃতি দেবীর রম্য বিহার-ভূমির প্রত্যেক পত্র, পুষ্প ও বৃক্ষের অন্তরালে সেই মহিমাময় পুরুষের অস্তিত্ব পরিষ্কাররূপে উপলব্ধি করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন, এই আর একদিন। যে আনন্দ লাভ করিবার জন্য তিনি এতদিন ব্যাকুল

হইয়াছিলেন, সেই আনন্দ এক্ষণে তাঁহার অন্তরের গভীরতম প্রদেশে লাভ করিয়া ধন্য হইলেন। অতি প্রাচীনকালে ঋষিরা ভারতের তপোবনে বসিয়া 'আনন্দাদ্ধেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি' এই যে মহাবাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহার সাক্ষ্য দিবার জন্যই যেন এতদিন পরে দেবেন্দ্র-নাথ হিমালয়ের পবিত্র সাধনক্ষেত্রে যোগাসনে উপবেশন করিয়া গান করিলেন—"যোগী জাগে ভোগী রোগী কোথায় জাগে। ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মানন্দরসপান, প্রীতি ব্রহ্মে যাঁর সেই জাগে।"

হিমালয়ে আসিয়া দেবেন্দ্রনাথ সফলকাম হইলেন। অন্তরের মধ্যে ব্রহ্মদর্শন লাভ করিলেন। বাহিরের ইন্দ্রিয়সমূহ মানবকে জড়রাজ্যে লইয়া যায়, জড়ের সংবাদ প্রদান করে, ইহার অতীত যে চৈতন্য রাজ্য তাহার মধ্যে লইয়া যাইতে পারে না। এই রাজ্যে ভ্রমণ করিতে হইলে, এই রাজ্যের সংবাদ পাইতে হইলে অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্মাদপি পরমসূক্ষ্ম জ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ না করিলে চলে না। মানব যতদিন বাহিরের সাধনের সাহায্যে এই রাজ্যের তত্ত্ব জানিবার জন্য চেষ্টা করিবে, ততদিনই তাহার চেষ্টা ও পরিশ্রম ব্যর্থ হইবে। কিন্তু যখন সে বৈরাগ্য, সংযম ও পবিত্রতা দ্বারা অন্তরিন্দ্রিয়সমূহকে শোধন করিবে, তখন তাহার দিব্যচক্ষু লাভ হইবে এবং তাহারই সাহায্যে অতীন্দ্রিয় রাজ্যের বিচিত্র শোভা ও অনুপম সৌন্দর্য্য দেখিয়া কৃতার্থ হইবে। যিনি বাহিরের রূপময় স্থূল জগতের আকারপ্রকারের মোহ অতিক্রম করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তিনিই কেবল সেই অরূপ রূপের আভাস পাইয়াছেন। যিনি বহির্জগতের কোলাহল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া নির্ব্বাতনিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় স্থির শান্তির রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে সক্ষম হইয়াছেন, তিনিই জানেন "অনাহত শব্দ বাজন্ত ভেরী"

কি বস্তু। দেবেন্দ্রনাথ সেই অতীন্দ্রিয় বস্তুর আস্বাদন কি প্রকারে লাভ করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন—"সম্মুখে যে বৃক্ষ আছে তাহাকে দেখিতেছি ও স্পর্শ করিতেছি, কিন্তু সেই বৃক্ষ যে আকাশে আছে সে আকাশকে আমরা দেখিতেও পাই না, স্পর্শ করিতেও পাই না। কালে কালে বৃক্ষের শাখা হইতেছে, পল্লব হইতেছে, ফুল হইতেছে, ফল হইতেছে; এ সকল দেখিতেছি, কিন্তু তাহার সূত্র সেই কালকে দেখিতে পাই না। বৃক্ষ যে-জীবনীশক্তির প্রভাবে মূল হইতে রস আকর্ষণ করিয়া আপনাকে পুষ্ট করিতেছে, যে-শক্তি তাহার প্রতি-পত্রের শিরায় শিরায় কার্য্য করিতেছে, সেই শক্তির প্রভাব আমরা দেখিতেছি কিন্তু সে শক্তিকে আমরা দেখিতে পাই না। যে বিজ্ঞানবান্ পুরুষের ইচ্ছাতে বৃক্ষ এই জীবনী-শক্তি পাইয়াছে, তিনি তো এই বৃক্ষেও ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছেন কিন্তু আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই না। 'এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়োত্মা ন প্রকাশতে'। 'এই গূঢ় পরমাত্মা সর্ব্বভূতে সকল বস্তুতে আছেন, কিন্তু তিনি প্রকাশিত হন না।' ইন্দ্রিয়-সকল বাহিরের বস্তুকেই দেখে, অন্তরের বস্তুকে দেখিতে পায় না--ধিক্ ইন্দ্রিয়-সকলকে! "পরাঞ্চিখানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূস্তস্মাৎপরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্ কশ্চিদ্ধীর! প্রত্যগাত্মানমৈষৎ আবৃত্ত চক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্"। 'স্বয়ম্ভূ ঈশ্বর ইন্দ্রিয়দিগকে বহির্মুখ করিয়াছেন। সেই হেতু তাহারা বাহিরেই দেখে, অন্তরাত্মাকে দেখে না। কোন ধীর অমৃতত্বকে ইচ্ছা করিয়া, মুদিত চক্ষু হইয়া, সর্ব্বান্তর্গত এক আত্মাকে দেখেন।' এই উপদেশ শ্রবণ করিয়া, মনন করিয়া নিদিধ্যাসন করিয়া এই ব্রহ্মযজ্ঞভূমি হিমালয় পর্ব্বত হইতে আমি ঈশ্বরকে দেখিতে পাইলাম। চর্ম্মচক্ষুতে নয়, কিন্তু জ্ঞানচক্ষুতে। আমার প্রতি উপনিষদের উপদেশ এই—'ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং' ঈশ্বরের দ্বারা এই-সকল আচ্ছাদন কর। আমি

ঈশ্বরের দ্বারা এই-সকল আচ্ছাদন করিলাম। 'বেদাহং এতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ' আমি এই তিমিরাতীত আদিত্যবর্ণ মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি।" তৎপরে হাফেজের কবিতাতে এই কথা উচ্চারণ করিলেন—

'এখন অবধি জ্যোতি আমার হৃদয় হইতে পৃথিবীতে ছড়াইব, যেহেতুক আমি সূর্য্যেতে পঁহুছিয়াছি ও অন্ধকার বিনাশ হইয়াছে।"

দেবেন্দ্রনাথ এইরূপে নির্জ্জন হিমালয়ক্রোড়ে বাস করিয়া পরমানন্দে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। সমস্ত দিন কেবল ব্রহ্মচিন্তা ও ব্রহ্ম-ধ্যান এবং রাত্রিতে কয়েক ঘণ্টা নিদ্রার পর কেবল ব্রহ্মযোগে দিন কাটিতে লাগিল। তাঁহার আর বাহিরের কোন বস্তুর প্রতি দৃষ্টি নাই। বাহিরের অতুল সম্পদ, প্রাণপ্রিয় পুত্র কন্যা ও আত্মীয়স্বজনপরিপূর্ণ বৃহৎ সংসার তাঁহার নিকট হইতে দূরে চলিয়া গিয়াছে। দিগ্‌দর্শন-যন্ত্রের শলাকার ন্যায় তাঁহার দৃষ্টি কেবল ব্রহ্মস্বরূপে সংলগ্ন রহিয়াছে। এই অবস্থায় কখন কখন তিনি এমনি আত্মহারা হইয়া পড়িতেন যে জীবনকে অনেক সময়ে বিপদের মধ্যে ফেলিয়াছেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! এই বিপদের মধ্যেও তিনি ঈশ্বরের নূতন নূতন ভাব দেখিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। ব্রহ্মকে লাভ করিবার জন্য তাঁহার প্রাণের এমনি ব্যাকুলতা হইয়াছিল যে ভয় বলিয়া যে কোন বস্তু আছে, তাহা যেন তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে সিপাহী বিদ্রোহের সময় যখন সকলে আপন আপন প্রাণ রক্ষার জন্য ব্যস্ত, দেবেন্দ্রনাথ তখন সিমলা শৈলে বন্ধুবান্ধববিহীন প্রদেশে একাকী বিহার করিতেছেন। একদিন তিনি বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিলেন যে একটা বনাকীর্ণ পর্ব্বতের মধ্য দিয়া একটা পথ

সঙ্গে কেহ নাই। একাকী অবিরাম চলিতে লাগিলেন। তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, সে দিকে তাঁহার দৃষ্টি নাই। এমনি তন্মনস্ক যে কোথায় যাইতেছেন, কেন যাইতেছেন, সে বিষয়ে কোন জ্ঞান নাই। এমন সময়ে দেখিলেন বিপরীত দিক্ হইতে একজন পথিক আসিতেছে। তিনি বলিতেছেন—"তখন আমার সংজ্ঞা হইল। আমি দেখি যে তখন সন্ধ্যা হইয়াছে, সূর্য্য অস্ত গিয়াছে। আমার তো আবার এতটা পথ ফিরিয়া যাইতে হইবে। আমি দ্রুতবেগে ফিরিলাম। রাত্রিও দ্রুতবেগে আসিয়া আমাকে ধরিল। গিরি, বন, কানন সকলই অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। সেই অন্ধকারে দীপ হইয়া অর্দ্ধচন্দ্র আমার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল। কোন দিকে কোন সাড়া শব্দ নাই। কেবল পায়ের শব্দ পথের শুষ্ক পত্রের উপরে খড় খড় করিতেছে। ভয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে কি এক গম্ভীর ভাব হইল। রোমাঞ্চিত শরীরে সেই বনের মধ্যে ঈশ্বরের চক্ষু দেখিলাম, আমার উপরে তাঁহার অনিমেষ দৃষ্টি রহিয়াছে। সেই চক্ষুই সেই সঙ্কটে আমার নেতা হইল। নানা ভয়ের মধ্যে নির্ভীক হইয়া রাত্রি ৮টার মধ্যে বাসাতে পঁহুছিলাম। তাঁহার এই দৃষ্টি চিরকালের জন্য আমার হৃদয়ে বদ্ধমূল রহিয়াছে। যখনি কোন সঙ্কটে পড়ি, তখনি তাঁহার সেই দৃষ্টি দেখিতে পাই।" বিপদের মধ্যে না পড়িলে বিপদ-ভঞ্জনকে চেনা যায় না। যে ব্যক্তি তাঁহার আহ্বানে পথ চলিতে চলিতে বিপদের মধ্যে পতিত হয়, তাহাকে স্বয়ং তিনি রক্ষা করেন এবং আপনার প্রেমের পরিচয় প্রদান করিয়া এই সংসারে নির্ভীক চিত্তে বিচরণ করিবার শক্তি প্রদান করেন। দেবেন্দ্রনাথ এইরূপে তাঁহার আহ্বান-ধ্বনি শুনিয়া সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া পথের ভিখারী সাজিয়া দেশ দেশান্তরে ফিরিয়াছেন, তাহার পুরস্কারস্বরূপ ব্রহ্মাণ্ডপতি তাঁহার হৃদয়ে

আপনার অনন্ত প্রেমের পরিচয় প্রদান করিয়া চির মঙ্গলের রাজ্যে বিচরণ করিবার শক্তি প্রদান করিয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করিয়াছেন। তাঁহার জীবনে আমরা এই একটি আশ্চর্য্য রহস্য দেখিতে পাই যে তিনি যখনি কোন প্রকার আদেশ আপনার অন্তরের মধ্যে অনুভব করিতেন, তখনি তাহা অবাধে পালন করিতেন। কোন প্রকার ভবিষ্যৎ চিন্তা অথবা সাংসারিক লাভ লোকসানের গণনা তাঁহাকে ভীত বা বিচলিত করিতে পারিত না। এই ভাবটি আমরা তাঁহার সমস্ত জীবনের কার্য্যকলাপের মধ্যে দেখিতে পাই। অতঃপর আমরা একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি যাহা দ্বারা এই সত্যটি অতি পরিষ্কাররূপে প্রমাণিত হইবে।

একদিন ভাদ্রমাসে তিনি সিমলা পাহাড়ের বর্ষাঋতুর মহিমা দর্শন করিতেছেন। ঘন মেঘ ও বিদ্যুতের আবির্ভাবে সমস্ত পর্ব্বত পরিপূর্ণ হইয়া গেল। কখন কখন মুষলধারে বৃষ্টিপতিত হইয়া সমস্ত স্থানকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করিত। দিবসেও সূর্য্যের কিরণ দেখা যাইত না। নদী ও প্রস্রবণসমূহ নূতন বৃষ্টির জলে পরিপূর্ণ হইয়া বিচিত্র শোভা ধারণ করিতেছিল। নদীর জলসমূহ পর্ব্বতের কন্দরে কন্দরে প্রতিধ্বনিত হইয়া সবেগে নিম্নে ধাবিত হইতে লাগিল ও সম্মুখস্থ বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর-খণ্ডসমূহ তাহার স্রোতে প্রবাহিত হইতে লাগিল। প্রকৃতির এই মহা উন্মত্ততার মধ্যে তিনি সেই অনন্তদেবের ভীমমূর্ত্তি দর্শন করিয়া কখন কখন বিস্ময়সাগরে মগ্ন হইয়া স্তব্ধ হইয়া থাকিতেন। একদিন তিনি এইরূপে প্রকৃতির বিচিত্র লীলার মধ্যে মগ্ন হইয়া চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে এক গম্ভীর বাণী হৃদয়ের মধ্যে শ্রবণ করিলেন—"তুমি এ উদ্ধত ভাব পরিত্যাগ করিয়া এই নদীর মত নিম্নগামী হও। তুমি এখানে যে সত্যলাভ করিলে, যে নির্ভর ও নিষ্ঠা

শিক্ষা করিলে, যাও পৃথিবীতে গিয়া তাহা প্রচার কর।" ইহা শুনিয়া তিনি চমকিয়া উঠিলেন। তখন তাঁহার মনের অবস্থা যে কি হইয়াছিল, তাহা তাঁহার নিজের ভাষাতে বর্ণিত হইতেছে—"আমি চমকিয়া উঠিলাম। তবে কি আমাকে এই পুণ্য-ভূমি হিমালয় হইতে ফিরিয়া যাইতে হইবে? আমার তো এ ভাবনা কখনই ছিল না। কত কঠোরতা স্বীকার করিয়া সংসার হইতে উপরত হইয়াছি, আবার সংসারে যাইয়া কি সংসারীদিগের সহিত মিশিতে হইবে? আমার মনের গতি নামিয়া পড়িল। সংসার মনে পড়িল, মনে হইল আবার আমাকে ফিরিয়া বাড়ী যাইতে হইবে, সংসার-কোলাহলে কর্ণ বধির হইয়া যাইবে। এই ভাবনাতে আমার হৃদয় শুষ্ক হইয়া গেল, ম্লান ভাবে বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। রাত্রিতে আমার মুখে কোন গান নাই। ব্যাকুল হৃদয়ে শয়ন করিলাম—ভাল নিদ্রা হইল না। রাত্রি থাকিতে থাকিতে উঠিয়া পড়িলাম, দেখি যে হৃদয় কাঁপিতেছে, বুক জোরে ধড়ধড় করিতেছে। আমার শরীরের এমন অবস্থা পূর্ব্বে কখনই ঘটে নাই। ভয় হইল কোন সাংঘাতিক পীড়াই বা আমার হইল? বেড়াইতে গেলে যদি ভাল হয়, এই মনে করিয়া বেড়াইতে বাহির হইলাম। অনেকটা পথ বেড়াইয়া সূর্য্য উদয় হইলে বাসাতে আসিলাম। তাহাতেও আমার বুকের ধড়ধড়ানি গেল না। তখন কিশোরীকে ডাকিলাম এবং বলিলাম কিশোরী! আমার আর সিমলাতে থাকা হইবে না, ঝাঁপান ঠিক কর। এই কথা বলিতে বলিতে দেখি যে আমার হৃৎকম্প কমিয়া যাইতেছে। তবে এই কি আমার ঔষধ হইল? আমি সেই সমস্ত দিনই বাড়ী যাইবার জন্য স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া উপযুক্ত ব্যবস্থা ও বন্দোবস্ত করিতে লাগিলাম—ইহাতেই আমি আরাম পাইলাম। দেখি যে আমার হৃদয়ের সে ধড়ধড়ানি আর নাই—সব ভাল হইয়া গিয়াছে।

ঈশ্বরের আদেশ বাড়ীতে ফিরিয়া যাওয়া, সে আদেশের বিরুদ্ধে কি মানুষের ইচ্ছা টিকিতে পারে? সে আদেশের বিরুদ্ধে ইচ্ছা করিতে গিয়া প্রকৃতিসুদ্ধ বিরুদ্ধে দাঁড়াইল। এমনি তাঁহার হুকুম। হুকুম অক্ষর সব কোই, বাহার হুকুম না কোই। আর কি আমি সিমলাতে থাকিতে পারি? * * * *

তাঁহার ইচ্ছাতেই আমার কার্য্য। তাঁহার ইচ্ছার সহিত আমার ইচ্ছা মিশাইয়া বাড়ী আসিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। আমার মনে বল আইল। এখনো পথে অনেক ভয় আছে, স্থানে স্থানে এখনো অনেক বিদ্রোহীদল রহিয়াছে। কিন্তু আমি আর সে-সকল ভাবনাকে মনে স্থান দিলাম না। নদী যেমন আপনার বেগমুখে প্রস্তরের বাধা মানে না, আমিও তেমনি আর কোন বাধা মানিলাম না।"

দেবেন্দ্রনাথের জীবনের এই একটি বিশেষত্ব যে তাঁহার শারীরিক যন্ত্র, অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি সকলি যেন তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনের সহিত এক সুরে বাঁধা। মহাপুরুষদিগের জীবনের এই বিশেষত্ব সাধারণের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রত্যেক মানুষই কত শবদেহ প্রতিদিন দেখিতেছে। কিন্তু তাহাদের মনে যুবক শাক্যসিংহের ন্যায় তো তেমন তীব্র বৈরাগ্য আসিতেছে না! শাক্যসিংহ একদিন একটি মাত্র শবদেহ দর্শন করিয়া এমনি অস্থির ও ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন যে অত বড় রাজত্ব, ঐশ্বর্য্য ও সাংসারিক সম্পদ তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিল না। রাজপুত্র হইয়া ভিখারীর সন্তানের ন্যায় দেশে বিদেশে ফিরিয়া বেড়াইলেন। কত লোকে তো প্রতিদিন অন্তরের মধ্যে বিধাতার আদেশ-বাণী শ্রবণ করিতেছে এবং অনেক স্থানে তাহা অনায়াসে অগ্রাহ্য করিয়াও মনের সুখে সংসারে দিনাতিপাত করিতেছে, কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ সেই বাণী শ্রবণ করিয়া এমনি অস্থির হইয়া পড়িলেন

যে তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া তাঁহার সাধ্যাতীত হইয়া উঠিল, তিনি পরিষ্কাররূপে বুঝিলেন যে ইহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া আর মৃত্যুকে ইচ্ছা করিয়া বরণ করা একই কথা। অন্তরের মধ্যে সত্য দর্শন করা এবং তাহা প্রতিপালন না করা, সাধারণের পক্ষে সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু মহাপুরুষদিগের পক্ষে তাহা অসম্ভব।

দেবেন্দ্রনাথ এইরূপে হিমালয়ের নির্জ্জন মনোরম প্রদেশে প্রায় দুই বৎসরকাল ধ্যান, যোগ ও সমাধিতে অতিবাহিত করিয়া স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সেই দিন ১লা কার্ত্তিক বিজয়া-দশমী। তাঁহার জন্য ঝাঁপান, দোলা ও অশ্ব সকলি প্রস্তুত হইল। তাঁহার সিমলার বাঙ্গালী বন্ধুগণ সমবেত হইলেন। যাঁহার সহিত তাঁহারা বহু দিবস ঈশ্বরপ্রসঙ্গে ও ঈশ্বর-উপাসনাতে যাপন করিয়াছেন, আজ তাঁহাদের হৃদয় বিষাদ-অন্ধকারে আচ্ছন্ন। এ প্রকার সাধুসহবাস সহজে পাওয়া যায় না। সুতরাং তাঁহারা যে দেবেন্দ্রনাথের সিমলা পরিত্যাগে অত্যন্ত দুঃখ পাইবেন, তাহা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। যাহা হউক তাঁহারা আজ বিজয়া-দশমীতে দেবেন্দ্রনাথকে বিসর্জ্জন দিবার জন্য সমবেত হইলেন। তিনিও সকলের নিকট হইতে বিদায় লইয়া স্বদেশাভিমুখে রওয়ানা হইলেন। এই সময়ে সিপাহীরা বিদ্রোহী হইয়া দেশের মধ্যে ভয়ানক অরাজকতা ও অশান্তি উৎপন্ন করিয়াছিল। সিমলাতে অবস্থান-কালে দেবেন্দ্রনাথ বাটী হইতে অনেক পত্র পাইয়াছিলেন। সকলে তাঁহাকে কলিকাতা ফিরিয়া আসিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ যে-ধনলাভের জন্য এত ব্যাকুল হইয়াছিলেন, এবং যাহার জন্য তিনি সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া এত দূরে অবস্থান করিতেছিলেন, তাহা লাভ না করিয়া কেমন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন, সুতরাং বিদ্রোহীর ভয় অথবা অন্য কোন আশঙ্কা তাঁহার মনকে বিচলিত করিতে

সমর্থ হয় নাই। এপর্য্যন্ত দেশে ফিরিয়া আসিবার চিন্তা তাঁহার মনে একেবারে স্থান পায় নাই। কিন্তু যখন তাঁহার কামনা পূর্ণ হইল, যখন ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ হইল তখন তিনি সিমলাতে অবস্থান করিবার আবশ্যক বোধ করিলেন না, তখন স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। তখনও বিদ্রোহীদিগের ভয়ে লোকে অত্যন্ত ভীত হইত। কোন যাত্রীর উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে ভ্রমণ করিবার সময়ে তাহার সঙ্গে সঙ্গে রাত্রিতে গবর্ণমেণ্ট-নিযুক্ত পাহারাওয়ালা ছুটিত। দেবেন্দ্রনাথ এই সময়ে বহুদিনের পর সিমলা হইতে ১৭৮০ শকের ১লা অগ্রহায়ণ কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

বিধবা বিবাহের আন্দোলন।

দেবেন্দ্রনাথ সিমলা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া নবজীবন লইয়া নবোৎসাহে ব্রাহ্মসমাজের সেবাতে আপনাকে নিযুক্ত করিলেন। তাঁহার অনুপস্থিতিকালে অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজনারায়ণ বসু, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি মহোদয়গণ বহুযত্নে ও বহু পরিশ্রমে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদন, এবং ব্রাহ্মসমাজের সমস্ত কার্য্য পরিচালন করিতেছিলেন। এই সময়ে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে যে-সমস্ত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, এবং উক্ত যুবকগণ কি ভাবে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য পরিচালন করিতেছিলেন, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস এই অধ্যায়ে লক্ষিত হইবে।

"১৭৭৯ শকে ভবানীপুরস্থ শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তি বাল্যকালে ভ্রমবশতঃ খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন এক্ষণে তদ্ধর্ম্মের কাল্পনিকতা প্রত্যক্ষ করিয়া পুনর্ব্বার হিন্দু হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বনের প্রার্থনায় যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রকটিত হইল।" এই বিজ্ঞাপন ১৭৭৯ শকের বৈশাখের পত্রিকাতে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে, সে সময়ে খৃষ্ট প্রচারকগণ অতি প্রবল ভাবে আপনাদের ধর্ম্ম এদেশে প্রচার করিতেছিলেন অন্যান্য অনেক শিক্ষিত যুবকের ন্যায় শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়ও খৃষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। কিন্তু পরে তিনি যতই এই ধর্ম্মের মত ও বিশ্বাসগুলি আলোচনা করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার এই ধর্ম্মের প্রতি উদাসীনতা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অবশেষে তিনি আর এই ধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত থাকিতে না পারিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার জন্য

'পত্রিকার' সম্পাদককে ইংরাজীতে এক পত্র লিখিয়াছিলেন। এই পত্র পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার কোন কোন অংশ এস্থানে অনুবাদ করিয়া দেওয়া গেল। "১৮৫৫ খৃঃঅব্দে মার্চ্চ মাসে আমার বয়স যখন ষোল বৎসর, তখন আমি খৃষ্ট-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলাম। কিন্তু পরে আমি চিন্তা ও আলোচনা করিয়া দেখিলাম যে ইহার কতক-গুলি মত যুক্তি-ও-জ্ঞান-বিরুদ্ধ। সেইজন্য আমি সাধারণের নিকট ইহা জ্ঞাপন করিতেছি যে এই ধর্ম্মে আমার বিশ্বাস চলিয়া গিয়াছে। আরও আমি ব্রাহ্ম ধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়া উচিত বিবেচনা করিয়া আপনাকে এই পত্র লিখিয়াছি, অনুগ্রহ করিয়া আমার পত্রখানি আপনার সুবিখ্যাত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।"

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা এই সময়ে শিক্ষিতদিগের অতি আদরের বস্তু ছিল। কলিকাতার সুবিখ্যাত শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ইহাতে আপনাদের মতামত প্রকাশ করিতেন এবং যাহা কিছু অন্যায় ও যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া মনে করিতেন, তাহা প্রকাশ করিয়া সকলের মনে যুক্তি-ও-জ্ঞান-সম্মত মতসকল যাহাতে প্রবেশ লাভ করে তাহার চেষ্টা করিতেন। দেবেন্দ্র-নাথ যখন সিমলা শৈলে সাধন ভজনে নিযুক্ত ছিলেন, তখন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাজনারায়ণ বসু প্রমুখ কৃতবিদ্য যুবকগণ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা পরিচালনে যথাসাধ্য সাহায্য করিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় 'বিধবা বিবাহ উচিত কি না' এ বিষয়ে অনেকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তিনি বহু শাস্ত্র হইতে ইহার সম্বন্ধে শ্লোকসমূহ উদ্ধৃত করিয়া প্রকাশ করেন। ইহা ব্যতীত তিনি আপনার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সাহায্যে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধ যুক্তিগুলি খণ্ড খণ্ড করিয়া প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ইহাতে দেশের জ্ঞানী ও শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন এই ভয়ঙ্কর অমানুষিক

সামাজিক প্রথা বিনষ্ট হওয়া ভাল। এ বিষয়ে অক্ষয়কুমার দত্তও আপনার লেখনীকে পরিচালন করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যথেষ্ট সাহায্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার লেখনীবিনিঃসৃত অগ্নিময়ী ভাষা কি প্রকারে বিধবা বিবাহের সমর্থনে নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহার একটি দৃষ্টান্ত এস্থলে উল্লেখ করা গেল। তিনি লিখিতেছেন—

"যাঁহাদের দুঃখ দেখিয়া দয়ার উদ্রেক হয় না, পাতক দেখিয়া অশ্রদ্ধার আবির্ভাব হয় না, এ বিষয়ে তাঁহাদের পরামর্শ জিজ্ঞাসার প্রয়োজন নাই। যাঁহার কিছুমাত্রও হিতাহিত বোধ আছে এবং যাঁহার হৃদয়ে কস্মিন্ কালে কারুণ্য রসের সঞ্চার হয়, তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করি 'বিধবা বিবাহ প্রচলন উচিত কি না'? যিনি কোন নববিধবা তরুণী স্ত্রীকে সদ্যোমৃত প্রিয় পতির শোক-মোহে মুহ্যমানা, ধরাতলে লুণ্ঠমানা ও অহর্নিশ রোরুদ্যমানা দর্শন করিয়া কাতর হইয়াছেন, তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করি 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না'? যিনি দেখিয়াছেন যে সাধ্বী রমণী মাসদ্বয় পূর্ব্বে স্বামী-সমাদরে মানিনী গৌরবিনী বলিয়া স্ত্রীজনের নিকট প্রসিদ্ধ ছিল, সেই স্ত্রী মাসদ্বয় পরে একান্ত অনাথা ও নিতান্ত সহায়-হীনা হইয়া দীনভাবে শীর্ণ শরীরে, সাশ্রু নয়নে দিনপাত করিতেছে, এবং স্বামী-সম্পর্কীয় বিদ্বেষিণী রমণীগণ কর্ত্তৃক নানাপ্রকার নিগৃহীত ও পরিবারস্থ দাসদাসীগণ কর্ত্তৃক উপেক্ষিত ও অশ্রদ্ধিত হইয়া কাতরস্বরে প্রতিবেশীদিগের দয়ার্দ্র হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছে, তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করি 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না?' যে রূপবান্ যুবাপুরুষ প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী, নানাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত লোকজন দাস দাসীতে পরিবেষ্টিত, গৃহমধ্যে উৎসব-ব্যাপারে সতত ব্যাপৃত, সেই ব্যক্তিকে যিনি অতিবালবিধবা অনাথা দুহিতার [illegible]

সহসা স্মরণ করিয়া অকস্মাৎ অবসন্ন হইতে এবং চিরপ্রদীপ্ত সুদারুণ শোকশিখা-সদৃশ ভয়ঙ্কর দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে দৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করি বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না?' যিনি দেখিয়াছেন যে পবিত্রকুলে কোন কালে কলঙ্ক-স্পর্শের বাষ্পও শ্রুত হয় নাই, সেই কুলের কোন যুবতী স্ত্রী অসহ্য বৈধব্য যন্ত্রণা সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া পিতৃ-কুল, মাতৃ-কুল ও ভর্তৃ-কুল চিরকালের মত কলঙ্কিত করিয়াছে এবং ভ্রূণবধ-জনিত অশুদ্ধ শোণিতসংস্পর্শে লোকমাতা বসুন্ধরাকে বারম্বার অশৌচ-গ্রস্ত করিয়াছে, তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করি 'বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না?' কোন পতিবিহীন পীড়িতা স্ত্রী তিথিবিশেষে পথ্যাভাবে নিতান্ত নির্জীব হইল, তথাপি কেহ কণামাত্র আহার-সামগ্রী অর্পণ করিল না! জলতৃষ্ণায় তালু ও কণ্ঠ পরিশুষ্ক হইয়া, দুই চক্ষু স্থিরীকৃত করিয়া প্রাণত্যাগ করিল, তথাপি কেহ জলবিন্দু প্রদান করিল না, এই হৃদয়-বিদারক ব্যাপার যিনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করি 'বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না?'

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকাতে এইরূপে বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে ক্রমাগত আলোচনা চলিতে লাগিল। তাহার ফলে কলিকাতাতে ও পল্লীগ্রামে পর্য্যন্ত বিধবা বিবাহের সূত্রপাত হইল। এ সম্বন্ধে পত্রিকা লিখিতেছেন :*— "কি আহ্লাদের বিষয়! গত ১২ ও ২৮ আষাঢ় হুগলি জেলার অন্তঃপাতী রামজীবনপুর নামক প্রসিদ্ধ গ্রামে দুইটি বিধবা বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে কলিকাতা নগরে

---

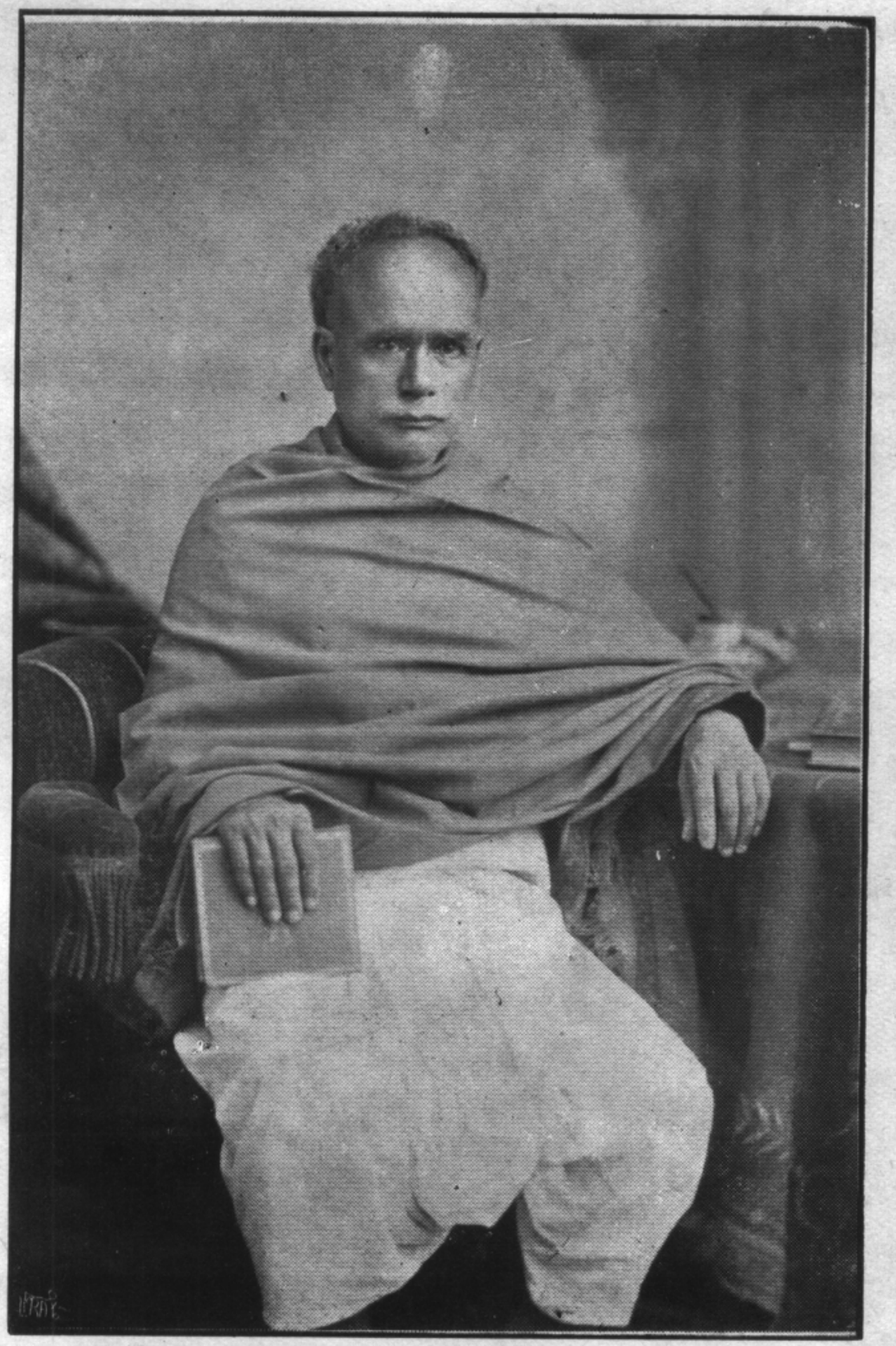
* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৭৮০ শক শ্রাবণ মাস।

ক্রমে ক্রমে পাঁচটি বিধবার উদ্বাহব্যাপার নির্ব্বাহ হইয়াছিল। পল্লীগ্রামে রীতিমত বিধবা-বিবাহের এই সূত্রপাত হইল। * * *

* * * * * *

যাহা হউক রামজীবনপুরে যে প্রণালীতে বিধবা বিবাহের শুভ সূত্রপাত হইয়াছে তাহাতে এরূপ প্রত্যাশা করা যাইতে পারে ঐ গ্রামে ও তৎসন্নিহিত গ্রামসমূহে এই মঙ্গলকর ব্যাপার অনায়াসে প্রচলিত হইতে পারিবেক। প্রথম বিবাহ-দিবসে ব্রাহ্মণ কায়স্থ নবশাক প্রভৃতি প্রায় দুই সহস্রের অধিক লোক নিমন্ত্রিত ও সভাস্থ হইয়া যথাবিধানে কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। বর ও কন্যা উভয় পক্ষীয় জাতি জ্ঞাতি ও কুটুম্ব বিবাহের পর উভয় পক্ষের আবাসেই আহার ব্যবহারাদি করিয়াছেন। উভয় পক্ষীয় কর্ত্তৃপক্ষের অভিমতে বিবাহ হইয়াছে এবং বিবাহ দিয়া বর কন্যা রীতিমত গৃহে পরিগৃহীত হইয়াছে। যাহার যে কুলপুরোহিত তিনিই পৌরোহিত্য করিয়াছেন। এই অভাবনীয় ব্যাপার সন্দর্শনার্থ বহু সহস্র লোক রামজীবনপুরে সমবেত হইয়াছিল।”

এই বৃত্তান্ত হইতে দেখা যাইতেছে যে সেই সময়ে বিধবা-বিবাহ প্রথা ধীরে ধীরে সমাজের মধ্যে প্রবেশলাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। এই পত্রিকাতে আরও দেখিতে পাওয়া যায় যে বিদ্যাসাগর মহাশয় এতদিন তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যরূপে ইহার কার্য্য পরিচালন করিতেন ও পত্রিকাতে রীতিমত প্রবন্ধাদি লিখিয়া পত্রিকার শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিতেছিলেন। এখন হইতে তিনি তত্ত্ববোধিনী সভার সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন। এ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন পত্রিকাতে দেখিতে পাওয়া যায়। “তত্ত্ববোধিনী সভার সম্পাদক পরিবর্ত্তন হইয়াছে, এ নিমিত্ত সকলকে জানান যাইতেছে যে অতঃপর যাঁহাদের সভায়



পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

কোন পত্র লিখিবার প্রয়োজন হইবেক, তাঁহারা নিম্নলিখিত প্রকারে শিরোনাম দিয়া লিখিবেন। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, তত্ত্ববোধিনী সভার সম্পাদক, কলিকাতা।"

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

সাম্বৎসরিক উৎসব।

দেবেন্দ্রনাথ হিমালয় হইতে কলিকাতাতে প্রত্যাগমনের পর যে-সমস্ত যুবক তাঁহার দক্ষিণ ও বাম হস্তস্বরূপ দণ্ডায়মান হইয়া ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে সহায়তা করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ এবং কেশবচন্দ্রই প্রধান ছিলেন। ইঁহারা এবং ইঁহাদের অন্যান্য বন্ধুগণ কি প্রকারে ব্রাহ্মধর্ম্মের পবিত্র আলোক দেশে বিদেশে বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের দেশের শিক্ষিত ব্যক্তি-গণ অন্ততঃ কিয়ৎ পরিমাণেও অবগত আছেন। উপরোক্ত দুই যুবক, বিশেষ ভাবে কেশবচন্দ্র, যে সমস্ত জীবন ব্রাহ্মসমাজের সেবাতে আপনার শক্তি ও সামর্থ্য নিয়োগ করিয়াছিলেন তাহা প্রায় সকলেই জানেন। দেবেন্দ্রনাথ বহুদিবস ব্রহ্মসাধনে মগ্ন ছিলেন এবং অনেক সত্যরত্ন লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া ব্রাহ্মগণ আনন্দে ও উৎসাহে উন্মত্ত হইয়া ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসবের জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। সকলের মনে নূতন উৎসাহ ও নূতন শক্তির সঞ্চার হইতে লাগিল। অবশেষে মাঘের সেই একাদশ দিবস উপস্থিত হইল। দেবেন্দ্রনাথ এই উৎসবের কার্য্য কি ভাবে সম্পন্ন করিতে হইবে, তাহা পূর্ব্ব হইতে স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। যুবক সত্যেন্দ্রনাথ এবারকার উৎসবে কিছু কার্য্য করেন, এই অভিপ্রায় তাঁহার পিতার নিকট জ্ঞাপন করাতে তিনি সম্মতি প্রদান করিলেন। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের যে প্রকার ক্ষীণ কণ্ঠ ও অল্প বয়স, তাহাতে এই গুরুতর কার্য্যের তিনি উপযুক্ত কি না সে বিষয়ে

তাঁহার পিতার মনে সন্দেহ হইয়াছিল, সেইজন্য তিনি বলিলেন "আচ্ছা তোমার বক্তৃতা তুমি লিখিয়া আমাকে দেখাও।" সত্যেন্দ্রনাথ তাঁহার লিখিত বক্তৃতা তাঁহার পিতাকে যখন দেখাইলেন, তখন তিনি অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলেন। এই বক্তৃতার কিয়দংশ আমরা পাঠকদিগকে উপহারস্বরূপ প্রদান করিতেছি। ইহা হইতে সেই অল্পবয়স্ক যুবকের গভীর চিন্তা, ঈশ্বরানুরাগ এবং বঙ্গভাষাতে কি প্রকার অধিকার জন্মিয়াছিল, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে। তিনি এইরূপে বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন—"অদ্য কি শুভদিন! অদ্য আমাদের ব্রাহ্মসমাজের ঊনত্রিংশ বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ হইল। এই সমাজেব প্রথমাবস্থায় কে মনে করিয়াছিল, যে, ইহা কুসংস্কার-লতার পরশুরূপে উত্থিত হইয়া এতকাল পর্য্যন্ত যথার্থ ঈশ্বরতত্ত্ব প্রচার করিবে এবং ধর্ম্মপথের দুস্তীর্ণ কণ্টকসমূহ ছেদন করিতে থাকিবে। কাহার মনে ছিল যে ঊনত্রিংশ বৎসর পরেও এই সমাজমন্দিরে আমরা সকলে ভ্রাতৃসৌহার্দ্দবলে মিলিত হইয়া পরমেশ্বরের দুরবগাহ্য মঙ্গলভাব নিরীক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইব। কি আশ্চর্য্য! যিনি আমাদের ইন্দ্রিয়ের অগোচর, যিনি আমাদের মন হইতে পৃথক্ পদার্থ, যাঁহার সহিত এ পৃথিবীর কোন বস্তুরই তুলনা না পাইয়া যাঁহাকে কেবল 'অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘং' 'অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্' এই প্রকার নেতি নেতি বাক্য দ্বারা বর্ণন করিতে হয়; কি আশ্চর্য্য! অদ্য এই আলোকময় সমাজমন্দিরে তাঁহারই অতুল জ্যোতি প্রতিভাসিত দেখিতেছি। * * * *

গভীর নিশীথ-সময়ে সকল জীব সুষুপ্ত হইলে নীলোজ্জ্বল গগনমণ্ডলে দীপ্তিমান্ তারকাগণ সৈন্যদলের ন্যায় দলবদ্ধ হইয়া প্রহরীরূপে যেন

নিঃসৃত হইয়া তাঁহারই আদেশ পালন করিবার জন্য কত দেশ বিদেশ অতিক্রম করিয়া এবং কত দুস্তর প্রতিবন্ধক ছেদন করিয়া বোরতর নিনাদে ও প্রবলবেগে ধাবমান হইতেছে, এবং তাঁহার এই রাজ্যের শোভা বর্দ্ধন ও অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছে। জনশূন্য দুর্গম গহনের প্রত্যেক মনোহর পুষ্প তাঁহার অতুল্য তুলিকা দ্বারা উন্মীলিত হইয়া এবং তাঁহারই হস্ত দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া তাঁহারই সুন্দর ভাব প্রকাশ করিতেছে। তাঁহার সুন্দর মঙ্গলভাব চতুর্দ্দিকে প্রকাশমান রহিয়াছে, জগতের অতি সামান্য বিষয়ও গূঢ় পরমার্থ ভাবে পূর্ণ রহিয়াছে। জ্যোতির্ব্বিদ্যায় পারদর্শী কোন সুবিজ্ঞ পণ্ডিত অসংখ্য অসংখ্য ভ্রাম্যমান্ লোকমণ্ডলের পরমাশ্চর্য্য শৃঙ্খলা অবলোকন করিয়া যেমন ঈশ্বরে প্রেমার্দ্রচিত্ত হয়েন; সুশিক্ষিত বিজ্ঞানবিৎ সুধীগণ একবিন্দু জলের মধ্যে কোটি কোটি কীটের সংস্থান প্রত্যক্ষ করিয়া এবং তাহাদের প্রত্যেকের অচিন্তনীয় সূক্ষ্ম শরীরে তদুপযোগী অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, আহার, বিহার ও রক্তসঞ্চালন দর্শন করিয়া এবং তাহাদের হরিদ্বর্ণ, রক্তবর্ণ, স্বর্ণবর্ণ ও হীরকখণ্ডবৎ উজ্জ্বলদেহে চমৎকার শিল্পকার্য্য অবলোকন করিয়া যেমন ঈশ্বরের বিচিত্র শক্তি ও অনন্ত করুণাতে মনোনিবেশ করেন; সেইরূপ কোন অশিক্ষিত এবং অনুপদিষ্ট ব্যক্তিও সূর্য্যমণ্ডলে তাঁহার প্রভা—বনপুষ্পে তাঁহার সৌন্দর্য্য—গগনব্যাপী নবাম্বুগর্ভ মেঘমালায় তাঁহার উদারভাব—অগণনীয় নক্ষত্ররাজিতে তাঁহার অভাবনীয় অনন্তভাব—প্রত্যেক বিশ্বকৌশলে তাঁহার জ্ঞান—এবং প্রভূত শক্তিশালী ও প্রভাবশীল পদার্থসমূহে তাঁহার শক্তি অনুধাবন করিয়া পুলকে আর্দ্র হয়েন এবং প্রতিনিমেষের করুণা স্মরণ করিয়া সেই প্রেমময়ের প্রেমে মগ্ন হয়েন। এখানে জ্ঞানী ও অজ্ঞানী উভয়েই ঈশ্বর-জ্ঞানে সমান

অধিকারী। তিনি তাঁহাকে জানিবার অধিকার কেবল আমাদের ভ্রান্ত বুদ্ধির হস্তে সমর্পণ করেন নাই যে কতিপয় সূক্ষ্মবুদ্ধি তার্কিক ব্যতিরেকে আর কেহই তাঁহাকে লাভ করিতে পারিবে না। তিনি তাঁহার স্বরূপ ও মঙ্গলভাব আমাদের প্রত্যেকেরই মনোমধ্যে গ্রথিত করিয়া দিয়াছেন। * * * * * তিনি আমাদিগের নিকট এজন্য আপনাকে প্রকাশ রাখিয়াছেন, যে আমরা তাঁহার পবিত্র মঙ্গলস্বরূপ নিরীক্ষণ করিয়া পবিত্র হই, এবং সেই মঙ্গলভাবের অনুকরণ করিতে যত্নশীল হই। এই শুভ উদ্দেশ্যেই তিনি আমাদিগের প্রত্যেকের হৃদয়ে পরমহিতকারী বন্ধুরূপে ধর্ম্মকে সংস্থাপন করিয়াছেন। * * * *

যেখানে ন্যায় ও সত্য—যেখানে নির্ম্মল প্রেম ও দয়া, সেইস্থানেই আত্মপ্রসাদ। যখন কাহারও আর্ত্তনাদ নিবারণ করা যায়—যখন কোন দুঃসহ শোকসন্তপ্ত ব্যক্তির মনঃশল্য উদ্ধার করা যায়—যখন ধর্ম্মযুদ্ধে পরাহত কোন বিপন্ন ব্যক্তিকে উৎসাহ ও সাহস প্রদান করা যায়—যখন প্রবোধ-সূর্য্য দ্বারা কাহারও মন হইতে অজ্ঞান-তিমির দূর করা যায়, অথবা কাহারও মোহনিদ্রা ভঙ্গ করা যায়—যখন অন্যের দোষ প্রশস্ত হৃদয়ে ক্ষমা করা যায় এবং আপনার সেই-সকল দোষকে নির্দ্দয়রূপে নির্য্যাতন করিয়া দূরীকৃত করা যায়—যখন আপনার পরমশত্রুস্বরূপ রিপুবিশেষকে আয়ত্ত করা যায় এবং যখন আপনার অনিষ্টকে অনিষ্টজ্ঞান ও গুরুবিপদকে বিপদজ্ঞান না করিয়াও ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠান করা যায়—তখনই নির্ম্মল সুখের উৎস উৎসারিত হইতে থাকে—তখনই বিশদ আত্মপ্রসাদ হৃদয়াকাশে আবির্ভূত হয়—তখনই ধর্ম্মামৃতরস পান করা যায়।"

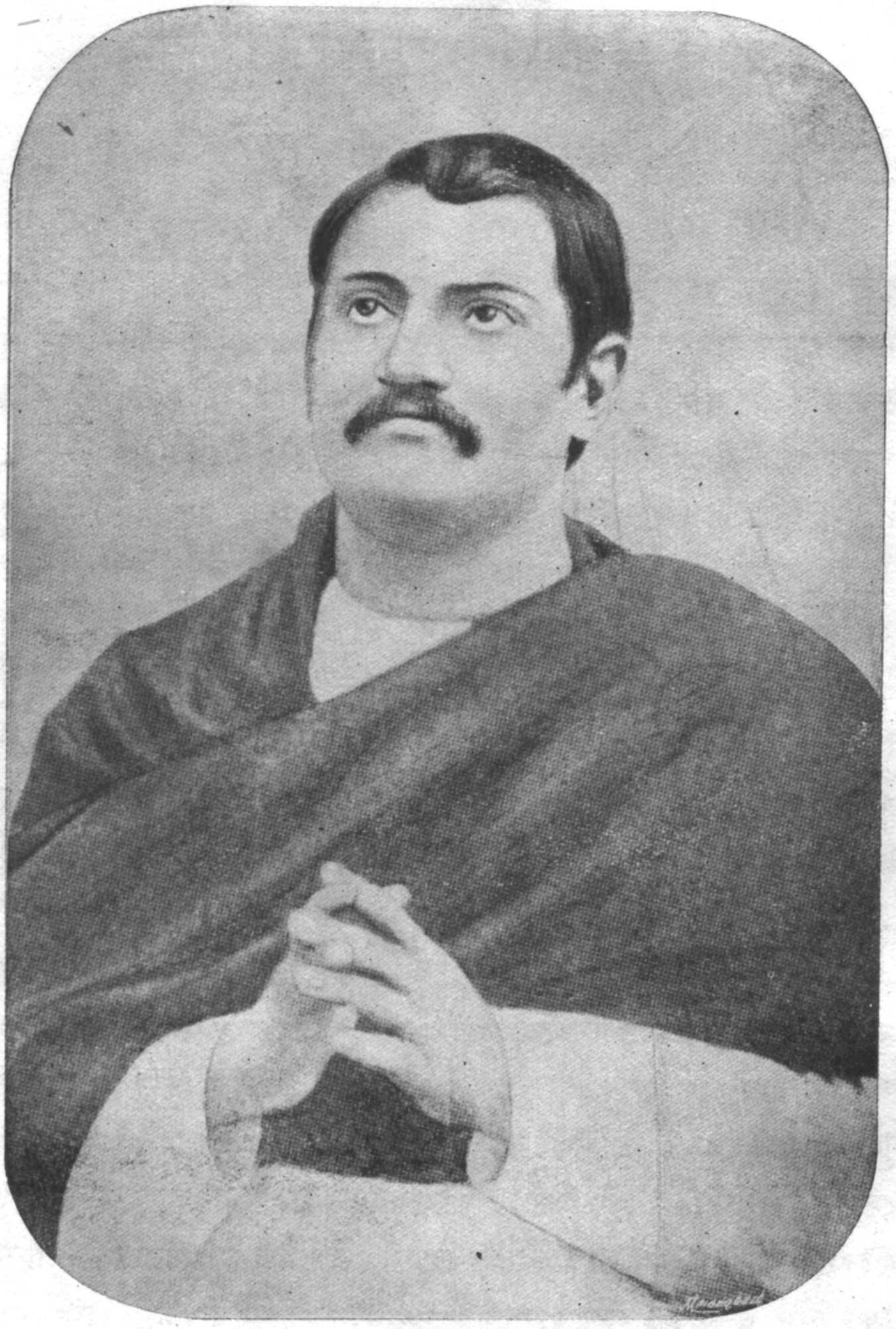
এই বক্তৃতার পর যুবক সত্যেন্দ্রনাথ যে প্রার্থনা করেন, তাহাতে

তাঁহার হৃদয়ের বিশালতা এবং ভাবের গাম্ভীর্য্য অতি পরিষ্কারক্সপে প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি প্রার্থনা করিতেছেন—"হে পরমাত্মন্! তুমি মনুষ্যকে অনন্ত কালের উন্নতিলাভে অধিকারী করিয়া তাহার মনে কতই মহত্ত্বের বীজ বিক্ষিপ্ত করিয়া রাখিয়াছ। তুমি তাহার সুখরাজ্য কতই বিস্তৃত করিয়াছ; তাহার অধিকার কতই প্রশস্ত করিয়াছ; তাহাকে কতই আধিপত্য প্রদান করিয়াছ; তথাপি যাহারা স্বকীয় গরীয়সী প্রকৃতি বিস্মৃত হইয়া অপথে পদার্পণ করিতেছে এবং আপনাদের সঙ্গে অন্যকেও দূষিত করিবার চেষ্টা পাইতেছে এবং যাহারা নানাপ্রকার ঘটনাসূত্রে অনুস্যূত হইয়া নানাপ্রকার যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, তাহাদের সকলের মঙ্গল প্রার্থনার জন্য আমার মন উৎসুক হইতেছে। যাঁহারা তোমার নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মপথে গমন করিবার মানস করিয়া সম্মুখে অনেক ব্যাঘাত ও বিস্তর প্রতিবন্ধক প্রাপ্ত হয়েন এবং দেশের কুরীতি বা কুসংস্কার বশতঃ সেই পথে একপদও অগ্রসর হইতে পারেন না, হে বিঘ্নবিনাশন বিশ্বপাতা! তুমি তাঁহাদের সেই পথ পরিষ্কার করিয়া দেও এবং তাঁহাদের মনে উৎসাহ ও সাহস প্রদান কর। যে সময়ে সাধুব্যক্তি ধর্ম্মক্ষেত্রে ক্রমাগত বিচরণ করিয়া বিষয়-কোলাহল দূর করিবার নিমিত্ত তোমাতে চিত্ত নিবেশিত করেন এবং আপনার মনকে শান্তি-জ্যোতিতে পবিত্র করেন, সেই সময়ে যাহারা অবৈধ ইন্দ্রিয়সুখ বা নিকৃষ্ট আমোদে রত থাকিয়া তোমার প্রদত্ত স্বকীয় মহীয়সী প্রবৃত্তি-সমুদায়কে নিদ্রিত রাখে, হে পরমাত্মন্! তুমি তাহাদিগকে শুভবুদ্ধি প্রদান কর এবং সৎপথ প্রদর্শন কর। যাহারা কেবল বিষয়রসে মুগ্ধ হইয়া সংসার-তরঙ্গে তরঙ্গিত হইতে থাকে, এবং বিপদের সময় সম্পদজীবী বন্ধুজনগণ দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া সহায়হীন ও আশাহীন হইয়া যায়, তাহারা যেন

সংসারঘটিত সমস্ত সম্বন্ধ অনিত্য জানিয়া তাহাতেই একান্ত লিপ্ত না হয় এবং তোমার সহিত চিরসম্বন্ধ জানিয়া তোমার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয়। যাহারা বিকারী যৌবন ও ধনমদে মত্ত থাকিয়া মৃত্যুকে একেবারে বিস্মৃত হইয়া যায় এবং আপনার অতুল ঐশ্বর্য্য, বলিষ্ঠ শরীর ও সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্ভোগ-সলিলে নিমজ্জন করে এবং অবশেষে এমত জঘন্য অবস্থায় পতিত হয়, যে, আমোদে তাহাদের আর পরিতৃপ্তি হয় না এবং নিদ্রায় আর বিশ্রাম হয় না। যাহারা পরিবর্ত্তনশীল সংসারমধ্যে সকলপ্রকার সুখভোগের পরীক্ষা শেষ করিবার পরে সংসারের প্রতি, মনুষ্যের প্রতি এবং আপনার প্রতি, একান্ত বিরক্ত ও সর্ব্বপ্রকার নিরাশ হইয়া কেবল আক্ষেপ করিয়াই আয়ু শেষ করিতে থাকে, তাহাদের যেন জ্ঞান হয় যে, আমরা কেবল আহার ও বিহারের নিমিত্তেই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করি নাই এবং পৃথিবীতেই আমাদের জীবনের শেষ নহে; তাহারা সংসারমধ্যে সুখরূপ মৃগতৃষ্ণিকায় প্রতিবার আশ্বাসিত ও প্রতিবার বঞ্চিত হইয়া যেন অপরিবর্ত্তনীয় স্বরূপে আপনার সুখের সম্বন্ধ নিবদ্ধ করে এবং আপনার যথার্থ ধাম অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হয়। এই প্রশস্ত নগরীমধ্যে যাহারা পাপ ও দুঃখে কালক্ষেপ করিতেছে, যে-সকল পাপাত্মা অন্ধকারময় নির্জ্জন ভীষণ কারাগৃহে নিজ কুকর্ম্মের ফলভোগ করিতেছে, যে-সকল দীন দরিদ্র ব্যক্তি স্বীয় শিশুসন্তানদিগের জন্য একমুষ্টি অন্ন সংগ্রহ করিতে অক্ষম, যে-সকল দুর্ভাগ্য ব্যক্তি যৌবনের প্রারম্ভেই সুখপ্রিয় স্বার্থপর দুঃশীল পাপাত্মা-দিগের হস্তে পতিত হইয়া স্বাভাবিক তেজস্বিনী প্রকৃতিকে নিস্তেজ ও বিকৃত করিতেছে এবং যে-সকল অনাথা অবলাগণ পতিবিয়োগে সহায়হীনা হইয়া দুঃসহ বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, হে পরমাত্মন্ ইহারা সকলেই তোমার আশ্রিত, তুমি ইহাদের সকলকেই সৎপথে

প্রবৃত্ত কর; ইহারা যেন তোমার প্রসারিত ক্রোড় আশ্রয় করিয়া সকল প্রকার দুঃখ শোক হইতে মুক্ত হয়।"

ষোড়শ বৎসর বয়স্ক বালকের উক্ত প্রকার গম্ভীর, ঈশ্বর-প্রেমোদ্দীপক, সুললিত-ভাষাপূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া সভাস্থ সকলে মুগ্ধ হইয়া ভাবে বিভোর হইয়া গেলেন। একেই ত দেবেন্দ্রনাথের পুনরাগমনে সকলের প্রাণ উৎসাহে পূর্ণ ছিল, তাহার পর তাঁহার পুত্রের ঐপ্রকার প্রার্থনা ও বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া সকলে ভাবিলেন বিধাতা কৃপা করিয়া তাঁহাদের এতদিনের প্রার্থনা শ্রবণ করিয়াছেন এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের পবিত্র আলোক দেশের মধ্যে বিস্তার করিবার জন্য এই বালককে তাঁহার কার্য্যে আহ্বান করিয়াছেন। বস্তুতঃ সত্যেন্দ্রনাথ যদিও প্রচারক-ব্রত গ্রহণ করেন নাই তথাপি তাঁহার সমস্ত জীবনে তিনি উচ্চভাবপূর্ণ গম্ভীর ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা, সহিত্যের সেবা, সমাজ-সংস্কার প্রভৃতি মহৎকার্য্যে আপনার শক্তি, সামর্থ্য নিয়োগ করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ের ব্রহ্মসঙ্গীতে আদিব্রাহ্মসমাজের যত সংগীত দেখিতে পাওয়া যায় তাহার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের রচিত সংগীত ব্যতীত অধিকাংশই সত্যেন্দ্রনাথের দ্বারা রচিত হইয়াছে।



ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র।

অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র।

হিমালয় হইতে প্রত্যাগমনের পর যে-সমস্ত যুবক দেবেন্দ্রনাথের সহিত মিলিত হইয়া ব্রাহ্মসমাজের সেবাতে আপনাদিগকে অর্পণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেশবচন্দ্র সর্ব্বপ্রধান। কেশবচন্দ্রের সহিত তাঁহার এপ্রকার মধুর সম্বন্ধ ও যোগ হইয়াছিল যে তাহা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। দেবেন্দ্রনাথ হিমালয়ে সাধন করিয়া যে-সমস্ত সত্যরত্ন লাভ করিয়াছিলেন, তাহার মূল্য বুঝিতে ও তাহা জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিতে কেশবচন্দ্রের ন্যায় একজন প্রতিভশালী ও ঈশ্বরপিপাসু ব্যক্তির প্রয়োজন হইয়াছিল বলিয়াই যেন বিধাতা এই দুইজনের মধ্যে এ প্রকার নিগূঢ় যোগ স্থাপন করিয়া পরস্পরকে প্রেমে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের জীবন ও কার্য্য এবং কেশবচন্দ্রের জীবন ও কার্য্য অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে গ্রথিত, সুতরাং দেবেন্দ্রনাথের জীবনীর মধ্যে কেশবচন্দ্রের জীবনীও স্থানলাভ করিবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। এইজন্য তাঁহার একটি ক্ষুদ্র জীবনী ইহার মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইল।

কলুটোলার বিখ্যাত সেন-পরিবারে ইং ১৮৩৮ সালের ১৯শে নবেম্বর তারিখে কেশবচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন তাঁহার পিতামহ স্বর্গীয় রামকমল সেন মহাশয় বিদ্যা, বুদ্ধি, চরিত্র ও ধর্ম্মের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। রামকমল সেন মহাশয়ের পুত্র স্বর্গীয় প্যারীমোহন সেনও আপনার চরিত্রগুণে সকলের প্রীতিলাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ইনি কেশবচন্দ্রের পিতা। দেবেন্দ্রনাথ ও প্যারীমোহন কিছুদিন একসঙ্গে হিন্দুকলেজে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ইঁহাদের পুত্রদ্বয় সত্যেন্দ্রনাথ এবং কেশবচন্দ্রও ঐ কলেজে একশ্রেণীতে অধ্যয়ন

করিয়াছিলেন। একাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমের সময় কেশবচন্দ্র পিতৃহীন হয়েন। সুতরাং তাঁহার মাতার উপর তাঁহার শিক্ষার ভার পতিত হয়। তাঁহার মাতা সারদা দেবী অতিশয় ধর্ম্মশীলা রমণী ছিলেন। শৈশবকাল হইতেই কেশবচন্দ্র হরিভক্ত হইয়াছিলেন। তিনি প্রতিদিন স্নান করিয়া পট্টবস্ত্র পরিধান করিতেন এবং হরিনামের ছাপ দিয়া তাঁহার ইষ্টদেবতার পূজা করিতেন।

বাল্যকালেই কেশবচন্দ্র আপনার সমবয়স্ক বন্ধুদিগের নেতাস্বরূপ হইয়া বাল্যক্রীড়া করিতেন। স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় তাঁহার ক্রীড়ার সহচর ছিলেন। সাত বৎসর বয়সের সময়ে তাঁহাকে হিন্দুকলেজে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। সেখানে তিনি আপনার প্রতিভাবলে উৎকৃষ্ট ছাত্রদিগের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন। ইংরাজী সাহিত্য ও ইতিহাসে তাঁহার যেপ্রকার ব্যুৎপত্তি হইয়াছিল গণিতে তাঁহার সেপ্রকার ছিল না। কিছুদিন পরে তাঁহাকে কলেজ ত্যাগ করিতে হইয়াছিল বটে, কিন্তু তিনি বাড়ীতে মনোযোগের সহিত সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ইত্যাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। বাল্যকালে তাঁহার এপ্রকার বৈরাগ্য জন্মিয়াছিল যে চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে তিনি আমিষ আহার পরিত্যাগ করেন। অন্তরের মধ্যে তিনি বিবেকবাণী শ্রবণ করিতেন এবং সেই অনুযায়ী কাজ করিতেন। সমস্ত জীবনে এই বিবেকপরায়ণতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তিনি রাখিয়া গিয়াছেন।

সেন-পরিবার বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। সুতরাং কেশবচন্দ্রও পরম বৈষ্ণব ছিলেন। কিন্তু ইংরাজী দর্শন ও বিজ্ঞান আলোচনা করাতে তাঁহার এই ধর্ম্মের প্রতি বিশ্বাস চলিয়া গিয়াছিল। এমন সময়ে স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের রচিত একখানি

গ্রন্থ তাঁহার হস্তগত হয়। তিনি তাহা পাঠ করিয়া দেখিলেন তাঁহার বিশ্বাসের সহিত ব্রাহ্মসমাজের বিশ্বাসের ঐক্য আছে। সেই দিনই তিনি স্থির করিলেন ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করিবেন। সত্যেন্দ্রনাথ তাঁহার সমপাঠী ছিলেন। একদিন তিনি কেশবচন্দ্রকে নিজ বাটীতে আনিয়া দেবেন্দ্রনাথের সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া দেবেন্দ্রনাথ পরম পরিতোষ লাভ করিলেন এবং দুইজনে একত্রে ব্রাহ্মসমাজের সেবাতে নিযুক্ত হইলেন। কিছুদিন পরে দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র ও সত্যেন্দ্রনাথকে সঙ্গে লইয়া সিংহল ভ্রমণ করিতে বহির্গত হইলেন। তাহা শুনিয়া সেন-পরিবারে ভীষণ ক্রন্দন-ধ্বনি উত্থিত হইল। কেশবচন্দ্র সিংহল হইতে ফিরিয়া আসিয়া বেঙ্গল ব্যাঙ্কে একটি কর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। কিন্তু তিনি বেশীদিন এই কর্ম্ম করিতে পারিলেন না। দেশের সেবার জন্য তাঁহাকে কর্ম্মত্যাগ করিতে হইল।

এই সময়ে দুইটি বিষয়ের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল। প্রথমতঃ দেশের শিক্ষিত যুবকেরা ইংরাজী শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িতেছিলেন। তাঁহাদিগকে সৎপথে আনিবার জন্য কেশবচন্দ্র বক্তৃতা ও সভা সমিতির আয়োজন, পুস্তিকা প্রচার করিতে লাগিলেন। দ্বিতীয়তঃ, খৃষ্টান পাদরিদিগের সহিত তাঁহার ভয়ঙ্কর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। তিনি যখন অসাধারণ বাগ্মিতা ও যুক্তি সহকারে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন তখন পাদরিগণ প্রমাদ গণিয়া তাঁহার সহিত তর্কযুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিলেন। বহুদিন ধরিয়া তাঁহাকে এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত থাকিতে হইয়াছিল এবং অবশেষে সত্যের জয় হইল, কেশবচন্দ্রের জয় হইল। তখন হইতে তিনি দেশের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি হইলেন।

তাঁহার এইপ্রকার ব্রহ্মানুরাগ ও ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে উৎসাহ দেখিয়া দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাকে 'ব্রহ্মানন্দ' এই উপাধিতে বিভূষিত করিয়া ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য করিয়াছিলেন। যেদিন তিনি ব্রাহ্ম-সমাজের উপাচার্য্য পদে অভিষিক্ত হয়েন, সেই দিন তিনি তাঁহার পত্নীকে দেবেন্দ্রনাথের বাড়ীতে আনয়ন করিলেন। এইবার সেন-পরিবারে ভীষণ অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। তাঁহার পৈতৃকবাটী হইতে তিনি কিছুদিনের জন্য নির্ব্বাসিত হইলেন। তাহাতে তিনি আরও উৎসাহের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। উপাচার্য্য পদে অভিষিক্ত হইবার কিছুদিন পরে তিনি মান্দ্রাজ ও বোম্বাই অঞ্চলে প্রচারার্থ বহির্গত হইলেন। যেখানে তিনি গমন করিতেন, সেখানে সকলেই তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণে মুগ্ধ হইতেন। এইরূপে সমস্ত ভারতবর্ষে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। কেশব-চন্দ্র প্রমুখ যুবকগণ অতঃপর আর এক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন। তাহা অসবর্ণ ও বিধবা বিবাহ প্রচলন। এই ব্যাপার লইয়া প্রাচীন ও নব্যদলের মধ্যে এক সংঘর্ষ হইল। তাহা হইতে এই ফল হইল যে নব্যদল দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া এক নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠা করিলেন। কেশবচন্দ্রের সহিত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি অনেক যুবক মিলিত হইয়া দেশে বিদেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন।

কেশবচন্দ্র ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের সংবাদ লইয়া ইংলণ্ড গমন করিলেন। সেখানে তিনি ছয়মাসকাল অবস্থান করেন এবং "সত্তরটি প্রকাশ্য সভায় চল্লিশ সহস্রের অধিক লোকের নিকট বক্তৃতা ও উপদেশ প্রদান" করেন। অতিরিক্ত পরিশ্রমে তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়াতে আমেরিকা যাইবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতা ফিরিয়া আসেন।

কলিকাতাতে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি সাধন ভজনে মনোযোগী হইয়া আপনার শিষ্যবৃন্দকে লইয়া সজনে ও নির্জ্জনে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম সাধন করিতে আরম্ভ করেন। এই সময়ে তাঁহার সহিত রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের পরিচয় হইল।

ইং ১৮৭৮ সালে তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা সুনীতি দেবীর সহিত কোচ-বিহারের মহারাজার বিবাহ হয়। ইহাতে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের লোকেরা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়েন। যাঁহারা এই বিবাহের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, তাঁহারা এক স্বতন্ত্র সমাজ স্থাপন করিলেন। অতঃপর কেশবচন্দ্র তাঁহার সমাজের "নববিধান" নামকরণ করিয়া আপনার মত ও বিশ্বাস প্রচারে মনোযোগী হইলেন।

এই নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে যদিও তাঁহার কর্ম্মোৎসাহ কমিল না, কিন্তু তাঁহার মনের মধ্যে এমন এক গুরুতর আঘাত লাগিল যে তাহা হইতে তিনি আর রক্ষা পাইলেন না। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে তিনি আরও অধিকতর উৎসাহে ও অসাধারণ পরিশ্রম সহকারে আপনার ধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া গেল। স্বাস্থ্যলাভের জন্য তাঁহাকে প্রায়ই পাহাড়ে গমন করিতে হইত। যখন তিনি স্বাস্থ্য-লাভের জন্য নির্জ্জনে গমন করিতেন, তখনও তিনি গভীর পরিশ্রম সহকারে পুস্তকাদি প্রণয়ন করিতেন। অবশেষে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া তাঁহাকে কলিকাতাতে ফিরিয়া আসিতে হইল। অনেক সুবিজ্ঞ চিকিৎসক তাঁহাকে চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। কেশবচন্দ্র অকালে এই পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া অমরধামে গমন করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর কত দেশী ও বিদেশী সংবাদপত্রে তাঁহার প্রশংসাপূর্ণ প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল তাহার সীমা

নাই, কত দেশী ও বিদেশী পণ্ডিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নিকট শোকপূর্ণ পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহার সংখ্যা নাই। আমরা এ সম্বন্ধে 'বঙ্গবাসী' সংবাদপত্রের রচনায় কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া উপসংহার করিব। "নির্ম্মল নীল গগনে সহসা বজ্রাঘাত হইল। আজ সুমেরুশৃঙ্গ ভাঙ্গিয়া পড়িল, আকাশ হইতে চন্দ্র খসিল—কেশবচন্দ্র আর ইহজগতে নাই। মঙ্গলবার সন্ধ্যাকালে নিমতলার শ্মশানে যাহা পুড়িয়াছে, কতকাল হইল ভারতের কোনও শ্মশানে তাহা পুড়ে নাই। ভাগীরথী সেদিন যে ভস্ম ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছেন, আজ কতকাল হইল পুণ্যসলিলের পবিত্র স্রোতে সেরূপ ভস্ম মিশে নাই।

* * * * * * * * *

"কেশব-মূর্ত্তি সম্মুখে নাই বটে, কিন্তু কেশবের অমর অন্তরাত্মা চিরদিন মানবকুলের অন্তরে বিরাজ করিবে। সেই মনোমোহন মূর্ত্তি, সেই মধুর কথা, সেই তেজস্বিনী বাগ্মিতা, সেই মোহনমুখে হরিনাম কীর্ত্তন কে ভুলিবে? যিনি ব্রাহ্মসমাজের বীজ, জাতীয় জীবনের উৎস, যাঁহার বাগ্মিতায় ইউরোপ মুগ্ধ, ব্রাইট, গ্লাডষ্টোন চমকিত, এমন মহাপুরুষের নাম কেন না চিরস্মরণীয় হইবে? * * * ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাযোগী, ইউরোপ আমেরিকায় উপাসিত, এই ভারতের মুকুটমণি কেশবকে কে বিস্মৃত হইবে? আজ কমল-কুটীরের মধ্যাহ্ন-সূর্য্য অকালে অস্ত গেল; টাউনহল বক্তা-শূন্য হইল; বীডন-পার্ক আঁধার হইল; ব্রহ্মমন্দিরের বেদী আচার্য্যশূন্য হইল, এ শূন্য পদ কে পূরণ করিবে?"

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

কেশবের সহিত মিলন ও সত্যেন্দ্রনাথ।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে কেশবচন্দ্র তখনকার শিক্ষিত যুবকদিগের উচ্ছৃঙ্খলতা ও ধর্ম্মশূন্যতা দেখিয়া মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন এবং তাহার প্রতিকারের জন্য তিনি সভা, সমিতি ইত্যাদি স্থাপনে মনোযোগী হয়েন। ১৭৭৯ শকে তিনি 'গুড উইল ফ্রেটারনিটি' সভা স্থাপন করেন। সেখানে তিনি ধর্ম্মবিষয়ে অসাম্প্রদায়িক উপদেশ ইত্যাদি প্রদান করিতেন। তাঁহার উৎসাহ, বৈরাগ্য, বুদ্ধি ও প্রতিভাগুণে অনেক যুবক আকৃষ্ট হইয়া এই সভাতে যোগদান করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে শ্রদ্ধাস্পদ রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের রচিত 'ব্রাহ্মধর্ম্ম কি?' নামক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া এই ধর্ম্মের মত ও বিশ্বাসের সহিত তাঁহার ঐক্য হইল। তিনি তখন ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করিবার জন্য এক প্রতিজ্ঞা-পত্র প্রেরণ করিলেন। দেবেন্দ্রনাথ যখন হিমালয়ে বাস করিতেছিলেন, তখন এই ব্যাপার ঘটিয়াছিল। তিনি হিমালয় হইতে প্রত্যাগত হইলে ১৭৮০ শকের সাম্বৎসরিক উৎসবের পর একজন একদিন তত্ত্ববোধিনী সভাতে তাঁহাকে বলেন 'কেশবচন্দ্র নামে এক যুবক কলুটোলাতে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিতেছেন।' ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের নাম শুনিয়া দেবেন্দ্রনাথের হৃদয় নৃত্য করিয়া উঠিল। তিনি একদিন গোপনে কেশবচন্দ্রের কলুটোলার বাড়ীতে গমন করিলেন। সেখানে যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার হৃদয়ে অপূর্ব্ব আনন্দ হইল। দেখিলেন কেশবচন্দ্র একখানি রক্তবর্ণ পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া ইংরাজীতে বক্তৃতা করিতেছেন, আর অনেক

শিক্ষিত যুবক অতি আগ্রহের সহিত তাহা শ্রবণ করিতেছেন। তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া দেবেন্দ্রনাথের অত্যন্ত আনন্দ হইল। তিনি সেদিন বাটী চলিয়া আসিলেন।

একদিন বুধবার সমাজের উপাসনার পর একজন তাঁহাকে বলিলেন 'ইনি কেশবচন্দ্র সেন'। সেদিন দেবেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার অল্প পরিচয় হইল। ক্রমে ক্রমে এই দুই মহৎ ব্যক্তির মধ্যে বন্ধুতা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। একজন আর-একজনের পিতৃস্থানীয় হইলেন। ব্রাহ্মসমাজে যোগদানের প্রায় এক বৎসর পরে কেশবচন্দ্রের জীবনে এক ভয়ঙ্কর পরীক্ষা উপস্থিত হইল। সে পরিবারের কুল-ক্রমাগত নিয়মানুযায়ী তাঁহার দীক্ষার দিন উপস্থিত হইল। সেই দিন কেশবচন্দ্রকে হিন্দুপ্রথানুসারে গুরুর নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু কেশবচন্দ্র চিরদিন অন্তরস্থিত বিবেক-গুরুর আদেশে চলিতেছিলেন, এক্ষণে পৌত্তলিক গুরুর নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিতে তাঁহার অত্যন্ত বিঘ্ন উপস্থিত হইল। তিনি কিছুতেই বিবেকের বিরুদ্ধে চলিতে প্রস্তুত নহেন। এদিকে তাঁহার আত্মীয় স্বজন প্রভৃতি তাঁহার এ প্রকার ব্যবহারে অত্যন্ত বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ হইতে লাগিলেন। তাঁহার নিকট এ কঠোর পরীক্ষা। তিনি অবশেষে দেবেন্দ্রনাথের নিকট উপস্থিত হইয়া এ বিষয়ে তাঁহার আদেশ জানিতে ইচ্ছা করিলেন। দেবেন্দ্রনাথ চিরকাল স্বাধীনতার পক্ষপাতী। সুতরাং এ বিষয়ে তিনি উত্তর করিলেন "তুমি মন্ত্র নেবে কি না, সে তোমার নিজের উপর নির্ভর করে। তুমি তোমার নিজের হৃদয়ের বল পরীক্ষা করে, বিবেচনা ক'রে স্থির কর। আমি কি পরামর্শ দেব ?"

এই ব্যাপার হইতে আমরা দেবেন্দ্রনাথের প্রকৃতির একটি গূঢ়তত্ত্ব জানিতে পারি। প্রথমতঃ তিনি মনে করিতেন ধর্ম্মজ্ঞান মানবের

হৃদয়-নিহিত সহজ জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। মানব যখন যে সোপানে আরোহণ করে, তখন তাহার উপযুক্ত ধর্ম্ম কি হইবে তাহা বিধাতা অন্তরের মধ্যে থাকিয়া তাহাকে উপদেশ প্রদান করেন। আধ্যাত্মিক রাজ্যে বাস্তবিকই ইহা একটি অমূল্য সত্য। কিন্তু এ সত্যের তাৎপর্য্য অনেকে গ্রহণ করিতে না পারিয়া ধর্ম্মকে এক অস্বাভাবিক কৃচ্ছ্রসাধনের ব্যাপার করিয়া তোলেন। আধ্যাত্মিক জীবনে সোপান আছে। এক সোপান হইতে ক্রমে অন্য সোপানে আরোহণ করাই জগতের নিয়ম। আধ্যাত্মিক জগতেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না। বল প্রয়োগে অথবা কোন উচ্চ সাধকের অভিজ্ঞতা-লব্ধ সত্যের দ্বারা সাধক জীবনের কোন উপকার হইতে পারে না। কারণ মানুষ যে স্তরে বাস করে, সেই স্তরের কথাই সে বুঝিতে পারে, যাহা তাহার জ্ঞানের অগম্য,ধারণার অতীত,তাহা কোন বিশিষ্ট ভক্তিভাজন সাধকের দ্বারা কথিত হইলেও তাহার বিশেষ কোন উপকার হয় না। দেবেন্দ্রনাথ ইহা জানিতেন, সেইজন্য এবিষয়ে কেশবচন্দ্রকে তাঁহার বুদ্ধি বিবেচনার উপর নির্ভর করিতে আদেশ করিলেন। দ্বিতীয়তঃ কেশবচন্দ্রের ধর্ম্মের বল, চরিত্রের শক্তি, ঈশ্বরানুরাগ সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথ বিশেষ অবগত ছিলেন না। কেশবচন্দ্র যে পরীক্ষার মধ্যে আপনাকে নিক্ষেপ করিতে অগ্রসর হইতেছেন, সে পরীক্ষার কঠোরতা তিনি সহ্য করিতে পারিবেন কি না তাহা তিনি জানিতেন না। বিশেষতঃ তিনি একজন বিখ্যাত সম্ভ্রান্ত হিন্দু-পরিবারের সন্তান। তাঁহার শিক্ষা, রুচি ইত্যাদি হিন্দু-পরিবারের সন্তানের ন্যায় হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। যদিও তিনি ইংরাজী শিক্ষার নূতন আলোক পাইয়া প্রাচীন রীতি-নীতির প্রতি উদাসীন হইয়াছিলেন তথাপি তাঁহার জীবনের পরিবর্ত্তন কি পরিমাণে হইয়াছিল, তাহা তিনি বিশেষরূপে জানিতেন

না। এ অবস্থাতে এই গুরুতর বিষয়ে লোকচরিত্রজ্ঞ দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার নিজের বুদ্ধি বিবেচনা ও শক্তির উপর নির্ভর করিয়া কার্য্য করিতে পরামর্শ দিলেন। একজন প্রবীণ, বহুদর্শী, ধার্ম্মিক ব্যক্তির পক্ষে এ প্রকার পরামর্শ দেওয়া সম্পূর্ণরূপে যুক্ত ও নীতিসঙ্গত।

আমরা কেশবচন্দ্রের জীবনী সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছি। এই অধ্যায়ে সত্যেন্দ্রনাথের বাল্যজীবনী ও তাঁহার ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। একজন প্রাচীন ও সুবিজ্ঞ ব্রাহ্মের ভাষাতে আমরা তাহা বর্ণনা করিতেছি।

"শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৭৬৪ শকের ২ জ্যৈষ্ঠ জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালাবধি তাঁহার সত্যনিষ্ঠা, কার্য্যতৎপরতা ও সময় প্রতিপালনাদি গুণ তাঁহার পরিবার ও বয়স্যদিগের মধ্যে তাঁহার ভাবী মহত্ত্বের চিহ্ন প্রকাশ করিত। পাঠদশায় তাঁহার সর্ব্ববিষয়ে প্রবেশ-শক্তি, পরিষ্কার জ্ঞান এবং সত্যপ্রকাশ সাহসাদি গুণে তাঁহার শিক্ষকগণ তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। তিনি যাহা উচিত বুঝিবেন, তাহাই করিবেন। যাহার আরম্ভ করিবেন, তাহার শেষ না করিয়া ছাড়িবেন না। তাঁহার এই গুণ পরে যৌবনকালের বল ও সাহসের সহিত যুক্ত হইলে, তাঁহার তাৎকালীন সহযোগী সমাজসংস্কারকেরা কেহ তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারেন নাই।

"তিনি প্রথমতঃ হেয়ার স্কুলে অধ্যয়ন করিতেন পরে ইংরাজদিগের সংসর্গে তাঁহার ইংরাজী শিক্ষা উত্তম হইবে বলিয়া দেবেন্দ্রবাবু তাঁহাকে এক সাহেবের স্কুলে অধ্যয়ন করিতে দেন। সেইখানে তাঁহার ইউরোপীয় ভাব সমস্ত শিক্ষা হয়। পরে তিনি প্রেসিডেন্সি কালেজেও অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

"গৃহেতে যিনি তাঁহার ইংরাজী শিক্ষক ছিলেন, তিনি ব্রাহ্ম; যিনি

তাঁহাকে সংস্কৃত পড়াইতেন, তিনিও ব্রাহ্ম। ব্রাহ্মধর্ম্মের আলোচনা তখন তাঁহার গৃহের সর্ব্বাংশেই প্রবেশ করিয়াছিল। সুতরাং অতি অল্প বয়সেই তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের সমুদায় মত ও ব্রাহ্মসমাজের সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত হইলেন। যখন দেবেন্দ্রবাবু সিমলা হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ১৬ বৎসর। এই বয়সেই তিনি ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উন্নত সাধক ও ব্রাহ্মসমাজের নেতার ন্যায় কার্য্য করিবার সামর্থ্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। দেবেন্দ্রবাবু তাঁহার ভাব দেখিয়া বাৎসল্য-রসে বিগলিত হইলেন এবং উন্নত শক্তির অনুরোধে তাঁহাকে ব্রাহ্ম-সমাজে যথাযোগ্য স্থান প্রদান করিলেন। তিনি এই অল্প বয়সেই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে এক একটি অপূর্ব্ব প্রস্তাব প্রকাশ ও ব্রাহ্ম-সমাজে এক একটি উজ্জ্বল বক্তৃতা প্রদান করিয়া ব্রাহ্মগণকে চমকিত করিয়া তুলিলেন।"

পূর্ব্ব অধ্যায়ে সত্যেন্দ্রবাবুর একটি বক্তৃতা উদ্ধৃত করা হইয়াছে। তাঁহার এই-সকল বক্তৃতা ও সঙ্গীত সম্বন্ধে উক্ত প্রাচীন ব্রাহ্ম লিখিয়া-ছেন ;—"সেই অল্প বয়সেই তিনি ধর্ম্মের তত্ত্বসকল নিজের চিন্তা দ্বারা কেমন নিপুণরূপে, শৃঙ্খলাপূর্ব্বক আয়ত্তীকৃত করিয়াছিলেন, তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। পরে যে স্নিগ্ধ-গম্ভীর অতুলরসভাবপূর্ণ সঙ্গীত সকল রচনা করিয়া তিনি ব্রাহ্মদিগের নিকট যশস্বী হইয়াছেন এবং তাঁহাদিগের চিরদিনের অবলম্বনীয় অমূল্য সম্পত্তি দান করিয়াছেন—যে-সকল সঙ্গীতের নিমিত্ত তিনি বঙ্গীয় কবিকুলের মধ্যে এক গণনীয় কবি বলিয়া মান্য হইবার উপযুক্ত। তাঁহার প্রথম দিবসের ঐ বক্তৃতাতে ঐ-সকল সঙ্গীতের প্রায় সমুদায় ভাবই প্রাপ্ত হওয়া যায়।"

যখন সত্যেন্দ্রনাথ এইরূপে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া-ছিলেন, তখন কেশবচন্দ্র কেবলমাত্র ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যের দর্শকমাত্র

ছিলেন। কেশবচন্দ্রের সহিত দেবেন্দ্রনাথের মিলন সম্বন্ধে উক্ত প্রাচীন ব্রাহ্ম বলিতেছেন ;—"দেবেন্দ্রবাবুর সহিত দিন কতকের আলাপের পর কেশববাবু সত্যেন্দ্রবাবুকে আপনার মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া এক পত্র লিখেন। তাহাতে তিনি দেবেন্দ্রবাবুকে ধর্ম্মতাত বলিয়া বরণ করিয়াছিলেন। সেই পত্রে দেবেন্দ্রবাবু কেশববাবুর মনের ভাব অবগত হইয়া অসীম আনন্দলাভ করিলেন। তিনি কেশববাবুর সহিত প্রথম সাক্ষাতেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে এই যুবা সাধারণ লোক হইবেন না। এক্ষণে তাঁহার পিতৃ সম্বোধনে আপ্যায়িত হইয়া তিনিও তাঁহাকে পুত্র বলিয়া মনে মনে গ্রহণ করিলেন। কিন্তু তখনো তিনি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ গাম্ভীর্য্য অনুসারে তাঁহার আন্তরিক ভাব সহসা প্রকাশ করিলেন না। সুতরাং তখন তাঁহাদের মধ্যে আর কোন ঘনিষ্ঠতা জন্মিল না। কিন্তু এই-সকল শুভ লক্ষণ দেখিয়া তাঁহার মনে যে আনন্দোদ্ভব হইয়াছিল, তাহাতে মধ্যে মধ্যে তাঁহার আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইত। কেশববাবু ও দেবেন্দ্রবাবুর মহত্ত্ব, আপনার জীবনের গতি ও ব্রাহ্মসমাজের অবস্থা চিন্তা করিতে করিতে অভাবনীয় সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। ১৭৮২ শকের প্রথম দিবস নববর্ষোপলক্ষিত ব্রাহ্মসমাজের উপাসনার পর, কেশববাবুর ভক্তিভাব উচ্ছ্বসিত হওয়াতে তিনি ঐ সমাজ-মন্দিরে প্রকাশ্যে পিতৃভাবে তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। তখন দেবেন্দ্রবাবুও তাঁহার আন্তরিক ভাব অব্যক্ত রাখিতে না পারিয়া পুত্রভাবে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। এইরূপে কেশববাবু ও দেবেন্দ্রবাবুতে ঘনিষ্ঠতর যোগ আরব্ধ হইল।" এই যোগ ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে এবং সমগ্র বঙ্গদেশের পক্ষে এক মহা-ব্যাপার। কারণ এই দুই মহাপুরুষের মিলন মণিকাঞ্চন যোগের ন্যায় হইয়া দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছে।"

একদিন কেশবচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথের নিকট প্রস্তাব করিলেন যে বিশেষরূপে ব্রাহ্মধর্ম্ম আলোচনা করিবার জন্য এবং যুবকদিগকে এবিষয়ে সহায়তা করিবার জন্য এক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিলে অনেক উপকার হইবার সম্ভাবনা। দেবেন্দ্রনাথ ঐ প্রস্তাবে সম্মত হইলে ১৭৮১ শকের ২৬ বৈশাখ দিবসে সিমুলিয়াপটিস্থ একটি বাটী স্থির হইল এবং তাহাতে ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপিত হইল। এ সম্বন্ধে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়।

"সম্প্রতি সিমুলিয়াপটির গোপাল মল্লিকের বাটীতে ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। তথায় প্রতি রবিবার প্রাতঃকালে ৭ ঘণ্টা অবধি ৯ ঘণ্টা পর্য্যন্ত ব্রহ্মবিষয়ক উপদেশ দেওয়া হইয়া থাকে। কেবল প্রতি মাসের প্রথম রবিবারে প্রাতঃকালের পরিবর্ত্তে সন্ধ্যা ৭টার সময় উক্ত বিদ্যালয়ের উপদেশ আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রহ্মের স্বরূপ ও তাঁহার প্রতি প্রীতি এবং তাঁহাতে আত্মসমর্পণ বিষয়ে উপদেশ দিয়া থাকেন এবং শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধন এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মের লক্ষণ ও তদনুষ্ঠান বিষয়ে সুচারু উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। যাঁহারা ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্ররূপে প্রবিষ্ট হইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা কলুটোলা-নিবাসী শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনের নিকট আবেদন করিবেন।"

এই বিদ্যালয়ে দেবেন্দ্রনাথ বঙ্গভাষাতে এবং কেশবচন্দ্র ইংরাজীতে উপদেশ প্রদান করিতেন। ইঁহাদের উপদেশে বহুসংখ্যক যুবক আকৃষ্ট হইয়া বিদ্যালয়ে রীতিমত অধ্যয়ন আরম্ভ করিলেন। কেবল উপদেশ দিয়া ইঁহারা ক্ষান্ত ছিলেন না, কিন্তু ছাত্রেরা ঐ-সমস্ত বিষয় সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছে কি না তজ্জন্য নিয়মিতরূপে পরীক্ষা হইত। এবং পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে প্রশংসাপত্র দেওয়া

হইত। এই প্রকার শ্রুত হওয়া যায় যে "কেশবচন্দ্র-প্রদত্ত দার্শনিক প্রশ্নসকল এতদূর কঠিন হইত যে, তৎকালের একজন কলেজের ইংরাজ অধ্যাপক প্রশ্ন দেখিয়া বলিয়াছিলেন যেসকল ছাত্র এই-সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে তাহাদিগকে অন্য পরীক্ষা না দিলেও এম, এ উপাধি অর্পণ করিতে তাঁহার কোন আপত্তি নাই।"

দেবেন্দ্রনাথ এই বিদ্যালয়ে যেসমস্ত উপদেশ প্রদান করিতেন, সত্যেন্দ্রনাথ সে-সমস্ত লিখিয়া রাখিতেন। তিনি প্রথমে নিম্নলিখিত বিষয়ে দশটি উপদেশ প্রদান করেন। ১। ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও লক্ষণ। ২। ঈশ্বর সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা। ৩। পরমেশ্বর আনন্দ-স্বরূপ। ৪। ঈশ্বর সত্যস্বরূপ। ৫। ঈশ্বরানুরাগ ও বিষয়বিরাগ। ৬। বিষয়সুখ ও ব্রহ্মানন্দ। ৭। পরলোক। ৮। স্বর্গ ও নরক। ৯, ১০। মুক্তি।

"ব্রহ্মবিদ্যালয়ের এইসকল উপদেশ ব্রাহ্মসমাজের পূর্ব্ববর্ত্তী সমুদায় ধর্ম্মালোচনার ফলস্বরূপ। দেবেন্দ্রবাবু পূর্ব্বে ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থখানি প্রস্তুত করিয়া যেমন শাস্ত্র হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মমত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তেমনি এক্ষণে তাঁহার নিজের চিন্তা ও ভাব হইতে এই দশটি উপদেশ দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মবিষয়ক মত ও বিশ্বাস প্রকাশ করিয়া সর্ব্বপ্রকার জিজ্ঞাসু লোকের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিলেন।" এই-সমস্ত উপদেশ পুস্তকাকারে ১৭৮৩ শকের শেষে প্রকাশিত হইয়াছিল। সত্যেন্দ্রনাথ এই পুস্তকের উপক্রমণিকাতে ধর্ম্মের সহজজ্ঞানমূলকত্ব প্রতিপাদন করিয়া একটি প্রবন্ধ যোগ করিয়া দিয়াছিলেন। এই পুস্তকখানি সকল ব্রাহ্মের পক্ষে অতি উপাদেয় বস্তু হইয়া এখনও বর্ত্তমান আছে।

১৭৮১ শকে দেবেন্দ্রনাথ কতকগুলি শিক্ষিত যুবকের অনুরোধে হালিসহরে গমন করিলেন এবং তাঁহাদের ব্রাহ্মধর্ম্মে উৎসাহ ও অনুরাগ

দর্শন করিয়া অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিলেন। সেখানকার ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে তিনি তথায় গমন করিয়াছিলেন। এই সময়ে ভক্তি-ভাজন রাজনারায়ণ বসু মহাশয় মেদিনীপুরে গবর্ণমেণ্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষকরূপে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি মেদিনীপুরে যাহা করিয়াছেন তাহা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। মেদিনীপুরে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য সম্বন্ধে বসু মহাশয় প্রায় সর্ব্বদাই দেবেন্দ্রনাথের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। সেই সময়ে কলিকাতাতে এবং মেদিনীপুরে সুবর্ণবণিকদের মধ্যে কোন কোন শিক্ষিত যুবক ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। মেদিনীপুরে শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র দত্ত ব্রাহ্মধর্ম্মে এমনি অনুরক্ত হইয়াছিলেন যে তিনি সংসারের কাজকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য দেবেন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিতে কলিকাতা আসেন এবং তাঁহার সহিত কিয়ৎকাল বাস করেন। সর্ব্বদাই যুবকদিগের সহিত মিশিয়া যাহাতে তাঁহারা ধর্ম্মবিষয়ে উন্নতিলাভ করিতে পারেন এবং অন্যান্য বিষয়ে তাঁহাদিগকে সহায়তা করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথ অত্যন্ত যত্নশীল ছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন একমেবাদ্বিতীয়মের পূজা প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য বিধাতা তাঁহাকে এজগতে প্রেরণ করিয়াছেন এবং তাঁহারই আদেশ কায়মনোবাক্যে প্রতিপালন করিবার জন্য তিনি সর্ব্বদাই চেষ্টা করিতেন।

পুনরায় আশ্বিন মাস আসিয়া উপস্থিত হইল, তিনি আর গৃহে থাকিতে পারিলেন না। প্রত্যেক বৎসর পূজার সময় তিনি গৃহ পরিত্যাগ করিয়া ভ্রমণার্থ বাহির হইতেন। এবৎসরও তাহাই স্থির হইল, কিন্তু অন্যান্য বৎসর যেমন দুর্গাপূজা পরিহার করিবার জন্য বাহির হইতেন, এ বৎসর তেমন নয়, কারণ এবৎসর হইতে তিনি বাটীতে পূজা বন্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এবৎসর "ঈশ্বরের অনন্ত ভাবের

প্রতিবিম্ব দেখিবার জন্য নীলোজ্জ্বল গভীর সমুদ্রের দিকে তাঁহার মন হেলিয়া পড়িয়াছে। এবারে তিনি কেশবচন্দ্র ও সত্যেন্দ্রনাথকে সঙ্গে করিয়া সিংহল ভ্রমণে যাইবেন স্থির হইল। তদনুসারে ১৭৮১ শকের ১২ই আশ্বিনে তিনি কেশবচন্দ্র, সত্যেন্দ্রনাথ এবং বাগবাজারের সুপ্রসিদ্ধ গাঙ্গুলী পরিবারের কালীকমল গাঙ্গুলীকে লইয়া নিউবিয়া নামক বাষ্পীয় পোতে আরোহণ করিয়া সিংহল যাত্রা করেন। সত্যেন্দ্রবাবু বলিতেছেন, "আমাদের সঙ্গে প্রিয় সুহৃৎ কেশববাবু আর কালীকমল বাবু; তাঁহারা বাষ্পীয় নৌকাতে চড়িয়া তাহার কুটরীর এক কোণে লুকাইয়া রহিলেন। সেখান হইতে উপরে কোন বাঙ্গালীকে দেখিবামাত্র বাড়ীর লোক মনে করিয়া চমকিয়া উঠিতে লাগিলেন। সকলের চক্ষে ধূলি দিয়া তাঁহারা যেপ্রকারে আমাদের সমভিব্যাহারী হইলেন, তাহাতে তাঁহারা যে সর্ব্বদাই সশঙ্কিত থাকিবেন, তাহার আর আশ্চর্য্য কি?" ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে কেশবচন্দ্র ও কালীকমল বাবু গোপনে তাঁহাদের সঙ্গে যাইতেছিলেন। প্রায় তিনমাস পরে দেবেন্দ্রনাথ কলিকাতা ফিরিলেন। এই সময়ে তিনি সহযাত্রী যুবকদিগকে নানাপ্রকারে উপদেশ প্রদান করিয়া ব্রাহ্মসমাজের সেবার জন্য তাঁহাদিগকে প্রস্তুত করিয়াছিলেন।



মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ত্রিংশ অধ্যায়।

ব্রাহ্মসমাজে প্রথম ব্যাখ্যান।

দেবেন্দ্রনাথ হিমালয় হইতে প্রত্যাগমন করিলে পর যখন তিনি প্রতিভাশালী ও ধর্ম্মানুরাগী যুবক কেশবচন্দ্রের সহিত মিলিত হইলেন, তখন একজনের সাধন ভজন, অভিজ্ঞতা ও ব্রহ্ম-উপলব্ধি অন্যের ঈশ্বরানুরাগ উৎসাহ, পরিশ্রম ও প্রতিভার সহিত মিলিত হইয়া ব্রাহ্মসমাজে নবযুগের অবতারণা করিল। এই সময় ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে এবং দেশের পক্ষে এক অভিনব সময়। এই দুইজনের সম্মিলন হইতে যে মহোপকার সাধিত হইয়াছে এবং দেশে যে নূতন মুক্তিপ্রদ ধর্ম্মের প্রচার হইয়াছে, তাহা চিন্তা করিলে মনে হয় বিধাতা যেন বহুদিনের গভীর তিমিররাশি হইতে ভারতকে মুক্ত করিবার জন্য এই ঘটনা সম্পন্ন করিলেন। দেবেন্দ্রনাথের চরিত্র ও জীবন এক্ষণে বহুলোকের প্রশংসা ও ভক্তির বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার অনন্যসাধারণ ব্যাকুলতা, স্বার্থত্যাগ, চরিত্রের পবিত্রতা কলিকাতার শিক্ষিতমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। বিশেষতঃ তিনি যখন 'বঙ্গের ধনকুবেরের' পুত্র হইয়া ফকীরের ন্যায় দুই বৎসর কাল হিমালয়ের নির্জ্জন প্রদেশে ব্রহ্মদর্শনে রত হইয়া অতিবাহিত করিলেন, তখন লোকে বুঝিতে পারিল এযুগে তিনি ঈশ্বরানুরাগ ও ব্যাকুলতার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবার জন্যই যেন জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার পবিত্র জীবন ও মধুর চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া অনেক যুবক তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি ব্রাহ্মসমাজে পুনরায় যখন বক্তৃতা ও উপদেশ প্রদান করিতে

আরম্ভ করিলেন তখন এতলোকে সমাজে আসিতে আরম্ভ করিলেন, যে স্থান সংকুলন হওয়া বড় কঠিন হইয়া উঠিল। সুতরাং তাঁহারা উপাসকমণ্ডলীর জন্য নির্দ্দিষ্ট আসন করিতে বাধ্য হইলেন। এ সম্বন্ধে পত্রিকাতে আমরা এইরূপ বিজ্ঞাপন দেখিতে পাই—"এক্ষণে ব্রাহ্মসমাজে লোকের অধিক সমারোহ হওয়াতে, অনেক ব্রাহ্মেরা উপাসনার জন্য আসন প্রাপ্ত হয়েন না; অতএব ব্রাহ্মদিগের জন্য কতকগুলি আসন নির্দ্দিষ্ট করা অত্যন্ত প্রয়োজন বোধ হওয়াতে বিজ্ঞাপন করা যাইতেছে যে, যে-সকল ব্রাহ্মেরা নিয়মিতরূপে ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া উপাসনা করিতে অভিলাষ করেন, তাঁহারা আমার নিকটে অবেদন করিলে তাঁহাদের জন্য আগামী পৌষ মাস অবধি আসন নির্দ্দিষ্ট থাকিবেক। তাঁহাদের নিকট যে নিদর্শন-পত্র প্রেরণ করা যাইবেক, তাহা তাঁহারা সমাজ-রক্ষককে দেখাইলেই তাঁহাদের আপন আপন নির্দ্দিষ্ট আসন পাইতে পারিবেন। আসন নির্দ্দিষ্ট হইবার যে নিয়ম ধার্য্য হইল, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল, তদনুসারে কার্য্য হইবেক। শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ, কলিকাতা—ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য।"

এতদিন পর্য্যন্ত দেবেন্দ্রনাথ বেদীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বক্তৃতা ও উপাসনা করিতেন। তিনি আপনাকে এত হীন মনে করিতেন যে ব্রাহ্মসমাজের বেদী গ্রহণের অনুপযুক্ত বলিয়া তাহা গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার অন্তরের বিনয় ও অমায়িকতার এই এক আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত। আমরা ইহা সহজেই বুঝিতে পারি যদি কেহ তখন ব্রাহ্মসমাজের বেদী গ্রহণ করিবার উপযুক্ত ব্যক্তি ছিলেন, তবে তিনি দেবেন্দ্রনাথ। কিন্তু এ ভাব তাঁহার মনে একদিনের জন্যও স্থান পায় নাই যে তিনি ব্রাহ্মসমাজের বেদীতে

বসিয়া উপদেশ প্রদান করিবেন। কেশবচন্দ্র ইহা বুঝিতে পারিলেন। তিনি দেখিলেন যাঁহারা দেবেন্দ্রনাথ অপেক্ষা কোন প্রকারে উন্নত নহেন তাঁহারা বেদীতে আসন গ্রহণ করিবেন, অথচ ঈশ্বরপিপাসু, যোগী, প্রবীণ দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া উপদেশ দিবেন, ইহা কখন হইতে পারে না। কেশবচন্দ্র তাঁহাকে বেদী গ্রহণ করিবার জন্য বারম্বার অনুরোধ করাতে অবশেষে বাধ্য হইয়া তিনি বেদী গ্রহণ করিলেন। প্রতি বুধবারে তিনি বেদী হইতে উপাসনা করিতেন এবং তাঁহার সম্মুখে কেশবচন্দ্রপ্রমুখ যুবকগণ উপবেশন করিতেন। মন্দির-গৃহ লোকে পরিপূর্ণ হইয়া যাইত। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় হারমোনিয়ম বাজাইতেন এবং সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নূতন নূতন সংগীত, গায়কেরা তাল মান লয়ের সহিত অতি বিশুদ্ধ ভাবে গান করিতেন। আর দেবেন্দ্রনাথ বেদী হইতে ভাবে বিভোর হইয়া মহোৎসাহে ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান অগ্নিময়ী ভাষাতে প্রকাশ করিতেন। ১৭৮২ শক ১১ই শ্রাবণ দিবসে তিনি প্রথম ব্যাখ্যান করেন। এই ব্যাখ্যানটি আমরা যথাযথ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"তং বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথা'। মৃত্যু তোমারদিগকে ব্যথা না দিউক, এই হেতু সেই অমৃতপুরুষকে আশ্রয় কর। সংসারে যতপ্রকার বিপদ আছে, সকল অপেক্ষা ভয়ানক বিপদ মৃত্যু। মৃত্যুর করাল মূর্ত্তি সর্ব্বদাই আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে। সংসার মৃত্যুরই প্রতিকৃতি। সংসারে যার জন্ম, তারই মৃত্যু; যার বৃদ্ধি তারই ক্ষয়। এখানকার চঞ্চল অনিত্য বিষয়সকল, পরিবর্ত্তনশীল অস্থির ঘটনাসকল, মৃত্যুকেই স্মরণ করিয়া দেয়। এই মৃত্যু-ভয়, এই মৃত্যু-পীড়া হইতে কি প্রকারে

নিস্তার পাইতে পারি? মৃত্যুর প্রতিকৃতি সর্ব্বত্রই রহিয়াছে। কিন্তু সেই অমৃতস্বরূপকে আশ্রয় করিয়া আমরা মৃত্যুভয় হইতে মুক্ত হই। সংসারেই মৃত্যু-ভয়, সংসারপারে সেই অমৃত-ধাম। এখানে মৃত্যু-ভয়ে ভীত হই; আবার এখানেই অমৃতকে আশ্রয় করিয়া অভয় প্রাপ্ত হই। কি আশ্চর্য্য! আমরা মৃত্যুর মধ্যে থাকিয়া অমৃতকে জানিতেছি! অতি ক্ষুদ্র হইয়া সেই রাজ-রাজ দেব-দেবের আশ্রয় প্রাপ্ত হইতেছি। এই-সকল বিচিত্র ঘটনার মধ্যে থাকিয়া তাঁহার মঙ্গল-উদ্দেশ্য সম্পন্ন করিতেছি। এখানে কত পশু পক্ষী, সিংহ হস্তী, জলচর খেচর, কতপ্রকার জীব আছে, তাহারা তাহাদের স্রষ্টা পাতাকে জানিতে পারে না; তাহারা তাঁহার প্রসাদে সুখে সঞ্চরণ করিতেছে, অথচ তাঁহার প্রসাদ অনুভব করিতে পারে না। তাহারা তাঁহার কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে, কিন্তু না জানিয়া তাঁহার কার্য্য করিতেছে। মনুষ্যেরই এই প্রশস্ত উন্নত অধিকার যে তিনি জানিয়া শুনিয়া আপন ইচ্ছাতে তাঁহার মঙ্গল অভিপ্রায়ে যোগ দিতেছেন। মনুষ্যই মৃত্যুর মধ্যে থাকিয়া সেই অমৃতকে প্রাপ্ত হইতেছেন। এই ভয়ানক স্থানে থাকিয়া সেই অভয়-পদকে আশ্রয় করিতেছেন। এখানেই তাঁহার সঙ্গে সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিতেছেন। অমৃতের পুত্র হইয়া অমৃতের আশ্রয়ে নির্ভয় হইতেছেন। তাঁহার প্রতি নির্ভর করিলে আমাদের নূতন জীবনের সঞ্চার হয়, তাহা হইলে আমাদের আত্মার আনন্দভাব আর কিছুতেই যায় না। আমাদের শরীর মন ক্লিষ্ট হইতে পারে; আমরা বিপদেই আক্রান্ত হই আর রোগেই বা কাতর হই, তথাপি সেই আত্মার আনন্দ কিছুতেই অবসন্ন হয় না। সেই অমৃত-নিকেতনকে আশ্রয় করিলে এমন যে ভয়ানক মৃত্যু, সেও আমাদিগকে ভয় দিতে পারে না।

"অতএব এই ঘোরতর সংসারে থাকিয়া ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিও না।

"মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোদ্ অনিরাকরণমস্ত।

ব্রহ্ম আমাকে পরিত্যাগ করেন নাই, আমি যেন তাঁহাকে পরিত্যাগ না করি। তাঁহাকে ছাড়িয়া যেন জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ না করি। যাঁহা হইতে আমরা সকল ভোগ সকল সুখ পাইয়াছি; ক্ষণকালের নিমিত্ত যিনি আমারদিগকে বিস্মৃত নহেন; তাঁহাকে যেন পরিত্যাগ না করি। একবার ভাবিয়া দেখ, তিনি আমারদিগকে পরিত্যাগ করিলে আমাদের কি দশা হইত? আমরা কোথায় থাকিতাম? আমরা এতদিনে বিনাশ প্রাপ্ত হইতাম। কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ-আনন্দো ন স্যাৎ। কে বা শরীর-চেষ্টা করিত, কে বা জীবিত থাকিত, যদি এই আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই না থাকিতেন? তিনিই সকলকে আনন্দ বিতরণ করেন। ভূমিষ্ঠ হইয়া অবধি আমরা যাঁহার প্রীতিতে লালিত পালিত হইতেছি; অনন্তকাল পর্য্যন্ত যাঁহার আশ্রয়ে থাকিবার আশা করিতেছি; তাঁহাকে কি পরিত্যাগ করিব? তিনি আমাদিগকে বিস্মৃত নহেন; তিনি এ প্রকার অনুগ্রহ করুন, যেন আমরা তাঁহাকে বিস্মৃত না হই। তিনি আমা কর্ত্তৃক সর্ব্বদা অপরিত্যক্ত থাকুন। যিনি আমাদের সুখের জন্য, শিক্ষার জন্য, ধর্ম্মের জন্য ব্যস্ত রহিয়াছেন; তাঁহাকে কি পরিত্যাগ করিব? এই কি মনুষ্যের কার্য্য? তাঁহাকে কেনই বা ত্যাগ করিব? তাহাতে কি আমাদের মঙ্গল হইবে? এখানে আমাদের কি কোন যাতনা নাই, সংসারে কি কোন বিঘ্ন নাই; আমাদের শরীর কি ক্লিষ্ট হইতেছে না, মন কি অবসন্ন হইতেছে না যে তাঁহার আশ্রয় ব্যতীত আমরা থাকিতে পারি? এখানে কি কোন ভয় নাই যে সেই অভয়পদকে আশ্রয়

করিতে হইবে না ? এখানে কি পাপতাপ নাই যে সেই পতিতপাবনের শরণাপন্ন হইবে না ? এখানে দীপ্ত-শিরা হইলে তিনি ব্যতীত আর কে আমাদিগকে শীতল করিবে ? এই ভয়াকীর্ণ সংসারে ভীত হইলে আর কে আমারদিগকে অভয় দান করিবে ? কেবল এক মোহ আসিয়া আমারদিগকে তাঁহা হইতে দূরে প্রক্ষেপ করিতেছে। তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলে কি আমাদের মঙ্গল হয় ? তাঁহাকে ছাড়িয়া আমাদের ধর্ম্মকার্য্য স্বার্থপরতা হইয়া পড়ে—আমাদের সুখভোগে কৃতঘ্নতা প্রকাশ পায়। এখানে যাঁহারা এই উপদেশ শ্রবণ করিতেছেন, তাঁহারা যদি কেবল শ্রবণ করিয়াই চলিয়া যান, তবে এখানে আসাই বৃথা। যদি গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াই ঈশ্বরকে ভুলিয়া যান, তবে তাঁহাদের আর কি হইল ? তাঁহাদের হৃদয় যদি উন্নত না হয় ; ঈশ্বরানুরাগ প্রজ্বলিত না হয় ; বিষয়কার্য্যের সময় তাঁহাকে মনে না থাকে ; তবে এত ক্লেশ করিয়া এখানে আসিবার আবশ্যক কি ? তাঁহারা কি এখানে কেবল পাঠ ও শ্রবণের জন্যই আসিয়াছেন ? ব্রহ্মের সহিত দৃঢ়তর সম্বন্ধ নিবন্ধ করিবার জন্য নহে ? যদি সুখের সময় তাঁহার প্রসাদ স্মরণ না করেন, যদি অন্নপানে পুষ্ট হইয়া সেই অন্নদাতাকে মনে না রাখেন, তবে তাঁহারা কি করিলেন ? সেই পবিত্রতার প্রস্রবণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পবিত্রতা কোথায় পাইবে ? ধর্ম্মাবহকে ছাড়িয়া আপনাকে ধার্ম্মিক বলিয়া কি প্রকারে পরিচয় দিবে ? সেই মঙ্গল-নিকেতনকে ত্যাগ করিয়া কিরূপে ভদ্র নামের যোগ্য হইবে ? অদ্য হইতেই তাঁহাতে আত্ম-সমর্পণ কর, অদ্যই তোমরা নবজীবন প্রাপ্ত হইবে।

"তাঁহাকে কি প্রকারে উপাসনা করিতে হয়, তাহার কি উপদেশ চাই ? প্রাণ ধন, বিদ্যা বুদ্ধি, যাহা হইতে সকলই পাইয়াছি, তাঁহার

প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া কি উপদেশ-সাপেক্ষ? আজন্ম যাঁহার প্রসাদ উপভোগ করিতেছি, অনন্তকাল যাঁহার আশ্রয়ে থাকিব, তাঁহার উপাসনাতে কি শিক্ষা চাই? পাপে তাপিত হইয়া তাঁহার আশ্রয়ে কি মনের মালিন্য দূর করিবে না? সেই গুরুর গুরু পিতার পিতাকে কি আরাধনা করিবে না? ধর্ম্মবল উপার্জ্জন করিবার জন্য কি তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিবে না? স্বভাবকে বিকৃত না করিলে আর তাঁহার উপাসনাতে অশ্রদ্ধা জন্মে না। আত্মাকে প্রকৃতিস্থ কর, অদ্য রাত্রি হইতেই তাঁহার উপাসনা আরম্ভ কর। কেবল শ্রবণ করিলে কোন ফল নাই। তাঁহার শরণাপন্ন না হইলে এ দেশের মঙ্গল কোথায়? যে দেশে ঈশ্বরের পূজা নাই—যে পরিবারের মধ্যে তাঁহার পবিত্র নাম উচ্চারণ হয় না—যে হৃদয়ে তাঁহার পবিত্র আসন নাই; সেই শূন্য দেশ, সেই শূন্য পরিবার, সেই শূন্য হৃদয় কেবল ঘন বিষাদের আলয়। অদ্য হইতেই তাঁহাকে আশ্রয় কর, তাঁহার উপাসনা আরম্ভ কর। তোমাদের শুনিবার উপায়ের অভাব নাই, তোমরা জ্ঞান দ্বারা অনেকে বুঝিয়াছ; তবে জ্ঞান ও কার্য্যে, বিশ্বাস ও আচরণে কেন না মিলিত কর? তোমরা অদ্য হইতেই তাঁহার উপাসনা আরম্ভ কর; তাহার ফল অচিরাৎ পাইবে। তাঁহার প্রসাদে জীবনের সমুদায় সুখভোগ করিতেছ, কৃতজ্ঞ হইয়া তাঁহাকে নমস্কার কর। ভয় ও বিপদের সময় তাঁহাকে আশ্রয় কর; মাতৃ-ক্রোড়ে যাইয়া শিশু যেমন নির্ভয় হয়, সেই প্রকার ভয়শূন্য হইবে। পাপে তাপিত হইলে অনুতাপ ও অশ্রুপাত করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হও। তিনি শরণাগতবৎসল. তিনি তোমাকে পাপ হইতে মুক্ত করিবেন। যিনি জগতের ঈশ্বর, রাজাধিরাজ, দেবতার দেবতা, তাঁহার আরাধনা কর। যাঁহাদের জানিয়া শুনিয়াও তাঁহার উপাসনাতে প্রবৃত্তি হয় না, তাঁহারা আপনাকে পবিত্র করুন; ঈশ্বরের

নিকটে যুক্ত হৃদয়ে প্রার্থনা করুন, যত্ন করুন, অবশ্যই তাঁহার প্রসাদ অনুভব করিবেন। ব্রহ্ম আমাকে পরিত্যাগ করেন নাই, আমি যেন তাঁহাকে পরিত্যাগ না করি; এই বাক্যের অর্থ তাঁহাদের হৃদ্গত হইবে।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।"

এক দিকে দেবেন্দ্রনাথ যেপ্রকার সরল ভাষাতে ও প্রেমে বিগলিত হইয়া ঈশ্বরের গুণানুকীর্ত্তন করিতেন এবং অতিশয় উৎসাহ সহকারে উপদেশ প্রদান করিতেন, অন্যদিকে তেমনি সত্যেন্দ্রনাথের নূতন রচিত উচ্চভাবপূর্ণ সংগীত-সকলের দ্বারা গায়কবৃন্দ উপাসকমণ্ডলীর হৃদয়ে নূতন নূতন ভাবের সঞ্চার করিয়া সকলকে বিগলিত করিয়া দিতেন। তখনকার রচিত কয়েকটি সংগীত এস্থলে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। এই-সকল সংগীতের রচনা যেমন উৎকৃষ্ট, রাগ রাগিণী তালও তেমনি অতি গম্ভীর।

রাগ গৌড় মল্লার—চৌতাল।

গাও তাঁরে, গাও সদা তরুণ ভানু, যবে অচেতন জগতে দেও প্রাণ; জনহৃদয় প্রফুল্ল কর চন্দ্রতারা সবে মিলে মিলে গাও তাঁরে।

সুগভীর গরজনে কাঁপাইয়া গগন মেদিনী, মহেশের মহৎ যশ ঘোষো, বারিদ; সবে মিলে মিলে গাও তাঁরে।

প্রবল সিন্ধু, স্রোতস্বতী, প্রফুল্ল কুসুম বনরাজী, অগ্নি, তুষার, কেহই থেকনা নীরব;

যত বিহঙ্গ চিত্র বিচিত্র সবে, আনন্দ-রবে গাও বিশ্ববিজয়ী ব্রহ্ম-নাম; সবে মিলে মিলে গাও তাঁরে।

রাগিণী ইমনকল্যাণ—চৌতাল।

তুমি জ্ঞান প্রাণ ; তুমিই সত্য, তুমি সুন্দর, তুমি মঙ্গল ; তুমি ভেলা ভবার্ণবে ; তুমি দীনশরণ ; তুমি গুরু পিতা মাতা।

তুমি আদি, তুমি অন্ত ; তুমি জ্যোতিস্বরূপ, তুমি সর্ব্বসুখদাতা ;

তুমি নিত্য, তুমি পুরাণ ; তুমি পরম, তুমি অমৃত-সেতু ; তুমি অগম্য অপার ; প্রপঞ্চবিষয়াতীত, অনাদি অন্তত কারণ, তুমি সকলের মূলাধার।

রাগিণী বেহাগ—রূপক।

প্রেম-মুখ দেখরে তাঁহার। শুভ্র সত্যস্বরূপ সুন্দর নাহি উপমা তাঁর।

যায় শোক, যায় তাপ, যায় হৃদয়ভার ; সর্ব্বসম্পৎ তাহে মেলে, যখন থাকি তাঁর সাথ।

না থাকে সংসারতাপ, করেন ছায়াদান ; সকল সময়ে বন্ধু তিনি এক, সম্পদে বিপদে।

যদি আসে তাঁর কাজে দিয়াছেন যে প্রাণ, ছাড়ি যাব অনায়াসে তাঁরে করিব দান।

রাগিণী বেহাগ—ধামাল।

অমৃতধনে কে জানে রে কে জানে রে। প্রখর বুদ্ধি না পেয়ে আসে ফিরে, তিনি হে অকিঞ্চন-গুরু।

ব্যাকুল অন্তরে চাহরে তাঁহারে, প্রাণ মন সকলি সঁপিয়ে ;

প্রেমদাতা আছেন ক্রোড় প্রসারি, যেজন যায় নাহি ফেরে।

দেবেন্দ্রনাথ প্রতি বুধবার মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর সমাজের তেতলাতে বসিয়া সমস্ত দিন ঈশ্বরচিন্তাতে যাপন করিতেন, তৎপরে বাটী আসিয়া স্নান করিয়া সমাজে গিয়া বেদী গ্রহণ করিতেন। সমস্ত দিন এইরূপ নিষ্ঠার সহিত ব্রহ্মচিন্তাতে যাপন করিয়া সন্ধ্যার পর যখন বেদী গ্রহণ

করিতেন, তখন শ্রদ্ধা ও ব্রহ্মভক্তি যেন আপনা হইতে আসিয়া তাঁহার হৃদয়কে অধিকার করিত। তিনি ব্রহ্মপ্রেমে আবিষ্ট হইয়া উপদেশাদি প্রদান করিতেন। সেই সময়ে যাঁহারা তাঁহার উপাসনাতে যোগদান করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে সুবিখ্যাত দুই ব্যক্তির এ বিষয়ে মন্তব্য নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয় বলিতেছেন—"ব্রাহ্মধর্ম্মের পুরাবৃত্ত আলোচনা করিলে ইহা অনায়াসে প্রতীত হইবে যে ইহা ক্রমশঃ উন্নত হইয়া আসিতেছে। এক্ষণে সমাজে যেপ্রকার উপাসনা ও ব্যাখ্যান ও ব্রহ্মসঙ্গীত হইয়া থাকে, তাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্ম অতিশয় সজীব আকার ধারণ করিয়াছে। পূর্ব্বকার ব্যাখ্যানের পরিবর্ত্তে এইক্ষণে যে-সকল ব্যাখ্যান সমাজের বেদী হইতে পঠিত হয়, তাহা হৃদয়ের অন্তরতম দেশ পর্য্যন্ত তড়িতের ন্যায় গমন করিয়া ঈশ্বর-প্রেমাগ্নিতে প্রজ্বলিত করে। পূর্ব্বে যে-সকল গান গীত হইত, তাহাতে ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি-ভাব বড় অধিক প্রকাশিত ছিল না; এক্ষণে যে-সকল সঙ্গীত হয়, তাহা চিত্তকে এরূপ আর্দ্র করে, আত্মাকে এতদ্রূপ উন্নত করে যে তাহা বর্ণনাতীত।"

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র বলিতেছেন;—"রামমোহন রায় যে বেদান্ত শাস্ত্র গোঁড়া পণ্ডিতদিগের মুখ বন্ধ করিবার জন্য গুরুতর প্রামাণিক প্রবচনরূপে সমাজে ব্যবহার করিতেন, বাবু দেবেন্দ্রনাথ উহাকে উচ্চাভিপ্রায় সাধনের জন্য নিয়োগ করিলেন। সে উচ্চাভিপ্রায়—উপাসকগণের চিত্তকে গভীর ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় অনুভূতি, জ্বলন্ত বিশ্বাস এবং প্রগাঢ় ভক্তিতে উপনীত করা। তিনি ঈদৃশ প্রার্থনা, প্রাণদ ব্যাখ্যা প্রচলিত করিলেন, যাহাতে ঈশ্বর এবং সাধকের মধ্যে সাক্ষাৎ ব্যক্তিগত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া দেয়। তিনি ব্রাহ্মসমাজে যে-সকল ব্যাখ্যান করিয়াছেন, তাহাতে যোগানন্দ, অধ্যাত্ম রাজ্যের শোভা,

আত্মসমর্পণের শান্তি, মানবজাতির পিতা মাতা পাপীর পরিত্রাতা ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য এবং গৌরব, যে স্বর্গে শোক নাই কেবল আনন্দের সাম্রাজ্য—সেই স্বর্গে ঈশ্বরের নিত্যসুখকর সঙ্গ ভাবোদ্দীপক বাগ্মিতায় চিত্রিত করা হইয়াছে। এই ব্যাখ্যানগুলি অতি শ্রেষ্ঠজাতীয় এবং কোন প্রতিবাদের ভয় না রাখিয়া আমরা বলিতে পারি, কি ইউরোপে কি এদেশে ঈদৃশ বিষয়ে যত ব্যাখ্যান মুদ্রিত হইয়াছে তাহাদিগের সকলের অপ্রতিদ্বন্দ্বী। চিন্তার গাম্ভীর্য্যে, ভাবের গৌরবে, নিবন্ধের সৌন্দর্য্যে ইহারা অতি উৎকৃষ্ট এবং আমরা সম্ভবতঃ লিখিয়া যাহা চিত্তে মুদ্রিত করিয়া দিতে আশা করিতে পারি তদপেক্ষা উহারা বিশিষ্টরূপে অসংখ্য ভাবী বংশধরগণের নিকটে সেই মহৎ আত্মাকে অভিব্যক্ত করিবে যাহা হইতে এইসকল বিনিঃসৃত। ভগবানের পরীক্ষিত দাসের জীবনকে যেন সমসাময়িক লোকে ভক্তি করিতে পারে। সত্যের জন্য দীর্ঘকাল তিনি যে পরিশ্রম করিয়াছেন তজ্জন্য ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ এবং তাঁহার দেশের কৃতজ্ঞতা তাঁহাকে পুরস্কৃত করুক।”

একত্রিংশ অধ্যায়।

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে দুর্ভিক্ষ।

দেবেন্দ্রনাথের ধর্ম্ম—"তস্মিন্ প্রীতি স্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসন মেব"। তিনি ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে মনোযোগী হইয়া যেমন ব্রহ্মবিদ্যালয়ে উচ্চ উচ্চ উপদেশ দ্বারা যুবকমণ্ডলীকে জ্ঞান ও ধর্ম্মের পথে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং বেদী হইতে প্রাণস্পর্শী ব্যাখ্যানের দ্বারা উপাসকদিগকে সাধনপথে অগ্রসর হইবার সহায়তা করিতে লাগিলেন, তেমনি আবার দেশের নরনারীদিগের শারীরিক ও আর্থিক কষ্ট মোচনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি নিজ জীবনে ঈশ্বরপ্রীতি ও মানবসেবার যে আশ্চর্য্য সমাবেশ দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠকেরা একটু চিন্তার সহিত এই পুস্তক অধ্যয়ন করিলেই বুঝিতে পারিবেন। দেবেন্দ্রনাথ যেমন হিমালয়ের নির্জ্জন প্রদেশে সমাসীন সমাধিস্থ ঋষি, তেমনি আবার জনসাধারণের সেবাতে নিযুক্ত অদ্ভুত পরিশ্রমী কর্ম্মবীর।

১৭৮২ শকে পশ্চিমপ্রদেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে। দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত নরনারীরা অন্নাভাবে কাতর হইয়া যে হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদ উত্তোলন করিয়াছে, তাহার প্রতিধ্বনি আসিয়া বঙ্গদেশে উপস্থিত হইয়াছে। প্রতিদিন অন্নাভাবে বহুসংখ্যক লোক মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতেছে। অন্নাভাবে জীর্ণশীর্ণ পিতামাতা কঙ্কালসার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম সন্তানদিগকে অকালে মৃত্যুর হস্তে সমর্পণ করিয়া মর্ম্মভেদীস্বরে চীৎকার করিতে করিতে আপনারাও ভীষণ দুঃখময় জীবনের অবসানের প্রতীক্ষা করিতেছে। ব্রহ্মযোগযুক্ত ঋষি দেবেন্দ্র-

নাথের হৃদয়তন্ত্রীসমূহ সেই চীৎকারধ্বনিতে স্পন্দিত হইয়া উঠিল। তিনি এই ভীষণ অন্নকষ্ট নিবারণের জন্য ব্রাহ্মসমাজের বেদীতে বসিয়া বিধাতার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া নিম্নলিখিতরূপে উপাসকদিগকে সম্বোধন করিতে লাগিলেন ঃ—

"অদ্য এই পবিত্র ব্রাহ্মসমাজে আমরা সকলে প্রীতির সহিত সম্মিলিত হইয়াছি। আমাদের আত্মাতে প্রীতি, হৃদয়ে মঙ্গল ভাব। আমরা ঈশ্বরকে প্রীতিদান করিব, এককালে সম্যকরূপে তাঁহার উপাসনা করিব। আজ আমাদের মহৎদিন। ঈশ্বর আমাদের নিকট হইতে পূজা চান; প্রীতি এবং আমাদের প্রীতির দান চান। আমাদের যৎকিঞ্চিৎ অন্নদানে ভ্রাতৃগণের দুঃখ দূর হইবে। উত্তমপশ্চিমে দারুণ মৃত্যু যেপ্রকার নির্দ্দয়রূপে এক্ষণে শাসন করিতেছে—চিতা-অগ্নির সহিত শোকানল দাবানলের ন্যায় যেপ্রকার অহর্নিশি প্রজ্বলিত হইতেছে; আমারদের কিঞ্চিৎ দানে তাহার উপশম হইবে। যেস্থানে এই দারুণ দুর্ভিক্ষ অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহা আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রিয়ভূমি। সেই প্রদেশই আমাদের জ্ঞান ও ধর্ম্মের আকরস্থান। আমাদের ঋষিরা সরস্বতী-নদীর তীরে ব্রহ্মাবর্ত্তে ব্রহ্মের নাম উচ্চারণ করিতেন। তাঁহাদের মুখ হইতে "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এই-সকল জীবন্ত মহাবাক্য বিনির্গত হইয়াছে, তাহা এখনো পর্য্যন্ত আমরা সংকীর্ত্তন করিতেছি। আহা! সেখানকার লোকেরা অন্নাভাবে প্রাণত্যাগ করিতেছে। সেই দাবানল নির্ব্বাণের নিমিত্তে আমাদের যাহার যে ক্ষমতা, যৎকিঞ্চিৎ বারিদানে যেন ত্রুটি না হয়। সেই ভারতভূমির প্রধান স্থান—সেখানকার সকলে শোকেতে, দুঃখেতে, ক্ষুধাতে, তৃষ্ণাতে জর্জ্জরিত হইতেছে। তাহাদের এই দুঃখের অবস্থা স্মরণ করিয়া আমরা কি

উদাসীন থাকিব? সেখানকার সেই ঘোর সন্তাপানল এ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। মৃতকল্পা মাতার উষ্ণ নিঃশ্বাস এখান পর্য্যন্ত আসিয়া আমাদের সমুদায় শরীর দগ্ধ করিয়া দিতেছে। এস আমরা সকলে যথাসাধ্য দান করিয়া সেই দুঃখ নিবারণ করি। ইহাতে আমরা কেবল আমাদের ভ্রাতৃগণের দুঃখ শান্তি করিব, এমন নহে; ইহার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পিতার কার্য্য করা হইবে। এই একস্থানে বসিয়াই আমাদের প্রীতি ও প্রিয়কার্য্য সাধন হইবে। সকলে হৃদয়ের দ্বার উদ্ঘাটন কর। প্রীতিকে প্রসারিত করিয়া ভারতভূমিকে ব্যাপ্ত কর। যে প্রীতি সমুদায় পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হইয়া ঈশ্বরের উদার প্রীতির ভাব ধারণ করিবে, তাহা কি এই সংকীর্ণ ভারতভূমিতে ব্যাপ্ত হইবে না? সেই পশ্চিম-বাসীগণ, যাহাদের দেশ হইতে—যেমন হিমালয় হইতে গঙ্গা আসিয়াছে—আমরা সেই গঙ্গার ন্যায় পূর্ব্বদেশে প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছি; ভাষাতে জ্ঞানেতে ধর্ম্মেতে সমুদায় সংসারের কার্য্যতে যাহাদের সঙ্গে আমাদের ঐক্য, তাহাদের সঙ্গে সমদুঃখী হওয়া কি কঠিন? তাহাদের দুঃখ-দাবানলে কিঞ্চিৎ সাহায্য দিতে কি আমাদের কষ্টবোধ হইবে? তাহাদের দুঃখ দেখিয়া আমরা কি হাস্য কৌতুকে দিন যাপন করিব? তাহারা অন্নাভাবে মরিতেছে মনে করিয়া আমরা কি অন্নের কোন স্বাদ পাই?

"আমরা ঈশ্বরের উপাসনার সময় বলি, তোমার যে করুণা তাহার প্রতিক্রিয়া কি করিব? তুমি অহর্নিশি আমাদিগকে রক্ষা করিতেছ, অন্নপানে হৃষ্টপুষ্ট রাখিতেছ, রজনীতে অন্ধকার প্রসারিত করিয়া বিশ্রামে প্রবৃত্ত করিতেছ; আমরা তাহার কি প্রতিক্রিয়া করিব? তাহার প্রতিক্রিয়া কি, শুন। যিনি ক্ষুধা তৃষ্ণা শান্তির নিমিত্তে তোমাদিগকে অজস্ররূপে অন্নপান পরিবেষণ করিতেছেন, তাঁহার অমৃতপুত্র-

দিগের দুঃখশান্তির নিমিত্ত তাহার কতক অর্পণ কর। ঈশ্বর তোমা-দিগকে যাহা কিছু দিয়াছেন, তাহার সকল আপনার জন্য রাখিও না। তোমার ভ্রাতৃগণের দুঃখ একেবারে বিস্মৃত হইও না। এই কি ভুলিবার সময়? তোমার ভ্রাতা ভগিনীরা আহার না পাইয়া কেহ অচেতন হইয়া পড়িয়াছে, কেহ প্রাণত্যাগ করিতেছে; এখন কি ভুলিবার সময়? এখন কি এ কথা বলিবার সময়, আমি বারম্বার দিয়াছি আর দিতে পারি না? এ কথা কি এখন মুখে আনিতে আছে? আমরা যতবার দান করিব, শত শত লোক ধন্যবাদ দিয়া তাহা গ্রহণ করিবে।

"আমরা এই সমাজে আসিয়া প্রীতির সহিত যে নৈবেদ্য প্রদান করিতেছি ঈশ্বর তাহা দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করিতেছেন। আমরা কোন মনুষ্যকে দিতেছি না, আমরা তাঁহার ধন তাঁহাকেই প্রত্যর্পণ করি-তেছি। তিনি আমাদের প্রীতির ধন আদরপূর্ব্বক গ্রহণ করিতেছেন। আমরা আমাদের অকিঞ্চিৎকর বস্তুসকল দিয়া ঈশ্বরের পূজা করিতেছি ভ্রাতৃগণের দুঃখ শান্তি করিতে। ব্রাহ্মেরই এই মহৎ অধিকার। এই-প্রকার নিষ্কাম প্রীতির সহিত ঈশ্বরের হস্তে দান করা ব্রাহ্ম ভিন্ন আর কেহই করিতে পারে না। অন্য লোকে লোককেই দান করে, আমরা ঈশ্বরের দক্ষিণ হস্তে এই-সকল অর্পণ করিতেছি। যিনি ক্ষুধার জন্য অন্ন দিতেছেন, তৃষ্ণার জন্য পানীয় দিতেছেন, তাঁহার অন্নপানীয় তাঁহার অমৃতপুত্রসকলের দুঃখ নিবারণের জন্য আমরা তাঁহারই হস্তে প্রত্যর্পণ করিতেছি। দেখিও যেন আমাদের সাধ্যের কোন ত্রুটি না হয়। এস, আমরা মুক্তহস্তে পিতার চরণে সকলি সমর্পণ করি—ভ্রাতৃবর্গের দুঃখ শান্তি করি—প্রীতি ও প্রিয়কার্য্য একত্রে সংসাধন করি।

"একবার চাহিয়া দেখ, দেখিবে যে চতুর্দ্দিকে দুঃখ-দাবানল

বলিতেছে না, তোমার সম্মুখে সহস্র সহস্র লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতেছে, তুমি কি সুখে ভোজন করিতেছ? কত কত লোক স্তব্ধ শূন্য গৃহে মৃতপ্রায় পড়িয়া রহিয়াছে, আহা! একটি লোক নাই যে তাহাদের প্রতি চাহিয়া দেখে, তুমি কি সুখে শয়ন করিতেছ? সাধু দয়াবৃত্তি কি আমাদিগকে বারম্বার এইপ্রকার আঘাত করিতেছে না? দেখ; আমাদের দেশের কিপ্রকার অবস্থা হইয়াছে। পশ্চিমে যোজন যোজন ভূমি মরুভূমি হইয়া রহিয়াছে, হরিৎবর্ণ আর কোথাও দেখা যায় না। আমাদের এমন ভারতবর্ষ আরব্যদেশের মরুভূমিতুল্য জলশূন্য মরুভূমি হইয়া গেল—ইহার আশ্রিত অগণ্য লোকদিগকে আর আহার দিতে পারে না—একি সামান্য শোচনীয় বিষয়? চক্ষে দেখিলেই কি আমাদের দয়ার উদয় হইবে? এই-সকল দেখিলে কি আমরা ক্ষণকালের জন্য সুস্থ থাকিতে পারিতাম? আমাদের ভ্রাতৃগণের হৃদয়-বিদারণ দুঃখের ক্রন্দন শুনিয়া, তাহাদের রক্তশূন্য অস্থিসার দেহ দেখিয়া কি আমাদেরও এই দেহ বিকল হইয়া পড়িত না? মাতা ভূমির উপর মৃত-শরীর হইয়া শয়ান রহিয়াছে, আর শিশু সেই মৃত দেহোপরি পড়িয়া রহিয়াছে; ইহা দেখিলে আমাদের হৃদয়ে কি শোণিত থাকিত? না আমাদের নিঃশ্বাসবহন হইত। জীবন্ত মনুষ্য গলিত মাংস ভোজন করিবার জন্য শৃগাল শকুনির সহিত বিবাদ করিতেছে, ইহা দেখিয়া কি হৃদয়ের রক্ত শীতল হইয়া যাইতেছে না?

"আমরা এই দুঃখের প্রতি মনোযোগ দিতেছি না। আমাদের দুঃখের সময় কে দেখিবে? পশ্চিম দেশ হইতে যদি পূর্ব্বদেশে এই দুর্ভিক্ষ চলিয়া আইসে, তখন আমাদের কি হইবে? তখন আর বলিতে পারিবে না, পৃথিবী নির্দ্দয়, আমাদের প্রতি কেহই ফিরিয়া

দেখে না। সম্পত্তি বিপত্তি এখানে অহর্নিশি পরিভ্রমণ করিতেছে। আজ আমার সম্পত্তি, আমার ভ্রাতার বিপত্তি; কল্য ভ্রাতার সম্পত্তি, আমার বিপত্তি। আগামী বৎসর যদি আমারদের এই প্রকার দুর্দ্দশা হয়, তখন পশ্চিমবাসীরা মনে করিবে, আমারদের দুঃখের সময় ইহারা একবারও ফিরিয়া চায় নাই। আর আমারদের এপ্রকার কৃপণতার পরিবর্ত্তে যদি সেই সময়ে তাহারা আমারদের প্রতি সাধু ব্যবহার করে, তখন আমাদের আপনারদের প্রতি কত লজ্জা ও ঘৃণা হইবে।

"ঈশ্বরের ধর্ম্ম-সেতু দেখ। তিনি আমারদিগেকে কি প্রকারে রক্ষা করিতেছেন। যদি পশ্চিমবাসীরা আপনারদের প্রাণরক্ষার জন্য এদেশে পঙ্গপালের মত আসিয়া আমারদের সকলকে আক্রমণ করে, তবে আমারদের কি দশা হয়? তাহারা আসিয়া যদি আমারদের নিকট হইতে ধন ধান্য সকলি কাড়িয়া লয়, তবে কে আমারদিগকে রক্ষা করিতে পারে? পঞ্জাব হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত যে-সকল লোক হাহাকার করিতেছে, তাহারা ক্ষিপ্তের ন্যায় বঙ্গদেশের উপরে পড়িয়া যদি শস্য ধান্য সকল হরণ করে, তবে কি হয়? তাহা হয় না কেন? কেননা ঈশ্বর স্বয়ং ধর্ম্মসেতু ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। তাহারা বরং অনাহারে প্রাণত্যাগ করিবে, তথাপি বলপূর্ব্বক আমারদের নিকট হইতে একমুষ্টি তণ্ডুলও গ্রহণ করিতে পারে না। আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক দান করিলে তবে তাহারা গ্রহণ করিতে পারে।

"দেখ! ধর্ম্ম কি বলে, দয়া কি বলে; কৃতজ্ঞতা কি বলে; সকলি বলিতেছে, তোমরা ভ্রাতৃগণের সাহায্যের নিমিত্তে হস্ত প্রসারণ কর। আমরা যৎকিঞ্চিৎ দিব বৈ নয়, আমরা যদি সর্ব্বস্ব জীবিকা প্রদান করি, তথাপি এই বিস্তীর্ণ দুর্ভিক্ষের কতই বা উপশম হইতে পারে। আমারদের মধ্যে ধনেতে, মানেতে, সকলেই অল্প। আমরা শ্রদ্ধার

সহিত যাহা দান করি, তাহাই আমারদের সর্ব্বস্ব। ঈশ্বরের পূজার নিমিত্তে প্রীতির সহিত, শ্রদ্ধার সহিত শ্রেয়স্কামেতে আমরা যাহা কিছু দিই, তাহাই আমারদের যথার্থ দান। ঈশ্বর তাহা আদরের সহিত গ্রহণ করিবেন। যশ, মান, খ্যাতি, প্রতিপত্তির যে দান, তাহা ব্রাহ্মসমাজের দান নহে। অন্যেরা অনুরোধে পড়িয়া দেয়, অন্যেরা নামের জন্য দেয়, অন্যেরা না জানিয়া শুনিয়া ঈশ্বরের কার্য্যে সাহায্য করে; আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রীতির সহিত, ঈশ্বরের কার্য্য জানিয়া, তাঁহার দক্ষিণ হস্তে সকলি সমর্পণ করিতেছি। আমারদের দানে যদি একবেলার জন্য একজনেরো ক্ষুধা শান্তি হয়, তথাপি তাহার ফল অনন্ত ফল। আমারদের সাধু ইচ্ছাই সর্ব্বস্ব। এস আমরা সকলে এমন দৃষ্টান্ত দেখাই যে আর সহস্র লোকে তাহার অনুগামী হয়। কৃপণতা, ক্ষুদ্রভাব পরিত্যাগ করিয়া উদারভাব ধারণ কর। ঈশ্বরের সেই উদার-মঙ্গলভাব মনে করিয়া দেখ। দেখ, তাঁর বৃষ্টি আসিয়া কেমন সমুদায় পৃথিবীকে শস্য-শালিনী করিতেছে। সেই বৃষ্টি একবৎসর আসে নাই বলিয়া দেখ কি হইয়াছে! যেদেশে মেঘ একবৎসর যায় নাই, আমারদের দয়া গিয়া কি তথায় এক বৎসরেরও কার্য্য করিতে পারিবে না? আমরা কি বাষ্প হইতেও লঘু? মেঘ হইতেও অপদার্থ? এই বৃষ্টি, সূর্য্য যাঁহার কার্য্য করিতেছে, আমরা কি তাঁহার কার্য্যে অবহেলা করিব? যাঁহার বায়ুতে আমরা নিঃশ্বাস লইতেছি, যাঁহার সূর্য্যকিরণে রক্ষিত হইতেছি, যাঁহার বৃষ্টিতে অপর্য্যাপ্ত অন্ন-পান পাইতেছি, তাঁর কার্য্য কি সমুদায় যত্নের সহিত অদ্য সম্পন্ন করিব না? আমারদের প্রতি তাঁর অজস্র দান; আমরা যথাসাধ্য তাঁহাকে দান করিয়া তাহার অল্পমাত্রাও পরিশোধ করিতে পারি, এ অপেক্ষা আমারদের সৌভাগ্য আর কি আছে।

"যদি সাধু দৃষ্টান্ত দেখিতে চাও, তবে দেখ। এই বিষয়ে ইংরাজেরা কত সাহায্য করিতেছে। দুই তিন বৎসর হইল সেই পশ্চিমের লোকেরা তাহারদের প্রতি কত অত্যাচার করিয়াছিল, তাহারদের বাস-গৃহ জ্বালাইয়া দিয়াছিল, তাহারদের স্ত্রী-পুত্রদিগকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়াছিল; সে শোণিত এখনও শীতল হয় নাই। কি মহত্ত্ব! তাহারা সে-সমস্ত ভুলিয়া গিয়া সেই-সকল লোকের দুঃখ দূর করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছে। তাহারা অসৎকে সদ্ভাব দ্বারা পরাজয় করিতেছে; শত্রুতাকে বন্ধুতা দিয়া দমন করিতেছে। তাহাদের তুলনায় আমাদের কি হীনতাই প্রকাশ পায়। আমাদের মধ্যে ধনী, মানী, উচ্চপদের লোকেরা তাহাদের প্রতি কৃপা-দৃষ্টিতে দেখিলে তাহারদের দুঃখ চলিয়া যায়; কিন্তু তাহারা আমোদ-কোলাহলেই মত্ত—পরদুঃখে কিঞ্চিৎমাত্রও কাতর নহে। বিদেশীয়েরা নিঃস্বার্থভাব অবলম্বনপূর্ব্বক তাহারদের দুঃসময়ের বন্ধু হইয়াছে, আর আমরা তাহাদের দুঃখে দৃক্‌পাতও করিতেছি না। ব্রাহ্মেরা যেন এই সাধারণ দোষে দোষী না হন। তাঁহারদের দৃষ্টান্তে যেন আর সকল লোকে অগ্রসর হইয়া এই মহৎকার্য্যে সহায়বান্ হন।

"আমরা সকলে দীন দরিদ্র, ধনী মানী আমারদের মধ্যে অতি অল্প। ঈশ্বর ধন-সম্পত্তি দেখেন না। তিনি হৃদয় দেখেন, তিনি সাধু ইচ্ছা দেখেন। তিনি আন্তরিক ভাব দেখিয়া দানের মূল্য বিবেচনা করেন। ঈশ্বরের নিকটে ধনী মানী পদশালীর মান নাই। আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত যে যাহা দান করে, তাহাই তিনি গ্রহণ করেন। যে ব্যক্তি অনুরোধে পড়িয়া লক্ষ মুদ্রা দেয়, ঈশ্বর তাহার মনের ক্ষুদ্রভাব দেখেন, যে আপনি দুই দিবস উপবাস করিয়া একজন ক্ষুধার্ত্তকে একবেলার অন্ন দেয়, তিনি

তাহার উদার ভাব দেখেন। নিঃস্বার্থ সাধুর হৃদয়েই তিনি বিমল আত্মপ্রসাদ প্রেরণ করেন। এস সকলে মিলিয়া আমরা নিঃস্বার্থভাবে দান করি। হৃদয়কে প্রীতি ও মঙ্গলভাবে পরিপূর্ণ করিয়া ঈশ্বরের দক্ষিণ হস্তে সকলি সমর্পণ করি ; আমাদের যেন কোন নীচ লক্ষ্য না থাকে, আমাদের সাধোর যেন ত্রুটি না হয়। মুক্ত হস্তে প্রশস্ত হৃদয়ে, যে যাহা পারি, তাহা তাঁহার চরণে অর্পণ করি।"

এই জ্বলন্ত বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া উপাসকমণ্ডলীর হৃদয় করুণাতে বিগলিত হইয়া গেল। তাঁহারা যে যাহা পারিলেন তৎক্ষণাৎ দান করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ বোধ করিলেন। এই দুর্ভিক্ষের সাহায্যের জন্য ২২৭৩।৵১০ সংগৃহীত হইল এবং যে-সমস্ত বস্তু প্রাপ্ত হওয়া গেল তাহার মূল্যও ৬০০৲ টাকার অধিক। যে-সমস্ত মহিলা সেদিন উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা এই দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত নিরন্ন ব্যক্তিদিগের অবস্থা শ্রবণ করিয়া এমনি বিচলিত হইয়াছিলেন যে অনেকে আপন আপন শরীর হইতে অলঙ্কার উন্মোচন করিয়া এই প্রেমের যজ্ঞে আহুতি প্রদান করিয়াছিলেন। যে-সমস্ত দ্রব্য সেই সভাতে পাওয়া গিয়াছিল তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল। ১। ফিরোজা রঙের রুমাল একখানা। ২। সবুজ রঙের রুমাল ২ খানা ৩। লাল একখানা। ৪। চিকনের একখানা।. ৫। জরদ রঙের এক জোড়া। ৬। লাল রঙের এক জোড়া। ৭। সাদা রুমাল একখানা। ৮। টুপি দশটা। ৯। চারি গজ কাল রঙের আল-পাকা। ১০। আনারসি কাপড়ের কাচা ১টা। ১১। হীরার অঙ্গুরী ২টা। ১২। ফিরোজার অঙ্গুরী ১টা। ১৩। স্বর্ণ অঙ্গুরী ২টা। ১৪। এক ছড়া সোনার গোট। ১৫। ঘড়ির শিকলি এক ছড়া। ১৬। ঝুমকা এক জোড়া ও পাশা এক জোড়া। ১৭। বালা ভাঙ্গা সোনা।

১৮। সোনার বাজু ২ খানা। ১৯। বোঁদা ২টা। ২০। টুকরা সোনা। ২১। রূপার থালা একখানা। ২২। রূপার আতরদান ১টা, গোলাপ পাশ ১টা, ফুলদান ১টা। ২৩। রূপার বিছা এক ছড়া ও বকলস ২টা। ২৪। রূপার ছালনা ১০টা। ২৫। রূপার গোটের থামি ১খানা। ২৬। রূপার মল এক জোড়া। ২৭। রূপার কাঁটা ২টা। ২৮। রূপার মল এক জোড়া। ২৯। রূপার শিকলি এক ছড়া ও চুটকি ২টা। ৩০। রূপার চিরুনি ২ খানা। ৩১। পিতলের ঘড়া একটা। ৩২। পিতলের থালা তিন খানা। ৩৩। কোমরবন্ধ একটা। ৩৪। গরদের ধুতি একখানা। ৩৫। লংক্লথ দুই গজ। ৩৬। কাগজের ট্রে একটা। ৩৭। বালাম চাউল ২ মণ।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

ইণ্ডিয়ান মিররের উৎপত্তি ও সংস্কার।

এই সময়ে দেবেন্দ্রনাথ যে-সমস্ত কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন তাহা হইতে দেখা যায় তিনি একজন অসাধারণ পরিশ্রমী ব্যক্তি ছিলেন। তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকা সমস্ত সংশোধন ও পরিদর্শন করিতেন, ব্রাহ্মসমাজের বেদী হইতে বক্তৃতা ও ব্যাখ্যান প্রদান করিতেন, ব্রাহ্মসমাজের সমস্ত কার্য্য পরিদর্শন করিতেন; এতদ্ভিন্ন মফঃস্বলস্থ ব্রাহ্মবন্ধুদিগের সহিত ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে চিঠিপত্রাদি লিখিতেন, কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে বক্তৃতা প্রদান করিতেন, ব্রহ্মবিদ্যালয়ে কেশবচন্দ্রের সহিত উপদেশ দিতেন, নিজের পরিবারের মধ্যে যাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রবেশলাভ করে তাহার জন্য পুত্রকন্যাদিগের সেইপ্রকার শিক্ষা এবং প্রতিদিন ব্রাহ্মধর্ম্মানুসারে উপাসনার ব্যবস্থা করিতেন। হিমালয় হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি বাটীর দুর্গোৎসব উঠাইয়া দিলেন। পাঠকের মনে থাকিতে পারে তিনি একস্থলে বলিয়াছেন প্রতিবৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গোৎসবের সময়ে তিনি কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিতেন। এজন্য অনেক সময় তাঁহাকে ঝড় ও বৃষ্টির প্রকোপ সহ্য করিয়া রাস্তায় রাস্তায় ফিরিয়া বেড়াইতে হইত। এক্ষণে সেই দুর্গোৎসব তিনি বাটী হইতে উঠাইয়া দিয়া তাহার স্থানে একমেবা-দ্বিতীয়মেব পূজা প্রবর্ত্তন করিলেন। যে স্থানে পূর্ব্বে মনুষ্যের হস্ত-নির্ম্মিত, কল্পনাপ্রসূত ক্ষুদ্র দেবতার পূজা জড়ীয় উপকরণের দ্বারা সম্পন্ন হইতেছিল, সেস্থানে এক্ষণে অবাঙ্‌মনসোগোচর, জ্ঞানময় নিরাকার অনন্ত পুরুষের পূজা আধ্যাত্মিক উপকরণের দ্বারা প্রবর্ত্তন

করিলেন। ইহাতে তাঁহার মনে যে আনন্দ হইয়াছিল, তাহা তিনি একসময়ে তাঁহার ধর্ম্মবন্ধু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের নিকট এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন,—"আমাদের দালানে এক্ষণে প্রতিদিন প্রাতঃকালে আমরা সকলে মিলিয়া সত্যংজ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া থাকি। সেখানে আর পরিমিত দেবতার উপাসনার সম্ভাবনা নাই। এইক্ষণে আমাদের গৃহ পবিত্র হইয়াছে। আমাদের দালান হইতে প্রতিদিন ঈশ্বরের মহিমা-ধ্বনি উত্থিত হইতেছে। ইহা হইতে আর এমন কোন্ বস্তু আছে যাহা দেখিলে আমার জীবনকে সার্থক বোধ হইতে পারে ?"

১৭৮২ শক হইতে ১৭৮৫ শক পর্য্যন্ত দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম্মপদ্ধতি অনুসারে সমস্ত অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েন। ইহার কয়েকটি কারণ নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে। প্রথমতঃ যখন কেশবচন্দ্রপ্রমুখ যুবকগণ ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন, তখন তাঁহারা এই প্রতিজ্ঞা করেন যে তাঁহারা উপাসনার সময়ে যেমন এক অনন্ত দেবতার পূজা করিবেন, তেমনি আবার সমস্ত পারিবারিক ও অন্যান্য অনুষ্ঠান যাহাতে অপৌত্তলিক ভাবে সম্পন্ন হয় তাহারও চেষ্টা করিবেন। দ্বিতীয়তঃ ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভাব ক্রমশঃ সমস্ত দেশে ব্যাপ্ত হইতেছিল এবং তৎসঙ্গেসঙ্গে খৃষ্টান ধর্ম্মের প্রচারও অতি মৃদু ভাব ধারণ করিল। ইহাতে খৃষ্টান পাদরিগণ অত্যন্ত কুপিত হইলেন। তাঁহারা দেখিলেন এতদিন পর্য্যন্ত তাঁহারা নির্ব্বিঘ্নে আপনাদের ধর্ম্ম প্রচার করিয়া আসিতেছেন কিন্তু এক্ষণে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রকাশিত হওয়াতে এবং তাহার উজ্জ্বল আলোক সমস্ত দেশময় ব্যাপ্ত হওয়াতে তাঁহাদের ধর্ম্ম নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছিল। এক্ষণে তাঁহারা আর অবাধে আপনাদের ধর্ম্ম প্রচার করিতে পারিতেছেন না।

সুতরাং তাঁহারা কাগজে পত্রে এবং বক্তৃতাতে ব্রাহ্মধর্ম্ম ও সমাজের বিরুদ্ধে অনেক অযথা নিন্দা ও বিদ্রূপ করিতে আরম্ভ করিলেন। "তাহাদের কথার উত্তর দিয়া ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ সমর্থন করিতে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ভিন্ন আর কাগজ ছিল না। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে দেশসাধারণের বা মনুষ্যসাধারণের বিষয় ভিন্ন, ব্যক্তি বিশেষের মতামত অথবা তাহার সহিত কোন বিষয়ের বাদানুবাদ প্রকাশ হয় না। আবার ইংরাজদিগের সমক্ষে বিশেষতঃ খৃষ্টানদিগের দ্বারা সম্পাদিত ইণ্ডিয়ান রিফরমারের উত্তরে ব্রাহ্মসমাজের প্রকৃত মত ও অবস্থা প্রদর্শন করিতে হইলে তাহা ইংরাজীতে প্রকাশ করা আবশ্যক হয়। এই নিমিত্ত ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ১লা আগষ্ট হইতে ইণ্ডিয়ান মিরর নামক সংবাদপত্র প্রচারিত হইল। প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার বাবু মনোমোহন ঘোষ ইহার প্রথম সম্পাদক ছিলেন। তিনি অনেক যত্নে ইহাকে মর্য্যাদান্বিত করিয়াছিলেন। খৃষ্টানদিগের বিরুদ্ধাচরণের দুইটি সুফল উৎপন্ন হইল। প্রথম ইণ্ডিয়ান মিররের উৎপত্তি এবং দ্বিতীয় নব্যব্রাহ্মেরা এরূপ প্রতিজ্ঞা করিলেন যাহাতে তাঁহাদিগকে কেহ কোন প্রকারে কপট বলিতে না পারে অর্থাৎ বাক্যে ও কার্য্যে যাহাতে সামঞ্জস্য থাকে, তাহার প্রতি অধিকতর মনোযোগী হইলেন।" পাদরী ডাইসন সাহেব ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরুদ্ধে যে-সকল তর্ক উত্থাপিত করেন, তাহার মধ্যে এক তর্ক এই ছিল যে ব্রাহ্ম হইয়া যাহারা হিন্দুধর্ম্মানুগত জাতকর্ম্ম অন্নপ্রাসন উপনয়নাদি সংস্কার প্রতিপালন করে, তাহাদিগকে কি কারণে লোকে ব্রাহ্মধর্ম্মানুশিষ্ট বলিয়া বিবেচনা করিবে।

উপরোক্ত দুই কারণে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠানের প্রতি বিশেষ মনোযোগী হইলেন। দেবেন্দ্রনাথ চিরকাল সত্যের মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সত্যের জয় জীবনে ও কার্য্যে ঘোষণা করিয়াছেন।

তিনি চিন্তা করিয়া দেখিলেন খৃষ্টানেরা তাঁহাদের সম্বন্ধে যে অপবাদ দেন, তাহার যথার্থ কারণ বিদ্যমান আছে। এইজন্য তিনি উপাচার্য্যদিগের সম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিলেন। অর্থাৎ উপবীতধারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণই চিরকাল ব্রাহ্মসমাজের বেদী গ্রহণ করিবেন অথবা ব্রাহ্মণেতর ব্যক্তিগণও উপযুক্ত হইলে ঐ অধিকার প্রাপ্ত হইবেন।

এই বিষয়টি অতি গুরুতর, কারণ ইহার জন্যই পরে এমন একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল, যাহা না ঘটিলে ব্রাহ্মসমাজের ও দেশের পক্ষে মঙ্গল হইত। এ বিষয়ে পূর্ব্বে যাহা নিয়ম ছিল তাহা একজন প্রাচীন ও দেবেন্দ্রনাথের সমসাময়িক সুবিজ্ঞ ব্যক্তির বর্ণনা হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। দেবেন্দ্রনাথের ব্যাখ্যান সম্বন্ধে বলিতে গিয়া তিনি বলিতেছেন—"এই ব্যাখ্যানের সহিত একটি ঐতিহাসিক বিবরণ সংলগ্ন আছে। অতএব তাহা প্রথমে উল্লেখ করা আবশ্যক। রামমোহন রায়ের সময় অবধি নিয়ম ছিল যে ব্রাহ্মসমাজের বেদীতে কেবল ভট্টাচার্য্য উপবেশন করিয়া উপদেশ ও ধর্ম্মব্যাখ্যা করিবেন। সেই রীতি দেবেন্দ্র বাবু যথাবৎ পালন করিতেন। অন্যান্য ব্রাহ্মসমাজেরও ঐ নিয়ম ছিল। এই জন্য কলিকাতার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ উপাচার্য্যের কার্য্য শিক্ষা করিতেন এবং তাহা শিক্ষা হইলে ভিন্ন ভিন্ন সমাজে ঐ পদে নিযুক্ত হইয়া যাইতেন। এক্ষণে সে নিয়ম সম্পূর্ণ না হউক এক প্রকার রহিত হইল। পূর্ব্বে যেমন রামমোহন রায়, তেমনি দেবেন্দ্র বাবু ও অন্যান্য ব্রাহ্মগণ বরাবর বক্তৃতা করিবার সময় বেদির নিম্ন দেশে দণ্ডায়মান হইয়া বক্তৃতা করিতেন। এক্ষণে কেশব বাবু প্রস্তাব করিলেন যে, দেবেন্দ্র বাবুকে বেদীতে বসিয়াও বক্তৃতা করিতে হইবে। এ পর্য্যন্ত যাহারা বেদীতে উপাসনা করিতেন, তাঁহারা উপাচার্য্য পদে বাচ্য হইতেন। আচার্য্যের পদ রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ

ছিল। দেবেন্দ্র বাবু সেই পদ গ্রহণ করিয়া বেদীতে বসিয়া প্রতি সমাজের দিনে বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। তদবধি দুইজন উপাচার্য্য ও আচার্য্য এই তিনজন করিয়া বেদীতে বসিতে লাগিলেন। সেই সময় বিচার হইয়াছিল যে বেদীতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতই কেবল উপাচার্য্য হইবেন কেন? শ্রদ্ধাবান্ ব্রাহ্মদিগকে উপাচার্য্য করিয়া বেদীতে বসান কর্ত্তব্য। কারণ তাহারাই ঐ কার্য্যের উপযুক্ত; যে ব্রাহ্ম তাহারই মুখে ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ শোভন পায়। তদনুসারে পূর্ব্বকার ব্রাহ্মধর্ম্মাধারী ছাত্র নিমতলা-নিবাসী শ্রীযুক্ত নীলমণি চট্টোপাধ্যায় ও তৎপরে বেহালা-নিবাসী বেচারাম চট্টোপাধ্যায়, এই দুইজন উপাচার্য্য হইলেন। ইঁহারা যদিও ঘটনাক্রমে ব্রাহ্মণ ছিলেন, কিন্তু যে নিয়ম ধার্য্য হইল, তাহাতে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতীর লোকেরাও অনায়াসে উপাচার্য্য হইতে পারিবেন, এমন সম্ভাবনা রহিল।" এ সম্বন্ধে আমরা দেবেন্দ্রনাথের এক পত্র উদ্ধৃত করিতেছি। এই পত্র তিনি ভক্তিভাজন রাজনারায়ণ বসু মহাশয়কে লিখিয়াছিলেন। এই পত্র হইতে আমরা পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারি এ সম্বন্ধে তাঁহার মত কেমন উদার ছিল।

ওঁ

কলিকাতা ৫ ভাদ্র ১৭৮২ শক

অভিন্নহৃদয়েষু—

প্রীতিপূর্ব্বক নমস্কার নিবেদনমিদং

শ্রীযুক্ত অভয়কুমার বসু তথাকার সমাজে যে 'অঙ্গুহাত' পাঠ করিয়াছেন, তাহা বোধ করি সেই প্রস্তাব হইবে, তাঁহার চট্টগ্রামে যাইবার পূর্ব্বে যাহা আমার নিকট পাঠ করিয়াছিলেন। তাহাতে আমরা ডিক্রি হাসিল করিতে পারি। কেমন ঠিক্ কি না? ভূমিখণ্ড

নিষ্কণ্টক হইয়াছে, এক্ষণে যাহাতে ত্বরায় তাহার উপরে সমাজগৃহ নির্ম্মাণ হয়, তাহার যত্ন করিতে ত্রুটি করিবে না। আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম যে, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের দ্বারা উপাচার্য্যের কার্য্য সুন্দর রূপে কোন প্রকারেই সম্পন্ন হয় না। এখনকার ব্রাহ্মণপণ্ডিত সেকালের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ন্যায় নয়, আবার সেকালের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এইক্ষণকার নব্যসম্প্রদায়দিগের নিকটে কখনই প্রিয় হইতে পারে না। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নামধারীরা এইক্ষণে অত্যন্ত লোভী হইয়া উঠিয়াছে। এতদ্রূপ ক্ষুধার জ্বালায় জ্বালাতন হইয়াছেন কেবলই ঘৃত, লবণ, তণ্ডুল, বস্ত্র, ইন্ধন চেষ্টায় অনবরত ফিরিতেছেন। তাঁহারা কেবল ধন আদায় করিবার জন্য পৃথিবীতে আসিয়াছেন। কাহাকেও কখন ধন প্রদান করিতে হয় না। এইবার উইলসন সাহেবের দৌরাত্ম্য তাঁহাদের ভোগ করিতে হইবেক। কলিকাতার ব্রাহ্মসমাজে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে উপাচার্য্য রাখিয়া রাখিয়া তাঁহাদের এ ধর্ম্মবিষয়ে ঔদাস্য দেখিয়া এইক্ষণে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে তিনজনকে উপাসনা-কার্য্যে ব্রতী করিয়াছি, তাঁহারা পর্য্যায়ক্রমে ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন করেন। আমি যে মধ্যে মধ্যে সমাজে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিতাম তাহা আমার বন্ধুদিগের অনুরোধে ত্যাগ করিয়া বেদীতেই বসিতে হইয়াছে। প্রথম প্রথম কেমন বোধ হইত, এইক্ষণে অভ্যাস হইয়া যাইতেছে। তথা হইতে আমি ব্রাহ্মধর্ম্মের যে ব্যাখ্যা করি, তাহা পর-সপ্তাহে মুদ্রিত হয় এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান সপ্তাহে সকলকে বিতরণ করা যায়, এবং যেখানে যেখানে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত আছে, সেখানে এক এক খণ্ড করিয়া পাঠাইয়া দেওয়া যায়, মেদিনীপুরের সমাজেও যাইতেছে এবং তাহার উল্লেখও তোমার এই পত্রে পাওয়া গিয়াছে। এইক্ষণে বেদীতে তিনজন আছেন; বেদাচার্য্যপদীয় [illegible]

সারে মেদিনীপুরেতেও যদি এইপ্রকার করা হয় তাহা হইলেও তো ভাল হয়। লোক দেখান ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে কি কার্য্য। তথাকার ব্রাহ্মদিগের মধ্যে কোন-কোন উত্তম শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিকে উপাচার্য্যের কর্ম্মে বৃত করিলেও তো হয়। এবং তাহার সঙ্গে তোমার একত্র বসিলেও তো হয়। এই প্রকার প্রতি ব্রাহ্মসমাজে উপাসনার প্রণালী হইলে ভাল হয়। যে ধর্ম্মে যাহার শ্রদ্ধা নাই, তাহার নিকট হইতে সে ধর্ম্মের কথা শুনা কি? যে কথায় ধর্ম্ম বলে, কার্য্যে তাহার অনুষ্ঠান করিতে সম্মত নহে, তাহাকে সমাজের মধ্যে প্রধান আসন দেওয়াই বা কোন্ বিধি। ব্রাহ্মণ না হইলে উপাচার্য্য হইবে না, এ কথারও মুণ্ডে বজ্রাঘাত করা যায়। শ্রদ্ধাবান্ ব্রাহ্ম অপেক্ষা কি কপট ব্রাহ্মণ ভাল? * *

ত্রয়োত্রিংশ অধ্যায়।

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার।

কলিকাতায় ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার কিছুদিন পরে ভবানীপুরেও যুবকদিগের শিক্ষার জন্য একটি ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এখানে দেবেন্দ্রনাথ আসিয়া নিয়মিতরূপে উপদেশ ও বক্তৃতা প্রদান করিতেন। এই বিদ্যালয়ে কিরূপ শিক্ষা দেওয়া হইত, তাহার একটু আভাস আমরা ১৭৮১ শকের ৩১এ বৈশাখ তারিখে ঐ বিদ্যালয়ের যে পরীক্ষা হইয়াছিল, তাহার কয়েকটি প্রশ্ন হইতে দিবার চেষ্টা করিতেছি।

১ প্রশ্ন। ঈশ্বরকে মঙ্গলস্বরূপ না বলিলে কি দোষ হয়?

২। ঈশ্বরকে অনন্ত-স্বরূপ না বলিলে কি দোষ হয়?

৩। ঈশ্বরকে শরীরী বলিলে কি দোষ হয়?

৪। ঈশ্বরকে কেবল বিশ্বনির্ম্মাতা বলিলে কি দোষ হয়?

৫। ঈশ্বর জগৎরূপে পরিণত হইয়াছেন বলিলে কি দোষ হয়?

৬। তিনি জগতের মধ্যে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত নহেন, তাঁহার অধিষ্ঠান জগতে নাই, ইহা বলিলে কি দোষ হয়?

৭। জগতে তিনি কি প্রকারে ব্যাপ্ত আছেন, ইহা উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দেও।

দেবেন্দ্রনাথ যেমন কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের উন্নতিকল্পে এবং কলিকাতায় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য অসাধারণ পরিশ্রম করিতেছিলেন তেমনি আবার তিনি মফঃস্বলে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য চেষ্টা

নাথকে কৃষ্ণনগরে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য প্রেরণ করেন। কেশবচন্দ্র সেখানে চারিটি বক্তৃতা প্রদান করেন। ১। ব্রাহ্মধর্ম্মের পত্তন-ভূমি, ২। প্রায়শ্চিত্ত ও মুক্তি, ৩। জীবনের লক্ষ্য ও প্রার্থনার আবশ্যকতা, ৪। ঈশ্বরের জন্য বিষয় ত্যাগ। এই-সমস্ত বক্তৃতাতে পাদরি ডাইসন-প্রমুখ অনেক খৃষ্টান উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতাস্থলে ডাইসন সাহেব কেশবচন্দ্রের বক্তৃতার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গীতে এবং কেশবচন্দ্রের বক্তৃতাতে কৃষ্ণনগরের অনেক যুবক আকৃষ্ট হইলেন।

কেশবচন্দ্র সেখান হইতে দেবেন্দ্রনাথকে এই সংবাদ প্রেরণ করিলেন এবং লিখিলেন—"কালেজের মধ্যে উৎসাহ-অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে, কত শত ছাত্র আমাদের বক্তৃতা শুনিতে আসিতেছে। প্রথম শ্রেণীর প্রায় সকলেই জালে পতিত হইয়াছে। আমাদের সহিত ভ্রাতৃ-ভাবে কালযাপন করিতে ও সুচারুরূপে ব্রাহ্মধর্ম্মের মত জানিতে তাঁহাদের অত্যন্ত উৎসাহ। শিক্ষকেরাও প্রায় সকলেই আগ্রহপূর্ব্বক শুনিতে আইসেন। সত্য জানিবার ইচ্ছা, ব্রহ্মরস পান করিবার তৃষ্ণা অনেকেরই আছে, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ দেখিতেছি। কৃষ্ণনগরস্থ যুবা-বৃদ্ধ প্রায় সকলেরই মধ্যে একটি গোলমাল হইয়াছে। নিদ্রা ও উপেক্ষার লক্ষণ বড় দেখা যায় না। এদিকে তো এই, আবার পাদ্রিদের মধ্যেও গোল হইয়াছে। ডাইসন সাহেব ব্রাহ্মধর্ম্মের আপ্ত-বাক্য ও প্রায়শ্চিত্ত-বিষয়ে বক্তৃতা করিবেন, তাহার বিজ্ঞাপন করিয়াছেন। শুনিলাম সংগ্রামের জন্য হামিল্টনের লেকচার এবং অন্যান্য অস্ত্রসকল সংগ্রহ করিতেছেন। দেখি, তিনি কি বলেন। আমাদের লক্ষ্য তর্ক-বিবাদ নহে; কেবল প্রীতির সহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করা।"

উঠিল। তিনি নিজে কৃষ্ণনগরে গমন করিলেন এবং তথায় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এইবারে ব্রাহ্ম ও খৃষ্টানদিগের মধ্যে ঘোর সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। কলিকাতায় Indian Mirror এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে উত্তর প্রত্যুত্তর চলিতে লাগিল এবং কেশবচন্দ্রের সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও প্রতিভার নিকট খ্রীষ্টান পাদ্রিদিগের তর্কজাল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইতে লাগিল।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে ব্রাহ্মসমাজে এক্ষণে অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হইয়াছে। সেইজন্য দেবেন্দ্রনাথ তদ্বিষয়ে মনোযোগী হইয়া হিন্দুধর্ম্মের অনুষ্ঠানাদির বিষয়ে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি আলোচনা করিয়া এই স্থির করিলেন যে ব্রাহ্মসমাজের তদানীন্তন অবস্থাতে এই পর্য্যন্ত সংস্কার করা যাইতে পারে যে যাহাতে ব্রাহ্মেরা অপৌত্তলিকভাবে সমস্ত অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিতে পারেন। তখনকার শিক্ষা, রুচি, ও পারিপার্শ্বিক অবস্থাসমূহ আলোচনা করিলে দেখা যায় যে সমস্ত অনুষ্ঠান যদি অপৌত্তলিকভাবে সম্পন্ন করিতে পারা যায়, তাহা হইলেই তখনকার পক্ষে যথেষ্ট হইবে। ইহার অধিক অগ্রসর হইলে সমাজের মধ্যে এমন এক মহাবিপ্লব ঘটিতে পারে যাহা দ্বারা ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টেরই বেশী সম্ভাবনা। এইজন্য তিনি স্থির করিলেন যে ব্রাহ্মেরা সকলেই অনুষ্ঠানাদি অপৌত্তলিকভাবে সম্পন্ন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। ১৭৮৩ শকের ১২ই শ্রাবণে তিনি নিজে এই পদ্ধতি অনুসারে নিজের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী সুকুমারীর উদ্বাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে বিবাহের সূত্রপাত তাঁহার পরিবারে এই প্রথম সম্পন্ন হইল। তিনিই অপৌত্তলিকভাবে পিতার শ্রাদ্ধ প্রথমে সম্পন্ন করিয়াছিলেন, এবং সত্য ও ধর্ম্মের মাহাত্ম্য জীবনে অক্ষুণ্ণ

করিয়াছিলেন। এই বিবাহ কি ভাবে সম্পন্ন হইয়াছিল তাহার একটু আভাস আমরা নিম্নে বর্ণনা করিতেছি।

"এই বিবাহ কিরূপ পদ্ধতিতে নির্ব্বাহ হইয়াছিল, তাহা নির্দ্দেশ করা আবশ্যক। বিবাহশালায় ব্রহ্মোপাসনার উপযোগী এক বেদি স্থাপিত হইয়াছিল এবং হিন্দু রীত্যনুসারে দানসাজাদি সুসজ্জিত হইয়াছিল। রাত্রি দশঘটিকার সময় কন্যাযাত্র, বর ও বরযাত্রসকল আসিয়া আসন পরিগ্রহ করিলে, সম্প্রদাতা শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন পূর্ব্বক পাত্রকে সম্মুখে উপবেশন করাইয়া প্রথমে পুণ্যাহং পুণ্যাহং ইত্যাদি স্বস্তিবাচন করিলেন। তদনন্তর অর্ঘ্য, মধুপর্ক, অঙ্গুরীয় ও বস্ত্রাদি দ্বারা বরের অভ্যর্থনা করিলেন। পরে ব্রাহ্মসমাজের রীতি ও পদ্ধতি অনুসারে ব্রহ্মোপাসনা হইল। অনন্তর সম্প্রদাতা বর ও কন্যার ঊর্দ্ধতন তিনপুরুষের নাম, গোত্র ও প্রবরাদি উল্লেখপূর্ব্বক বরকে কন্যাদান করিলেন। পরে সম্প্রদাতা বরকে উক্ত দানের কাঞ্চন-দক্ষিণা প্রদান করিলেন। এইরূপে বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন হইলে বেদি হইতে উপাচার্য্য বর ও কন্যাকে দম্পতীধর্ম্ম পরিপালন-নিমিত্ত একটি সারগর্ভ উপদেশ প্রদান করিলেন। অনন্তর বর ও কন্যা গৃহপ্রবেশ করিলেন ও সভাভঙ্গ হইল। এই ক্রিয়াতে প্রথম স্বস্তিবাচন, পরে বরের অর্চ্চনা বা অভ্যর্থনা ও তৎপরে কন্যাদান, বিবাহপদ্ধতির অন্তর্গত সংস্কৃত বাক্য-সকলের দ্বারা হইয়াছিল। শেষে উপাচার্য্য বাঙ্গলা ভাষায় উপদেশ দিয়াছিলেন। এই পদ্ধতি দ্বারা প্রতীতি হইবে যে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্মমতে বিবাহকার্য্য সমাধানের নিমিত্ত যে-সকল ক্রিয়া আবশ্যক, হিন্দুবিবাহপদ্ধতি হইতে তাহা গ্রহণ করিয়া পৌত্তলিকতা- ও কুসংস্কারাদিদূষিত অংশ পরিত্যাগ করা হইয়াছে।

যতঃ ইহার মধ্যে উপদেশ ও উপাসনা সন্নিবেশিত হওয়াতে দর্শকবৃন্দের মনে অপূর্ব্ব ধর্ম্মভাবের উদয় হইয়াছিল। ইহার পর হইতে ঐরূপে জাতকর্ম্ম নামকরণ প্রভৃতি অপরাপর অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হইল এবং এক একটি করিয়া ভিন্ন ভিন্ন পরিবারের মধ্যে তাহা অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল।"

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

সঙ্গত সভা ও হরদেব চট্টোপাধ্যায়।

যুবকদিগের ধর্ম্মশিক্ষার জন্য ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, ইহা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। ইহাতে ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে গভীর উপদেশসমূহ প্রদান করা হইত। কিন্তু ইহাতেও যুবকেরা সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। তাঁহারা আরও ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পরের সহিত যুক্ত হইতে অভিলাষ করেন এবং পরস্পরের ধর্ম্মভাবের দ্বারা পরস্পরের সহায়তা করিয়া একটি ধর্ম্মমণ্ডলী সংস্থাপন করিতে ইচ্ছা করেন। "একদিন জোড়াসাঁকোস্থ পরলোকগত শ্রদ্ধাস্পদ জয়গোপাল সেন ও তাঁহার ভ্রাতা শ্রদ্ধেয় বৈকুণ্ঠনাথ সেন মহোদয়দিগের উল্টাডিঙ্গিস্থ উদ্যানে সকলে গমন করেন; উদ্যানে গিয়া সকলকে এক এক খণ্ড নূতন গামচা ও নূতন বস্ত্র প্রদত্ত হইল, সকলে স্নান করিলে ব্রহ্মোপাসনান্তে প্রীতিভোজন হইল। সেই সভায় স্থির হইল যে চরিত্রগঠনার্থ ভ্রাতৃসভা স্থাপিত হয়, যাহাতে সকলে আপন আপন অভাবের কথা বলিবেন এবং তন্মোচনার্থ উপায় উদ্ভাবিত হইবে। ব্রাহ্মসমাজে প্রত্যাগমনকালে বৃদ্ধ ও যুবক নানা রকমের ব্রাহ্মগণ সমবেত হইয়া দল বাঁধিয়া ব্রহ্মসংকীর্ত্তন করিতে করিতে আগমন করিতে লাগিলেন। শ্রদ্ধেয় মৃত হরদেব চট্টোপাধ্যায় এই দলের নেতা হইলেন। তিনি অগ্রে অগ্রে উৎসাহ-সহকারে নৃত্য ও ব্রহ্মসংগীত করিতে করিতে চলিতে লাগিলেন, আর আর সকলে এবং তন্মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার কয়েকটি পুত্রসহ এবং কেশবচন্দ্র দলবলসহ চলিতে লাগিলেন। দেবেন্দ্রনাথ পঞ্জাব প্রদেশ ভ্রমণ করিয়া গুরু নানকের অপৌত্তলিক ও

উচ্চতর ভক্তির ধর্ম্মের অত্যন্ত পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। শিখদিগের ধর্ম্মালোচনা ও ধর্ম্মপ্রসঙ্গের সভার নাম সঙ্গতসভা। তিনি অত্যন্ত উৎসাহের সহিত এই প্রস্তাবিত সভার তদনুকরণে সঙ্গতসভা বলিয়া নামকরণ করিলেন।" প্রথমে তিনটি সঙ্গতসভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, কিন্তু অবশেষে একটি জীবিত রহিল অন্য দুইটি উঠিয়া গেল। এই তিনটি সঙ্গতসভায় একটি করিয়া মাসিক সভা হইত। এই মাসিক সভা দেবেন্দ্রনাথের বাটীতে হইত। এই সভা দ্বারা যে যুবকদিগের বিশেষভাবে উন্নতি হইয়াছিল সে বিষয়ে আর কোন সংশয় নাই। এই সভার প্রতি তাঁহারা কিরূপ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, সে বিষয়ে কিছু আলোচনা করা উচিত।

"বেলা ৫টা হইতেই প্রতিদিন যুবকদিগের সমাগম হইতে আরম্ভ হইত। সন্ধ্যার সময় প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ জন যুবকে গৃহ পরিপূর্ণ হইত। সন্ধ্যার সময় যে-সকল লোক একত্রিত হইতেন প্রায় রাত্রি ১০ ঘটিকার সময় তাঁহাদের মধ্যে অনেকে গৃহে গমন করিতেন। এই সভায় কেবল যে ধর্ম্মবিষয়ের প্রসঙ্গ হইত তাহা নহে, নানা প্রকার কথোপকথন হইত। * * * রাত্রি প্রায় ১২টার সময় আর একদল লোক গৃহে গমন করিতেন; কিন্তু অবশিষ্ট যে ছয় সাত জন থাকিতেন, তাঁহাদের পদদ্বয় আর গৃহাভিমুখে গমন করিতে চাহিত না। * * * ক্রমে রাত্রি ২টা ৩টা হইত, তথাপি তাঁহারা পরস্পর হইতে স্বতন্ত্র হইতেন না। কোন কোনদিন রাত্রি শেষ হইয়া প্রাতঃকাল ৬টার তোপ পড়িয়া যাইত তথাপি সকলে একত্র। * * * সঙ্গতসভায় স্বাভাবিক ভাবে নানাপ্রকারের ধর্ম্মালাপ হইত। বিনয়, বিশ্বাস, ভ্রাতৃভাব, উপাসনা, মনুষ্যের কর্ত্তব্য, বিবেক, জাতিভেদ ও জাতিভেদসূচক উপবীত রাখা উচিত কি না, জীবনের উদ্দেশ্য, সময়ের ব্যবহার, ব্যায়াম, ক্ষমা,

জীবনের নিয়তি, সংসার সম্বন্ধে মৃত্যু ও নবজীবন প্রভৃতি কথোপকথনের বিষয় ছিল। * * * যে-সকল বিষয় সঙ্গতসভায় আলোচিত হইত, তাহা কেশবচন্দ্র স্বয়ং লিপিবদ্ধ করিয়া 'ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান' নামক পুস্তক প্রকাশ করেন। একবার সঙ্গতসভায় সাংবৎসরিক উৎসব হয়। দেবেন্দ্রনাথ ইহার সভাপতি হন। সেই উপলক্ষে এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি প্রকাশিত হয়। পুস্তকের এক স্থানে লেখা আছে 'উপবীত পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য'; যখন তিনি এই লেখাটি পাঠ করিলেন, অমনি আপনার উপবীতের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন 'তবে আর ইহা কেন?' এই বলিয়া উপবীত ত্যাগ করিলেন।"

দেবেন্দ্রনাথের একজন অনুগত শিষ্য ছিলেন। তাঁহার কথা ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। ইঁহার বাস বাঁশবেড়ে* গ্রাম। নাম হরদেব চট্টোপাধ্যায়। সেই সময়ে বাঁশবেড়ের চন্দ্রনাথ রায় প্রভৃতি কয়েকজন যুবক দেবেন্দ্রনাথের নিকট প্রায় সর্ব্বদা যাতায়াত করিতেন এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ গ্রহণ করিতেন। হরদেব চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের হৃদয় মানবপ্রেমে এবং পরসেবার ভাবে পরিপূর্ণ ছিল। একবার দামোদর নদীতে ভীষণ বন্যা হয়, তাহাতে মেদিনীপুরের কোন কোন স্থান বন্যাতে ডুবিয়া যায় এবং প্রজাদিগের অত্যন্ত ক্লেশ হয়। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের হৃদয় তাহাদের দুঃখে বিগলিত হইল। তিনি দেবেন্দ্রনাথের সহিত প্রথম সাক্ষাতেই ঐ দুঃখপ্রপীড়িত প্রজাদিগের কষ্টের কথা জ্ঞাপন করেন এবং তাহাদিগকে করভার হইতে মুক্তি দিবার জন্য প্রার্থনা করেন। ইহার পর একবার ত্রিবেণীতে ভীষণ মড়ক হইয়া-

---

* এ বিষয়ে কিছু মতদ্বৈধ আছে। প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন ইঁহার বাড়ী সাঁতরাগাছি।

ছিল । অনেক লোক এই মড়কে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তখন অক্লান্তভাবে ঐ-সমস্ত রোগীদিগের শুশ্রূষাতে আপনাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। একদিন দেবেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে আলাপ হয়। তাহাতে তিনি বলিলেন "আমি মাকে বড় ভক্তি করিতাম, তাঁহাকেই পূজা করিতাম। আমার মাতা যখন পরলোক গমন করেন, তখন আমার মনে হইল মাতো মরেন নাই, মায়ের শরীরই মরেছে—আত্মার বিনাশ নাই, সবই আত্মা, সবই ব্রহ্ম।" দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন, তুমি অনেকটা জেনেছ, কেবল একটু জান্‌তে বাকি আছে। ব্রহ্ম অর্থ বড়। প্রথমে চন্দ্র সূর্য্যকেই বড় মনে হইত, তারপরে আত্মাকেও বড় মনে হইত, কিন্তু এই সুখদুঃখসঙ্কুল আত্মাকে ব্রহ্ম মনে করবো কি ক'রে, তাই মনে হল আত্মার ভিতরকার পরমাত্মাই ব্রহ্ম। "তিনি চন্দ্র সূর্য্যের মধ্যে, তিনি আমার আত্মার মধ্যে ইত্যাদি।" এই কথাতে তাঁহার মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল এবং বলিলেন "আমি এখন বুঝেছি।" এই বলিয়া তাঁহাকে গুরুরূপে বরণ করিলেন।

তিনি এবং তাঁহার অন্য বন্ধুগণ দেবেন্দ্রনাথের বাড়ীতে আসিতেন এবং কখন কখন তাঁহার বাড়ীতে আহার করিতেন। সেই ভীষণ অন্ধকারাচ্ছন্ন সময়ে যখন জাতিভেদ প্রবলরূপে বঙ্গদেশের উপরে রাজত্ব করিতেছিল, তখন এই ব্রাহ্মণসন্তান, ঠাকুর-পরিবারে আহার করিতেন এবং আপনার গ্রামে গিয়া সকলের সমক্ষে ইহা স্পষ্টরূপে স্বীকার করিতেন। ইহাতে তাঁহার বন্ধুরা তাঁহার প্রতি অতি বিরক্ত হইতেন এবং তাঁহাকে গ্রাম হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য গ্রামবাসীদের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার উপর নানাপ্রকার অত্যাচার করিতেন। অবশেষে তাহাদের অত্যাচার যখন অসহ্য হইয়া উঠিল, তখন তাঁহার নিজের সম্পত্তি ভ্রাতার হস্তে অর্পণ করিয়া অতি অল্প

টাকা লইয়া সাঁতরাগাছিতে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তখন হইতে দেবেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার আরও ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি হইল।

যখন উচ্চস্ত্রীশিক্ষার জন্য বেথুন সাহেব কলিকাতায় বিদ্যালয় স্থাপন করেন, তখন একদিন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বেথুন সাহেবের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কেহ কাহারও কথা বুঝিতে পারেন না। কোন প্রকারে বেথুনের নিকট প্রকাশ করিলেন তাঁহার দুই কন্যাকে তিনি বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিবেন। বেথুন সাহেব অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া তাঁহার দুই কন্যাকে লইলেন। তাঁহার গ্রামের লোকেরা ইহাতে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিল "কলিকাতার ভদ্র-লোকেরা স্কুলে কন্যাদিগকে প্রেরণ করেন না। আর তুমি তোমার কন্যাদিগকে প্রেরণ করিতেছ। তোমার এ কুবুদ্ধি কেন? আমরা তোমার সহিত আহারাদি বন্ধ করিব।" চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন "তোমরা খাবে না, আমার খাবার লোক অনেক আছে।" এই বলিয়া তিনি মিছরি টুকরা টুকরা করিয়া পিঁপড়েদের খাওয়াইতে আরম্ভ করিলেন। বেথুন সাহেব তাঁহাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। তিনি তাঁহার পুত্রদিগকে বিষয়কর্ম্ম করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি দোকানদার, মুটে, মজুরদের সঙ্গে মিশিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিতেন। তাহারা তাঁহাকে অত্যন্ত ভক্তি করিত।

দেবেন্দ্রনাথের পুত্র হেমেন্দ্রনাথের যখন বিবাহের সময় হইল, তখন তাঁহার জন্য কন্যা পাওয়া গেল না। কারণ এক্ষণে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম্মমতে সমস্ত অনুষ্ঠানাদি করার জন্য সকলে তাঁহাকে একঘরে করিয়াছেন। আর ইহা ব্যতীত কেহ ব্রাহ্মমতে বিবাহ দিতে চায় না। একদিন চট্টোপাধ্যায় আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন "আমার কন্যাকে আপনার পুত্রের সহিত যদি বিবাহ দিতে ইচ্ছা করেন, আমি অতি

আপ্যায়িত হইব।" দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি এমন কাজ করিও না, তাহা হইলে তোমাকে সকলে অত্যন্ত পীড়ন করিবে।" তিনি বলিলেন "আমি যখন কথা দিয়াছি, তখন অন্যথা হইবে না।" তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র এই বিবাহের বিরোধী হইয়া উঠিল। পাড়ার সকলে ক্রোধে উন্মত্ত হইল এবং এই প্রতিজ্ঞা করিল যে বিবাহের দিবসে মেয়েকে জোর করিয়া লইয়া যাইবে। এই কথা শুনিয়া তাঁহার কন্যা বলিলেন "কে আমাকে কেড়ে নিয়ে যেতে পারে দেখব।" অবশেষে অনেক গোলমালের মধ্যে পুলিসের সাহায্যে বিবাহক্রিয়া খুব ধূমধামের সহিত সম্পন্ন হইয়া গেল।

একবার দেবেন্দ্রনাথ কঠিন ম্যালেরিয়াতে আক্রান্ত হইয়াছেন। পীড়া এত কঠিন হইয়াছিল যে তিনি ভাবিলেন তাঁহাকে শীঘ্রই ইহলোক হইতে প্রস্থান করিতে হইবে। তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে ডাকাইয়া বলিলেন "আমি যখন মৃত্যুমুখে পতিত হইব, তখন আমি যাহা বলিব ঠিক্ সেইভাবে যেন আমার সৎকার করা হয়, কিছু বৈলক্ষণ্য না হয়।" তিনি বলিলেন "কিছু তফাৎ হবে না।" কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ সারিয়া উঠিলেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় নিজের মৃত্যুকালে পুত্রদিগকে বলিয়াছিলেন "আমার মৃতদেহ তোমরা স্পর্শ করিবে না। তিনি এসে যাহা বলিবেন, তাহাই করিও।" তাঁহার মৃত্যু হইলে "পিতৃভক্তিপরায়ণ পুত্রেরা প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের নিকট সেই রাত্রিতেই সমাচার প্রেরণ করেন। রাত্রি অবসান হইলে প্রাতঃকালে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম বন্ধুবান্ধবদিগকে সঙ্গে লইয়া চট্টোপাধ্যায়ের বাটীতে উপস্থিত হন। উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, হরদেবের মৃতদেহ পাটলবর্ণ বসনে আবৃত হইয়া দ্বারদেশে খট্টার উপরে শয়ান রহিয়াছে। শবের

নিকট হইতে ধূপের সুস্নিগ্ধ সুগন্ধ নির্গত হইতেছে। অনন্তর প্রধান আচার্য্য মহাশয় হরদেবের মুখশ্রীর অবিকৃত ভাব ও পবিত্র ভাবের সুস্পষ্ট চিহ্ন তখনো পর্য্যন্ত জাজ্বল্যমান দেখিয়া কিয়ৎক্ষণ বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। পরে তাঁহার আদেশানুসারে মৃতদেহ সলিলক্ষালিত ও পরিস্কৃত করা হইল। মৃত-দেহের উপর কষায় বস্ত্রের পরিবর্ত্তে শ্বেত বস্ত্র নিহিত হইল; ও সেই আচ্ছাদন-বস্ত্রের উপর অভ্রমিশ্রিত আবীর নিক্ষিপ্ত হইল এবং মাল্য চন্দন পুষ্প দ্বারা তাহা সুসজ্জিত করা হইল। অনন্তর প্রধান আচার্য্য মহাশয় স্বহস্তে পুষ্পরাশি তাহার উপরে বিকীর্ণ করিলেন। চট্টোপাধ্যায়ের দুই পুত্র ও জামাতারা এবং অন্যান্য ব্রাহ্মগণ মৃতদেহের উভয় পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলে প্রধান আচার্য্য মহর্ষিদেব স্বয়ং শবের শিরোভাগে দণ্ডায়মান হইয়া বাষ্প-গদগদ বাক্যে একটি বক্তৃতাসহ প্রার্থনা করিলেন।" এইরূপে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপ্ত করিয়া দেবেন্দ্রনাথ কলিকাতা প্রত্যাগমন করেন।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

অনুষ্ঠানপদ্ধতি প্রণয়ন ও কেশবের সহিত সম্বন্ধ।

১৭৮৩ শকে ৮ই পৌষ রবিবারে ব্রাহ্মসমাজের এক সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। তাহাতে সেই বৎসরের জন্য দেবেন্দ্রনাথ সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন। এই সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র অসাধারণ পরিশ্রম করিতে-ছিলেন। কেশবচন্দ্র সম্পাদকরূপে এইরূপ বক্তৃতা করিলেন;—"গতবর্ষে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের অনেক দূর উন্নতি হইয়াছে। প্রথমতঃ কলিকাতা ব্রাহ্ম বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক পরীক্ষাতে ৮ জন ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছেন; এবং তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের মহান সত্য-সকল আয়ত্ত করিতে সক্ষম হইয়াছেন! ভবানীপুর ও চুঁচুড়াতে* ব্রহ্মবিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়া প্রায় দেড়শত ছাত্রকে নিয়মিতরূপে ব্রহ্মবিদ্যা দান করা হইয়াছে। ভবানীপুর বিদ্যালয়ের পরীক্ষাতে ১১ জন ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ ইংরাজীতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে এবং তদ্দ্বারা অনেকে ইহার মত অবগত হইয়াছেন। তৃতীয়তঃ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সমাজের আচার্য্যপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া উৎসাহকর ব্যাখ্যান দ্বারা সমাজের উপাসনা-কার্য্যে জীবন প্রদান করিয়াছেন এবং এসকল ব্যাখ্যান পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়া অনেকের আত্মাকে ঈশ্বরের পথে লইয়া যাইতেছে। চতুর্থতঃ ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান নামক একখানি পুস্তক মুদ্রিত হইতেছে! শীঘ্র প্রকাশিত হইবে। ইহাতে চরিত্রশুদ্ধি ও ঈশ্বরের

---

* এই দুই স্থানে দেবেন্দ্রনাথ ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য গমন করিতেন।

প্রিয়কার্য্য সাধনবিষয়ক নীতিসকল সহজ ভাষায় সন্নিবেশিত হইয়াছে ;
পঞ্চমতঃ কলুটোলার পল্লীতে একটি শিশুবিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে, প্রতি শনিবার সন্ধ্যার সময়ে ইহার শিক্ষা আরম্ভ হয়।"

পাঠকেরা বুঝিতে পারিতেছেন এই সময়ে দেবেন্দ্রনাথ আর একটি অতি আবশ্যকীয় কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। এ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মেরা যে ভাবে অনুষ্ঠানসমূহ সম্পন্ন করিতেন, তাহার কোন নিয়ম ছিল না। তিনি ভাবিলেন সমাজে থাকিতে হইলে কতক-গুলি নিয়ম ও পদ্ধতির একান্ত প্রয়োজন, তাহা না হইলে সমাজবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারা যায় না। অবশ্য তাহার এ উদ্দেশ্য নয় যে ইহাকে অভ্রান্ত শাস্ত্ররূপে মান্য করিয়া সকল সময়ে চলিতে হইবে। কোন সময়ে প্রয়োজন হইলে ইহা হইতে তিলমাত্র কেহ বিচলিত হইবেন না, তাহা নয়, কিন্তু যথাসম্ভব এই নিয়ম ও পদ্ধতি রক্ষা না করিলে সমাজের পক্ষে কখন শুভকর হইতে পারে না। এই চিন্তা করিয়া তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান নামক গ্রন্থ প্রণয়নে নিযুক্ত হইলেন। সর্ব্বপ্রথমে জাতকর্ম্মের নিম্নলিখিত ব্যবস্থা প্রণয়ন করিলেন। "অভিনব জাতকুমারের সূতিকাগারে সপ্তাহের মধ্যে জাতকর্ম্ম কর্ত্তব্য। সূতিকা-গারে দণ্ডায়মান হইয়া বালককে হস্তে লইয়া পিতা এই প্রার্থনা পাঠ করিবেন ; হে সর্ব্বলোকমহেশ্বর ! অখিলবিধাতা ! তুমি আমাদের চিরকালের পিতা মাতা। তোমার প্রসাদে এই যে অভিনব শিশু গর্ভ-সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছে এবং এই কয়েক দিবস পর্য্যন্ত কুশলে রক্ষিত হইয়াছে, ইহার জন্য কৃতজ্ঞতা সহকারে তোমাকে প্রণিপাত করিতেছি এবং ইহাকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিতেছি, এ তোমারই স্নেহের ধন, এমন অবস্থাতেও তোমার প্রসাদে ইহার কিছুরই অভাব নাই। তোমার কৃপাতে এ যখন হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ

হইবে এবং যখন ইহার জ্ঞান প্রস্ফুটিত হইবে, তখন যেন তোমার প্রতি ইহার দৃষ্টি যায় এবং তোমার প্রিয় কার্য্যে মনকে নিমগ্ন করে। এক্ষণে তুমি ইহাকে আপনার ক্রোড়ে রাখিয়া যেমন লালন পালন করিতেছ, ইহার পরে সেইরূপ ইহার হৃদয়ে বিরাজমান থাকিয়া ইহাকে কুটিল পাপ হইতে রক্ষা করিবে এবং তোমার সৎপথে অগ্রসর করিবে; এই আমার প্রার্থনা।

অথবা এই প্রার্থনা পাঠ করিবেন।

ওঁ মনুষ্যানামৃষীণাঞ্চ ভূতানাং ভক্তবৎসল।
ঈশ রক্ষস্ব মে পুত্রং সর্ব্বসাক্ষী নমোস্তুতে॥
পিতা ত্বং সর্ব্বভূতানাম্ রক্ষিতা চ বিশেষতঃ।
সততং সর্ব্ববিশ্বেভ্যঃ সুতং রক্ষ নমোস্তুতে॥
নমস্তে পালক ত্বংহি বালকং রক্ষ নিতাশঃ।
সমন্তাৎ সাক্ষিরূপেণ কুরু বালকরক্ষণং॥
সচ্চিদ্রূপ মহাভাগ সর্ব্বলোক বরপ্রদ।
ত্বৎপ্রসাদেন দেবেশ চিরং জীবতু বালকঃ॥
আগত্য সূতিকাগারে সর্ব্ববিঘ্নবিনাশন।
রক্ষাং কুরু মহাভাগ সর্ব্বোপদ্রবনাশন॥
অয়ং মম কুলোৎপন্নো রক্ষার্থং পাদয়োস্তব।
দত্তো ময়া মহাভাগ চিরং জীবতু মে সুতঃ॥
শান্তিরস্তু শিবঞ্চাস্তু বিনশ্যন্ত্বশুভানিচ।
সর্ব্বোপদ্রবশান্ত্যর্থং গৃহাণ শরণাগতং॥

প্রার্থনা পাঠের পর পিতা বালকের মাতার ক্রোড়ে সেই বালককে সমর্পণ করিবেন।”

এইরূপে জাতকর্ম্ম, নামকরণ, দীক্ষা, বিবাহ ইত্যাদি সমস্ত অনুষ্ঠানের পদ্ধতি প্রণয়নে তিনি নিযুক্ত হইলেন ও ব্রাহ্মধর্ম্মের শ্লোকসমূহ টীকা, ব্যাখ্যা এবং বাঙ্গালাতে অনুবাদ সহকারে রীতিমত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশ করিতে লাগিলেন। যে, সমস্ত শ্লোক প্রায় দুই ঘণ্টার মধ্যে তাঁহার হৃদয়মধ্যে প্রতিভাত হইয়াছিল, সেই-সমস্ত শ্লোক ব্যাখ্যা ও অনুবাদসহ প্রকাশ করিতে তাঁহার দীর্ঘকাল লাগিয়াছিল। হার জন্য তাঁহাকে অনেক পরিশ্রমও করিতে হইয়াছিল।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব উপস্থিত হইয়াছে। পূর্ব্বদিন রাত্রিতে দেবেন্দ্রনাথ সশিষ্যে বসিয়া সঙ্গীতের আলোচনা করিতেছিলেন। এমন সময়ে এক ব্যক্তি কেশবচন্দ্রের কানে কানে কি বলিয়া গেলেন। অমনি তিনি উঠিয়া গেলেন। তাঁহার চলিয়া যাওয়ার কারণ কেহ কিছু বুঝিলেন না। পরদিন কেশবচন্দ্র তাঁহার পত্নীকে দেবেন্দ্রনাথের গৃহে আনিলেন। দেবেন্দ্রনাথের স্ত্রী তাঁহাকে আপন বধূর ন্যায় বাড়ীতে অতি আদর ও যত্নের সহিত গ্রহণ করিলেন। বিখ্যাত কলুটোলার সেনপরিবারের কুলবধূ আজ জোড়াসাঁকোর ঠাকুরপরিবারে গৃহীত হইয়া সেখানে বাস করিতে লাগিলেন। হিন্দুসমাজের পক্ষে ইহা অতি অসহ্য। এজন্য কেশবচন্দ্রকে নানা বাধা বিঘ্নের সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। কিন্তু কেশবচন্দ্রের এমনি প্রতিজ্ঞা ছিল যে যাহা ইচ্ছা, তাহাই কার্য্য। কে তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারিবে? পরদিন ব্রাহ্মসমাজের উৎসব। কেশবচন্দ্র একাকী উৎসবে যোগদান করিতে পারেন না, কারণ তিনি জানিতেন 'সস্ত্রীকম্ ধর্ম্মমাচরেৎ।' যে ব্রাহ্মধর্ম্মকে তিনি প্রাণাপেক্ষা অধিক প্রিয় জ্ঞান করিতেন এবং যাহা প্রচারের জন্য তিনি আপনার সাংসারিক উন্নতির দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া, আপনার সমস্ত শক্তি ও সামর্থ

। নিয়োগ করিলেন, সেই ব্রাহ্মধর্ম্মের মহিমা তাঁহার ধর্ম্মপত্নীর হৃদয়ে জয়যুক্ত হইবে না ? সেইজন্য হিন্দুসমাজের কোনপ্রকার রীতিনীতির প্রতি লক্ষ্য না করিয়া আপনার পত্নীকে ঠাকুরপরিবারের মধ্যে আনয়ন করিলেন। বস্তুতঃ দেবেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ এরূপ মধুর হইয়াছিল, যে, দেবেন্দ্রনাথের বাড়ী আর তাঁহার নিজের বাড়ীর মধ্যে কোন প্রভেদ তাঁহার নিকট লক্ষিত হয় নাই। দেবেন্দ্রনাথের সহিত কেশবচন্দ্রের কিরূপ প্রীতির বন্ধন ছিল, তাহা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

"মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সহিত আচার্য্য কেশবচন্দ্রের যে কিরূপ মধুর সম্বন্ধ ছিল এবং তাঁহার ভবন কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার দলবলের যে কিরূপ আরামস্থল ছিল, তাহা এখন মনে করিলেও চিত্ত পবিত্র হয়। সুবিখ্যাত দ্বারকানাথ ঠাকুরের অট্টালিকা—যাহা এক সময়ে রাজা মহারাজা ও উচ্চপদস্থ জনগণের আমোদ প্রমোদের স্থান ছিল, তাহা কেবল ধর্ম্মের মোহিনীশক্তি দ্বারা ছিন্নবস্ত্রপরিধায়ী দুঃখী যুবকবৃন্দের এবং আপিসের অতি সামান্য কেরাণী ও অল্পবয়স্ক ছাত্র—ব্রহ্মানুরাগ ব্যতীত যাহাদের আর কোন গুণ ছিল না—তাহাদিগের পবিত্র আমোদ ও আরামের স্থান হইয়াছিল।

* * * * *

"তাঁহার ভবনের যে সুপ্রশস্ত হলে তিনি বসিতেন, তাহাতে কোন-প্রকার বাহ্যশোভা ছিল না, কেবল মাদুর দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। ঘরের এক পার্শ্বে একখানি কোচ ছিল, তাহাতে মহর্ষি বসিতেন। এই কোচের সম্মুখে একটি ক্ষুদ্র টিপাই থাকিত এবং তাহার সম্মুখে সাধারণের বসিবার জন্য কতকগুলি চেয়ার ছিল। * * * সন্ধ্যার পর সৎপ্রসঙ্গ ও কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইয়া রাত্রি ২।৩ টা বাজিয়া যাইত,

দুই একজন যুবক কেহ কেহ আপন চেয়ারে বসিয়া গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন হইতেন। মহর্ষির গৃহ নিঃশব্দ হইত, কেবল বোলাকী অথবা কিনু নামক হরকরাদ্বয় আজ্ঞাকারী হইয়া দ্বারে প্রতীক্ষা করিত। এত গভীর রাত্রিতেও উৎসাহপূর্ণ সৎপ্রসঙ্গের বিরাম হইত না, এক একবার মহর্ষি প্রিয়তম ব্রহ্মানন্দের মুখপানে তাকাইতেন, আর তাঁহার ভাবাবেগ যেন উথলিয়া উঠিত। পাছে সভা ভঙ্গ হয় ও ভাবাবেশ বিলুপ্ত হয়, এই আশঙ্কায় তিনি অনেক সময়ে ঘর হইতে ঘড়ি বিদায় করিয়া দিতেন। মহর্ষি কখন কখন বলিয়া উঠিতেন যে, পূর্ব্বে রমানাথ ঠাকুর প্রভৃতি বড়লোক-সকল তাঁহার বন্ধু ও আত্মীয় ছিলেন, তাঁহাদের সহিত তিনি আমোদ প্রমোদ করিতেন, এখন এই-সমস্ত বিনীত দুঃখী যুবা তাঁহার বন্ধু হওয়ায়, ইহাঁদের সহবাসে তিনি যেপ্রকার সুখী হইয়াছেন, এমন আর কখন হন নাই। মহর্ষি যখন বেরিলী ব্রাহ্মসমাজ পরিদর্শন করিয়া প্রত্যাগত হন, তখন সৎপ্রসঙ্গচ্ছলে বলিয়াছিলেন যে, যদি পথে পরলোকে যাইতাম তবে কি আমোদই হইত। তখন এই বলিয়া টেলিগ্রাম করিতাম যে, কেশববাবু শীঘ্র শীঘ্র এস, দেখ কেমন আনন্দ করিতে করিতে গৃহে চলিয়া যাইতেছি।' কেশবচন্দ্রকে পরলোকযাত্রার কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর করিলেন 'আমার ইচ্ছা হয় প্রার্থনা করিতে করিতে বিনীতভাবে পিতার নিকটে চলিয়া যাই।'

"বৃদ্ধ দেবেন্দ্রনাথের সহিত যুবা কেশবচন্দ্রের যেরূপ সুমিষ্ট ধর্ম্মসম্বন্ধ ছিল, তাহা বর্ণনাতীত। স্বামী-স্ত্রীতে, পিতাপুত্রে, বন্ধুবন্ধুতে; এবং গুরুশিষ্যে যেরূপ সম্বন্ধ হয়, মহর্ষি ও ব্রহ্মানন্দের মধ্যে সে সমস্ত সম্বন্ধেরই সমষ্টি ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কেশবচন্দ্র গৃহে প্রবেশ করিলে মহর্ষি আস্তে ব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইতেন, কেশবচন্দ্র অন্যান্য

লোকের সহিত সম্মুখস্থ চেয়ারে বসিতে চাহিতেন, কিন্তু বৃদ্ধ তাঁহার হস্তধারণপূর্ব্বক আপন কোচের উপর নিজপার্শ্বে বলপূর্ব্বক এই বলিয়া বসাইতেন যে, তোমার এই স্থান। যখন মাখন মিছরী বা অন্য কোন খাদ্য মহর্ষির জন্য আনীত হইত, তখন তিনি এই বলিয়া এক চামচ ব্রহ্মানন্দের মুখে ও অপর চামচ নিজমুখে প্রদান করিতেন যে, 'একবার তুমি খাও; একবার আমি খাই।' একএকবার কেশবচন্দ্রের মুখপানে তাকাইয়া মহর্ষি অনিবার অশ্রুধারা বিসর্জ্জন করিতেন। কেশবচন্দ্রের অনুরোধে মহর্ষি ব্রাহ্মসমাজের বেদী হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান নামে প্রসিদ্ধ যে-সকল উপদেশ দান করেন, সেই-সকল উপদেশকালে কেশবচন্দ্রের মুখপানে তাকাইয়া থাকিতেন। এরূপ করিবার কারণ এই যে ইহাতে তাঁহার ভাবোদ্দীপন হইত এবং এই কারণেই কেশব-চন্দ্রকে বেদীর সন্মুখে বসিতে হইত। মহর্ষির পুত্রগণ কেশবচন্দ্রকে ব্রহ্মানন্দ দাদা বলিয়া ডাকিতেন।

"কিছুদিন পরে ১ বৈশাখের উৎসব উপলক্ষে স্বীয় পত্নীকে ঠাকুর-পরিবারে আনয়ন জন্য কেশবচন্দ্রকে গৃহত্যাগ করিতে হয়। অল্পদিন পরেই তাঁহার বিষম একটি ফোড়া হইয়াছিল এবং তজ্জন্য তাঁহাকে দীর্ঘকাল রোগশয্যায় পড়িয়া থাকিতে হয়। মহর্ষি সুদক্ষ ডাক্তারদিগের দ্বারা তাঁহার চিকিৎসা করাইয়াছিলেন, এবং সকলে এত যত্ন করিতেন যে কেশবচন্দ্র তিলার্দ্ধও বুঝিতে পারেন নাই যে, তিনি পরগৃহে বাস করিতেছেন। অন্তঃপুরে মহিলাগণ এবং গৃহের বালকগণ তাঁহার পত্নীর সহিত এরূপ সস্নেহব্যবহার করিতেন যে, তাহা বর্ণনাতীত। আচার্য্যদেবের নিজমুখে অনেকবার শুনা গিয়াছে যে, কন্যাকে শ্বশুর-বাড়ী পাঠাইবার সময় যেরূপ সজ্জিত করিয়া পাঠাইতে হয়, তাঁহার লক্ষ্মীকে মহর্ষি নিজগৃহ হইতে সেইরূপে সাজাইয়া বিদায় দিয়াছিলেন।"

যেখানে এরূপ অকৃত্রিম বন্ধুতা ও মধুর সম্বন্ধ সেখানে কেশবচন্দ্র নিজ পত্নীকে আনিয়া রাখাতে কোনপ্রকার নিন্দার বিষয় হইতে পারে না। কেশবচন্দ্র এই ব্যাপারে যেরূপ সাহস ও বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার জীবনচরিতে অতি পরিষ্কাররূপে প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং পাঠকেরা তাহা পাঠ করিলে নিশ্চয়ই আনন্দিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন সন্দেহ নাই।

কলিকাতাতে যে ব্রাহ্মধর্ম্মের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে ভারতের অনেক স্থানে উপস্থিত হইয়াছে। কৃষ্ণনগরে কেশবচন্দ্র ও সত্যেন্দ্রনাথের প্রচারের ফলে সেখানে এক ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তৎপরে কৃষ্ণনগরের অন্তর্গত মোহরপুর গ্রামে শ্রীযুক্ত কাশীশ্বর মিত্র ও অন্যান্য কয়েকজন যুবক মিলিত হইয়া এক ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিলেন। ১৭৮৩ শক ১৭ ভাদ্র এই ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সভাস্থলে প্রায় দুইশত ভদ্রলোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। প্রথমে কাশীশ্বর মিত্র মহাশয় একটি বক্তৃতা প্রদান করিলে পর উপাসনা ও সঙ্গীত হইয়া সভার কার্য্য শেষ হইল। এইস্থানের যুবকেরা দেবেন্দ্রনাথের সহিত সর্ব্বদাই চিঠিপত্র দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ গ্রহণ করিতেন। বস্তুতঃ এই সময়ে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের কেন্দ্রস্থানে অবস্থান করিয়া ইহার বিস্তৃত কার্য্যাবলী আপনার বুদ্ধি ও ধর্ম্মের শাসন দ্বারা নিয়মিত করিতেছিলেন। অনেক ব্যক্তির এই বিশ্বাস যে দেবেন্দ্রনাথ কেবল প্রীতি ও ভাবযোগে ব্রহ্মের উপাসনা ও ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু একথা পূর্ণ সত্য নয়—আংশিক সত্য বটে। স্থানবিশেষে ইহার আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

দেবেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে আর একটি অভিযোগ এই যে তিনি

নিজে "ব্রাহ্ম-সমাজপতি" এই উপাধি গ্রহণ করেন। একথা সত্য নয়। যশঃস্পৃহা অথবা সম্মান লাভের আকাঙ্ক্ষা তাঁহার আদৌ ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এ সম্বন্ধে আমরা দুই একটি ঘটনা উল্লেখ করিতেছি। একবার বঙ্গের জনৈক ছোটলাট—তাঁহাকে 'রাজা' উপাধি প্রদান করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। এই কথা তাঁহার কর্ণগোচর হইবামাত্র তিনি কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিলেন এবং যে পর্য্যন্ত না সেই উপাধি প্রদানের দিন অতিবাহিত হইল, সে পর্য্যন্ত তিনি কলিকাতা প্রত্যাগমন করিলেন না। ইহা শুনিয়া ছোটলাট বলিলেন "The man is too proud to have any title from us"। আর একবার ভক্তিভাজন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় সশিষ্যে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। তখন তিনি ব্রাহ্মসমাজের সহিত সংস্রব পরিত্যাগ করিয়াছেন। মহর্ষি বলিলেন "বিজয় তুমি কত উন্নতি করিয়াছ দেখিলে অত্যন্ত আনন্দ হয়।" গোস্বামী বলিলেন "সে তো আপনার' কৃপাতে। কারণ আপনিই তো আমার প্রথম ও প্রধান গুরু।' মহর্ষি বলিলেন "সে কি রকম জান, যেমন বালকেরা প্রথমে গুরুমহাশয়ের নিকট পাঠশালাতে পড়ে, পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি লাভ করিয়া জ্ঞানে পূর্ব্বের গুরুমহাশয় অপেক্ষা অনেক উন্নত হয়।" এইরূপে দুইজনে আলাপ পরিচয় হইল। এই দুই ব্যক্তির মধ্যে কি প্রকার সম্বন্ধ ছিল পাঠকেরা ক্রমে তাহা বুঝিতে পারিবেন। দেবেন্দ্রনাথ জীবদ্দশাতে এত টাকা দান করিয়া যান যে তাহা শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। যখন যাহাকে দান করিয়াছেন তখনি তাহাকে আপনার নাম প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। তখন বাঙ্গালীর

লাভ সম্ভব হইতে পারিত, তাহা 'প্রিন্স' দ্বারকানাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র অনায়াসে লাভ করিতে পারিতেন। কিন্তু সেদিকে তাঁহার একেবারে দৃষ্টি ছিল না। এরূপ নিরভিমান, যশলিপ্সাবর্জ্জিত ব্যক্তির সম্বন্ধে এইপ্রকার অভিযোগ কিপ্রকারে হইতে পারে, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। যাহা হউক তাঁহার সমাজ-পতি উপাধি সম্বন্ধে আমরা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে দেখি যে ১৭৮৩ শকের ২৭ চৈত্র ব্রাহ্মসমাজের একটি সাধারণ সভা হয়। এই সভাতে নিম্নলিখিত নিয়ম-সকল অবধারিত হয়।

"ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কার্য্যের ভার যোড়াসাঁকোস্থিত শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রতি অর্পিত হইল। এবং তিনি ব্রাহ্মসমাজ-পতি ও প্রধান আচার্য্য উপাধি প্রাপ্ত হইলেন।"

এই সময়ে দেবেন্দ্রনাথের সহিত বীরভূমনিবাসী বিখ্যাত সিংহ মহোদয়দিগের ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত হয়। প্রতাপসিংহ তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিতে আসিতেন। একদিন তিনি প্রস্তাব করেন তাঁহার পিতা শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন সিংহ মহাশয়ের বীরভূমস্থ বাটীতে উপাসনা হয়। তাঁহার অনুরোধে ১৭৮৩ শকের ১৮ চৈত্র তাঁহার বাড়ীতে ব্রহ্মোপাসনার ব্যবস্থা হইল। দেবেন্দ্রনাথ কয়েক জন অনুচরসহ সেখানে গমন করিয়া ব্রহ্মোপাসনা করিলেন। তাহাতে সিংহ মহাশয় অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

একবার দেবেন্দ্রনাথ বর্দ্ধমানের অন্তর্গত গুসকরা নামক গ্রামে একটি আম্র-কাননে বাস করিতেছিলেন। তাঁহার তখন এই ইচ্ছা হয় যে এমন একটি নির্জ্জন স্থান স্থির করিতে হইবে, যাহা সাধন ভজনের অনুকূল। এইরূপ স্থান অন্বেষণ করিতে করিতে তিনি ভ্রমণ

করিতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার মনে হইল কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যপদে আসীন হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। তাঁহার ব্রহ্মানুরাগ, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে স্পৃহা, তাঁহার সাহস, চরিত্রের বল ও প্রতিভা—এ-সমস্ত স্মরণ করিয়া দেবেন্দ্রনাথের মনে হইল যে সেই বৎসর ১লা বৈশাখে তাঁহাকে আচার্য্যপদে নিযুক্ত করিতে হইবে। তিনি সে স্থান হইতে ফিরিয়া আসিয়া আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত প্রবীণ ব্যক্তিদিগের নিকট এই প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু প্রায় সকলেই তাঁহার কথার প্রতিবাদ করিলেন। দেবেন্দ্রনাথ কাহারও কথা না মানিয় ১৭৮৪ শক ১লা বৈশাখে তাঁহাকে আচার্য্যের পদ প্রদান করিলেন। নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে এই গম্ভীর অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইল।

১লা বৈশাখ সমাজগৃহ লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। কেশবচন্দ্রের বন্ধুগণের হৃদয় আজ আনন্দে পরিপূর্ণ। তাঁহারা সকলে আপন আপন আসন গ্রহণ করিলে দেবেন্দ্রনাথ নিয়মিতরূপে ব্রহ্মোপাসনা করিলেন এবং তৎপরে বলিলেন,—

"ঈশ্বরপ্রসাদে ব্রাহ্মসমাজের আয়তন ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। পূর্ব্বের ন্যায় কেবল ইহা কলিকাতাতে বদ্ধ নাই; কিন্তু দেশ বিদেশে, গ্রামে গ্রামে তাঁহার মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইতেছে; বঙ্গভূমির সর্ব্বত্রই সেই ঈশ্বরের পবিত্র নাম কীর্ত্তিত হইতেছে—কেবল বঙ্গদেশে কেন; উত্তরপশ্চিমাঞ্চল হিন্দুস্থানের মধ্যেও ঈশ্বরের মঙ্গলময় ব্রাহ্মধর্ম্ম ঘোষণা হইতেছে। ক্রমে আমাদের ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মক্ষেত্র প্রশস্ত হইতেছে; এখন সমস্ত বঙ্গভূমি যাহাতে পবিত্র ধর্ম্মেতে উন্নত হয়, ভারতবর্ষ যাহাতে উন্নত হয়, তাহার উপায় চেষ্টা করিতে হইবে। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে একটি ঐক্যবন্ধন স্থাপিত করিতে হইবে; দূরাদূরের ব্রাহ্মসমাজ-সকল সুপ্রণালীতে বদ্ধ করিতে হইবে। কিন্তু আমি কেবল

কলিকাতায় বদ্ধ থাকিলে সকল সমাজের সম্যক্‌রূপে তত্ত্বাবধারণ হয় না। যেখানে যেখানে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইয়াছে, সেই সেই স্থানে আমার স্বয়ং যাইবার প্রয়োজন। আমি এখন আর কলিকাতায় বদ্ধ থাকিতে পারি না, সুতরাং এখানে একটি আচার্য্যের প্রয়োজন হইতেছে। অতএব আমি এক্ষণে আহ্লাদপূর্ব্বক শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র ব্রহ্মানন্দকে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য-পদে প্রতিষ্ঠিত করিতেছি। ঈশ্বর-প্রসাদাৎ ব্রাহ্মধর্ম্মে ইঁহার যেপ্রকার অনুরাগ, যেপ্রকার নিষ্ঠা, তাহাতে সমাজের অবশ্যই উন্নতি হইবে। এইক্ষণে সকলে মিলিত হইয়া ইঁহার অভিষেককার্য্য সম্পন্ন করুন।

"শ্রীমান্ কেশবচন্দ্র! তুমি যে এই মহদ্ভার গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ, আমি জানিতেছি যে তাহাতে তোমার দ্বারা এ ধর্ম্মের অশেষ উন্নতি হইবে। তুমি এই গুরুভার অপরাজিতচিত্ত হইয়া অহোরাত্র বহন করিবে। কিসে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ উন্নত হয়, কিসে ব্রাহ্মদিগের মনের মালিন্য দূর হয়, এপ্রকার যত্ন করিবে। অন্য কোন প্রচলিত ধর্ম্মের প্রতি দ্বেষ কি নিন্দাবাদ করিবে না, কিন্তু যাহাতে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে ঐক্যবন্ধন হয় এমত উপদেশ দিবে। আপনার আন্তরিক ভাব অকপটহৃদয়ে নির্ভয়ে ব্যক্ত করিবে, সদা নম্রস্বভাব হইবে। বৃদ্ধদিগকে সমাদর করিবে। যাঁহার যেপ্রকার মর্য্যাদা তাঁহাকে সেইপ্রকার মর্য্যাদা দিবে। তুমি যে-কর্ম্মে অগ্রসর হইয়াছ এ অতি দুরূহ কর্ম্ম। কিন্তু অল্পবয়স্ক মনে করিয়া আপনাকে অবজ্ঞা করিও না। আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাত্মা রামমোহন রায় ধর্ম্মের জন্য ষোড়শ বৎসরে দেশত্যাগী হইয়াছিলেন, সেই ষোড়শ বৎসরে তিনি যে-ভাব দ্বারা নীয়মান হইয়াছিলেন, সেই ভাব তাঁহার হৃদয়ে চিরদিনই ছিল। প্রথম বয়সে যাঁহারা ধর্ম্মের জন্য ত্যাগ স্বীকার করেন,

তাঁহারা কদাপি অবসন্ন হন না; তুমি আপনার ইচ্ছার সহিত প্রাণ, হৃদয়, মন সকলি ঈশ্বরেতে অর্পণ কর। না ধনের দ্বারা, না প্রজার দ্বারা, কিন্তু কেবল ত্যাগের দ্বারাই তাঁহাকে লাভ করা যায়। ধর্ম্মের জন্য ত্যাগ স্বীকার করিতে ক্ষুব্ধ হইবে না। কলিকাতার ব্রাহ্মদিগের হৃদয়ে ব্রাহ্মধর্ম্মবীজ প্রাণপণে রোপণ করিবে।

"এক্ষণে তুমি আপনার আত্মাকে সেই অমৃতসাগরে নিমগ্ন কর, সেই জগৎ-প্রসবিতা পরমদেবতার বরণীয় জ্ঞান ও শক্তি ধ্যান কর, যিনি আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তিসকল প্রেরণ করিতেছেন। ঈশ্বর তোমাকে এইক্ষণে আপনার অমৃত-সলিলে অভিষিক্ত করিতেছেন। তাঁহার আদেশে আমিও তোমাকে এই আচার্য্যপদে অভিষিক্ত করিতেছি। তুমি কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য-পদ ধারণ করিয়া চতুর্দ্দিকে শুভফল বিস্তার কর।

"এই ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ গ্রহণ কর। যদিও হিমালয় চূর্ণ হইয়া ভূমিসাৎ হয়, তথাপি ইহার একটিমাত্র সত্য বিনষ্ট হইবে না। যদি দক্ষিণসাগর শুষ্ক হইয়া যায়, তথাপি ইহার একটি সত্যেরও অন্যথা হইবেক না। যে প্রকারে পূর্ব্বে অগ্নিহোত্রীরা অগ্নিকে রক্ষা করিতেন, তুমি এই ব্রাহ্মধর্ম্মকে তদ্রূপ রক্ষা করিবে। হে ব্রাহ্মগণ, তোমরা অদ্যাবধি এই কলিকাতার আচার্য্যের প্রতি অনুকূল হইয়া ইঁহার কথা শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিবে, তাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের অবশ্যই গৌরব বৃদ্ধি হইবে।"

এই উপদেশ প্রদান করিয়া মহর্ষি নিম্নলিখিত অধিকারপত্র পাঠ করিয়া কেশবচন্দ্রের হস্তে অর্পণ করিলেন।

অধিকারপত্র।

ওঁ তৎসৎ।

"ব্রহ্ম-জ্ঞান ব্রহ্ম-ধ্যান ব্রহ্মানন্দ-রস পান।"

"শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র ব্রহ্মানন্দ কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজের আচার্য্য মহাশয়েষু।

"তুমি অদ্য ঈশ্বরপ্রসাদে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য-পদে অভিষিক্ত হইলে; তুমি এই ভার কায়মনোবাক্যে বহন করিবে। তোমার উপদেশ ও অনুষ্ঠান যেন ব্রাহ্মদিগের অমৃতের সোপান হয়। যাহাতে বিশ্বস্রষ্টা, বিশ্বপাতা, মঙ্গলবিধান, পরমেশ্বরের প্রতি ব্রাহ্মদিগের মনোবুদ্ধি আত্মা উন্নত হয়; ধর্ম্ম, প্রীতি, পবিত্রতা ও সাধুভাবের সঞ্চার হয়; যাহাতে দ্বেষ কলহ অন্তরিত হইয়া ব্রাহ্মদিগের মধ্যে একটি ঐক্যবন্ধন স্থাপিত হয়, এপ্রকার সদুপদেশ দিবে এবং সাধু দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবে। সম্পত্তি বিপত্তিতে, স্তুতি নিন্দাতে, মান অপমানে অবিচলিত থাকিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিবে। আপনার মান মর্য্যাদা প্রভুত্ব বিস্তারের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া ঈশ্বরের মহিমাকে মহীয়ান্ করিবে। ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করুন, তোমার জ্ঞান ধর্ম্ম পোষণ করুন, তোমার শরীর বলিষ্ঠ হউক, মন বীর্য্যবান্ হউক, জ্ঞান উজ্জ্বল হউক, ধর্ম্ম স্বার্থহীন হউক, হৃদয় প্রশস্ত ও পবিত্র হউক, জিহ্বা মধুময় হউক, তোমার চক্ষু ভদ্র রূপ দর্শন করুক, কর্ণ ভদ্র কথা শ্রবণ করুক। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরি ওঁ।

১লা বৈশাখ
১৭৮৪ শক।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
ব্রাহ্মসমাজপতি ও প্রধান আচার্য্য।"

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

কর্ম্মজীবন।

কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যপদে অভিষিক্ত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত হরিমোহন সেন এবং জ্যেষ্ঠভ্রাতা নবীনচন্দ্র সেন তাঁহাকে জানাইলেন যে তিনি যেন নিজের গৃহে আর প্রত্যাগমন না করেন। তিনি সেই পত্র দেবেন্দ্রনাথকে দেখাইলেন। দেবেন্দ্রনাথ পত্র পাঠ করিয়া বলিলেন "আমার গৃহ তোমার গৃহ, তুমি সুখে এই গৃহে বাস কর।" এখন হইতে কেশবচন্দ্র তাঁহার পরিবারের মধ্যে বাস করিতে লাগিলেন। "প্রধানাচার্য্যের পত্নী ও কন্যাগণ কেশবচন্দ্রের পত্নীর প্রতি এমন সুমধুর সস্নেহ ব্যবহার করিতেন যে, তিনি কখন স্বগৃহ হইতে তাড়িত হইয়া পরগৃহে বাস করিতেছেন, ইহা একদিনের জন্যও বুঝিতে পারেন নাই। সকলের আদর অভ্যর্থনায় তিনি নির্ব্বাসন-দুঃখ ভুলিয়া পরমানন্দে মহর্ষিগৃহে বাস করিতে লাগিলেন। কেশবচন্দ্রের তো কথাই নাই, তিনি প্রধানাচার্য্যকে পিতৃপদে বরণ করিয়াছিলেন, তাঁহার পুত্রগণ তাঁহার সহোদরতুল্য ছিলেন। সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে পরগৃহবাস হইবার কোন কারণই ছিল না। গৃহ হইতে নির্ব্বাসন যেমন একদিকে অতি দুঃখময় ব্যাপার ছিল, অন্যদিকে তেমনি আধ্যাত্মিক পরিবার-বন্ধনের হেতু হইল বলিয়া আনন্দের কারণ হইয়াছিল।"

যাহাহউক এইরূপে কেশবচন্দ্র গৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়া মহর্ষির গৃহে বাস করিতে লাগিলেন এবং ব্রাহ্মসমাজের সেবাতে অধিকতর পরিশ্রম ও উৎসাহ সহকারে আপনাকে নিযুক্ত করিলেন। ঐ বৎসরে হালিসহর ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে কেশবচন্দ্র ও অন্যান্য কতিপয়

যুবকসহ দেবেন্দ্রনাথ, তথায় গমন করেন। নৌকা হইতে অবতরণ করিবার সময় কেশবচন্দ্র হঠাৎ এক গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হয়েন। কলিকাতা ফিরিয়া আসিয়া তিনি শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন। দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার সুচিকিৎসা ও সেবার সকলপ্রকার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। কিন্তু তাঁহার মাতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহাকে শুশ্রূষা করিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। কেশবচন্দ্রের মাতা হিন্দুসমাজের প্রথানুসারে ঠাকুর-বাড়ীতে আসিতে পারিলেন না বলিয়া অন্য একটি গৃহ ভাড়া লওয়া হইল এবং সেখানে কেশবচন্দ্রকে লইয়া যাওয়া হইল। "বিদায় দেওয়ার সময়ে নূতন গৃহে গিয়া বাস করিবার উপযোগী সমুদায় তৈজসপত্র দ্রব্যজাত সঙ্গে দিলেন। একালে অতি সম্পন্ন লোক কন্যাকে পতিগৃহে পাঠা-ইতে যেপ্রকার আয়োজন সঙ্গে দিয়া পাঠাইয়া থাকেন, কেশবচন্দ্রের পত্নীকে সেইপ্রকার আয়োজনে মহর্ষি নূতন গৃহে প্রেরণ করিলেন।"

সাধারণ লোকের এই বিশ্বাস যে দেবেন্দ্রনাথ ভাব ও প্রীতিযোগে ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন ও ব্রহ্মোপাসনা প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। অনেক সময়ে প্রাচীন ও শিক্ষিত ব্রাহ্মের মুখেও এ কথা শুনা যায় যে রাজা রাম-মোহন রায় জ্ঞানযোগে ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন ও প্রচার করেন, দেবেন্দ্রনাথ এই ধর্ম্ম ভাব- ও প্রীতিযোগে সাধন ও প্রচার করেন এবং কেশবচন্দ্র কর্ম্ম ও অনুষ্ঠানের দ্বারা এই ধর্ম্মসাধন ও প্রচার করেন। কেশবচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথের সহিত প্রীতিযোগে যুক্ত হইয়া বহুকাল পর্য্যন্ত একত্রে বাস ও একত্রে কার্য্য করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনিও একথা বলেন—"আমরা যতদূর বুঝিতে পারি, তাহাতে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য—ভাবে ও প্রীতিতে জীবন্ত ঈশ্বরের অর্চ্চনা। ইহারই জন্য তিনি জীবন ধারণ করেন, ইহারই জন্য তাঁহার জীবন ও পরিশ্রম মূল্যবান্ এবং আমাদের চিত্তাকর্ষক। * * * * * এই ভাবের প্রকৃতিই এই যে, ইহা

গণ্ডগোল এবং আড়ম্বর দূরে পরিহার করে। মহাগণ্ডগোলপূর্ণ সংসার এবং মহাপরিবর্ত্তনের ব্যাপারের মধ্যে নহে, কিন্তু নির্জ্জন জীবনের গণ্ডগোল-বিরহিত শান্ত উপদেশাদির মধ্যে উহা আত্মপ্রকাশ করে।"* এ পর্য্যন্ত যাঁহারা দেবেন্দ্রনাথের জীবনী মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবেন সাধারণের এই বিশ্বাসের মূলে যথেষ্ট ভ্রম আছে। তত্ত্ববোধিনী সভা ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অভ্যুদয়, ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিত্তি অন্বেষণের জন্য অক্ষয় বাবু প্রভৃতির সহিত বিচার ও তর্ক, পরে হিমালয়ে অবস্থানকালে শারীরিক ও সাংসারিক সকলপ্রকার ক্লেশ বহন, পিতৃঋণ শোধ করিবার জন্য অসাধারণ পরিশ্রম ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা, পিতার পরলোকগমনে সুবিখ্যাত সম্ভ্রান্ত ও স্বনামধন্য দ্বারকানাথ ঠাকুরের গৃহে প্রথম অপৌত্তলিক অনুষ্ঠান, কন্যার ধর্ম্মবিশ্বাসানুযায়ী বিবাহ-অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিতে গিয়া সমাজ ও আত্মীয়গণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হওয়া,—এই-সমস্ত ব্যাপার যে-জীবনে দেখিতে পাওয়া যায়,সে-জীবন কি কেবল "ভাবে ও প্রীতিতে জীবন্ত ঈশ্বরের অর্চ্চনার" কথা প্রকাশ করে? আমরা যখনকার কথা উল্লেখ করিতেছি, তখন তিনি নিজে অর্থব্যয় করিয়া ও কত পরিশ্রম করিয়া ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন।

১৭৮৩ শক পৌষ মাসে তিনি বেরিলিতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারার্থ গমন করিয়াছিলেন। সেখানে তখন ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি লোকের এরূপ অনুরাগ হইয়াছিল যে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা হিন্দি ও উর্দ্দু ভাষাতে প্রকাশিত হইয়া সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইতেছিল। এই সময়ে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারার্থ এরূপ পরিশ্রম করিতেন যে

* আচার্য্য কেশবচন্দ্র, মধ্য বিবরণ, ৫৪ পৃষ্ঠা।

সাধারণতঃ তাহা দেখা যায় না। এই সময়কার তাঁহার কার্য্যাবলী চিন্তা করিলে মনে হয় যে তাঁহার আত্মগোপনের চেষ্টাই তাঁহার সম্বন্ধে সাধারণের এই বিশ্বাস দৃঢ় করিবার একটি প্রধান কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। কোন কোন সময়ে তিনি প্রচারে বহির্গত হইয়াছেন কিন্তু ফিরিয়া আসিবার সময়ে উপযুক্ত সময়ে পৌঁছিতে না পারাতে গাড়ী চলিয়া গিয়াছে, এজন্য অনাবৃত স্থানে, অনন্ত আকাশের নিম্নে একটি ভগ্ন খাটিয়া কিম্বা বেঞ্চের উপর তাঁহাকে সমস্ত রাত্রি যাপন করিতে হইয়াছে। কতবার এই প্রকার ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহার সংখ্যা নাই। এই সময়ে তিনি কলিকাতাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান দিতেন; ব্রাহ্মসমাজের সমস্ত কার্য্য পরিদর্শন করিতেন; কলিকাতা, ভবানীপুর এবং চুঁচুঁড়াতে ব্রহ্মবিদ্যালয়ে উপদেশ প্রদান করিতেন এবং বঙ্গদেশ ও উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গমন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতেন। একদিকে এই-সমস্ত কার্য্য ও অন্যদিকে তাঁহাকে প্রকাণ্ড বিষয়সম্পত্তির তত্ত্বাবধারণ এবং বহুপরিবারবিশিষ্ট সংসারের সমস্ত কার্য্য পরিচালন করিতে হইত। তিনি এত বিভিন্নপ্রকার কার্য্যের মধ্যে নিযুক্ত থাকিয়াও সাংসারিক কার্য্যের কিরূপে শৃঙ্খলা করিতেন, তাহা চিন্তা করিলে মনে হয় এরূপ মনুষ্য জগতে অতি বিরল। এ সম্বন্ধে স্থানান্তরে আলোচনা করা হইয়াছে। এই-সমস্ত কি "মহাগণ্ডগোলপূর্ণ সংগ্রাম এবং মহাপরিবর্ত্তনের ব্যাপারের মধ্যে" তিনি সম্পন্ন করেন নাই? যিনি বাল্যকাল হইতে ক্ষুদ্রের উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া অনন্তের উপাসনাতে মনপ্রাণ নিয়োগ করিয়াছিলেন এবং ভ্রম ও কুসংস্কারের গভীর অন্ধকারে নিমগ্ন, ক্ষুদ্র ও পরিমিতের উপাসনাতে একান্ত অনুরক্ত হিন্দুজাতির মধ্যে তাহা প্রচারের জন্য আপনার শক্তি, অর্থ ও জীবন অর্পণ করিয়াছিলেন, তিনি কি

"একাকী সবলে প্রাচীন ভ্রমদুর্গ" ভগ্ন করিবার জন্য এবং "কঠোর আত্মবলিদান" করিবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না? তবে কেন আমরা এই কথা বলিব যে তিনি কেবল 'ভাবে ও প্রীতিতে' ঈশ্বরের পূজা করিয়া গিয়াছেন? তাঁহার মধ্যে দুইপ্রহরের প্রখর সূর্য্যালোকের ন্যায় উজ্জ্বল প্রতিভা না থাকিতে পারে এবং হয়ত এইজন্যই তিনি পৃথিবীতে বিশেষভাবে পরিচিত নহেন, "কিন্তু তাঁহার ভিতরে যে মহান গুণ আছে পৃথিবীকে তাহা একদিন বুঝিয়া প্রশংসা করিতে হইবে, এবং সমুদায় ভারত গভীর কৃতজ্ঞতা সহকারে তাঁহার নাম পোষণ করিবে।"

মেদিনীপুরে তাঁহার অকৃত্রিম বন্ধু ও শিষ্য রাজনারায়ণ বসু মহাশয় জিলাস্কুলে প্রধান শিক্ষকের কার্য্য করিতেন। তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী ইতিপূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। সেখানকার অবস্থা পরিদর্শনের জন্য দেবেন্দ্রনাথ ঐ শকের শ্রাবণ মাসে গমন করেন, এবং কুমারখালি হইতে তাহার নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত প্রেরণ করেন। "মেদিনীপুরে আমি গত শ্রাবণ মাসে উপস্থিত হইয়া তথাকার ব্রাহ্মসমাজ অবলোকন-পূর্ব্বক ও ব্রাহ্মদিগের মধ্যে পরস্পর প্রণয়ভাব সন্দর্শন করিয়া অতীব তৃপ্ত হইয়াছি। মেদিনীপুরের ব্রাহ্মসমাজ ১৭৬৮ শকে কোন-নগর-নিবাসী শ্রীযুক্তবাবু শিবচন্দ্র দেবের দ্বারা স্থাপিত হয়। তাঁহার মেদিনীপুর হইতে কর্ম্মানুরোধে অন্যত্র গমন হইলে সমাজ ভগ্নপ্রায় হইয়াছিল। পরে ঈশ্বরপ্রাসাদাৎ তথায় শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের অবস্থিতি হইলে তাঁহার দ্বারা ১৭৭৩ শকে পুনরুদ্ধৃত ও উদ্দীপ্ত হয়। সম্প্রতি গতবৎসরে তথাকার ব্রাহ্মদিগের সাহায্যে একটি ব্রাহ্মসমাজ-গৃহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তথায় প্রতি বুধবারে ব্রহ্মোপাসনা উৎকৃষ্টরূপে নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু

মহাশয় ব্রহ্মোপাসনা-সময়ে বেদী হইতে উপদেশ দেন এবং তাহার পূর্ব্বে এক অধ্যেতা ব্রাহ্মধর্ম্মের তাৎপর্য্য ও আর-একজন অধ্যেতা ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান পাঠ করেন। * * * তথাকার অধ্যক্ষেরা ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির জন্য বিশেষ উদ্যোগী, ইহা দেখিয়া আমি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি। * * শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের বিনয়গুণে সকলে একমনা হইয়া সমাজের সাহায্য-বিধান করিতেছেন। দৃঢ়ব্রত রাজ-নারায়ণ বসুর যত্ন ও পরিশ্রমে তথায় ব্রাহ্মধর্ম্ম দিন দিন উন্নতবেশ ধারণ করিতেছে। তথাকার সকল ব্রাহ্মেরাই তাঁহার উপদেশ ও দৃষ্টান্ত আদরপূর্ব্বক গ্রহণ করেন এবং তাঁহাকে তাঁহারা মনের সহিত শ্রদ্ধা করেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতির জন্য কষ্ট ও লোকের অত্যাচার সহ্য করিতে তিনি বিমুখ নহেন; ত্যাগ স্বীকার করা তাঁহার অভ্যাস পাইয়াছে। তাঁহার যত্ন ও পরিশ্রমে মোহ-মুগ্ধ মেদিনীপুরে যে জ্ঞানালোক প্রকাশ হইয়াছে, যে ধর্ম্মামৃত বর্ষিত হইতেছে, তাহা আর যাইবার নহে, তাহা দিন দিন বৃদ্ধিই হইবে। এই আশার ভিত্তিভূমি তথাকার ব্রহ্মবিদ্যালয়। ব্রহ্ম-বিদ্যালয় হইতে যে-সকল ছাত্রেরা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছে এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহা-দের আবাস সেই মেদিনীপুরখণ্ডে। তাহাদের নব উৎসাহে ব্রাহ্মধর্ম্ম তৎপ্রদেশে অচিরাৎ উদ্দীপিত হইবে। এখন হইতেই মেদিনীপুরখণ্ডের পল্লীগ্রামেও ব্রাহ্মধর্ম্মের আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। তথাকার ব্রহ্ম-বিদ্যালয়ের প্রধান ছাত্র শ্রীযুক্ত * অখিলচন্দ্র দত্ত ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিবার ভার লইতে অগ্রসর হইয়াছেন, এবং তদুপযুক্ত শিক্ষালাভের জন্যে আমার সহিত সম্প্রতি ভ্রমণ করিতেছেন। ঈশ্বর তাঁহার সাধু ইচ্ছা সফলা করুন।"

---

* ইনি মেদিনীপুরের 'মেদিনী' ও পরে 'নবমেদিনী' পত্রিকাদ্বয়ের নির্ভীক

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

স্ত্রীশিক্ষা ও ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের ব্যবস্থা।

এই সময়ে নবীন ব্রাহ্মযুবকগণ আর একটি সভা স্থাপন করেন। ইহার নাম ব্রাহ্মবন্ধুসভা। এই সভা যেসমস্ত কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা আমরা পত্রিকার নিম্নলিখিত বিবরণ হইতে অবগত হইতে পারি। "কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের অধীনে ব্রাহ্মবন্ধুসভা নাম্নী একটি সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কলিকাতার যত সাধুচরিত্র ও কৃতবিদ্য ব্রাহ্ম আছেন অনেকেই ইহার সভ্য। যেসকল বিষয়ে ধর্ম্মজ্ঞান, ব্রহ্মতত্ত্ব এবং আত্মোন্নতি লাভ করা যায়, সে-সকল বিষয়ই এখানে আলোচিত হইয়া থাকে, বিশেষতঃ দেশোন্নতি এবং ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচার-সম্বন্ধে এই সভা বিশেষ উপকারিণী। বয়স্থা নারীগণের শিক্ষার্থে সভ্যেরা এক প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, এবং ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারার্থে স্থানে স্থানে প্রচারক প্রেরণ করিতে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন, কিন্তু অর্থাভাবে সম্যক্-রূপে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছেন না।" এই সভা কি কি উপায়ে ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, সে-সম্বন্ধে ইহা লিখিত হইয়াছে যে "১। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ এবং অন্য সকল স্থানস্থ ব্রাহ্ম-সমাজের মধ্যে একটি বিশেষ যোগ সংস্থাপন করা, যদ্দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচার-কার্য্য সর্ব্বত্রই এক প্রণালীতে সম্পন্ন হইতে পারে। ২। স্ত্রীলোক-দিগের হিতার্থে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধ ও কথোপকথনচ্ছলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত করা। ৩। সাধারণের উপকারার্থে ব্রহ্মবিদ্যালয়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক রচনা, বক্তৃতা। অজ্ঞলোকদিগের উপকারার্থে সহর এবং পল্লীগ্রামে

নির্দ্দিষ্ট স্থানে সরল ভাষায় উপদেশ। ৪। সময়বিশেষে অবস্থা-বিশেষে চিকিৎসা—রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের শারীরিক সুস্থতা এবং ধর্ম্মোপদেশ ও আত্মার শান্তি সম্পাদনের চেষ্টা পাওয়া। ৫। ব্রাহ্মধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় বিবিধ গ্রন্থ রচনা করা।"

ব্রাহ্মগণ এক্ষণে স্ত্রীশিক্ষার প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগী হইয়াছেন। তাঁহারা অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষার আয়োজন করিয়াছেন। এই সময়ে সুবিখ্যাত বামাবোধিনী পত্রিকার জন্ম হয় এবং ভক্তিভাজন স্বর্গগত উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী কাল ইহার সম্পাদকত্ব করিয়া স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার কন্যা শ্রীমতী সৌদামিনী দেবীকে বেথুনস্কুলে প্রেরণ করিয়াছিলেন। হরদেব চট্টোপাধ্যায়ও তাঁহার দুই কন্যাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং সাধু মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়ও তাঁহার কন্যাকে বেথুন স্কুলে প্রেরণ করিয়া অনেক লাঞ্ছনা ও নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছিলেন। ইঁহাদের দৃষ্টান্তে আরও কতিপয় বালিকা স্কুলে প্রেরিত হইয়া অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। এদিকে কেশবচন্দ্রপ্রমুখ ব্রাহ্মযুবকগণ স্ত্রীশিক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রতি বৎসরে পরীক্ষা ও পুরস্কার বিতরণ করিয়া বালিকাদিগকে উৎসাহ প্রদান করিতে লাগিলেন। যেমন একদিকে তাঁহারা বদ্ধপরিকর হইয়া ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন, তেমনি অন্যদিকে যাহাতে দেশের স্ত্রীলোকেরা অজ্ঞতার অন্ধকার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া জ্ঞানের আলোকময় রাজ্যে বিচরণ করিতে পারেন, তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে দেশের স্ত্রীলোকেরা শিক্ষালাভের জন্য অত্যন্ত আগ্রহান্বিতা হইলেন। একজন রমণী তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে একটি প্রার্থনা প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন সময়েও

কোন কোন স্ত্রীলোক অতি সুন্দর ভাবে ও, ভাষাতে আপনার মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারিতেন। "নাথ! সমস্ত দিবস অবসান হইল, প্রাতঃকাল অবধি সমস্ত দিন সূর্য্য প্রখর কিরণ সহিত উদিত থাকিয় তোমার আজ্ঞা পালন করিয়াছেন, এবং সন্ধ্যা আরম্ভেতেই তিনি অস্ত হইলেন। এইক্ষণে নিস্তব্ধ রজনী উপস্থিত। এই সময়ে আবার চন্দ্র অগণ্য তারার সহিত আকাশমণ্ডলে উদয় হইয়া তোমার আজ্ঞা পালনে রত হইয়াছেন, কিন্তু পিতা, আমি তোমার কন্যা হইয়া সমস্ত দিনের মধ্যে একবারও তোমার আজ্ঞাপালন করিতে পারি নাই, কেবলি সংসারের প্রলোভনে পড়িয়া তোমাকে ভুলিয়াছিলাম, কেবলি এই প্রকারে মিথ্যা কার্য্যে রত থাকিয়া জীবনের সকল দিবস নিরর্থ ক্ষেপণ করিতেছি। হে পিতা! তোমার নিকটে এই প্রার্থনা করি যেন সূর্য্যের ন্যায় আমি তোমার আজ্ঞা প্রাণপণে পালন করি, যেন আমার শরীরে আলস্য প্রবেশ করিতে না পারে। আমাকে ধর্ম্মবলে বলবতী কর, এবং আমার ইচ্ছা-সকলকে কর্ত্তব্যের অনুগামী করিয়া আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর। দীননাথ, আমি অতি দুঃখিনী, আমার নিকটে প্রকাশিত হও, পাপীয়সী বলিয়া ত্যাগ করিও না। আমার আর তোমার সমান কেহ নাই, আমাকে তোমার কার্য্যে নিযুক্ত কর, যেন তোমার প্রিয় কার্য্য করিতে করিতে আমার জীবন শেষ হয়, আমাকে তোমার চরণ ছায়াতে রক্ষা কর। যেন শ্রেয়কে অবলম্বন করিয়া দিন দিন তোমার নিকটে অগ্রসর হই। পিতা! তোমার প্রেম-মুখ প্রদর্শনে বঞ্চিত করিও না, যেন সকল সময়ে ও সকল অবস্থাতে তোমাকে নিকট জানিয়া অভয় প্রাপ্ত হই। করুণাময়! মনোনিবেশ করিয়া তোমার রাজ্যের শোভা দেখিলে আমার মন পুলকিত হয় এবং তোমার করুণা সকল বস্তুতে প্রকাশ পায়। তুমি করুণাসাগর,

তোমার করুণার কথা কি বলিব, আমি অজ্ঞান স্ত্রীলোক আমার সাধ্য নাই যে তাহা ব্যক্ত করি। আমার অজ্ঞানতা দূর কর ও তোমার নির্ম্মল স্নেহবারি দিয়া আমার হৃদয়ের মলা প্রক্ষালন কর, আমাকে তোমার সঙ্গী করিয়া লও। তোমার চরণে প্রণাম, হে নাথ! অনাথিনীর প্রণাম গ্রহণ কর। হে প্রভু! এ দুঃখিনীর হৃদয়ে বিরাজ কর।" বলা বাহুল্য যে যদিও নব্য ব্রাহ্মদল স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু দেবেন্দ্রনাথই তাঁহাদের এই-সমস্ত কার্য্যে যথেষ্ট সহায়তা করিয়া তাঁহাদিগকে উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন।

এই শকের অগ্রহায়ণ মাসে দেবেন্দ্রনাথ আপনার তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিবাহ ব্রাহ্মবিবাহ-পদ্ধতি-অনুসারে সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ইহা ব্রাহ্মবিবাহের দ্বিতীয় অনুষ্ঠান। এ সম্বন্ধে আমরা পত্রিকাতে দেখিতে পাই "গত ১১ই অগ্রহায়ণ ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য্য শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র শ্রীমান্ হেমেন্দ্র-নাথ ঠাকুরের শুভবিবাহ ব্রাহ্মধর্ম্মমতে সাত্রাগাছী গ্রামে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। কন্যাকর্ত্তার নাম শ্রীযুক্ত হরদেব চট্টোপাধ্যায় এবং কন্যাটির নাম শ্রীমতী নীলময়ী দেবী। এই বিবাহোপলক্ষে প্রায় ২০০ কলি-কাতাস্থ ব্রাহ্ম, বরের অনুযাত্র হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতিরেকে সাত্রা-গাছীরও কোন কোন ব্রাহ্ম উপস্থিত ছিলেন। বিবাহ-রাত্রিতে সর্ব্বসুদ্ধ প্রায় ৪৫০।৫০০ লোকের সমাগম হইয়াছিল।" এই বৃত্তান্ত হইতে বুঝিতে পারা যায় যে এই বিবাহে ব্রাহ্ম ব্যতীত অনেক হিন্দুও যোগদান করিয়াছিলেন।

এই সময়ে কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক, ও সুবিখ্যাত বক্তা ও ধর্ম্ম-প্রচারক প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় সহকারী সম্পাদকের পদে

নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ভক্তিভাজন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ও প্রায় এই সময়ে ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করিয়াছিলেন। তখন বঙ্গ-দেশে কোন্ কোন্ স্থানে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার একটি তালিকা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে তখন ব্রাহ্মসমাজ শিশু হইলেও ধীরে ধীরে কেমন পরিপুষ্ট ও সবল হইতেছিল। কলিকাতার মধ্যে জোড়াসাঁকো, পটলডাঙ্গা, নেবুতলা ও বহুবাজার, ভবানীপুর, বেলঘরিয়ার নিকটস্থ নওদাপাড়া, রামকৃষ্ণপুর, সাঁত্রাগাছী, কোন্নগর, শ্রীরামপুর, চন্দননগর, দত্তপুকুর, পুটুরি, দীর্ঘগুই, হালিসহর, বেহালা, টাকী, মেদিনীপুর, বর্দ্ধমান, জলেশ্বর, বলুহাটী, বৈদ্যবাটী, নিবাধৈ, মুদিয়ালী, ভাষতাড়া, চুঁচুড়া, শান্তিপুর, কৃষ্ণনগর, বগুড়া, ত্রিপুরা, ফরিদপুর, যশোহর, বাখরগঞ্জ, বরিশাল, বোয়ালিয়া, ঢাকা, ত্রিপুরা শাখা, মৈমনসিংহ, পাবনা, চট্ট-গ্রাম। এতদ্ব্যতীত কটক, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, বেরিলি, এবং লাহোরেও ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইয়াছিল। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি লোকে এত আকৃষ্ট হইয়াছিল যে বাগআঁচড়া গ্রামে একেবারে ১৫০টি পরিবার এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। যেমন ব্রাহ্মধর্ম্মের পতাকা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উড্ডীন হইল, সঙ্গে সঙ্গে সকলের উৎসাহ ও আনন্দ সেই পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। প্রধানাচার্য্য মহাশয় এই-সমস্ত স্থানে প্রচারক প্রেরণ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিক হইতে প্রচারক প্রেরণ করিবার জন্য তাঁহার নিকট পত্রসমূহ আসিতে লাগিল। তাহার উত্তরে পত্রিকাতে এই বিজ্ঞাপন প্রদত্ত হইল "বঙ্গদেশস্থ নানাস্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের সভ্যেরা ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারকের জন্য কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে পত্র লিখিতেছেন। আমরা অতি আহ্লাদের সহিত প্রকাশ

হইবেন। শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের প্রযত্নে ও বিশুদ্ধ চেষ্টায় ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচার-কার্য্য সম্পূর্ণরূপে প্রণালীবদ্ধ হইতেছে। ব্রহ্মনিষ্ঠ, শ্রদ্ধাবান্, জ্ঞানাপন্ন ব্রাহ্মগণকে সাংসারিক জীবিকা নির্ব্বাহের সংস্থান করিয়া দিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারার্থে স্থানে স্থানে প্রেরণ করা হইবে এমত যুক্তি হইয়াছে এবং এতৎ প্রচারকার্য্যের যাহা যাহা তাঁহাদিগের নিকট বিহিত উপায় বোধ হয় তত্তাবৎ অবলম্বন করিয়া তাঁহারা ব্রাহ্ম-সমাজের উন্নতি সাধন করিবেন। যেখানে যেরূপ অভাব সেখানে সেইরূপ উপায় অবলম্বিত হইবে। ইহার মধ্যেই এবম্বিধ কয়েকটি ব্রাহ্ম-প্রচারক নিযুক্ত হইয়াছেন। এ বিষয়ের জন্য শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের নিকট সকলেরই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা কর্ত্তব্য। তিনি যে কেবল উপাসনা দ্বারা ব্রাহ্মসমাজকে সাহায্য করিতেছেন এমত নহে, অর্থ দ্বারাও প্রচুররূপে আনুকূল্য করিতেছেন।”

———

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

ব্রাহ্মসমাজের বিস্তৃতি ও জ্ঞান প্রচার।

এই অধ্যায়ে আমরা একটি ঘটনার উল্লেখ করিব। সে সময়কার লোকেরা ব্রাহ্মধর্ম্ম জীবনে প্রতিপালন করিবার জন্য যে কি প্রকার কষ্ট ও নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছিলেন, তাহা এই ঘটনা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে। শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় লিখিতেছেন. "মহাশয়! কৃষ্ণনগরনিবাসী শ্রীযুক্ত মধুসূদন লাহিড়ী, তাঁহার পিতার আদ্য শ্রাদ্ধ ব্রাহ্মমতে করিবেন বলিয়া তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর অবধিই উৎসুক হইয়াছিলেন। কিন্তু * শান্তিপুরস্থ কোন ব্যক্তির নিকট এবিষয়ের উৎসাহ না পাইয়া তিনি কলিকাতায় আমাদিগের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি যদিও তাঁহাকে সাধু বলিয়া জানিতাম তথাপি নানাপ্রকার সাংসারিক ভয় প্রদর্শনপূর্ব্বক পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম যে তাঁহার ধর্ম্মভাব কিছুতেই চঞ্চল না হইয়া বরং ক্রমে ক্রমে আরও উজ্জ্বল প্রভায় প্রকাশিত হইতে লাগিল, তখন আমি তাঁহাকে উৎসাহ দিতে লাগিলাম। অনন্তর, সকলে পরামর্শ করিয়া তাঁহার পিতার শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য ২৮এ অগ্রহায়ণ রবিবার দিন স্থির করা গেল, এবং তদুপলক্ষে কতিপয় ব্রাহ্ম ভ্রাতাকে নিমন্ত্রণ করা গেল। ২৭ অগ্রহায়ণ রাত্রিতে জনকতক ভদ্রলোক আমাদের বাসায় আসিলেন এবং লাহিড়ী মহাশয়কে কহিলেন যে 'অত্যন্ত প্রয়োজন আছে তুমি শীঘ্র আমাদের বাসায় চল্।' সেই সরলচিত্ত সাধু যুবা তাঁহাদের দুরভিসন্ধি বুঝিতে না

---

* তাঁহার পিতার শ্রাদ্ধ [illegible]

পারিয়া তাঁহাদের সঙ্গে গমন করিলেন। আমরা নিবারণ করিবার অবকাশ পাইলাম না, কেবল এইমাত্র কহিলাম যে আপনারা কল্য প্রাতে ইঁহাকে পাঠাইয়া দিবেন। পরদিবস প্রাতঃকালে আসা দূরে থাকুক, বেলা ৮।৯টা বাজিয়া গেল, তথাপি লাহিড়ী মহাশয় উপস্থিত হইলেন না। এদিকে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মগণ উপস্থিত, এবং কার্য্যেরও সময় উপস্থিত হইল। তখন যে আমরা কি পর্য্যন্ত বিষাদিত হইয়াছিলাম, তাহা বুঝিতেই পারিতেছেন। কিছুকাল বিবেচনা করত ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া সকলে স্ব স্ব গৃহে প্রতিগমন করিলেন। পরে, প্রায় ২॥০টার সময় আমাদের প্রিয় ভ্রাতা শারীরিক ও মানসিক কষ্টে জর্জ্জরিত হইয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি যেরূপ কষ্টে পড়িয়াছিলেন তাহা শ্রবণ করিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। প্রথমে আমাদের বাসা হইতে লইয়া গিয়া পথের মধ্যে তাঁহার নির্য্যাতনকারীগণ তাঁহাকে কতপ্রকার কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। পরদিবস প্রাতঃকালে তিনি আসিতে চাহিলেন, তাহারা কোনমতেই আসিতে দিল না। এবং অবশেষে তাঁহাকে দ্বাররুদ্ধ করিয়া রাখিল। তখন তিনি শোকার্ত্ত হৃদয়ে কোন উপায়ান্তর না দেখিয়া একটি ক্ষুদ্র প্রাচীর উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক আসিতে চেষ্টা করিলেন, অমনি দস্যুপ্রায় একজন আসিয়া এমত বলপূর্ব্বক তাঁহাকে ধরাশায়ী করিল যে তাহাতে তিনি ক্ষতবিক্ষত হইলেন। এরূপ অবস্থায় পতিত হইয়া এবং আপনাকে অনন্যগতি জানিয়া, কেবল ঈশ্বরের নিকট ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহার ক্রন্দন শুনিয়া সেই বাসাস্থ বালকগণ পর্য্যন্ত ক্রন্দন করিয়া তাঁহার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল, কিন্তু সেই পাষাণহৃদয় মনুষ্যগণের হৃদয় কিছুতেই আর্দ্র হইল না। কিছুক্ষণ

পরে, তাঁহাকে স্নান করাতে লইয়া গেল, শোকার্ত্ত ভ্রাতা সেই সুযোগে পলাইবার চেষ্টা করাতে, তাঁহাকে পথে ফেলিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। তখন ছিন্নবস্ত্রে ধূলি-ধূসরিত অঙ্গে চতুর্দ্দিকে কাহাকেও আপনার লোক না দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন, পথিমধ্যে লোকারণ্য হইল, এবং তাঁহাকে বাতুল বলিয়া সকলে বিবিধ প্রকারে অপমান ও নির্য্যাতন করিতে লাগিল, কিছুতেই ছাড়িয়া দিল না, তিনিও কিছুতেই আর তাহাদের বাসায় প্রত্যাগমন না করাতে তাহারা তাঁহাকে স্থানান্তরে লইয়া গিয়া কহিল যে 'আমরা আর তোমার মুখাবলোকন করিব না, তুমি যথেচ্ছা গমন করা।' তখন তিনি ক্ষতবিক্ষত শরীরে ক্লেশে ও অনাহারে শীর্ণ হইয়া আমাদের নিকট উপস্থিত হইলেন। বিপদাপন্ন ভ্রাতাকে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া আমাদের শোকসাগর উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তাঁহাকে অতি স্নেহের সহিত সান্ত্বনা করিয়া সকলে একত্রে অবস্থিতি করিতে লাগিলাম।" এইরূপ আরও অনেক ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে, কিন্তু বাহুল্য-ভয়ে ও অনাবশ্যক বোধে তাহা হইতে নিবৃত্ত হওয়া গেল।

যাহা হউক এইরূপ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও যখন ব্রাহ্মধর্ম্মের পবিত্র জ্যোতি দেশ বিদেশে ব্যাপ্ত হইতে লাগিল, তখন ব্রাহ্ম-সাধারণের, বিশেষ ভাবে প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের, কি আনন্দ, কি উৎসাহ! তিনি একদিন সাপ্তাহিক উপাসনার দিবসে ব্রাহ্ম-সমাজের বিস্তৃতি সম্বন্ধে কি আশ্চর্য্য ও গম্ভীর বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন! তাঁহার বক্তৃতার ভাষা, বাক্য ও ভাবসমূহের মধ্যে এক অনুপম গাম্ভীর্য্য, স্নিগ্ধতা ও আনন্দের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। পরমব্রহ্মের নামকীর্ত্তন ও তাঁহার মহিমা প্রচারে দেবেন্দ্র-নাথের কি প্রকার আনন্দ ও উৎসাহ ছিল, তাহা এই বক্তৃতা হইতে

আমরা সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারি। পাঠকদিগের অবগতির জন্ত ইহা এস্থলে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

"প্রথমে এই বঙ্গদেশে এই একমাত্র ব্রাহ্মসমাজ ছিল, সমুদায় অরণ্যের মধ্যে এই একটিমাত্র চম্পকের বৃক্ষ ছিল, কোথাও আর ব্রহ্মনামের কীর্ত্তন হইত না, কোথাও আর ব্রহ্মনাম অবগত ছিল না। এই চতুঃপ্রাচীরের অভ্যন্তরে তাঁর গুণগান হইত, আর সকলই শূন্ত ছিল, আর সকলই অন্ধকার ছিল। সেই শূন্ত অন্ধকার ভেদ করিয়া একমেবাদ্বিতীয়ং, জ্যোতির জ্যোতিরূপে, প্রাণের প্রাণরূপে, আত্মার আত্মারূপে এই ব্রাহ্মসমাজে আবির্ভূত হইলেন। যেদিন কৃষ্ণনগর হইতে শব্দ আসিল, যে, সেই পৌত্তলিকতার দুর্গমধ্যে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবার উদ্যোগ হইতেছে, সেদিনের আনন্দ আমি অদ্যাপি বিস্মৃত হই নাই। উৎসাহদাতা উৎসাহ প্রেরণ করিলেন, আর সেখানে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল। পরে ঢাকাতে বিক্রমপুরে এই শুভ সমাচার গেল, পরে মেদিনীপুরে। এখন দেখ বঙ্গভূমি ব্রাহ্মধর্ম্মের রত্নভূষণে, ব্রহ্মজ্ঞানের দীপমালায়, দিন দিন কেমন অলঙ্কৃতা হইতেছে। এইক্ষণে বিপক্ষেরা বাধিত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে জানিতেছে, বিপক্ষেরা স্বপক্ষের ন্যায় ব্রহ্মের নাম কীর্ত্তন করিতেছে। তখন একজনের মনে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রকাশ পাইতেছিল, এখন দেখ যতলোক ইহার অনুচর হইয়াছে, রোগী শীর্ণ হইয়াও বলবান্ বিপথগামীকে ব্রাহ্মধর্ম্মের শীতল আশ্রয়ে আনিতেছে, নির্ধন কুটীরবাসী হইয়াও শ্রীসম্পন্ন মহাশীল ধনাঢ্যকে স্বধর্ম্মে অনুরক্ত করিতেছে, পিতা কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়াও নিরাশ্রয় যুবা পরমপিতার নিকটে প্রার্থনা করিতেছে, যে, হে পরমপিতঃ, আমার পিতার মনকে তোমার দিকে আকর্ষণ কর। কি আনন্দ! কি আনন্দ! চতুর্দ্দিকে তাঁহার গুণগান হইতেছে, তাঁহার নাম কীর্ত্তন

হইতেছে। ব্রাহ্মেরা সদ্ভাবে সাধুভাবে সুহৃদভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন—ঐক্য সম্পন্ন হইতেছে। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে সকল বিবাদ তিরোহিত হইয়া এইমাত্র উগ্র বিবাদ রহিয়াছে, যে, কে অধিক পরিমাণে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে পারে। কেহবা পরিব্রাজক প্রচারক ভাবে পরিভ্রমণ করিতেছেন, কেহবা উপদেষ্টা হইয়া আচার্য্যের আসন গ্রহণ করিয়াছেন। এই স্বর্গীয় ধর্ম্ম প্রচারের জন্য, যার ধন আছে, সে তাহা অকাতরে অজস্র বিতরণ করিতেছে; যার বিদ্যা বুদ্ধি, তর্কশক্তি, বাক্‌পটুতা আছে, সে লোকদিগের কুসংস্কার-কণ্টক-সকল ছেদন করিতেছে, মোহ অন্ধকার নিরাস করিতেছে, তাহাদিগকে বিপথ হইতে সৎপথে আকর্ষণ করিতেছে; যার গান-শক্তি ও স্বর-সৌষ্ঠব ও তাল মান বোধ আছে, সে লোকের সরল মনকে বিশুদ্ধ ভক্তি-রসে আর্দ্র করিতেছে। যেখানে যে প্রকার ক্ষেত্র, সত্য প্রচারের জন্যে ব্রাহ্মেরা সেখানে সেইরূপ উপায় অবলম্বন করিতেছেন। বিদ্বানের জন্যে বিদ্বান্ ব্রাহ্ম, কৃষকের জন্যে কৃষক ব্রাহ্ম দণ্ডায়মান হইয়াছেন। এই প্রকারে দেখ বঙ্গভূমি কেমন উজ্জ্বল পবিত্রবেশ ধারণ করিয়াছে, ব্রহ্ম উপাসনা কেমন ঘরে ঘরে প্রবিষ্ট হইয়াছে, দেবভাব কেমন পশুভাবকে অতিক্রম করিতেছে। কিন্তু কেবল কি এই বঙ্গদেশে আমাদের সকল ভাব, সকল স্নেহ বদ্ধ থাকিবে? ইহা হইতে কি দূরে যাইবে না? প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, অনেকের ভাব বঙ্গদেশ হইতে অন্য প্রদেশে প্রসারিত হইতেছে, বঙ্গদেশে যে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে, ভারতবর্ষময় তাহা ক্রমে বিকীর্ণ হইতেছে। অযোধ্যা ও বেরিলীতে তাহা প্রবেশ করিয়াছে, লাহোরে ও পেশওয়ারে তাহা দীপ্তি পাইতেছে। এইক্ষণে তাঁহার সমুদ্র অতিক্রম করিবার উপক্রম দেখিতেছি। আমার প্রিয় সুহৃৎ এই কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের

আচার্য্য, যিনি এইক্ষণে আমার সম্মুখে বিনীত বেশে ভক্তিভাবে ব্রহ্মানন্দে পূর্ণ হইয়া পরম পুরুষের আরাধনা করিতেছেন, তিনি নানা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সত্যধর্ম্ম প্রচারের জন্য এই মাসের অষ্টাবিংশ দিবসে বোম্বাই নগরে যাত্রা করিবেন। কিন্তু আপনার কিসের জন্যে? শরীরের সুস্থতার জন্যে, কি প্রতিষ্ঠা লাভের জন্যে, কি প্রভুত্ব বিস্তারের জন্যে, না পরিবারের সন্তুষ্টির জন্যে? ইহার কিছুরই জন্যে নহে। ঈশ্বর তাঁহার হৃদয়ে যে ব্রহ্মাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছেন, সেই তাঁহাকে সমুদ্রতীরে প্রক্ষেপ করিতেছে। সেখানে যে কি প্রকারে তাহা প্রচার করিবেন, তাহার কিছুই তিনি অবগত নহেন; এই জানিতেছেন যে যাইতেই হইবে।

"হে ব্রাহ্মসকল! তোমরা তোমাদের আচার্য্যের এই মহদ্দৃষ্টান্তের অনুগামী হও, তিনি যদি স্বীয় দুর্ব্বল শরীর লইয়া পৌত্তলিকতার দুর্গম দুর্গ দ্বারকাধামে ঈশ্বরের জয়স্তম্ভ নিখাত করিতে দণ্ডায়মান হন, তবে তোমরা কি স্বচ্ছন্দ শরীরে বঙ্গভূমিতে স্বীয় গৃহে থাকিয়া তাঁহার পবিত্র রাজ্য বিস্তার করিবে না? যেখানে যেখানে নদী-প্রবাহ প্রবাহিত হইতেছে, যেখানে যেখানে লৌহবর্ত্ম প্রসারিত হইতেছে সেই সকল স্থানে যাও, সেই মহদ্যশের যশ ঘোষণা কর।

"হে জগদীশ্বর! সকলের হৃদয়ে তোমার ধর্ম্ম প্রেরণ কর; যিনি তোমার কার্য্যে দণ্ডায়মান হন, তাঁহাকে তুমি রক্ষা কর।"

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে বাগআঁচড়া গ্রামে অনেকগুলি পরিবার ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া প্রচারকপ্রেরণ করিতে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে আবেদন করেন। তদনুসারে প্রধান আচার্য্য মহাশয় পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে প্রচারকপদে নিযুক্ত করিয়া তথায় প্রেরণ করিলেন। গোস্বামী মহাশয় নিজের ধর্ম্মানুরাগ দ্বারা

সকলকে আকৃষ্ট করিলেন এবং তাহার ফলে ২৩টি পরিবার নূতন ধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। গোস্বামী মহাশয় সেখানে একটি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন।

এতদিনে ব্রাহ্মমতে অনুষ্ঠানের পদ্ধতি স্থিরীকৃত হইয়াছে। প্রধান আচার্য্য মহাশয় সে-সমস্ত পদ্ধতি মুদ্রাঙ্কন করিতে নিযুক্ত হইয়াছেন। কিছুদিন পরে এই পুস্তক 'অনুষ্ঠান-পদ্ধতি' নামে প্রকাশিত হইল। প্রধান আচার্য্য মহাশয় চিরকাল জ্ঞানের পক্ষপাতী ছিলেন। ব্রাহ্মবিদ্যালয়ে ছাত্রেরা তাঁহার এবং কেশবচন্দ্রের উপদেশ দ্বারা ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভ করিত এবং পরীক্ষা দিয়া উপযুক্ত হইলে পুরস্কার লাভ করিত। তিনি কেবল ইহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না। যাহাতে ছাত্রেরা দার্শনিকজ্ঞানালোচনাতে প্রবৃত্ত হয় ও ব্রাহ্মধর্ম্মের তত্ত্ব-সমুদায় বোধগম্য করিতে পারে তজ্জন্য পত্রিকাতে নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিলেন।

"সহস্র মুদ্রা পুরস্কার।

"পুরস্কারের জন্য দুইটি প্রস্তাব নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। প্রস্তাব বাঙ্গলা অথবা ইংরাজী ভাষায় লেখা হইবে। প্রত্যেক প্রস্তাবের পারিতোষিক ৫০০ টাকা। দুইটির মধ্যে যিনি যে প্রস্তাব লিখিবেন, তিনি ১৭৮১ শকের ভাদ্রমাসের মধ্যে তাহা ব্রাহ্মসমাজপতি শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া দিবেন। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয়েরা পরীক্ষা করিয়া যাঁহার প্রস্তাব গ্রাহ্য করিবেন, উক্ত বৎসরের ১১ মাঘে তাঁহাকে সেই প্রস্তাবের পুরস্কারস্বরূপ ৫০০ টাকা প্রদত্ত হইবেক এবং সেই প্রস্তাবের স্বত্বও তাঁহারই থাকিবেক।

প্রথম প্রস্তাব।

পুরস্কার ৫০০ টাকা।

"১ প্রশ্ন। ঈশ্বর-বিষয়ে ব্রাহ্মধর্ম্মের মত কি ও বেদান্ত দর্শনের মতের সহিত তাহার প্রভেদ কি, কর্ত্তব্য-বিষয়ে ব্রাহ্মধর্ম্মের মত কি ও বেদান্ত দর্শনের মতের সহিত তাহার প্রভেদ কি, এবং পরকাল-বিষয়ে ব্রাহ্মধর্ম্মের মত কি ও বেদান্ত দর্শনের মতের সহিত তাহার প্রভেদ কি ?

২ প্রশ্ন। ব্রাহ্মধর্ম্মের যে যে মত বেদান্ত দর্শনের মতের বিরুদ্ধ সেই সেই মত বেদান্ত দর্শনের মত অপেক্ষা কিজন্য উৎকৃষ্ট ও উপাদেয় ?

৩ প্রশ্ন। ব্রাহ্মধর্ম্ম দ্বারা পরিবার মধ্যে ও সাধারণ সমাজে কিরূপ উপকারের সম্ভাবনা ?

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

পুরস্কার ৫০০ টাকা।

১ প্রশ্ন। ঈশ্বর-বিষয়ে, কর্ত্তব্য-বিষয়ে ও পরকাল-বিষয়ে ব্রাহ্মধর্ম্মের মত কি ?

২ প্রশ্ন। ব্রাহ্মধর্ম্ম দ্বারা পরিবার-মধ্যে ও সাধারণ সমাজে কিরূপ উপকারের সম্ভাবনা ?

৩ প্রশ্ন। য়িহুদী, মহম্মদান্ ও খ্রীষ্টান্ মতের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মমতের কোন্ কোন্ অংশে ঐক্য ও কোন্ কোন্ অংশে বিরোধ এবং সেই বিরুদ্ধ স্থলে ব্রাহ্মধর্ম্মের মত কিজন্য উৎকৃষ্ট ও উপাদেয় ?"

এই বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রকে বোম্বাই ও মান্দ্রাজে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য প্রেরণ করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। নূতন ধর্ম্মের সম্বন্ধে ঐ দেশবাসীগণ অনেকদিন হইতে অনেক

কথা শুনিয়া আসিতেছেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহারা সন্তুষ্ট হইলেন না। প্রতিদিন ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহারা পত্রাদি লিখিতে আরম্ভ করিলেন। এই প্রকার রাশি রাশি পত্র কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ সমুদয়ের নামে আসিতে লাগিল। এইজন্য দেবেন্দ্রনাথ স্থির করিলেন যে কেশবচন্দ্র স্বয়ং ঐ অঞ্চলে গমন করিবেন এবং ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের সত্যসমূহ তাঁহাদিগের নিকট প্রচার করিবেন। এই সময়ে কেশবচন্দ্রের প্রথম পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েন। সুতরাং তাঁহার জাতকর্ম্ম সমাপন না করিয়া তিনি কলিকাতা পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। এই অনুষ্ঠান তিনি ব্রাহ্মমতে নিজ গৃহে সম্পন্ন করিবেন স্থির করিলেন। তাঁহার প্রভূত প্রতাপশালী জ্যেষ্ঠতাত হরি-মোহন সেন বলিয়া পাঠাইলেন যদি জাতকর্ম্ম করিতেই হয়, তাহা হইলে যেন উদ্যানে গিয়া সম্পন্ন করা হয়। কেশবচন্দ্র তাহাতে সম্মত হইলেন না। অবশেষে হরিমোহন সেন পরাস্ত হইয়া নিজে উদ্যানে বাস করিতে লাগিলেন। অনুষ্ঠানের দিন উপস্থিত হইল। তাঁহার বন্ধুবান্ধবেরা আসিলেন। দেবেন্দ্রনাথ অনুষ্ঠানের সকল প্রকার আয়োজন সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইলেন। গৃহের যে প্রাঙ্গণে সর্ব্বদা কার্য্যানুষ্ঠান হইত, সেই প্রাঙ্গণ পুষ্পমালাদিতে সুন্দররূপে সজ্জিত করিয়া উপাসনা-মণ্ডপ প্রস্তুত হইল। ঝাড় লণ্ঠনাদিতে সমুদায় মণ্ডপ আলোকিত, উপাসনার বেদী অত্যন্ত শোভান্বিত, কোথাও কিছুরই অভাব নাই। সভাস্থল বন্ধুগণেতে পূর্ণ, ব্রাহ্মধর্ম্মের জয়জনিত আনন্দের মধ্যে যথাসময় জাতকর্ম্মানুষ্ঠান আরম্ভ হইল। প্রথমতঃ প্রধানাচার্য্য কর্ত্তৃক উদ্বোধন, তৎপর শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ব্রহ্মস্তোত্র পাঠ, তদনন্তর প্রধানাচার্য্য ব্রাহ্মধর্ম্মের গ্রন্থ হইতে শ্লোকের

আশীর্ব্বাদ করিয়া অনুষ্ঠান পরিসমাপ্ত করিলেন।" ইহাই কেশবচন্দ্রের প্রথম অপৌত্তলিক অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়া তিনি প্রচারার্থ বহির্গত হইলেন।

এইবারে ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান প্রত্যেক ব্রাহ্মপরিবারে সম্পন্ন হইতে লাগিল। প্রাচীন ব্রাহ্মেরা কিন্তু ইহার বড় পক্ষপাতী ছিলেন না। নব্যদলেরা অতি প্রবলবেগে সংস্কার-কার্য্যে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এইরূপে দুইদলের মধ্যে যে মতভেদ হয়, তাহা দ্বারা ভবিষ্যতে এমন একটি ঘটনার সূত্রপাত হয়, যাহাতে নব্যদলেরা প্রাচীন দলকে পরিত্যাগ করিয়া নূতন সমাজ স্থাপন করিয়াছিলেন। রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ও প্রথমে বিবাহ-অনুষ্ঠানে সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন নাই; তাঁহার সহিত মহর্ষির যে-সমস্ত চিঠিপত্রাদি চলিয়াছিল, তাহা হইতে ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু মহর্ষির সুযুক্তি, অভিজ্ঞতা ও দৃঢ়তা অবশেষে জয়লাভ করিয়াছিল। বসু মহাশয় পরে ইহার প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মমতে আপনার প্রথমা কন্যার বিবাহ-অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন।

এই বিবাহ ১৭৮৬ শক ২০ জ্যৈষ্ঠ তারিখে মেদিনীপুরে সম্পন্ন হইয়াছিল। কলিকাতা হইতে কেশবচন্দ্র ও অন্যান্য যুবকগণকে সঙ্গে লইয়া দেবেন্দ্রনাথ গমন করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে আমরা পত্রিকাতে দেখিতে পাই "আমরা অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, বিগত ২০শে জ্যৈষ্ঠ মেদিনীপুরস্থ শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের প্রথমা তনয়ার সহিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন ঘোষের পরিণয়কার্য্য মেদিনীপুর নগরে সুচারুরূপে সমাধা হইয়া গিয়াছে। * * * বর্ত্তমান মহৎকার্য্য দ্বারা আমাদিগের প্রিয় সুহৃদ রাজনারায়ণ বসু মহাশয় [illegible] সংস্থাপন করিলেন, দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত দূষণীয় সামাজিক

নিয়মকে পরিবর্ত্তিত করিয়া দেশের মুখোজ্জল করিলেন এবং একটি ব্রাহ্মপরিবারের প্রতিষ্ঠা করিলেন। * * * বিবাহ-উপলক্ষে পথের অসুবিধার জন্য অত্রত্য অনেক ব্রাহ্ম বরের অনুযাত্র হইতে পারেন নাই ; কিন্তু মেদিনীপুরস্থ অনেক মহৎ ও বর্দ্ধিষ্ণু লোকেই রাজনারায়ণ বাবুর ভবনে সমাগত হইয়া সাধ্যমতে তাঁহাকে উৎসাহ ও সাহায্য প্রদান করিয়াছিলেন, এমন কি কেহ কেহ তাঁহাদিগের পরিবারাদি পর্য্যন্ত উৎসব-নিকেতনে প্রেরণ করিতে সঙ্কুচিত হয়েন নাই। বিবাহ অতি সমারোহপূর্ব্বক সম্পন্ন হইয়াছিল। মেদিনীপুরে এককালে হুলুস্থুলু পড়িয়া গিয়াছিল। বাটী উজ্জ্বল আলোকমালায় আকীর্ণ, পুষ্পসজ্জায় সজ্জীভূত, বাদ্যাড়ম্বরে পরিপূর্ণ, ব্রহ্মসঙ্গীত-কোলাহলে প্রতিধ্বনিত হইল, চতুর্দ্দিক লোকের আনন্দসূচক কলরবে আচ্ছন্ন হইল, অগ্নি-কার্য্যের বিবিধ বর্ণজ্যোতিতে আলোকিত হইল এবং ঘনগম্ভীর শব্দে শব্দায়মান হইতে লাগিল। সকল স্থানেই উল্লাস, মহোৎসব, কাহারও মুখে অসন্তোষ ও বিষাদের চিহ্ন লক্ষিত হয় নাই।" রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের পরিবারে এই প্রথম অনুষ্ঠান বিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্মমতে সম্পন্ন হইল।

এই বৎসরের সাধারণ সভাতে প্রধান আচার্য্য মহাশয় একবৎসরের জন্য সভাপতি মনোনীত হইলেন। তিনি বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়কে প্রচারকরূপে বাগআঁচড়া প্রেরণ করেন। সেখানে গোস্বামী মহাশয় অত্যন্ত কৃতিত্বের সহিত আপনার কর্ত্তব্যকার্য্য সম্পন্ন করেন। তাঁহার ধর্ম্মজীবনে ও উপদেশে মুগ্ধ হইয়া সেইপ্রকার লোকেরা দলে দলে তাঁহার নিকটে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ গোস্বামীমহাশয় এই যৌবন বয়সে আপনার সাংসারিক উন্নতি উপেক্ষা

ছিলেন, তাহা স্মরণ করিলে প্রত্যেক ব্রাহ্মেরই হৃদয় আনন্দ ও তাঁহার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতাতে পূর্ণ হয়। কেশবচন্দ্র মান্দ্রাজে গমন করিয়া জ্বলন্ত উৎসাহের সহিত অগ্নিময়ী ভাষাতে বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। তাহার ফলে সেখানে এক ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল এবং তাহারা সভ্যেরা তেলেগু ভাষাতে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা মুদ্রাঙ্কিত করিয়া প্রকাশ করিলেন। তখন পর্য্যন্ত সমস্ত ভারতে হিন্দি, তেলেগু ও বাংলা ভাষাতে পত্রিকা প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। এই-সমস্ত দেখিয়া প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের প্রচারস্পৃহা আরও প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়কে উপাচার্য্যপদে অভিষিক্ত করিবার মানসে পত্রিকাতে এক বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিলেন। তৎপরে ১৭৮৬ শক ৬ই ভাদ্র তাঁহা-দিগকে নিম্নলিখিত প্রকারে উপাচার্য্যপদে নিযুক্ত করিলেন। তাঁহা-দিগের অভিষেকের সময় প্রধানাচার্য্য মহাশয় যে নিয়োগ-পত্র প্রদান করিয়াছিলেন তাহা এই ;—"সৌম্য! তুমি অদ্য ঈশ্বর-প্রসাদে উপাচার্য্যপদে অভিষিক্ত হইলে। তুমি এই ভার কায়মনোবাক্যে বহন করিবে। ব্রহ্মজ্ঞান ও কর্ত্তব্যজ্ঞান উপার্জ্জনে সর্ব্বদা যত্নশীল থাকিবে, এবং সর্ব্বসাধারণ-মধ্যে তাহা বিতরণ করিবে। অধ্যয়ন, অধ্যাপনে ও গৃহধর্ম্ম যাজনে নিরাপদ হইবে। নিয়ত ধর্ম্মানুষ্ঠানে পবিত্র হইয়া পবিত্র-স্বরূপের সহবাসে আনন্দ উপভোগ করিতে এবং সদুপদেশ ও সাধু দৃষ্টান্ত দ্বারা ঈশ্বরের পথে সকলের মনকে আকর্ষণ করিবে। গুরুজনকে ভক্তি করিবে, বৃদ্ধদিগকে সমাদর করিবে ও সকলকে যথোপযুক্ত সম্মান দিবে। স্বাধীন হইয়া বিনয়ী হইবে। পরের অত্যুক্তি-সকল সহ্য করিবে, কাহারো প্রতি দ্বেষ করিবে না। অন্যে যদি তোমার প্রতি অসাধু ব্যবহার করে, তুমি সাধুভাব অবলম্বন করিয়া

তাহাকে শিক্ষা দিবে। 'পাপাচারী ব্যক্তির প্রতি পাপাচার করিবে না, কিন্তু সর্ব্বদা সাধুই থাকিবে।' সম্পদে বিপদে, স্তুতি-নিন্দাতে, মান-অপমানে অবিচলিত থাকিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিবে। ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করুন, তোমার জ্ঞান ধর্ম্ম পোষণ করুন—তোমার শরীর বলিষ্ঠ হউক, মন বীর্য্যবান হউক, জ্ঞান উজ্জ্বল হউক, অভিপ্রায় মহান্ হউক, ধর্ম্ম নিঃস্বার্থ হউক, হৃদয় পবিত্র হউক, জিহ্বা মধুময় হউক। তোমার চক্ষু ভদ্ররূপ দর্শন করুক, কর্ণ ভদ্রকথা শ্রবণ করুক।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ব্রাহ্মসমাজপতি ও প্রধান আচার্য্য।"

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়

বিরোধের পূর্ব্বাভাস।

যখন প্রধানাচার্য্য মহাশয় এইরূপে ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি ও প্রচারের ব্যবস্থা করিতেছিলেন, তখন বিধাতার কোন গূঢ়, অজ্ঞাত নিয়মানুসারে প্রাচীন ও নব্যদলের মধ্যে এক বিরোধের সূত্রপাত হইতেছিল। এ সম্বন্ধে ঠিক্ সত্য বুঝিতে পারা বড় কঠিন। এই বিরোধ যে অবশেষে এক ভয়ানক আকার ধারণ করিয়া ব্রাহ্মসমাজকে প্রবলভাবে আন্দোলিত করিয়া বিভক্ত করিবে, তাহা কেহ স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই। তদানীন্তন অবস্থাসমূহ আমরা সত্যভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু বিশেষ প্রমাণাভাবে কোন কোন তথ্য আমরা বুঝিতে সমর্থ হই নাই। যতদূর আমরা বুঝিতে পারিয়াছি, তাহা এই অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ হইল।

প্রধানাচার্য্য মহাশয় এই সময়ে প্রায় পঞ্চাশৎবর্ষে উপনীত হইয়াছেন। তাঁহার প্রকৃতি পাঠকেরা অবগত হইয়াছেন। বাল্যকাল হইতে ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মযোগের প্রতি তিনি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। তাঁহার প্রকাণ্ড জমিদারী, বিষয়, বিভব ও সংসার কোনদিন তাঁহাকে বদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে নাই। তিনি স্বাধীনভাবে যেখানে ইচ্ছা সেখানে গমন করিতেন। এ বিষয়ে আমরা রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে এইপ্রকার শুনিয়াছি যে একমুহূর্ত্ত পূর্ব্বে তিনি তেতলাতে বসিয়া আপনার কার্য্য করিতেছেন, পরমুহূর্ত্তে তাঁহার নিকট হইতে সংবাদ আসিল তিনি বাহির হইবেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহার ভ্রমণের উপযোগী সমস্ত উপকরণ

প্রস্তুত হইল, তিনি অমনি বহির্গত হইলেন। তাঁহার স্বাধীনতা এইপ্রকার ছিল। বরষার মেঘখণ্ডের ন্যায় যেখানে ইচ্ছা সেখানে গমন করিতেন। কেহ কোন বাধা দিতে পারিত না। এতদিন তিনি ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে নানাপ্রকারে নিযুক্ত ছিলেন। সংসারের বিষয়রক্ষা ও সর্ব্বোপরি ব্রাহ্মসমাজের সেবাতে তিনি অসাধারণ পরিশ্রম ও ক্লেশ করিয়াছেন। এক্ষণে যখন ইন্দ্রিয়সমূহ শিথিল হইয়া আসিতেছিল, যখন শরীরের শক্তি ক্রমশঃ হ্রাস হইতে লাগিল, তখন স্বাভাবিকভাবে পূর্ব্বের ন্যায় কার্য্য করিবার প্রবৃত্তিও কিঞ্চিৎ সংযত হইল। এক্ষণে যুবকদল ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য করিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহাদের হস্তে ব্রাহ্মসমাজের সমস্ত কার্য্যভার অর্পণ করিয়া নিজে একটু একটু দূরে থাকিয়া তাঁহাদের কার্য্যসমূহ পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। কেশবচন্দ্রকে ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য ও সম্পাদক, প্রতাপচন্দ্রকে সহকারী সম্পাদক, গোস্বামী ও অন্য কয়েকজনকে প্রচারক ও উপাচার্য্য পদে নিযুক্ত করিয়া তিনি অবসর গ্রহণ করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন। তাঁহার এই ইচ্ছা ছিল ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যভার উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে অর্পণ করিয়া তিনি ব্রহ্মধ্যান ও ব্রহ্মযোগে জীবনের অবশিষ্ট অংশ অতিবাহিত করেন। এই জন্যই তিনি নব্যদলকে নানাপ্রকার কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যভার প্রাপ্ত হইয়া এমন সকল কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং ব্রাহ্মসমাজের উপর এমন সকল অধিকার স্থাপন করিতে প্রয়াসী হইলেন, যাহাতে ব্রাহ্মসমাজের ভবিষ্যতে অনিষ্ট হইতে পারে, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া দেবেন্দ্রনাথ মুখ ফিরাইয়া দণ্ডায়মান হইলেন ও ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে যাহা কল্যাণকর তাহা সাধন করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। ইহা হইতেই এই বিবাদের উৎপত্তি। এ সম্বন্ধে একজন

প্রাচীন ব্রাহ্মের লিখিত ইতিবৃত্ত হইতে আমরা কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"নূতন ব্রাহ্মগণ সত্যের উন্নতির জন্য যে-সকল অভিনব নিয়ম প্রবর্ত্তনা করেন, দেবেন্দ্রবাবু তাহাতেই যোগ দিয়া তাঁহাদের সাহায্য করিতেন। কিন্তু তদ্দ্বারা এ পর্য্যন্ত তাঁহার এরূপ প্রত্যয় হয় নাই যে ব্রাহ্মসমাজ ক্রমশঃ সাম্প্রদায়িক মতাক্রান্ত হইয়া পড়িতেছে। যখন ইহা তিনি জানিলেন তখন একেবারে তাঁহার গতিরোধ হইল; তিনি অন্যপথে গমন করিলেন; আর কোনদিন সেই পথ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন না।

"দেবেন্দ্রবাবুর সহযোগী প্রাচীন ব্রাহ্মেরা "অনুষ্ঠান"-সম্বন্ধে যে-সকল আপত্তি করিতেন, তাহা তিনি বড় গ্রাহ্য করিতেন না। কারণ তিনি জানিতেন যে ঐ-সকল প্রাচীন ব্রাহ্মদিগের মতানুসারে চলিলে ব্রাহ্মধর্ম্মে অগ্রসর হওয়া যায় না। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের যেরূপই উন্নতি হউক তাঁহারা বা তৎসদৃশ কোন ব্রহ্মোপাসক যে ব্রাহ্মসমাজ হইতে বহিষ্কৃত বা অধিকারচ্যুত হইবে তাহা তিনি কখনই ইচ্ছা করেন নাই। তিনি অবশ্য আগ্রহের সহিত চাহিতেন যে নিজে বা অধিকতর ধর্ম্মবলধারী ব্রাহ্মদিগের দ্বারা উন্নতির দৃষ্টান্ত-সকল প্রদর্শিত হয়, কিন্তু তা বলিয়া কোনপ্রকার ব্রাহ্মকেই ব্রাহ্মসমাজ হইতে বিদায় করিয়া দিতে চাহেন না। কিন্তু তিনি দেখিলেন যে নব্যদলদিগের চেষ্টার বৃক্ষে সেই ফলই প্রসূত হয়। দেবেন্দ্রবাবু চাহেন যে অনুষ্ঠান-কারীদিগকে ব্রাহ্মসমাজের প্রধান প্রধান কার্য্যের ভার দেওয়া হয়, অথচ অনুষ্ঠানকারীদিগকে বিদায় করিয়া দেওয়া না হয়। এই হইতেই বিবাদের সূত্রপাত হইল। দেবেন্দ্রবাবু যদিও নূতন ব্রাহ্মগণকে সমূহ আশার স্থল বলিয়া ভাবিতেন এবং ইহাদিগকে বিবিধ প্রকারে

সাহায্য করিতেন, কিন্তু ইহাদিগের কার্য্যে তিনি সম্পূর্ণ যোগ দিতেন না। ব্রাহ্মসমাজের সমুদায় ভার কেশববাবুর উপরেই ছিল। দেবেন্দ্র বাবু ব্রাহ্মসমাজ হইতে একপ্রকার অবসৃত হইয়াছিলেন বলিলেও বলা যায়। প্রধান আচার্য্য ও ব্রাহ্মসমাজপতি বলিয়া দেবেন্দ্রবাবুর উপরে যে কর্ত্তৃত্বভার অর্পণ করা হইয়াছিল, তাহা যে সর্ব্বাংশে সার্থক হইয়াছিল এমন বোধ হয় না। এ সময়ে কেশববাবুই একপ্রকার সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন। মূল ব্রাহ্মসমাজকে লইয়া সকল ব্রাহ্মসমাজ। তিনি সেই সমাজের আচার্য্য ও বলীয়ান্ নেতা। তিনি সেই ব্রাহ্মসমাজে যাহা করিতেন, তাহাই হইত। আর, তাহাই ব্রাহ্মসমাজের স্কন্ধে আরোপিত হইত। ইহার ফল এই হইল যে কেশব বাবুর সহিত সর্ব্ব বিষয়ে যাঁহারা যোগ রাখিতে পারিলেন, তাঁহারা সফল হইলেন। যাঁহারা তাহা না পারিলেন, তাঁহারা হতপ্রভ হইয়া পড়িলেন; কেহ কেহ বা সমাজ ত্যাগ করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মসমাজ-সকল ও ব্রাহ্মদিগের যখন এইরূপ ভাবান্তর ও মতান্তর, তখন ঐক্য বন্ধনের উদ্দেশে কেশববাবু প্রতিনিধি-সভার চেষ্টা করেন। কিন্তু রোগ একপ্রকার ও ঔষধ অন্যপ্রকার হওয়াতে তদ্দ্বারা কোন ইষ্টলাভ হইতে পারে নাই।"

উপরে যে প্রতিনিধি-সভার কথা দেখিতে পাওয়া যায়, সে সম্বন্ধে প্রথম বিজ্ঞাপন পত্রিকাতে নিম্নলিখিত ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। "বিবিধ উপায়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ও ভারতবর্ষস্থ সমুদায় ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে ঐক্য-সংস্থাপন-উদ্দেশে আগামী ১৫ কার্ত্তিক রবিবার সন্ধ্যা ৭৷৷ ঘটিকার সময় কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয়তল গৃহে ব্রাহ্মদিগের একটি "প্রতিনিধি-সভা" প্রতিষ্ঠিত হইবে। প্রতি শাখাব্রাহ্মসমাজের

অভিমতানুসারে কলিকাতা-প্রবাসী (অথবা নিবাসী) কোন ব্রাহ্মকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া সেই সেই প্রতিনিধির নাম নিম্নে স্বাক্ষরকারীর নিকট পাঠাইয়া দেন, এবং ঐ দিবসে উক্ত সভায় উপস্থিত থাকিতে তাঁহাদিগকে উপদেশ প্রদান করেন।

১৪ই আশ্বিন
১৭৮৬ শক।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক।

নব্যদল যখন উপবীত ত্যাগ, বিধবা বিবাহ, শঙ্কর বিবাহ প্রভৃতি সামাজিক সংস্কারে প্রবৃত্ত হয়েন, তখন হইতেই প্রাচীন ও নব্যদলের মধ্যে একটি মতভেদ উপস্থিত হয় এবং এই মতভেদ হইতেই বিরোধের সূত্রপাত হয়। উপাচার্য্যদিগের উপবীত ত্যাগ সম্বন্ধে আমরা এই কথাই শুনিতে পাই যে নব্য ব্রাহ্মদল যখন বুঝিলেন যে ব্রাহ্মদিগের জাতিভেদ থাকিতে পারে না, তখন তাঁহারা দেবেন্দ্রনাথের নিকট এই প্রস্তাব করিলেন। উপবীত, জাতিভেদের চিহ্নসূচক, সুতরাং ব্রাহ্ম হইলে উপবীত কিছুতেই রক্ষা করা যাইতে পারে না। যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য তাঁহারা কিছুতেই এই জাতিভেদসূচক উপবীত রক্ষা করিতে পারেন না। ব্রাহ্মসাধারণের বিশ্বাস এই যে প্রধানাচার্য্য মহাশয় এই বিষয়ে কেশববাবুর প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন, কিন্তু এ সম্বন্ধে আমরা যাহা অবগত হইয়াছি, তাহাতে এ কথা ঠিক্ বলিয়া মনে হয় না। কেশববাবু তাঁহার নিকটে এ প্রস্তাব করিয়াছিলেন সত্য। তিনি বলিয়াছিলেন যাঁহারা উপবীতত্যাগী, তাঁহারাই বেদীতে বসিবার অধিকারী, কিন্তু যাঁহারা তাহা ত্যাগ করিতে পারেন নাই, তাঁহারা বেদীতে বসিতে পারেন না। তাহার উত্তরে প্রধানাচার্য্য বলিয়াছিলেন "তাহা হইতে পারে না, উভয়েই বসিতে পারেন।" এ পর্য্যন্ত দেবেন্দ্রনাথ কোন বিষয়েই কেশববাবুর

প্রতিবাদ করেন নাই কিন্তু এই প্রথম প্রতিবাদ হইল। ইহাতে কেশবচন্দ্র দুঃখিত হইলেন। মতভেদের মধ্যে বিরোধের যে বীজ উপ্ত হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে অঙ্কুরিত হইল।

কেশবচন্দ্র যে প্রকার শক্তিমান ও প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন, তাহাতে তিনি যে কোন সময়ে জন্মগ্রহণ করুন না কেন, তখনকার নেতৃত্ব গ্রহণ করিবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ইহা বুঝিয়া তাঁহাকে অনেক অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ যখন তাঁহার অপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তি তখন ছিল না, তখন তাঁহার উপর এই-সমস্ত ভার দিয়া তিনি ভালই করিয়াছিলেন। কিন্তু কেশবচন্দ্র এই-সমস্ত লাভ করিয়াও সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যেমন তিনি ব্রাহ্মসমাজের একপ্রকার কর্ত্তা হইয়াছেন তেমনি দেবেন্দ্রনাথের পারিবারিক সমস্ত কার্য্যেও সর্ব্বময় কর্ত্তা হয়েন। দেবেন্দ্রনাথ ইহা বুঝিয়া তাঁহার এইপ্রকার ইচ্ছাতে বাধা দিতেন। কেশবচন্দ্র ধর্ম্মানুরাগী, বুদ্ধিমান ও শক্তিশালী ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহার শিক্ষা করিবার তখনও অনেক বাকী ছিল। সংযম, বৈরাগ্য, কর্ত্তৃত্বশূন্যতা প্রভৃতি আধ্যাত্মিক উচ্চ সম্পদসমূহ লাভ করা তাঁহার পক্ষে একান্ত আবশ্যকীয় ছিল। দেবেন্দ্রনাথ আপনার অকৃত্রিম স্নেহপূর্ণ ব্যবহারের জন্য কেশবচন্দ্রের পিতৃস্থান অধিকার করিয়াছিলেন এবং তাঁহার গুরুও ছিলেন। তিনি কেশবচন্দ্রকে পাইয়া ব্রাহ্মসমাজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অত্যন্ত আশান্বিত হইয়াছিলেন, সেইজন্য তাঁহার চরিত্র ও জীবন যাহাতে যুগধর্ম্মপ্রচারকের চরিত্র ও জীবনের ন্যায় মহৎ হয়, সে বিষয়ে তাঁহার প্রখর দৃষ্টি ছিল। এইজন্য বিবিধ উপায়ে তাঁহার শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার সম্বন্ধে সমস্ত কার্য্যের বন্দোবস্ত করিতেন। কোন কোন সময়ে তাঁহাকে কোন কার্য্যের ভার অর্পণ

না করাতে কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার বন্ধুগণ দেবেন্দ্রনাথের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন ও দেবেন্দ্রনাথের যথার্থ উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার উপর অন্যায় অভিসন্ধির আরোপ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আমরা দুইটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি।

দেবেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পুত্র ও কেশবচন্দ্রের সহপাঠী এবং বন্ধু সত্যেন্দ্রনাথ যখন ইংলণ্ড গমন করেন, তখন তাঁহাকে বিদায় দিবার সময়ে অনেকে উপস্থিত ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ং উপাসনা করিয়া তাঁহাকে উপদেশ প্রদান করেন। ইহা ঠিকই হইয়াছে। কিন্তু কেশবচন্দ্রের ইচ্ছা ছিল তিনি তাঁহাকে উপদেশ প্রদান করেন। তাহা করিবার সুবিধা না পাওয়াতে তিনি ক্ষুণ্ণ হয়েন ও অকারণ তাঁহার প্রতি বিরক্ত হয়েন। সত্যেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র দুই জন সমপাঠী ছিলেন। একজনের সঙ্গে আর-এক জনের অকৃত্রিম বন্ধুত্ব ছিল। কেশবচন্দ্রের প্রতিভা সত্যেন্দ্রনাথ অপেক্ষা অধিক হইলেও তিনি তাঁহার উপদেষ্টার আসন গ্রহণ করিবার উপযুক্ত ছিলেন না। বিশেষতঃ দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ং যখন সেস্থানে উপস্থিত থাকিয়া উপদেশ প্রদান করেন, তখন তাহাতে বিন্দুমাত্রও দোষ হয় নাই, একথা সাহসের সহিত বলা যাইতে পারে।

আর একবার তাঁহার পঞ্চম পুত্র শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দীক্ষার সময়ে দেবেন্দ্রনাথ অনেক বন্ধু বান্ধবকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। পরে একদিন কথাপ্রসঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রকে বলিলেন "অমুক দিবস জ্যোতির দীক্ষা হইবে তোমরা সকলে সেইদিন উপস্থিত থাকিয়া উপাসনাতে যোগদান করিবে এবং প্রীতিভোজন করিয়া আনন্দ বর্দ্ধন করিবে" ইত্যাদি। কেশবচন্দ্র কোন উত্তর না করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার মুখে কোন প্রকার আনন্দের চিহ্ন প্রকাশ পাইল না, বরং একটু দুঃখিতভাবে বসিয়া রহিলেন।

দেবেন্দ্রনাথ ইহার কোন কারণ বুঝিতে পারিলেন না। একটু পরে তাঁহার একজন সহচর বলিলেন "সেই দিন বাগআঁচড়াতে আমাদের নিমন্ত্রণ আছে, এখানে কেমন করিয়া উপস্থিত থাকিব?" কেশবচন্দ্র বলিলেন "তাইত, সেদিন তা'হলে এখানে আর আসা হয় না।" এই কথা বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। তাহার পর দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাকে এক পত্র লিখিলেন। তাহাতে লিখিলেন "জ্যোতির দীক্ষা-সম্বন্ধে তোমার কোনও উৎসাহ দেখলেম না কেন? আমাদের এখানকার ক্রিয়া উপেক্ষা করিয়া তুমি বাগআঁচড়ায় যাবে, তারই বা কারণ কি?" তিনি তাহার এক উত্তর লিখিলেন এবং অনুষ্ঠানের দিন উপস্থিত হইলেন। দেবেন্দ্রনাথ বলিতেছেন "আমি বুঝ্‌লেম জ্যোতির দীক্ষা সম্বন্ধে কেশববাবুর সবিশেষ পরামর্শ না নেওয়াতেই তাঁর এই রাগ। আমিও মনে মনে বিরক্ত হলুম্। দীক্ষার সময় আমি পাকৃড়াসাকে আসন গ্রহণ করতে বল্‌লুম। কেশববাবু অত্যন্ত বিষণ্ণ। খাবার সময় তাঁরা সদলে অনুপস্থিত।" এই দুই ঘটনা হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে কেশববাবুর এই ইচ্ছা ছিল যে দেবেন্দ্রনাথের পারিবারিক বিষয়েও তাঁহার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সময়ে আরও এই প্রকার কোন কোন ঘটনা হওয়াতে কেশবচন্দ্র ও তাঁহার অনুচরেরা দেবেন্দ্রনাথের প্রতি বিরক্ত হইলেন। এদিকে নব্যদল তাঁহাদের ইচ্ছামত নূতন নূতন সামাজিক সংস্কার আরম্ভ করাতে দেবেন্দ্রনাথও তাঁহাদের উপর বিরক্ত হইলেন। তাঁহার সমাজসংস্কারের ভাব ও আদর্শ অন্য প্রকার। এসম্বন্ধে পূর্ব্বে আলোচনা করা গিয়াছে। কিন্তু নব্যদল তাঁহার সংস্কারের আদর্শে সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না। ইহা হইতে বিরোধের সৃষ্টি হইল।

তৎপরে উপবীতের প্রশ্ন যখন উঠিল, তখন এই বিরোধ ঘনীভূত

আকার ধারণ করিল। এইবারে আমরা এমন একস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি যেখানে অত্যন্ত শান্তভাবে, পক্ষপাতিত্বশূন্য হইয়া, দলাদলি ও অনুরাগ বিরাগের অতীত স্থলে দণ্ডায়মান হইতে না পারিলে দেবেন্দ্রনাথের কার্য্যাবলীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝিতে সক্ষম হইব না। "১৭৮৬ শকের ২০ আশ্বিন দিবসে যে প্রলয়ঙ্করী ঝটিকায় কলিকাতার বহুসংখ্যক অট্টালিকা নিপতিত হইয়াছিল, সেই দুর্যোগে ব্রাহ্মসমাজের গৃহও এমন ভগ্নপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিল যে তাহার সংস্কার না করিলে, তাহাতে কোনমতেই সাধারণের উপাসনা-কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে না। অতএব দেবেন্দ্রবাবু, এই ব্যবস্থা করিলেন যে যতদিন না ব্রাহ্মসমাজগৃহ পুনরায় সংস্কৃত হইবে, ততদিন তাঁহার বাটীতে সাধারণ উপাসনা হইবে।" এই মর্ম্মে পত্রিকাতে নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন প্রদত্ত হইল।

"ব্রাহ্মসমাজ-গৃহ সংস্কারের প্রয়োজন হইয়াছে। যে অবধি ইহার সংস্কার সম্পন্ন না হয়, সেই অবধি এখানে ব্রহ্মোপাসনা স্থগিত থাকিবেক। অতএব সাধারণ সজ্জনকে অবগত করা যাইতেছে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ভবনে প্রতি বুধবারে সায়ংকালে ব্রহ্মোপাসনা হইবেক। যাঁহারা মানস করেন, তথায় যাইয়া উপাসনা করিবেন।

শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।"

এই সময়ে শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ, শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী প্রাচীন দলের মুখপাত্র-স্বরূপ ছিলেন। তাঁহারা বহুদিন হইতে ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্যের কার্য্য করিয়া আসিতেছেন, সুতরাং প্রধানাচার্য্য মহাশয়ের সহিত ইঁহাদের একটি ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপিত হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে

উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা একজন প্রাচীন, সুশিক্ষিত, ধার্ম্মিক ও দেবেন্দ্রনাথের সমসাময়িক ব্যক্তির লিখিত ইতিবৃত্ত হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। তিনি বলেন যে নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে উপাসনা আরম্ভ হয় নাই, বরং নির্দ্দিষ্ট সময়ের পরে উপাসনা আরম্ভ হইয়াছিল। "আচার্য্য কেশবচন্দ্র"-প্রণেতা ভক্তিভাজন, গৌরগোবিন্দ রায় উপাধ্যায় মহাশয় এসম্বন্ধে লিখিতেছেন "এখানে উপবীতত্যাগী উপাচার্য্যের উপস্থিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে উপবীতধারী ব্যক্তিগণ উপাচার্য্যের কার্য্য আরম্ভ করিলেন।" ইহা দ্বারাও প্রমাণ হয় না যে নির্দ্দিষ্ট সময়ের দশ মিনিট পূর্ব্বে মহর্ষি উপবীতধারী উপাচার্য্যদিগকে বেদী গ্রহণ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া দেবেন্দ্রনাথের দৃঢ় সত্যনিষ্ঠার উপর সংশয় আরোপ করিতে বোধ হয় কেহই প্রস্তুত নহেন; কারণ যিনি প্রথম বয়সে এই সত্যের জন্য আপনার যথা-সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া পথের ভিখারী সাজিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই, তিনি পরিণত বয়সে, ধর্ম্মের উচ্চস্থানে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সাংসারিক-বুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া সেই সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করেন নাই, একথা মানব-চরিত্রজ্ঞ কোন ব্যক্তি বিশ্বাস করিতে পারেন না।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিয়াছি। কেশববাবু তাঁহার নিকটে যখন প্রথমে প্রস্তাব করেন যে উপবীত-ধারী উপাচার্য্য বেদীতে বসিতে পারিবেন, তখন তিনি তাঁহার উত্তরে বলিয়াছিলেন, তাহা হইতে পারে না, উভয়েই বসিবেন, উপবীত-ত্যাগী ও উপবীতধারী উভয়েই বসিতে পারিবেন। কিন্তু এ সম্বন্ধেও মতভেদ আছে। নব্যদল বলেন তিনি প্রথমে উপবীতধারীদিগকে বেদীতে বসিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করেন, পরে তাঁহাদিগের অনুরোধে পুনরায় তাঁহাদিগকে বেদীতে বসিবার অধিকার প্রদান

করেন। পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে আমারা যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছি, তাহা মহর্ষি নিজে বলিয়াছিলেন, সুতরাং এসম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। "ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত"কার একস্থলে লিখিতেছেন "বিজয়বাবু ও অন্নদাবাবুকে উপাচার্য্যপদে নিয়োগ করিবার সময় প্রধান আচার্য্য মহাশয় এই নিয়ম করেন যে আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম ভিন্ন কেহ কলিকাতা সমাজের বেদীতে বসিতে পাইবেন না।" ব্রাহ্মসাধারণের এইরূপই বিশ্বাস আছে। কিন্তু "ইতিবৃত্তকার" মহাশয়কে আমরা এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি—যে নিয়ম এতকাল প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে. তাহা রহিত করা হইল অথচ পত্রিকাতে সে সম্বন্ধে কোনপ্রকার উল্লেখ নাই কেন? ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধীয় সমস্ত কার্য্য ও ঘটনা যখন রীতিমত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়াছে, তখন এমন একটি গুরুতর নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইল, অথচ তাহার কোন উল্লেখ নাই। সুতরাং আমরা ঐ কথা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নই। যাঁহারা এ পর্য্যন্ত ঐ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া কাগজে পত্রে ও বক্তৃতাতে উক্ত কথা প্রচার করিয়াছেন, তাঁহারা যে সত্যবাদী তাহার কোন সন্দেহ নাই। তবে একথার মূল কি? সম্ভবতঃ কেশবচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথের কথা বুঝিতে একটু ভূল করিয়াছিলেন অথবা স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারেন নাই। এ প্রকার দৃষ্টান্ত আমরা সর্ব্বদাই প্রতিদিনের জীবনে দেখিতে পাই। সুতরাং ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই।

যাহা হউক এইরূপে নব্যদল দেবেন্দ্রনাথের প্রতি বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হইয়া পড়িলেন। আর সামাজিক কার্য্যে তাঁহাদের সেপ্রকার মনোযোগ ও উৎসাহ দেখা গেল না। একদিন বেদীতে একজন উপবীতধারী উপাচার্য্য বসিয়া আছেন, এমন সময়ে শ্রদ্ধেয় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

বসিবার নিয়ম ছিল। দেবেন্দ্রনাথ সেস্থানে একজন দেখিয়া গোস্বামী মহাশয়কে বলিলেন "উহার সঙ্গে বেদীতে বস।" গোস্বামী মহাশয় বলিলেন "উপবীত-ধারীর সহিত আমি বেদীতে বসিতে পারি না।" ইহাতে দেবেন্দ্রনাথ অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইলেন। কারণ এইভাবে তাঁহার কথার প্রতিবাদ এই তিনি প্রথম শুনিলেন। ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে তিনি যেমন শক্তি, সামর্থ্য, জীবন দিয়া পরিশ্রম করিতেছিলেন, তখন এরূপ আর কে করিয়াছেন? বিশেষতঃ তিনি যুবকদলের গুরুস্থানীয় ছিলেন। এবং তাঁহাদিগকে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিতেছিলেন। তাঁহারাও এ পর্য্যন্ত তাঁহার বিরুদ্ধে কোন কথা বলা বা কোন কাজ করা ধৃষ্টতা বলিয়া মনে করিতেন। হঠাৎ যুবক গোস্বামীর নিকট হইতে উক্তপ্রকার প্রতিবাদ শুনিয়া তিনি আশ্চর্য্য হইলেন। দেবেন্দ্রনাথের তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার নিকটে যুবকদিগের সমস্ত আন্তরিক ভাব প্রকাশিত হইয়া পড়িল। তিনি তখন সমাজরক্ষার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। যে সমাজকে তিনি এতদিন আপনার পক্ষপুটে আচ্ছাদন করিয়া সকলপ্রকার বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, তাহাকে পুনরায় রক্ষা করিবার প্রয়োজন বোধ করিলেন। কিন্তু তখন সকল ক্ষমতা তিনি যুবকদিগের হস্তে অর্পণ করিয়া নিজে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি তখন কেবল সমাজের একজন ট্রষ্টী ছিলেন মাত্র। বাধ্য হইয়া তাঁহাকে এই ট্রষ্টীর ন্যায্য অধিকারের সাহায্য লইতে হইল। তিনি নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন পত্রিকাতে প্রকাশ করিলেন।

"কলিকাতা সমাজের ট্রষ্টডীড অনুযায়ী উপাসনাকার্য্য সম্পাদনের জন্য শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তাহার সম্পাদকীয় কার্য্যে নিযুক্ত করা গেল এবং যাবতীয় ট্রষ্ট সম্পত্তি তাঁহার হস্তে অর্পিত হইল।

"কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের সহায়তা নিমিত্ত শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাকৃড়াশী মহাশয়কে সহকারী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত করিলাম।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ট্রষ্টী।"

চত্বারিংশ অধ্যায়।

বিরোধ-ঝটিকা।

যুবকদল যখন দেখিলেন তাঁহারা সমস্ত অধিকার হইতে বঞ্চিত হইলেন, তখন তাঁহারা অপর দুইজন ট্রষ্টীর নিকট গমন করিয়া দেবেন্দ্রনাথের কার্য্যের উপর হস্তক্ষেপ করা আবশ্যক মনে করিলেন না, সুতরাং তাঁহারা নিরাশ হইয়া অন্যপথ অবলম্বন করিলেন। এই সময়ে তাঁহারা দেবেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে নানাপ্রকার বাক্যবাণ প্রয়োগ ও তাঁহার কার্য্যপ্রণালীকে তীব্রভাবে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করেন। শান্ত-প্রকৃতি, গম্ভীরস্বভাব, বহুদর্শী ও স্থিতপ্রজ্ঞ দেবেন্দ্রনাথ কিছুতেই চঞ্চল হইলেন না। তিনি আপনার কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়া কর্ত্তব্য সাধন করিতে লাগিলেন। যুবকদলও আপনাদের প্রণালী অনুসারে উপাসনা ও অন্যান্য কার্য্য করিবার সুবিধা অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। যখন তাঁহারা দেখিলেন যে ব্রাহ্মসমাজের ট্রষ্টী সমস্ত সম্পত্তির ভার নিজে গ্রহণ করিয়াছেন, তখন কেশবচন্দ্র প্রভৃতি ব্রাহ্মসমাজের যুবক কর্ম্মচারীগণ আপন আপন কার্য্যভার হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া এক বিজ্ঞাপন পত্রিকাতে প্রকাশ করিলেন।

এই সময়ে ১৭৮৬ শকের অগ্রহায়ণ মাসে যুবকদল 'ধর্ম্মতত্ত্ব' নামক পত্রিকা প্রকাশ করিয়া তাহাতে আপন আপন মতামত ও কার্য্যপ্রণালী সাধারণের সমক্ষে প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। এইরূপে দুই দলের মধ্যে যে ঘোরতর আন্দোলন ও বিরোধ উপস্থিত হয়, তাহা সবিশেষ বর্ণনা করা উচিত নয় এবং তাহার কোন প্রয়োজন নাই। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসলেখক এবিষয়ে যথাযথ আনুপূর্ব্বিক ঘটনা-

সমূহ লিপিবদ্ধ করিতে পারেন, কিন্তু মহর্ষির জীবনীলেখকের সে অধিকার নাই এবং থাকারও কোন প্রয়োজন নাই। তবে এই বিবাদের মধ্যে মহর্ষি ও কেশবচন্দ্রের মধ্যে যে-সমস্ত পত্র চলিয়াছিল, তাহার দুই একটি আমরা এস্থলে উদ্ধৃত করিব। কারণ মহর্ষির নিজের পত্র ও লেখা তাঁহার কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে যেপ্রকার আলোক প্রদান করিবে, তাহারই সাহায্যে তাঁহাকে বুঝিতে দেওয়া বর্ত্তমান লেখক অতি আবশ্যক মনে করেন। এতদ্ব্যতীত মহর্ষি যে-সমস্ত পত্র কেশবচন্দ্রকে লিখিয়াছেন, তাহার ভাষা ও প্রণালী সম্বন্ধে বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে এই মতভেদ, আন্দোলন ও বিরোধের মধ্যেও তাঁহার হৃদয় কেমন স্নেহের কোমল ভাবে পূর্ণ ছিল। তখন কেশবচন্দ্র তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া আসিবার কল্পনা করিয়াছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আদিসমাজকে দুর্ব্বল ও শক্তিহীন করিয়া অন্য এক সবল সমাজ স্থাপন করিবার চিন্তা করিতেছিলেন। মহর্ষি ইহা জানিতেন এবং তাহা হইলে তাঁহার প্রিয়তম ব্রাহ্মসমাজ যে অকালে দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে, তাহাও তিনি জানিতেন। কিন্তু ইহা বুঝিতে পারিয়াও তিনি অধীর অথবা প্রকৃতিচ্যুত হয়েন নাই। ১৭৮৭ শকে ২৪ বৈশাখ শিবপুর হইতে কেশবচন্দ্র লিখিতেছেন "প্রণাম নিবেদনঞ্চ। আমার প্রতি আপনার পূর্ব্বে যেরূপ স্নেহ ও প্রীতি ছিল তাহার সহিত আপনার বর্ত্তমান ব্যবহার তুলনা করিলে যে কি পর্য্যন্ত বিস্ময়াপন্ন ও দুঃখিত হইতে হয় তাহা বলিতে পারি না। আপনি যে-সকল পত্র আমাকে লিখিতেন এবং যেপ্রকার প্রিয় সম্ভাষণ করিতেন তাহা যে অসাধারণ প্রণয়ের লক্ষণ তাহা আপনিও বিলক্ষণ জ্ঞাত আছেন। বাস্তবিক পিতা-পুত্রের যে কোমল নিকট সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধই আমাদিগকে আবদ্ধ করিয়াছিল। ইহারই জন্য আপনার বর্ত্তমান ব্যবহার আমার পক্ষে

নিতান্ত কষ্টদায়ক হইয়াছে, এবং যখন ইহা স্মরণ করি তখনি হৃদয়ে ভয়ানক আঘাত লাগে। যাহা হউক ঈশ্বরের মহিমা কে বুঝিতে পারে। কয়েক দিবস হইল প্রতিনিধি-সভা সম্বন্ধে একখানি পত্র লিখিয়াছিলাম, কিন্তু আপনি অবজ্ঞা করিয়া তাহার উত্তর দেন নাই। সে পত্রের উত্তর লেখাতে সমাজের মানের হানি বা মহত্ত্বের হ্রাস হইত, ইহা কোন মতেই স্বীকার করা যায় না। বিশেষতঃ আপনি আমার বিষয় যাহা কিছু জানেন তাহাতে কখনই আমাকে এত নীচ বলিয়া ঘৃণা করিতে পারেন না এবং আমার সহিত সামান্য ভদ্রতা রক্ষা করিতে কুণ্ঠিত হইতে পারেন না। ইহাতে আমার যে বিশেষ অনিষ্ট বা ক্ষতি হইয়াছে তাহা নহে; এ বিষয়ের উল্লেখ করিবার এইমাত্র তাৎপর্য্য যে, যদি আমরা উভয়েই ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া স্বীয় স্বীয় উদ্দেশ্য সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকি তাহা হইলে পরস্পরকে ঘৃণা বা ভয় করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য; প্রশান্ত চিত্তে সাহসপূর্ব্বক সত্য পালন করিলে সকল দিক শোভা পাইবে। আমার দোষ দেখেন ভর্ৎসনা করুন, আমার অসঙ্গত মত থাকে প্রকাশ্যরূপে নির্ভয় মনে তাহা খণ্ডন করুন; কিন্তু বিদ্বেষ, ঘৃণা বা ভয় এ-সকল ঈশ্বরের কার্য্যের প্রকৃত লক্ষণ কখনই নহে। যাহা হউক এবিষয়ে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই; পূর্ব্বে আপনি যে অসামান্য মহত্ত্বের পরিচয় দিয়াছেন তাহার উপর এই বিষয়টি নির্ভর করিতেছি, আপনি ইহার ন্যায়ান্যায় বিবেচনা করিবেন।

"(২) আপনি পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে ব্রাহ্মসমাজ-গৃহ ট্রষ্টডীড অনুসারে কেবল উপাসনার জন্য ব্যবহৃত হইবে এবং প্রচারের জন্য ভিন্ন স্থান আবশ্যক। কিন্তু ঐ গৃহে আবার (ট্রষ্টডীড-বিরুদ্ধে) প্রচারের জন্য ব্রহ্মবিদ্যালয় সংস্থাপিত হইল, তবে পূর্ব্বের ন্যায় তথায় প্রতিনিধি-সভা বা প্রচার সম্বন্ধীয় অন্যান্য কার্য্য কেন হইবে না তাহ

বুঝিতে পারি না। এইমাত্র বোধ হয় যে উক্ত সভা এবং আমাদের সমুদায় কার্য্য আপনি ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির প্রতিবন্ধকস্বরূপ জ্ঞান করেন এবং তৎপ্রতি উৎসাহ দান করিতে আপনি ভীত হন। কিন্তু আপনি আবার প্রতিনিধি-সভার সভাপতি এবং প্রচারকার্য্যের অন্যতর অধ্যক্ষ, তবে এ-সকল বিষয়ে আপনি বিশেষ অনুরাগ ও উৎসাহ প্রকাশ না করিয়া কি ক্ষান্ত থাকিতে পারেন? উভয় দিকে আপনি সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিয়াছেন, অতএব উভয় দিকেই সদ্ভাব থাকা আবশ্যক।

"(৩) যখন বর্ত্তমান গোলমালের সূত্রপাত হয় তখনই আমি বলিয়াছিলাম যে এই কলহ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইবে এবং সতর্ক না হইলে ইহা হইতে অবশেষে দলাদলি হইবে। কিন্তু তখন আপনি এ কথায় উপেক্ষা করিয়াছিলেন। এখন সেই কলহ-অগ্নি যেরূপ প্রজ্বলিত হইতেছে তাহা প্রত্যক্ষের বিষয়। সামান্য বিবাদ হইতে কেমন ভয়ানক দলাদলি উৎপন্ন হইতেছে। এখন মতান্তর ও ভাবান্তর দুই-ই দেখা যাইতেছে। আপনি ভবানীপুরে যে উপদেশ দিয়াছিলেন (যদিও তাহা হইতে কিয়দংশ বাদ দেওয়া হইয়াছে) তাহা লইয়া বিলক্ষণ আন্দোলন হইতেছে। ইহাতে আপনার যথার্থ মত ও বিশ্বাস বিবৃত হইয়াছে, এবং এতৎপাঠে আমার পূর্ব্বের সংস্কার দূরীভূত হইয়াছে যে আপনি অনুষ্ঠানকারীদলের প্রতি যে কেবল অপ্রসন্ন তাহা নহে, তাহাদের উন্নতির পথ অবরোধ করিতেও আপনার একান্ত চেষ্টা। এ অবস্থায় যে দলাদলি ভাব আরো প্রগাঢ় হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? আপনি আমাদের কার্য্যের কিছুমাত্র ব্যাঘাত না করিয়া যদি কেবল সমাজের ট্রষ্ট-সম্পত্তি সম্বন্ধীয় কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন, এবং বিরোধী না হইয়া পৃথক ভাবে স্বীয়

না। কিন্তু যখন দেখা যাইতেছে, যে-পরিমাণে আমরা সফলযত্ন হইব সেই-পরিমাণে আপনার উদ্দেশ্যসিদ্ধির ব্যাঘাত, তখন আপনি উল্লিখিত উপদেশের ন্যায় মত প্রচার না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। এবং যখন আমাদের আন্তরিক বিশ্বাস যে এরূপ উপদেশ দ্বারা গূঢ়রূপে ব্রাহ্মসমাজের অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা তখন আমরাই বা ঈশ্বরের দাস হইয়া তৎপ্রচারে কিরূপে উপেক্ষা করিব? এটি অত্যন্ত গুরুতর বিষয়, ইহা বিশিষ্টরূপে বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। আমি বিবাদের জন্য লিখিতেছি না; ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গল হয় ইচ্ছা আপনারও যেমন আমারো তেমনি ইচ্ছা। সমাজে এরূপ বিরোধ অত্যন্ত ভয়ানক, কিন্তু উভয়দিকেই আত্মপক্ষ সমর্থনে অপ্রতিহত চেষ্টা থাকিলে এ বিরোধ হইবেই হইবে, নিশ্চয়ই হইবে। ভাবে ভাবে, কথায় কথায়, উপদেশে উপদেশে, বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে, লেখায় লেখায় অশেষ বিবাদ চলিবে, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

"এ অবস্থায় কি করা কর্ত্তব্য? আমাদের পরস্পরের মধ্যে যে বৈষয়িক সম্বন্ধ তাহা পরিষ্কার করা কর্ত্তব্য। আপনি যেরূপ উপদেশ দিতেছেন তদ্দ্বারা আপনার ধর্ম্মবিষয়ক যথার্থ মত প্রকাশিত হইবে, এবং আমরা যাহা লিখিতেছি ও লিখিব তাহাতে আমাদের মত প্রদর্শিত হইবে। এ বিবাদ নিবারণের উপায় নাই। কিন্তু এ বিবাদ হইতে অবশেষে সত্যের জয় হইবে। ঈশ্বরের মহিমা মহীয়ান্ হইবে। আপাততঃ কেবল কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বৈষয়িক সম্বন্ধ লইয়া যে বিবাদ হইতেছে তাহার মীমাংসা করা উচিত। এ বিষয়ে আপনার যাহা যথার্থ মত তাহা বিস্তারিতরূপে প্রকাশ করা বিধেয়; পত্র দ্বারাই হউক বা অন্য উপায়ে হউক ইহা আমাদিগকে অবগত করিতে হইবে। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের অর্থ কি, ইহাতে কেবল উপাসনা হইবে

কি প্রচারও হইবে, ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে আমাদের কোন সভার অধিবেশন বা আমাদের প্রচার সম্বন্ধীয় কোন কার্য্য হইবে কি না, ইহার দান কিরূপে ব্যয়িত হইবে, ইহার সহিত সাধারণের কিপ্রকার যোগ থাকিবে, আপনি প্রতিনিধি-সভা ও আমাদের তাবৎ প্রচার কার্য্যের সহিত কিরূপ সম্বন্ধ রাখিবেন ; এ-সমুদায় আপনি পরিষ্কার করিয়া লিখিলে আমরা আমাদের কার্য্যক্ষেত্র বুঝিয়া লইতে পারি, এবং যাহাতে বৈষয়িক বিরোধ না থাকে এরূপ চেষ্টা করা যাইতে পারে। অতএব বিনীতভাবে আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি এ বিষয়ে আপনি সত্বর মনোযোগী হইবেন। আগামী রবিবারে সাধারণ সভা হইবার কথা আছে, যদি ইহার পূর্ব্বে আপনি লিখিয়া দেন তাহা হইলে ভাল হয়।"

ইহার উত্তরে মহর্ষি যে পত্র লেখেন তাহাও উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

"প্রাণাধিকেষু,

"সান্ত্বনাপূর্ব্বকম্ সম্ভাষণমিদম্।

"আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইও না, আমার কথায় বিরক্ত হইও না। তোমার মনোহর কান্তি ও উজ্জ্বল মুখ যখনি মনে হয়, তখনি তোমার প্রতি আমার স্নেহ-অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া ধাবিত হইতে যায়, কিন্তু পরক্ষণেই আমার প্রতি তোমার নিষ্ঠুর নির্য্যাতনের চেষ্টা স্মরণ হইয়া অমনি তাহা নির্ব্বাণ হইয়া যায় এবং তাহা হইতে ধুম বিনির্গত হইয়া আমার হৃদয়কে ব্যথিত করিয়া তুলে। আমার জীবনে বঙ্গভূমি-মধ্যে তোমার অপেক্ষা বিশুদ্ধ চরিত্র ও মহৎ ব্যক্তি আমি দেখি নাই, বিশুদ্ধতার সঙ্গে মহত্ত্বের সঙ্গে ঘৃণাভাব কখনই থাকিতে পারে না। অতএব তোমাকে আমি কখনই ঘৃণা করিতে পারি না—বিশেষতঃ তোমার হৃদয়ে যখন পবিত্রস্বরূপ বাস করিতেছেন।

প্রতিনিধি-সভার অধিবেশনের জন্যে সম্পাদককে যে পত্র লিখিয়াছিলে, তিনি তাহার উত্তর দিয়াছিলেন, সে বিষয়ে আমার কোন মত দেওয়া নিষ্প্রয়োজন ভাবিয়া পুনর্ব্বার তাহার উল্লেখ করিতে সম্পাদককে বলি নাই। তোমাকে আমি নীচ ভাবিয়া, তোমার প্রতি আমি ঘৃণা করিয়া যে সম্পাদককে তাহার উত্তর লিখিতে বলি নাই ইহা কদাচ মনে করিবে না। তুমি চিরকালই আমার সমাদরভাজন আছ ও থাকিবে। তোমার বুদ্ধি, কৌশল, তোমার মনের কল্পনা, তোমার বাক্‌পটুতা, নিপুণতা, একাগ্রতা, প্রভৃতি যে-সকল প্রচুর সদ্‌গুণ আছে, ইহাতে তুমি যে জয়লাভ করিবে, ইহাতে আমার একটুকুও সন্দেহ নাই। কিন্তু যদি তুমি আপনাকে ভূলিয়া এবং জয় পরাজয় ভুলিয়া কেবল ঈশ্বরের মহিমাকে মহীয়ান্ করিতে প্রবৃত্ত থাক, তবে এই বঙ্গভূমিতে অমৃতবারির বর্ষণ হইবে ও ইহার মহোপকার সাধিত হইবে—নতুবা আপনার গৌরবের জন্যে আপনার দলপুষ্টির জন্যে, আপনার জয়লাভের জন্যে যদি ঈশ্বরের মহিমা ঘোষণা উপায় মাত্র করা হয়, তবে তাহা হইতে কালকূট গরল উৎপন্ন হইয়া সকল লোককে অভিভূত করিবে। আমার ভয় হইতেছে যে পাছে তোমার হৃদয় অতীব কঠোর হইয়া তোমার সদ্‌গুণ সকলকে অযোগ্যরূপ ব্যবহার করে এবং লোকের অনিষ্ট উৎপন্ন হয়। এজন্য বলিতেছি যে, যাহাতে "ভাবে ভাবে, কথায় কথায়, উপদেশে উপদেশে, বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে, লেখায় লেখায় অশেষ বিবাদ" না চলে এমন বিধান সর্ব্বাগ্রে করিবে। আমার কথা যদি শ্রবণ কর, তোমার এই করা কর্ত্তব্য যে তুমি আমার কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ না কর। আমি তোমার কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে চাহি না। এই ছয় বৎসর যেরূপ প্রাণে প্রাণে

হৃদয়ে হৃদয়ে মনের সহিত তোমার সহিত যুক্ত হইয়া কর্ম্ম করিয়া আসিতেছিলাম, এখন আর তোমার সহিত সেপ্রকার যোগ হইবার সম্ভাবনা নাই। কেবল মৌখিক যোগ দিলে হিতে আরো বিপরীত হইয়া পড়িবে। তোমার অভিপ্রায়-মতে আমি কর্ম্ম না করাতেই বর্ত্তমান গোলমালের সূত্রপাত হয়। এ বিষয়ে তুমি লিখিয়াছ যে 'যখন বর্ত্তমান গোলযোগের সূত্রপাত হয়, তখনই আমি বলিয়াছিলাম যে, এই কলহ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইবে'। পরে তুমি লিখিতেছ যে, 'আপনি এই কথায় উপেক্ষা করিয়াছিলেন।' যথার্থই আমি তখন এই কথায় উপেক্ষা করিয়াছিলাম, যেহেতু তখন আমি জানিতে পারি নাই যে তোমার মনে মনে এত ছিল। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ আমার কার্য্যের পরিমিত ক্ষেত্র, আমি তথায় ব্রাহ্মদিগের ও ঈশ্বর-পরায়ণ সাধুদিগের সঙ্গে একত্র হইয়া ব্রহ্মোপাসনা করিব; তথা হইতে যাহাতে ব্রহ্মবিদ্যার শিক্ষা হয়, তাহার সদুপায় অবলম্বন করিব; পত্রিকা দ্বারা ও অন্যান্য উপায়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম যাহাতে প্রচার হয়, তাহাতে যত্ন করিব। ইহা করিলে যদি তোমার বিপক্ষতা করা হয়, তবে ইহার উপায় নাই। আমার দল নাই, বল নাই, আমার এ পৃথিবীর জীবন অতি অল্পই অবশিষ্ট আছে, আমি সেই কয়দিনের জন্য যতটুকু পারি একাকী বা আমার সুহৃদদিগের সঙ্গে ঈশ্বরের আদিষ্ট কার্য্য ও তাঁহার নির্নীত ভার অপরাজিত চিত্তে বহন করিব, এই আমার প্রিয় অভিলাষ। কর্ম্মেতে আমার অধিকার, কিন্তু ইহার ফল ফলদাতার হস্তে, আমি সে ফল উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বেই এখান হইতে প্রস্থান করিব। তোমার সহিত যুক্ত থাকিয়া এই ছয় বৎসর তোমার নিকট হইতে যে-কিছু উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি তাহার জন্য তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ হইয়া নমস্কার করিয়া

এই পত্র শেষ করিতেছি। সুবিজ্ঞকে আর অধিক লিখিবার প্রয়োজন কি।”

এই সময়ে এবং ইহার পরবর্ত্তী সময়ে মহর্ষি ও ব্রহ্মানন্দের মধ্যে যে-সমস্ত পত্র আদানপ্রদান হইয়াছিল, তাহার কতকগুলি শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার প্রকাশিত মহর্ষির আত্মজীবনচরিত গ্রন্থের পরিশিষ্টে প্রকাশ করিয়াছেন। এই-সমস্ত পত্র পাঠ করিলে অনেক তত্ত্ব জানিতে পারা যায় এবং অত্যন্ত আনন্দ হয়। সুতরাং আমরা পাঠকবর্গকে সেই-সমুদয় পত্র পাঠ করিতে অনুরোধ করি। এই পুস্তকে আমরা আরও দুই একটি পত্র প্রয়োজনমত প্রকাশ করিব।

একচত্বারিংশ অধ্যায়।

আরও দুইখানি পত্র।

যখন ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে এইরূপ গোলযোগ চলিতেছিল, তখন মহর্ষি ও ব্রহ্মানন্দ আপন আপন মতানুযায়ী কর্ত্তব্যসাধনে অগ্রসর হইতেছিলেন। ১২ই বৈশাখ ১৭৮৭ শকে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজগৃহে পুনরায় ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল এবং ইংরাজী ভাষায় শ্রীযুক্ত নবগোপাল মিত্র ও শ্রীযুক্ত ত্রৈলক্যনাথ রায়, বাঙ্গালা ভাষায় শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাকড়াসী উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। এই সময়ে শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ও কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের পদত্যাগ করিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র স্বদলসহ কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাতে যোগদান করিতে নিরস্ত হইলেন বটে কিন্তু তথাপি তাঁহারা সমাজের কার্য্যপ্রণালী পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব করিয়া এবং একত্রে উপাসনা করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া প্রধানাচার্য্য মহাশয়ের নিকট এক আবেদনপত্র প্রেরণ করিলেন। তাঁহাদের আবেদন এবং প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের উত্তর নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

"শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ট্রষ্টী ও প্রধান আচার্য্য মহাশয় সমীপেষু।

"বিহিত সম্মান পুরঃসর নিবেদন।

কয়েক বৎসরাবধি ব্রাহ্মসমাজের যেরূপ উন্নতি হইয়া আসিয়াছে তদ্দর্শনে ব্রাহ্মমাত্রেরই হৃদয় উল্লাসে পূর্ণ হইয়াছে, এবং ইহাতে ঈশ্ব-

রের করুণা ও সত্যের মহিমা প্রত্যক্ষ করিয়া অনেকেই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি সমধিক অনুরক্ত হইয়াছেন। এই উন্নতি, সমগ্র ও জীবন্তভাবে প্রকাশিত হইতেছে। চতুর্দ্দিকে, দেশে বিদেশে ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য-সকল ধাবিত হইতেছে; যুবা বৃদ্ধ নরনারী, নির্ধন সধন, জ্ঞানী ও জ্ঞানহীন, সকলপ্রকার লোকেই ইহার শরণাপন্ন হইতেছে; ব্রাহ্মের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে, এবং ব্রাহ্মসমাজের শাখা প্রশাখা নানাস্থানে সংস্থাপিত হইতেছে। ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ইহার গভীরতারও বৃদ্ধি হইতেছে। ইহা যেমন অধিকতর লোককে এক বিশ্বাসসূত্রে গ্রথিত করিতেছে, তেমনি আবার প্রত্যেকের জীবনে গভীরতররূপে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। জ্ঞানোন্নতি, প্রীতির বিকাশ, চরিত্রোৎকর্ষ, সামাজিক সংস্কার ও ধর্ম্মপ্রচার, সকল বিষয়েই উন্নতি দেদীপ্যমান। কিন্তু আপনার নিকট এবিষয়ে বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করা অনাবশ্যক। আপনি স্বয়ং যেরূপ অপ্রতিহত অনুরাগ ও যত্নসহকারে প্রায় ত্রিশ বৎসর ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গলসাধন করিয়াছেন, তাহাতে এখনকার উন্নতি যে আপনার পক্ষে বিশেষ আনন্দকর তাহা আমরা সহজেই অনুভব করিতেছি। আপনি কত সময়ে আনন্দের সহিত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, আমি আমার অতীত ফললাভ করিয়াছি।'

"এই উন্নতির স্রোত হইতেই বর্ত্তমান বিরোধ উৎপন্ন হইয়াছে, অনেকেই ব্রাহ্মসমাজের পুরাতন কার্য্যপ্রণালীর প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। এই অসন্তোষই এক্ষণকার বিবাদের মূলীভূত কারণ। * * *

"সুতরাং এ অবস্থাতে ব্রাহ্মসমাজে কতকগুলিন পরিবর্ত্তন নিতান্ত আবশ্যক। কালের উন্নতভাবের সহিত যোগ রাখিয়া জনসমাজের নূতন ভাব ও নূতন অভাব অনুসারে ইহার কার্য্যপ্রণালী পরিবর্ত্তন না করিলে ইহা অগ্রগামী লোকদিগের অনুরাগবিরহিত হইয়া স্বীয়

মহান্ উদ্দেশ্য সংসাধন করিতে অক্ষম হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম যেমন উন্নতির ধর্ম্ম, ব্রাহ্মসমাজকেও সেইরূপ উন্নতিশীল করা কর্ত্তব্য।

"এই কর্ত্তব্যজ্ঞানের অনুরোধে অদ্য আমরা বিনীতভাবে নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রস্তাব আপনার উদার বিবেচনার উপর নির্ভর করিতেছি, আপনি যথাবিহিত বিধান করিবেন।

"১ম। ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য বা উপাচার্য্য বা অধ্যেতা, কেহ সাম্প্রদায়িক বা জাতিভেদসূচক কোন চিহ্ন ধারণ করিবেন না।

"২য়। সাধু, সচ্চরিত্র ও জ্ঞানাপন্ন ব্রাহ্মেরাই কেবল বেদীর আসনের অধিকারী হইবেন।

"৩য়। ব্যাখ্যান, স্তোত্র ও উপদেশে ব্রাহ্মধর্ম্মের উদার, প্রশস্ত ও নিরপেক্ষ ভাব প্রকাশ পাইবে। কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতি অবজ্ঞা বা ঘৃণাসূচক বাক্য উহাতে ব্যবহৃত হইবে না, সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করা উহার উদ্দেশ্য থাকিবে।

"যদ্যপি উপাসনা সম্বন্ধে উল্লিখিত নূতন প্রণালী অবলম্বনে আপনি স্বীকৃত না হন তাহা হইলে সাধারণ ব্রাহ্মদিগকে ঐ প্রণালী অনুসারে অপর দিনে ব্রাহ্মসমাজগৃহে উপাসনা করিতে অনুমতি দিয়া বাধিত করিবেন, ইহা হইলে উভয় দিক্ রক্ষা হইবে এবং ব্রাহ্মদিগের মধ্যে যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে তৎপরিবর্ত্তে সদ্ভাব সঞ্চারের সম্ভাবনা হইবে। যদ্যপি ইহাতেও আপনি অস্বীকৃত হন তাহা হইলে আমাদিগকে পৃথক্ ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন বিষয়ে সৎপরামর্শ দিবেন।

"কলিকাতা ১৯ আষাঢ়
শকাব্দা ১৭৭৮ }

নিতান্ত বশম্বদ

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন, শ্রীউমানাথ গুপ্ত, শ্রীমহেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীনিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার।"

ইহার উত্তরে মহর্ষি তাঁহাদিগকে নিম্নলিখিত পত্র লেখেন।

"ওঁ তৎসৎ।

"প্রীতিভাজন

শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন শ্রীযুক্ত বাবু উমানাথ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত বাবু নিবারণ-চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় সমীপেষু।

"সাদর নিবেদন,

"১। তোমারদের ১৯ আষাঢ়ের পত্র পাইয়া তোমারদের অভিপ্রায় ও সেই অভিপ্রায় অনুযায়ী প্রার্থনা অবগত হইলাম। তোমরা যে ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান প্রণালীতে অসন্তুষ্ট হইয়া নূতন প্রণালী সংস্থাপনে উদ্যত হইয়াছ, ইহা ব্রাহ্মসমাজের উন্নতিরই লক্ষণ; আমিও বিলক্ষণ অবগত আছি যে কেবল ব্রাহ্মসমাজ নয় কোন প্রকার জনসমাজেই চিরকাল একটি প্রণালী প্রচলিত রাখিবার নিমিত্তে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়া সামাজিক নিয়মের নিতান্ত বিরুদ্ধ, কালসহকারে মনুষ্যের অবস্থা পরিবর্ত্ত হইয়া উঠে, সেই পরিবর্ত্তসহকারে পুরাতন সামাজিক প্রণালীও পরিবর্ত্তিত করিতে হয়, তাহা না করিলে উন্নতির মধ্যে অনেক ব্যাঘাত উপস্থিত হইতে পারে। ব্রাহ্মসমাজে কদাপি এ নিয়মের অন্যথা হয় নাই। যখন যখন যে বিষয়ের যে প্রকার পরিবর্ত্ত আবশ্যক হইয়াছিল, সাধ্যানুসারে তাহা সম্পন্ন করা গিয়াছে এবং এইক্ষণেও সেইরূপ নিয়ম চলিতছে।

"২। অনেকে ব্রাহ্মধর্ম্মকে পৌত্তলিকতা ও সাম্প্রদায়িকতা এবং সামাজিক ও গৃহসম্বন্ধীয় সকল প্রকার পাপ ও অনিষ্টের সম্পূর্ণ বিরোধী বলিয়া যেপ্রকার বিশ্বাস করিয়াছেন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। এপ্রকার বিশ্বাস না থাকিলে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের ফললাভ হয় না। এই

বিশ্বাসের অনুবর্ত্তী হইয়া সুশিক্ষিত নব্যসম্প্রদায়ের অনেকেই যে ব্রাহ্মসমাজের শাসনপ্রণালী, উপাসনাপ্রণালী অপ্রশস্ত ও সাম্প্রদায়িক লক্ষণাক্রান্ত ও উন্নতির প্রতিরোধক জানিয়া তাহার সহিত যোগ রাখিতে অক্ষম ও তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রণালী অবলম্বনে উন্মুখ হইয়াছেন এবং তন্নিমিত্তে তোমরা একত্র হইয়া যে তিনটি প্রস্তাব করিয়াছ, তাহা আহ্লাদের সহিত বিবেচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

"৩। তোমারদের প্রথম প্রস্তাব এই যে 'ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য বা উপাচার্য্য বা অধ্যেতা কোন সাম্প্রদায়িক বা জাতিভেদসূচক চিহ্ন ধারণ করিবেন না।' জাতি-বিভাজক ও গোত্রপ্রকাশক যেসকল উপাধি সাম্প্রদায়িক ও জাতিভেদ-সূচক দীপ্যমান চিহ্নস্বরূপ রহিয়াছে, বোধ হয় তাহা রহিত করা তোমাদের উদ্দেশ্য নয়। জাতিভেদ-সূচক একমাত্র উপবীতই তোমাদের প্রস্তাবের লক্ষ্য। আমি এক্ষণে এ প্রস্তাবে নানা কারণে সম্মত হইতে পারি না। যেসকল কারণে ইহাতে অসম্মতি প্রদর্শন করিতেছি, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

"৪। অনুষ্ঠান-প্রণালী প্রচার ও প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে ব্রহ্মোপাসনা প্রচলিত হইয়াছিল, সেই সময় অবধি যাঁহারা উৎসাহপূর্ব্বক শ্রদ্ধার সহিত ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়াছিলেন এক্ষণকার কৃতানুষ্ঠান ব্রাহ্মদিগের ন্যায় তাঁহারাও দুর্ব্বিষহ তাড়না সহ্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন এবং অনেককে তাহা সহ্য করিতেও হইয়াছিল। বর্ত্তমান অনুষ্ঠানপ্রণালী এবং তোমারদের ন্যায় উন্নত ব্রাহ্মদিগকে লাভ করা তাঁহাদিগেরই উৎসাহ ও আন্দোলন ও ধৈর্য্যের ফল। তোমরাও প্রথমে কেবল ব্রহ্মোপাসনার নিমিত্তে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়াছিলে, এবং অদ্যাপি হয় তো তোমাদের মধ্যে এমত লোকও আছেন যে

ও নব্যদিগের মধ্যে অনেকে অদ্যাপি অগ্রসর হইতে পারেন নাই বটে কিন্তু তাঁহারা ও তোমরা কেহই আমার অনাদরের বস্তু নহ। তোমরা উভয় পক্ষই সদ্ভাবে ও সাধুভাবে মিলিত হইয়া ব্রহ্মোপাসনা ও ব্রাহ্ম-সমাজের উন্নতিসাধন কর, তাঁহারদের বল তোমারদের নূতন বলে মিলিত হইয়া তাহাকে আরো পোষণ করুক এবং তোমারদের দৃষ্টান্তে তাঁহারদের উৎসাহ বর্দ্ধিত হউক, এই আমার অভিলাষ। তোমারদের পরস্পর বিচ্ছেদ উপস্থিত হইলে তোমরাও অপেক্ষাকৃত হীনবল হইয়া পড়িবে, এবং তাঁহারাও তোমাদের সাহায্য-অভাবে আরো মৃদুগতি হইবেন। এই উভয় ঘটনাই আমার ক্লেশকর ও ব্রাহ্মসমাজের অহিতকর। যেসকল কার্য্য অনুষ্ঠিত হইলে এইরূপ ঘটনার সম্ভাবনা, তাহা পরিহার করা আমার পক্ষে নিতান্ত কর্ত্তব্য। তোমারদের প্রথম প্রস্তাবের অভিপ্রায় অনুসারে কার্য্য আরম্ভ হইলেই এই অনিষ্ট ঘটনা সংঘটিত হইবার আর কোন কারণই অবশিষ্ট থাকিবে না। আবার তোমাদের অভিপ্রায় সম্পন্ন না হইলে তোমরাও পৃথক হইয়া সেইরূপ সংঘটিত করিতে পার, এই ভাবিয়া তোমাদের ইচ্ছার অনুরোধে যদি তাঁহাদের প্রতি উপেক্ষা করি, তাহা হইলে নিতান্ত পক্ষপাত করা হয়। যাঁহারা যে ভাবের সহিত এতকাল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের সেই ভাব সত্ত্বে কি প্রকারে তাঁহা-দিগকে পূর্ব্বাধিকার হইতে বঞ্চিত করি। তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজে যেসকল অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন, তোমরা যদি ঔদার্য্যগুণে তাহা সহ্য করিতে পার এবং প্রীতিপূর্ব্বক শ্রেষ্ঠ ভ্রাতার তুল্য তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া গমন করিতে পার, তাহা হইলে প্রথম প্রস্তাবদ্বারা যে সকল উন্নতির কল্পনা করিতেছ, তাহা অপেক্ষাও অধিকতর উন্নতি হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা

আনুকূল্য ব্যতীত ব্যাঘাত হইবার সম্ভাবনা নাই। তোমরা যে সাধু লক্ষ্য সিদ্ধ করিবার জন্য ধাবমান হইতেছ, ইহারদেরও তাহাই লক্ষ্য। কেবল উপায়-অবলম্বন-বিষয়ে তোমারদের পরস্পর মতভেদ দৃষ্ট হইতেছে।

"৫। দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রস্তাব উত্থাপন করা বাহুল্য। জ্ঞানানুসারে সম্ভবমত উক্ত দুই প্রস্তাবের অনুযায়ী কার্য্য চিরকালই হইয়া আসিতেছে এবং চিরকালই তদনুসারে চলিতে হইবে।

"৬। তোমরা লিখিয়াছ যে 'যদ্যপি উপাসনা সম্বন্ধে উল্লিখিত নূতন প্রণালী অবলম্বনে আপনি অস্বীকৃত হন, তাহা হইলে সাধারণ ব্রাহ্মদিগকে ঐ প্রণালী অনুসারে অপর দিনে ব্রাহ্মসমাজগৃহে উপাসনা করিতে অনুমতি দিয়া বাধিত করিবেন।' ইহার দ্বারা বোধ হইতেছে যে তোমরা যে কয়েকটি ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থাতে অসন্তুষ্ট হইয়াছ, সেই অতি অল্পসংখ্যক কএকটিকেই সাধারণ ব্রাহ্ম বলিয়া গ্রহণ করিতেছ। বাস্তবিক তোমারদের সহিত মিলিত হন নাই, এমন এত ব্রাহ্ম রহিয়াছে যে, তাঁহারদের সংখ্যা তোমারদের অপেক্ষা অনেক অধিক। তোমারদের ও তাঁহারদের সকলেই সাধারণ ব্রাহ্ম বলিয়া পরিলক্ষিত হইয়া থাকেন। যদি সকলকে সাধারণ মনে করিয়া তাঁহাদের জন্যে অপর দিনে উপাসনা করিবার প্রস্তাব করিয়া থাক, তাহা হইলে এ প্রস্তাব নিতান্ত অনাবশ্যক হইয়াছে। কেননা, উপাসনার জন্য যে যে দিন নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা সাধারণ ব্রাহ্মগণেরই জন্যে। কেবল ব্রাহ্মসাধারণের জন্যেও নয়, সর্ব্বসাধারণের জন্যে। সেই সেই দিনে ব্রাহ্মদিগের—সাধারণ ব্রাহ্মদিগের দ্বারা উপাসনা-মণ্ডপ অলঙ্কৃত হইয়া থাকে। তাহাতে তাঁহারা আপনাদের মনের আনন্দই ব্যক্ত

"৭। তোমরা যদি আপনাদের জন্যে আর একটি দিন প্রার্থনা করিয়া থাক, তাহাতেও সম্মত হইতে পারি না বলিয়া দুঃখিত হইতেছি। তোমরা লিখিয়াছ যে, 'ইহা হইলে উভয়দিক রক্ষা হইবে এবং ব্রাহ্মদিগের মধ্যে যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে, তৎপরিবর্ত্তে সদ্ভাব সঞ্চারের সম্ভাবনা হইবে।' আমার নিশ্চয় প্রতীতি হইতেছে যে ইহা হইলে আরো অনিষ্ট ঘটনার সম্ভাবনা এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে তাহা হওয়াও সুসঙ্গত বোধ হয় না। ইতিপূর্ব্বে এইরূপ নিয়ম করিয়াছিলাম যে মাসের প্রথম বুধবার তোমাদের অভিলষিত ব্যক্তিরা বেদীতে আসন গ্রহণ করিয়া উপাসনা সম্পন্ন করিবেন, ইহা হইলে অতিরিক্ত দিনের আবশ্যক তোমাদের মনে হইত না, অথচ নির্ব্বিঘ্নে একটি পরিবর্ত্তনের ও উন্নতির সোপান নির্দ্ধার্য্য হইত। এইরূপ নিয়মে একবার উপাসনাকার্য্যও চলিয়াছিল এবং কয়েকবার তোমাদের জন্যে প্রতীক্ষা করাও হইয়াছিল, কিন্তু তৎকালে তাহাতেও তোমাদের অভিরুচি না হওয়াতে আমি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছিলাম। এইক্ষণে পূর্ব্ববৎ একত্র মিলিয়া উপাসনা ব্যতীত ঐক্যের আর কোন সম্ভাবনা নাই।

"৮। তোমারদের শেষকথা এই যে আমি কিছুতেই সম্মত না হইলে তোমরা পৃথক্ ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করিবে এবং তন্নিমিত্ত আমার নিকট সৎ পরামর্শ প্রার্থনা করিয়াছ। একমেবাদ্বিতীয়ং পরব্রহ্মের উপাসনা বিস্তারের জন্য ব্রাহ্মসমাজ স্থানে স্থানে যত সংস্থাপিত হয়, ততই মঙ্গল। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম প্রবর্ত্তক মহাত্মা রামমোহন রায়ের উপদেশ অবলম্বন করিয়া ইহাতে আমি এই পরামর্শ দিতেছি যে যাহাতে পরমেশ্বরের প্রতি মন ও বুদ্ধি হৃদয় ও আত্মা উন্নত হয়, যাহাতে ধর্ম্ম, প্রীতি, পবিত্রতা ও সাধুভাবের সঞ্চার হয়, সেই সমাজের উপাসনা-সময়ে এই প্রকারে বক্তৃতা, ব্যাখ্যান স্তোত্র ও গান ব্যবহৃত করিবে।

"৯। উপরিউক্ত সকল হেতুতে বাধ্য হইয়া তোমারদের ইচ্ছার অনুকূল অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে পারিলাম না, ইহাতে আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইবে না। স্বস্তি হউক, শান্তি হউক, মঙ্গল হউক, তোমারদের নিকট ঈশ্বর সর্ব্বদা প্রকাশিত থাকুন।

কলিকাতা ২৩ আষাঢ়
১৭৮৭ শক।

নিতান্তশুভাকাঙ্ক্ষিণঃ
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ।"

দ্বাচত্বারিংশ অধ্যায়।

কয়েকটি অনুষ্ঠান ও ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে মহর্ষির মত।

ব্রাহ্মসমাজগৃহে যুবকদল আপনাদের মনোমত উপাসনা ও অন্যান্য কার্য্য করিতে অসমর্থ হইয়া অত্যন্ত অসুবিধা বোধ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের ইচ্ছা ছিল যে প্রধান আচার্য্য মহাশয় তাঁহাদের সমস্ত কার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করেন এবং সমাজের সমস্ত কার্য্য পরিচালনার ভার তাঁহাদের উপর অর্পণ করেন, কিন্তু যখন সে বিষয়ে তাঁহারা নিরাশ হইলেন, তখন নূতন সমাজ সংস্থাপনের জন্য যত্ন ও চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এ সম্বন্ধে তাঁহাদের পত্র ও প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের প্রত্যুত্তর পূর্ব্বাধ্যায়ে প্রকাশিত হইয়াছে। যদিও তাঁহারা আর পূর্ব্বের ন্যায় উৎসাহের সহিত সমাজের কার্য্যে যোগদান করিলেন না, তথাপি ১৭৮৭ শক ১১ই মাঘে যে ব্রহ্মোৎসব হইয়াছিল, তাহাতে প্রধানাচার্য্য মহাশয় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রকে ও দ্বিজেন্দ্রনাথকে লইয়া বেদীতে উপবেশন করিলেন এবং উৎসবের উপাসনাদি রীতিমত সম্পন্ন করিলেন। দুই দলের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হওয়ার দরুণ ব্রহ্মোৎসবের কোন প্রকার ব্যাঘাত জন্মে নাই, বরং আরো উত্তমরূপে উৎসবের কার্য্যাদি সম্পন্ন হইয়াছিল।

এদিকে নব্যদল ধর্ম্মতত্ত্ব নাম দিয়া এক নূতন পত্রিকা বাহির করিলেন। ইহা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে। ইণ্ডিয়ান মিররও তাঁহারা অধিকার করিলেন। এই দুই পত্রিকাতে তাঁহাদের মতামত, কার্য্য ও অন্যান্য ঘটনাসমূহ রীতিমত প্রকাশ করিয়া সাধারণের সহিত যোগস্থাপন করিলেন। কেশবচন্দ্র আপনার ইচ্ছামত ভারতের ভিন্ন

ভিন্ন স্থানে গমন করিয়া অদম্য উৎসাহসহকারে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। অন্যদিকে প্রধান আচার্য্য মহাশয়ও এই পরিণত বয়সে ব্রহ্মবিদ্যালয়ে উপদেশ, মাসিক সমাজে উপদেশ ও ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার সম্বন্ধীয় নানাপ্রকার কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া ব্রহ্মের সেবা করিতে লাগিলেন। তাঁহার উপদেশগুলি একত্রে প্রকাশ করিলে বঙ্গভাষার একটি অমূল্য সম্পত্তি হইবে। ভাষার গাম্ভীর্য্যে, ভাবের মাধুর্য্যে, চিন্তার গভীরতাতে এবং ঈশ্বর-প্রেমে ভূষিত হইয়া এই উপদেশগুলি এখনও পর্য্যন্ত প্রাচীন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাগুলির মধ্যে বর্ত্তমান আছে। যদি কোন ব্যক্তি এইগুলি সাধারণের নিকট প্রকাশ করেন, তিনি দেশের অনেক উপকার করিবেন।

১৭৮৮ শকে ভাদ্রমাসের চতুর্থ দিবস রাত্রিতে হরদেব চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পরলোক গমন করেন। ইঁহার একটি ক্ষুদ্র জীবনী ইতিপূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। ইঁহার মৃত্যুর পরে প্রধানাচার্য্য মহাশয় কয়েকজন ব্রাহ্মবন্ধু সঙ্গে করিয়া ইঁহার ভবনে উপস্থিত হয়েন এবং একটি গম্ভীর ও সরল বক্তৃতা প্রদান করিয়া সকলকে পরিতৃপ্ত করেন। এই বক্তৃতাটি এমন সময়োপযোগী ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল যে আমরা ইহার কোন কোন অংশ এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম। "যখন এই মহাত্মা ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, তখন কেহই আমরা ইঁহাকে আহ্বান করি নাই, সে সময় কেহই আমরা পৃথিবীতে ছিলাম না। এখন, যখন ইনি স্বর্গস্থ হইলেন এখন ইঁহাকে সম্মান করিতে আমরা সকলে এখানে একত্রিত হইয়াছি। যদিও আমারদের মুখ ম্লান, কিন্তু ইঁহার সদ্গতি অনুভব করিয়া আমারদের আত্মা নির্ম্মলানন্দে প্লাবিত হইতেছে। দেখ, ধর্ম্মের কি পুরস্কার। ইনি একাকী ৬৫ বৎসর পর্য্যন্ত এক ধর্ম্মের উদ্দেশে নানাপ্রকার ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করিয়া আত্মাকে নির্ম্মল করিয়াছেন। যতদিন পর্য্যন্ত

এই শরীরে ইঁহার আত্মা ছিল, ততদিন এমন দিন যায় নাই, যেদিন ইনি কোন-না-কোন উপকারের চিন্তা না করিয়াছিলেন। ইনি ক্রমিক ৬৫ বৎসর পর্য্যন্ত একাকী নিঃস্বার্থ ধর্ম্মের পথে গমন করিয়া এখন দিব্যলোকে আনন্দ অনুভব করিতেছেন। * * * * এইক্ষণে দেবতারা দিব্যধামে ইঁহার আত্মাকে আদরপূর্ব্বক গ্রহণ করিতেছেন। মনুষ্যলোকের আর একজন সচ্চরিত্র অমল সাধু আত্মাকে লাভ করিয়া দেবতারা প্রহৃষ্ট হইয়াছেন। এই সাধু মহাত্মা কত ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন। * * * * * যেমন ইনি ইঁহার আত্মাকে ঈশ্বরে অর্পণ করিয়াছিলেন, তেমনি ঈশ্বর ইঁহার শরীর ও ইঁহার সকল পরিবারকে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছেন। * * * কিসে সমুদয় বঙ্গভূমি এই মাতৃভূমি শ্রীসৌভাগ্যে উন্নত হয়, দিবারাত্রি এই তাঁর চিন্তা ছিল। * * * আমার সহিত প্রথম দিনের আলাপে প্রথমেই এই মুখ হইতে বিনির্গত হয়—'জলপ্লাবনে দেশ ভেসে গেল, কিসে প্রজাদের দুঃখ নিবারণ হইবে।' পরের দুঃখ নিবারণ করা ইঁহার আন্তরিক চেষ্টা ছিল। * * * কি সহ-মরণ নিবারণ, কি বিধবা-বিবাহ—কি বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন, কি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠাতে, দেশের সকলপ্রকার মঙ্গলকার্য্যে, ইনি সকলের অগ্রসর ছিলেন। ইনি লোক-ভয়ে ভীত হইতেন না, ইনি লোকের অত্যাচারে অবসন্ন হইতেন না, ইনি ধর্ম্মযুদ্ধে কখন পরাঙ্মুখ হয়েন নাই। দেখ অদ্য এখানকার কি বিষণ্ণ ভাব—এখন সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে না, এই মেঘাবৃত মলিন নভোমণ্ডল আমারদের অন্তঃকরণের বিষাদ-ভাবের অনুরূপ রূপ ধারণ করিয়াছে—সম্ভ্রমের সহিত এই মৃতদেহকে ছায়াদান করিয়া রক্ষা করিতেছে। * * * ইঁহার পিতামাতার প্রতি ভক্তি ইঁহার মুখ হইতে কতবার শুনিয়াছি, আমার বিলক্ষণ বিশ্বাস, ইঁহার মত পিতৃভক্ত

সৎপুত্র পৃথিবীতে অতি দুর্ল্লভ। ইনি প্রতিদিন মাতার পদপূজা করিতেন। মাতার মৃত্যুর সময় হইতেই ইঁহার তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনা আরম্ভ হইল। * * * ইঁহার পৈতৃক ধর্ম্ম শাক্তধর্ম্ম ছিল, ইনিও প্রথম বয়সে শক্তি-মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে ইনি আলোচনা করিয়া দেখিলেন যে কালীমূর্ত্তি, দুর্গামূর্ত্তি কিছুই নহে, আত্মাই সত্য এবং লোকের উপকারই ঈশ্বর-পূজার নৈবেদ্য ; অতএব ইনি প্রাণপণে পরোপকারে আপনার শরীর ও মনকে নিযুক্ত করিলেন। ইনি যখন যে সত্য জানিতেন, তদনুরূপ আচরণে প্রবৃত্ত হইতেন। ইনি একটি সত্যপালনের জন্য ইঁহার পৈতৃক নিবাসবাটী পরিত্যাগ করিতে বাধিত হইলেন। ইঁহার নিকটে বিষয় এমনি তুচ্ছ ছিল যে পিতৃভূমি ছোট ভ্রাতাকে দিয়া সন্ন্যাসী হইয়া চলিয়া আইলেন।"

এই শকে পৌষমাসের নবম দিবসে বোয়ালিয়াতে ব্রাহ্মসমাজ-গৃহ নির্ম্মাণের কার্য্য আরম্ভ হয়। এই উপলক্ষে প্রধানাচার্য্য মহাশয় সেস্থানে গমন করেন এবং উপাসনার পর একটি সুদীর্ঘ ও সারগর্ভ উপদেশ প্রদান করেন। তৎপরে তিনি স্বহস্তে কর্ণিক লইয়া ব্রাহ্মসমাজ-গৃহের ভিত্তি স্থাপনপূর্ব্বক তথায় একখানি তাম্রফলক স্থাপন করেন।

ইহার মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের উপর দিয়া ঘোরতর ঝঞ্ঝাবাত চলিয়া গিয়াছে। বক্তৃতাতে, পুস্তকে, সংবাদপত্রে উত্তর প্রত্যুত্তর প্রকাশিত হইয়াছে। ব্রাহ্মেরা এই আকস্মিক বিপদে অত্যন্ত ভীত ও উত্তেজিত হইয়াছিলেন, কিন্তু এখন সে ভীতি ও উত্তেজনা প্রশমিত হইয়াছে। প্রাচীন ও নব্যদল পরস্পরের মতামত ও কার্য্য পরিষ্কাররূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া আপন আপন কার্য্যে মনো-নিবেশ করিয়াছেন। অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত কেশবচন্দ্র উত্তর-পশ্চিম

ব্রহ্ম-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে এই বিদ্যালয়ে উপদেশ প্রদান করিবার জন্য আহ্বান করেন। মহর্ষি চিরদিনই কেশবের প্রতি অনুরক্ত এবং শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন। পূর্ব্বের মত আবার দুইজনে যুবকদিগকে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম শিক্ষা দিবেন, এই চিন্তাতে তাঁহার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি কেশব-চন্দ্রের আহ্বানে ব্রহ্মবিদ্যালয়ে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। পুনরায় পিতা পুত্রের মিলনে যুবকেরাও উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন। "নবীন বিদ্যালয়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এবং কেশবচন্দ্র যখন সকল প্রকার বিরোধ বিস্মৃত হইয়া দক্ষিণে বামে উপবেশন করিলেন তখন সকলের মনে যে কি প্রকার উৎসাহ আহ্লাদ উপস্থিত হইল, তাহা বর্ণনা দ্বারা প্রকাশ করিতে পারা যায় না। প্রতিদিন প্রার্থনান্তে বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ হইত। প্রথমতঃ মহর্ষি বাঙ্গলা ভাষায় উপদেশ দিতেন, তদনন্তর কেশবচন্দ্র ইংরেজিতে দর্শন, ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেন।"

পাঠকেরা জানেন ইতিমধ্যে অনেকগুলি বিবাহ ব্রাহ্ম-পদ্ধতি অনুসারে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সম্প্রতি মজিলপুরে শ্রীযুক্ত দীননাথ দত্তের সহিত রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী হেমলতার বিবাহোপলক্ষে প্রায় ১৫০ বরযাত্র ও কন্যাযাত্র• উপস্থিত ছিলেন। "এই বিবাহোপলক্ষে বর-পক্ষ ও কন্যা-পক্ষ কাহাকেই হিন্দুসমাজের বিশেষ আক্রোশে নিপতিত হইতে হয় নাই। এক্ষণে বোধ হইতেছে হিন্দু সমাজের মধ্যে থাকিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের অপৌত্তলিক অনুষ্ঠান সহজ হইয়া আসিতেছে। * * * * * তাঁহাদিগের চির পরম্পরাগত এই ব্যবহারটি রক্ষা করাতে বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষ ভদ্র সমাজের বক্ষঃস্থলে বাস করিয়া অপৌত্তলিক ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে সমর্থ

হইতেছেন।" তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে উক্ত বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐ পত্রিকাতে আরও জানিতে পারা যায় যে তখন শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হয়েন।

আদি ব্রাহ্মসমাজ চিরকালই ব্রাহ্মধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্মের সুসংস্কৃত পরিণতি বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সেইজন্য হিন্দুসমাজের মধ্যে যাহাতে অপৌত্তলিক ধর্ম্ম বা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রবেশ করে, তাহার জন্য বিশেষ যত্নশীল ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন একটি প্রাচীন সমাজকে সংশোধিত করিয়া উন্নত করা ধর্ম্মের প্রধান কাজ, কিন্তু তাহার মধ্যে ঘোরতর বিপ্লব আনয়ন করিয়া তাহাকে বিনাশের পথে লইয়া যাইতে সাহায্য করা কখনও ধর্ম্মের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। হিন্দুধর্ম্মের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের কি সম্বন্ধ এই বিষয়ে তাঁহার মনের ভাব আমরা এই অধ্যায়ে কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিব। তিনি বলিতেছেন "অনেকে মনে করেন যে, বৌদ্ধ, মুসলমান ও খৃষ্টিয়ান্ ধর্ম্ম যেমন হিন্দুধর্ম্মের সহিত অবচ্ছেদাবচ্ছেদে বিরোধিতা ও বিসম্বাদিতা প্রদর্শন করিয়া থাকে, ব্রাহ্মধর্ম্মও সেইভাবে হিন্দুধর্ম্মের সহিত বিরোধাচরণ করিতেছে। যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের আমূল বৃত্তান্ত আলোচনা না করিয়া বর্ত্তমান সাধারণ লোকের মধ্যে প্রচলিত পৌত্তলিকতাকেই ইহার সর্ব্বস্ব বিবেচনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা যে ব্রাহ্মধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্মের বিরোধী ও বিসম্বাদী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিবেন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। হিন্দুসমাজে যে নানাপ্রকার দেবদেবীর আরাধনা প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হিন্দুধর্ম্মের নিকৃষ্ট ভাগ। নানা দেব-দেবীর উপাসনাত্মক যাগ যজ্ঞ হোমাদির ব্যবস্থা-সকল সেই অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের জ্ঞানলাভের সোপানরূপে হিন্দুশাস্ত্রে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে।

"সুবিস্তীর্ণ হিন্দুসমাজে কালে কালে যে-সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন মত উদ্ভাবিত হইয়াছিল, হিন্দুরা তৎসমুদায়ই আপনাদের ধর্ম্মশাস্ত্র-মধ্যে নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। বুদ্ধি-ও-প্রবৃত্তি-ভেদে লোকে সেই-সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন মত অবলম্বন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। * * * প্রত্যুত একেশ্বরবাদই হিন্দুধর্ম্মের উৎকৃষ্ট অংশ ও হিন্দুশাস্ত্রানুসারেই তাহা হিন্দুধর্ম্মের বিশুদ্ধ মত। হিন্দুধর্ম্মের সেই একেশ্বরবাদই আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্ম। একেশ্বরপ্রতিপাদক ধর্ম্মে নানা দেবদেবীর উপাসনাত্মক কনিষ্ঠ ধর্ম্ম হইতে মহান্ প্রভেদ প্রদর্শন করিবার নিমিত্তই আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম এই নাম মনোনীত করিয়া লইয়াছি।

"যদি হিন্দুধর্ম্মের সমুদায় অংশ আমরা বিশুদ্ধ যুক্তি দ্বারা রক্ষা করিতে পারিতাম; তাহা হইলে আমরা আপনাদিগকে যার পর নাই সৌভাগ্যশালী বোধ করিতাম। যে যে অংশে ভ্রম প্রমাদ দেখিতে পাওয়া যায়, আমরা অতি দুঃখিত হইয়া সেই সেই অংশ পরিত্যাগ করি এবং তদ্দ্বারা হিন্দুধর্ম্ম সংশোধিত হইতেছে ইহাই বিশ্বাস করিয়া থাকি। যদি আমাদের পুরাতন শাস্ত্র-সকলের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম না পাইতাম তাহা হইলেও ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদের আশ্রয়স্থান হইতেন সন্দেহ নাই; কিন্তু সেরূপ হইলে হিন্দুধর্ম্মের সহিত বিরোধে প্রবৃত্ত হইয়া আমাদিগকে অত্যন্ত ক্ষোভ পাইতে হইত। * * * যদিও ব্রাহ্মধর্ম্মে এরূপ উদারতা আছে যে, ইহা জাতিবিশেষে কখনই আবদ্ধ হইয়া থাকিবে না; তথাপি হিন্দুজাতির সহিত ইহার সবিশেষ সম্বন্ধ চিরকালই বিদ্যমান থাকিবে। * * *

"আমরা শ্লাঘার সহিত ব্যক্ত করিতেছি যে, ইংরাজি শিক্ষা দ্বারা এদেশীয় লোকদিগের সংস্কার-সকল যেরূপ পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের আবির্ভাব না হইলে ধর্ম্ম-বিষয়ে ঘোরতর বিপ্লব উপস্থিত

হইত। এক্ষণে ব্রাহ্মধর্ম্মরূপ প্রবল সেতুর প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও যখন সেই বিপ্লবের নিদর্শন চতুর্দ্দিকে দৃষ্ট হইতেছে, তখন ব্রাহ্মধর্ম্ম না থাকিলে হিন্দু-জাতির আর কিছু অবশিষ্ট থাকিবে না। যখন বিদ্যার আলোক আরও অধিকতর হিন্দু-সমাজের স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই মন হইতে কুসংস্কাররূপ অন্ধকার অপসারিত করিবে, তখন ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্যতীত আর কেহই হিন্দু-জাতিকে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে পারিবে না। মনে কর, সুপ্রসিদ্ধ হিন্দু-জাতির আর সমুদয় বিষয়ই এক্ষণে বিজাতীয় ভাবে পরিবর্ত্তিত হইতে চলিল এবং তাহাও কিয়ৎপরিমাণে আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু এ অবস্থায় যদি আমাদের নিজের ধর্ম্ম না থাকে,তাহা হইলে আমরা যার পর নাই নিকৃষ্ট জাতি হইয়া পড়িব। যদি আমাদের এখানে উপযুক্ত ধর্ম্ম না থাকিত, তাহা হইলে যাহাই হউক, তাহাই স্বীকার করিতে হইত। ইহা নিশ্চয় বলিতে পারি যে, যদি ব্রাহ্মধর্ম্ম না থাকে, তাহা হইলে এক্ষণ হিন্দু-সমাজে ধর্ম্মবিষয়ে যে সংস্কার আছে, তাহা তো দূরীকৃত হইবেই হইবে; কিন্তু আবার নূতনপ্রকার কুসংস্কার প্রবিষ্ট হইয়া ইহকালে হিন্দু-জাতিকে লোপ করিয়া যাইবে ও পরকালের উন্নতিকেও রুদ্ধ করিয়া ফেলিবে। হিন্দু-জাতির মান, সম্ভ্রম ও গৌরব কেবল ব্রাহ্মধর্ম্ম দ্বারাই পরিরক্ষিত হইবে; ইহার প্রধান কারণ এই যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দু-জাতিরই পুরাতন ধর্ম্ম।"

উক্ত উদ্ধৃত অংশ হইতে পাঠকেরা বুঝিতে পারিতেছেন যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম্মকে হিন্দু-ধর্ম্মেরই বিকশিত, সংস্কৃত ও উন্নত অবস্থা বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু তাই বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে যদি এই ব্রাহ্মধর্ম্ম অবিকশিত অবস্থাতে না থাকিত, তাহা হইলে তিনি এই ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিতেন না। কারণ তিনি বলিতেছেন "যদি আমাদের পুরাতন শাস্ত্র-সকলের

মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম না পাইতাম, তাহা হইলেও ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদের আশ্রয়-স্থান হইতেন সন্দেহ নাই।”

১৭৮৯ শক ২৪ শ্রাবণ দিবসে দেবেন্দ্রনাথ পিতার বাৎসরিক শ্রাদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্ম পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন করেন। এই শ্রাদ্ধবাসরে অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত হয়েন। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকগণও উপস্থিত হইয়াছিলেন। উপাসনার পরে তিনি যে প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাহাতে আমরা তাঁহার গভীর বিশ্বাস ও ঈশ্বর-প্রেম দর্শন করিয়া বিস্মিত হই। এই প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া ও এই শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের গাম্ভীর্য্য ও পবিত্রতা দেখিয়া স্বর্গীয় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রার্থনার কিয়দংশ আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

“হে পরমপিতা, অখিলমাতা! অদ্য আমার পিতার শ্রাদ্ধবাসরে সপরিবারে তোমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া তোমাকে প্রীতিপূজা প্রদান করিয়া প্রার্থনা করিতেছি যে, যেমন তুমি আমাদের এখানকার সকলের মঙ্গলবিধান করিতেছ, সেইরূপ পরলোকবাসী আমার অতি শ্রদ্ধেয় ভক্তি-ভাজন পিতার আত্মার উন্নতি সাধন কর, এবং সংসারের পাপতাপ হইতে মুক্ত করিয়া তোমার সঙ্গী করিয়া লও। তোমার প্রতিনিধিস্বরূপ পিতা হইতেই আমি শরীর, মন, জীবন, আত্মা সকলই পাইয়াছি। পিতা মধু-স্বরূপ। পিতা হইতেই সুখ-সৌভাগ্য, পিতা হইতেই বল বীর্য্য, পিতা হইতেই ধর্ম্মপথে চলিবার অধিকার পাইয়াছি। পিতাকে পাইয়াই পরমপিতাকে লাভ করিয়াছি। তোমার মহিমা সর্ব্বত্র অনুভব করিতেছি। অতএব তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা, ভক্তি উদ্দীপন কর এবং আমাকে তাঁহার সমর্পিত সংসারধর্ম্মের ভার বহন করিবার ক্ষমতা দেও। তিনি যে লোকে থাকুন, আমার প্রতি

প্রসন্ন থাকুন ; এবং তাঁহার অপ্রিয় ব্যবহার যাহা কিছু করিয়া থাকি, তিনি তাহা ক্ষমা করুন।* * * হে জীবন-দাতা জ্ঞানদাতা পরমপিতা! তোমার জ্ঞান আমাদিগকে শিক্ষা দেও, তোমার আশ্রয় প্রদান কর এবং তোমার অক্ষয়ভাণ্ডার হইতে আমাদের সকল অভাব দূর কর। তোমা হইতে আমরা যে-কিছু মঙ্গল প্রাপ্ত হই, তাহাতেই যেন সন্তোষ থাকি, তুমি যাহা কিছু দিয়াছ যদি সকলই যায়, তথাপি তোমার মঙ্গল-স্বরূপে বিশ্বাস যেন কখনই শিথিল না হয়। তুমি আমারদিগকে সংসারের সম্পদই প্রেরণ কর, আর বিপদেই আবৃত কর, হে মঙ্গলময়! প্রত্যেক অবস্থান-পরিবর্ত্তনে তুমি আমারদের সঙ্গেই থাকিও। তোমার দক্ষিণ মুখ—তোমার প্রেম-দৃষ্টি যেন সকল সময় আমারদের হৃদয়কে প্রফুল্ল ও উন্নত করিয়া রাখে। হে বিশ্ববিধাতা জগৎপিতা! তোমার প্রসাদে বায়ু মধু বহন করিতেছে, সমুদ্র মধুক্ষরণ করিতেছে, আবার তোমারই প্রসাদে ওষধি বনস্পতি সকল মধুমান্ হউক, গো-সকল সুমধুর দুগ্ধদান করুক। রাত্রি মধু হউক, উষা মধু হউক, দ্যুলোক ও সূর্য্য মধুময় হউক ; পিতা তোমার মধুময় মঙ্গলভাবের অনুকরণ করুন।"

দেবেন্দ্রনাথের সিমলা হইতে প্রত্যাগমনের পর তাঁহার উপাসনা ও উপদেশাদিতে আকৃষ্ট হইয়া অনেক লোক সমাজে রীতিমত উপাসনা করিতে আসিতেন। তাঁহার ধর্ম্মভাবে মুগ্ধ হইয়া অনেক স্ত্রীলোকও তাঁহার নিকট আসিতেন, তন্মধ্যে একজন রমণী ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি এমনি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে মৃত্যুকালে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি ব্রাহ্মসমাজকে দান করিয়া পরলোক গমন করেন। এ সম্বন্ধে আমরা পত্রিকাতে এইরূপ দেখিতে পাই। "আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত অঙ্গীকার করিতেছি যে যোড়াসাঁকো-নিবাসিনী কমলিনী দাসী গত ৩১ বৈশাখ সোমবার তাহার মৃত্যুকালে নিজ বন্ধু বান্ধবগণকে সমক্ষে ডাকাইয়া

তাহার যাহা কিছু সম্পত্তি ছিল, তাহাতে দেনা পরিশোধ করিয়া অবশিষ্ট যাহা উদ্বৃত্ত হইল, তৎসমুদায় অর্থাৎ সিংহবাবুদিগের বারদ্বারির বাগানস্থিত একখানি খোলার বাটী ও নগত ৬১ টাকা এই সমাজের সাহায্যার্থ দান করিয়া গিয়াছে। কমলিনী দাসী পতিপুত্রবিহীনা ছিল এবং তাহার আর উত্তরাধিকারী কেহই নাই। সে চিরকাল সামান্য বৃত্তি অবলম্বন করিয়া পরিশ্রমে কালযাপন করিত, মৃত্যুকালে ব্রহ্মধর্ম্মের প্রতি তাহার যে এ প্রকার আন্তরিক শ্রদ্ধা উপস্থিত হইল, ইহা অতি আশ্চার্য্যের বিষয়। সামান্য স্ত্রীলোকের মৃত্যুকালে এইরূপ শুভকর্ম্মে দান আমাদিগের দেশে আমরা এই প্রথম দেখিলাম। বোধ হয় এই দৃষ্টান্ত অনেকের উৎসাহানল সঙ্কুক্ষিত করিবে।”

এই শকের ২ অগ্রহায়ণ রবিবার দিবসে প্রধানাচার্য্য মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী স্বর্ণকুমারীর সহিত কৃষ্ণনগরের অন্তঃপাতী জয়রামপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত জানকীনাথ ঘোষালের বিবাহ ব্রাহ্মধর্ম্মপদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হয়। এই বিবাহোপলক্ষে দেশ বিদেশ হইতে বহুসংখ্যক ভদ্রলোক ও ব্রাহ্মণপণ্ডিত উপস্থিত হইয়া বিবাহে যোগদান করিয়াছিলেন।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

অভিনন্দনপত্র ও তাহার প্রত্যুত্তর।

ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরিয়া যে বিবাদ বিসম্বাদের ঝটিকা চলিতেছিল, এতদিনে তাহা প্রায় প্রশমিত হইয়াছে। এখন সকলে প্রকৃতিস্থ হইয়া আপন আপন কার্য্যে মনোযোগ দিয়াছেন। আদি ব্রাহ্মসমাজ আপনার নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন এবং নব্যদলও আপনাদের মত ও বিশ্বাসানুযায়ী কার্য্যে মনোযোগী হইয়াছেন। কিন্তু এই বিরোধের মধ্যে যে-সমস্ত হিংসা, বিদ্বেষ ও অপ্রেমের বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা স্মরণ করিয়া অনেকেই অনুতপ্ত হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ ধর্ম্মপিতা দেবেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে নব্যদল হয়ত অনেক সময়ে অনেক অযথা ভাষা প্রয়োগ করিয়াছিলেন, এইজন্য তাঁহারা স্থির করিলেন যে এই সাময়িক উত্তেজনা ও বিরোধের মধ্যে তাঁহার প্রতি যে অন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তাঁহারা দেবেন্দ্রনাথকে একটি অভিনন্দনপত্র প্রদান করিবেন। বস্তুতঃ নব্যদল যদিও দেবেন্দ্রনাথকে পরিত্যাগ করিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন তথাপি তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে তাঁহারা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। কোন প্রকার বিরোধের সময় এই শ্রদ্ধা ও ভক্তির ভাব কিছু মলিন হওয়া আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা এই যে যখন বিরোধের উত্তেজনা চলিয়া যায়, যখন আবার আমরা প্রকৃতিস্থ হই, তখন ভক্তিভাজনের প্রতি

ভক্তি আবার জাগিয়া উঠে এবং তাঁহার প্রতি অযথা ব্যবহারের জন্য প্রাণ অত্যন্ত অনুতপ্ত হয়। মানবমনের এই নিয়ম। কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার বন্ধুগণ স্থির করিলেন যে, দেবেন্দ্রনাথ যেভাবে আপনার সমস্ত জীবন ব্রহ্মলাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া অতিবাহিত করিয়াছেন, যেপ্রকার অসাধারণ পরিশ্রম, যত্ন ও সহিষ্ণুতার সহিত ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে আপনাকে অর্পণ করিয়াছেন, এবং তাঁহারা এই মহাপুরুষের পদতলে বসিয়া যে কত ধর্ম্মোপদেশ লাভ করিয়াছেন, তাহার নিদর্শন-স্বরূপ তাঁহারা তাঁহাকে 'মহর্ষি' এই উপাধিতে ভূষিত করিবেন। তাঁহারা যে অভিনন্দনপত্র তাঁহাকে প্রদান করেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

অভিনন্দনপত্র।

"ভক্তিভাজন "মহর্ষি" শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজের প্রধান আচার্য্য মহাশয়

শ্রীচরণেষু।

"আর্য্য,—যেদিন দেশহিতৈষী ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা রামমোহন রায় বঙ্গ-দেশে পবিত্র ব্রহ্মোপাসনার জন্য একটি সাধারণ গৃহ প্রতিষ্ঠিত করিলেন সেইদিন ইহার প্রকৃত মঙ্গলের অভ্যুদয় হইল। বহুকালের অজ্ঞাননিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া বঙ্গদেশ নূতন জীবন প্রাপ্ত হইল, এবং কুসংস্কার হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীনভাবে উন্নতির পথে পদসঞ্চারণ করিতে লাগিল। কিন্তু উক্ত মহাত্মার অনতিবিলম্বে পরলোকপ্রাপ্তি হওয়াতে তৎপ্রদীপ্ত ব্রহ্মোপাসনারূপ আলোক নির্ব্বাণোন্মুখ হইল এবং সকল আশা ভঙ্গ হইল। এই বিশেষ সময়ে ঈশ্বর আপনাকে উত্থিত করিয়া বঙ্গদেশের ধর্ম্মোন্নতির ভার আপনার হস্তে অর্পণ করিলেন। আপনি নিঃস্বার্থভাবে ও অপরাজিত চিত্তে বিগত ত্রিশ বৎসর এই গুরুভার

বহন করিয়া যে অশেষ কল্যাণসাধন করিয়াছেন তাহাতে আমরা আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞতা ঋণে-বদ্ধ হইয়াছি।

"যে বেদান্তপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মোপাসনা বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল, তাহা পুনরুদ্দীপন করিবার জন্য আপনি ১৭৬১ শকে তত্ত্ববোধিনী সভা সংস্থাপন করেন; তথায় অনেক কৃতবিদ্য যুবক ধর্ম্মালোচনা-দ্বারা কুসংস্কার হইতে মুক্ত হইলেন এবং ব্রহ্মোপাসনা-দ্বারা হৃদয় মনকে বিশুদ্ধ করিতে সক্ষম হইলেন। এই সভার দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল এবং অবিলম্বে বহুসংখ্যক সভ্যদ্বারা ইহা পরিপূর্ণ হইল। যাহাতে আপনাদের আলোচনার ফল আরও বিস্তীর্ণরূপে প্রচারিত হয় এই উদ্দেশে আপনি ১৭৬৫ শকে সুবিখ্যাত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশ করিলেন। এই পত্রিকা-দ্বারা বঙ্গভাষা প্রকৃতরূপে সংগঠিত ও অলংকৃত হইয়াছে এবং অপরা ও পরা বিদ্যার বিবিধ তত্ত্বসমুদায় বঙ্গদেশে ও উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের নানাস্থলে প্রচারিত হইয়াছে। এইরূপে তত্ত্ববোধিনী সভা ও রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজ পরস্পর সাহায্য-দ্বারা ব্রহ্মোপাসকদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তাঁহা-দিগকে বিশ্বাস-সূত্রে গ্রথিত করিয়া দলবদ্ধ করিবার জন্য আপনি যথা-সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রহণপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করিলেন। এই প্রকৃষ্ট-উপায়-দ্বারা আপনি উপাসনাকে বিশ্বাসভূমিতে বদ্ধমূল করিলেন এবং ব্রহ্মোপাসক-দিগকে বেদান্তপ্রতিপাদ্য ব্রাহ্মধর্ম্মে সম্প্রদায়ীভূত করিলেন। এইরূপে ব্রাহ্মসমাজ সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন হইয়া ক্রমশঃ উন্নত হইতে লাগিল এবং ইহার দৃষ্টান্তে স্থানে স্থানে শাখাসমাজ সংস্থাপিত হইল। কিন্তু পবিত্র ধর্ম্মের উন্নতিস্রোতে অধিককাল অসত্য তিষ্ঠিতে পারে না। এ কারণ বেদাদিগ্রন্থের অভ্রান্ততাবিষয়ক যে ভয়ানক মত এই-সমুদায় ব্যাপারের মূলে গূঢ়রূপে স্থিতি করিতেছিল, তাহা যখনই বিশুদ্ধ জ্ঞান-চর্চ্চাতে

প্রকাশিত হইল, তখনই বিবেকের অনুরোধে ও ঈশ্বরের আদেশে আপনি উহা পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মভ্রাতাদিগকে তাহা হইতে মুক্ত করিতে যত্নবান্ হইলেন। হিন্দুশাস্ত্র মন্থন করিয়া পূর্ব্বে সত্যামৃত লাভ করিয়াছিলেন, পরে তন্মধ্যে গরল দৃষ্ট হওয়াতে তদুভয়কে ভিন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং অবশেষে ব্রাহ্মধর্ম্ম নামে হিন্দুশাস্ত্রোদ্ধৃত সত্যসংগ্রহ প্রচার করিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রহণপ্রণালীও সুতরাং পরিবর্ত্তিত হইল। গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া আপনি ব্রাহ্মধর্ম্মের কয়েকটি নির্ব্বিরোধ মূলসত্য নির্দ্ধারণ করত তদুপরি ব্রাহ্মমণ্ডলীকে স্থাপন করিলেন। এইরূপে সমাজসংস্কার করিয়া আপনি কয়েক বৎসর পরে হিমালয় পর্ব্বতে গমন করিলেন। তথায় দুইবৎসরকাল অবস্থান করত হৃদয়মনকে উপাসনা, ধ্যান ও অধ্যয়নদ্বারা সমধিক উন্নত করিয়া সেখান হইতে প্রত্যাগত হইলেন; এবং দ্বিগুণিত উদ্যম ও নিষ্ঠাসহকারে ও বিশুদ্ধ প্রণালীতে সংস্কৃত সমাচারে উন্নতিসাধনে নিযুক্ত হইলেন। যে ব্রহ্মবিদ্যালয়ে আপনি সপ্তাহে সপ্তাহে ব্রাহ্মধর্ম্মের নির্ম্মল মুক্তিপ্রদ জ্ঞান নিয়মিতরূপে বিতরণ করিয়া নব্যসম্প্রদায়ের অনেককে ঈশ্বরের পথে আনিয়াছেন এবং যে ব্রহ্মবিদ্যালয়ের উপদেশগুলি গ্রন্থবদ্ধ হইয়া প্রচারিত হওয়াতে শত শত লোকে এখনও ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস বুঝিতে সক্ষম হইতেছে, আপনিই তাহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কিন্তু আপনার যথার্থ মহত্ব তখনও পর্য্যন্ত সম্যক্‌রূপে প্রকাশ পায় নাই। যখন আপনি কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য্যরূপে পবিত্র বেদী হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মের মহান্ সত্যসকল বিবৃত করিতে লাগিলেন, তখনই আপনার হৃদিস্থিত মহোচ্চ ও সুগভীর ভাবনিচয় লোকের নিকট প্রকাশিত হইল; এবং বিশেষরূপে ঈশ্বরের দিকে উপাসকদিগের হৃদয়কে আকর্ষণ করিল। কতদিন আমরা সংসারের পাপতাপে

উত্তপ্ত হইয়া সমাজে আসিয়া আপনার হৃদয়বিনিঃসৃত জ্ঞানামৃতলাভে শীতল হইয়াছি, কতদিন আপনার উৎসাহকর উপদেশ দ্বারা আমাদের অসাড় ও মুমূর্ষু আত্মা পুনর্জীবিত হইয়াছে এবং আপনার প্রদর্শিত আধ্যাত্মিক রাজ্যের গাম্ভীর্য্যে ও সৌন্দর্য্য পুলকিত হইয়া সংসারের প্রতি বীতরাগ হইয়াছে। সেই-সকল স্বর্গীয় অনুপম 'ব্যাখ্যান' পরে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। আমরা তৎশ্রবণ-দ্বারা যে মহোপকার লাভ করিয়াছি, বোধ করি অনেকে পাঠ করিয়া তাদৃশ ফলপ্রাপ্ত হইবেন। পরন্তু ইহা আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস যে এই অমূল্য পুস্তক ভবিষ্যতে দেশবিদেশে উপযুক্তরূপে সমাদৃত হইবে। এইপ্রকার সাধারণ ভাবে আপনি স্বীয় হৃদিস্থিত আদর্শ অনুসারে ব্রাহ্মমণ্ডলীর কল্যাণসাধন করিয়াছেন, আবার বিশেষরূপে আমাদের মধ্যে কেহ কেহ আপনার পুত্রসদৃশ স্নেহপাত্র হইয়া পরম উপকার লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা আপনার জীবনের গূঢ়তম মহত্ত্ব অনুভব করিয়া এবং আপনার উপদেশ ও দৃষ্টান্তে এবং পবিত্র সহবাসে উন্নত হইয়া আপনাকে পিতার ন্যায় ভক্তি করেন এবং আধ্যাত্মিক উন্নতিপথে আপনাকে যথার্থ বন্ধু ও সহায় জানিয়া চিরজীবন আপনকার নিকট কৃতজ্ঞতা-ঋণে বদ্ধ থাকিবেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম যে প্রীতির ধর্ম্ম এবং কঠোর জ্ঞান ও শূন্য অনুষ্ঠানের অতীত তাহা আপনারই নিকট ব্রাহ্মেরা শিক্ষা করিয়াছেন এবং আপনারই উপদেশ ও দৃষ্টান্তে তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের আধ্যাত্মিক পবিত্রতা ও আনন্দ হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

এই-সকল মহোপকারে উপকৃত হইয়া আমাদের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা- ও ভক্তিসূচক এই অভিনন্দনপত্রখানি অদ্য আপনাকে উপহার দিতেছি। শূন্য প্রশংসাবাদ করা আমাদের অভিপ্রায় নহে, কেবল

এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে সাহসী হইয়াছি। আপনার মহত্ত্বের অযোগ্য এই উপহারটি গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে পরমাপ্যায়িত করিবেন। পরমেশ্বর আপনার হৃদয়ে বিমলানন্দ বিধান করুন, আপনার সাধুকামনা-সকল পূর্ণ হউক এবং আপনার ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হউক।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি।"

এই অভিনন্দনপত্রের উত্তরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যে প্রত্যুত্তর প্রদান করেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"হে প্রিয়দর্শন কেশবচন্দ্র ও প্রীতিভাজন ব্রাহ্মবন্ধুগণ আমি আদর-পূর্ব্বক কিন্তু সঙ্কুচিত হইয়া আপনাদের নিকট হইতে এই প্রেমোপ-হার গ্রহণ করিতেছি। আমার পক্ষে ইহা অভাবনীয় অচিন্তনীয় ব্যাপার; ইহা আমার কখন চিন্তার পথেও আইসে নাই যে, আমি আমার যৎকিঞ্চিৎ কার্য্যে আপনাদের এপ্রকার প্রীতি ও অনুকূলতা আকর্ষণ করিব। আমি এই হিন্দুস্থানের স্বকীয় হিন্দুজাতির মমতাতে বদ্ধ হইয়া ইহাকে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম-দ্বারা সংস্কৃত ও উন্নত করিতে ব্যাকুল রহিয়াছি। এই ব্রাহ্মধর্ম্মের যে মধুর অমৃতরস আস্বাদন করিয়া আমার আত্মা তৃপ্ত হইয়াছে, তাহাই আমার স্বজাতির মধ্যে পরিবেষণ করিবার নিমিত্তে মন নিতান্ত উৎসুক রহিয়াছে। আমি কেন প্রথমে নির্ব্বিশেষে সমুদয় উপনিষদ্‌কে অবলম্বন করিয়া এই হিন্দু-সমাজে বেদান্ত-প্রতিপাদ্য বলিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়া-ছিলাম, পরে কেনই বা এখন তাহার পরিবর্ত্তে ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ প্রকাশ করিয়া ইহাতে সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছি, তাহার আমূল হেতু এই অবসরে সংক্ষেপে আপনাদের নিকট ব্যক্ত করিতে ইচ্ছা হইতেছে। প্রথম বয়সে আমার নিকটে এই নক্ষত্র-

এই অগণ্য নক্ষত্রপুর্ণ অনন্ত আকাশ আমার নয়নপথে প্রসারিত হইয়া প্রদীপ্ত হইল। তাহার আশ্চর্য্যভাবে একেবারে আমার সমুদায় মন সমুদয় আত্মা আকৃষ্ট হইল! অমনি বুঝি প্রকাশিত হইয়া সিদ্ধান্ত করিল যে এ কখন পরিমিত হস্তের রচনা নহে। সেই মুহূর্ত্তে অনন্তের ভাব হৃদয়ে প্রতিভাত হইল; সেই মুহূর্ত্তে জ্ঞান-নেত্র বিকশিত হইল। তখন আমার পাঠ্যাবস্থা। একথা অদ্যাপি আমি কাহারও নিকটে প্রকাশ করি নাই। আপনাদের অদ্যকার সৌহার্দ্দে বাধ্য হইয়া হৃদয়দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া তাহা এখন ব্যক্ত করিতেছি। প্রথমে এই অনন্ত আকাশ হইতে অনন্তের পরিচয় পাইলাম, যেন আবরণ ভেদ করিয়া অনন্ত ঈশ্বর আমাকে দেখা দিলেন, যেন যবনিকার এক পার্শ্ব হইতে মাতার প্রসন্ন বদন দেখিতে পাইলাম। সেই প্রসন্ন বদন আমার চিত্তপটে চিরদিনের নিমিত্ত মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। প্রথম বয়সে উপনয়নের পর প্রতিনিয়ত যখন গৃহেতে শালগ্রামশিলার অর্চ্চনা দেখিতাম, প্রতিবৎসরে যখন দুর্গাপূজার উৎসবে উৎসাহিত হইতাম, প্রতিদিন যখন বিদ্যালয়ে যাইবার পথে ঠনঠনিয়ার সিদ্ধেশ্বরীকে প্রণাম করিয়া পাঠের পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য বর প্রার্থনা করিতাম, তখন মনের এই বিশ্বাস ছিল যে ঈশ্বরই শালগ্রামশিলা, ঈশ্বরই দশভূজা দুর্গা, ঈশ্বরই চতুর্ভুজা সিদ্ধেশ্বরী। কিন্তু সেই শুভক্ষণে যেমন এই অনন্ত আকাশের উপরে আমার নয়ন-যুগল উন্মীলিত হইল, অমনি আমার জ্ঞান উন্মীলিত হইয়া মনের পৌত্তলিক ভাবকে ক্ষণকালের মধ্যে তিরোহিত করিয়া দিল। অমনি জানিলাম, অনন্ত আকাশের অগণ্য নক্ষত্র পরিমিত হস্তের কার্য্য নহে, অনন্ত পুরুষেরই এই অনন্ত রচনা। প্রথম উপদেশ অনন্ত আকাশ হইতে পাইলাম। পরে

উত্থিত হইল। সেই উদাস ভাবের আনন্দে হৃদয় এমনি বিকশিত হইল যে সেরাত্রি চক্ষুতে নিদ্রা আইল না। তাহার পরদিনে সে আনন্দ চলিয়া গেল। তখন আমি ঘোর বিষাদে অকূল চিন্তাতে নিমগ্ন হইলাম। পিপাসাতুর পথিকের ন্যায় সেই আনন্দের আকর প্রেমের সাগর সত্যস্বরূপের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। মনে হইতে লাগিল যে চিত্ত-পটের জ্ঞানভূমিতে অনন্তের যে সুন্দর ছবি মুদ্রিত রহিয়াছে, তাহা কি কেবল ছবিমাত্র? তাহা কি মনের ভাবমাত্র? সেই বাস্তবিক সত্য কি নাই, যাহার এই প্রতিবিম্ব, যাহার এই প্রতিরূপ? এই প্রকারে বুদ্ধির মহা আন্দোলন চলিল। এই আন্দোলন ও আলোচনাতে যখন আমার মন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইতেছিল, তখন হঠাৎ উপনিষদের এক ছিন্নপত্র আমার হস্তে নিপতিত হইল। যখন প্রথম তাহাতে পাঠ করিলাম "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং"। তখন আমার মন এক আনন্দময় নূতন রাজ্যে প্রবেশ করিল। ইহার পূর্ব্বে আমার মনে এই ভ্রান্তি ছিল যে আমাদের হিন্দু-শাস্ত্রে পৌত্তলিকতা ভিন্ন নিরাকার নির্ব্বিকার সত্যস্বরূপের নির্দ্দেশ নাই। আমাদের এই দুর্ভাগ্য হিন্দুস্থানে একমেবাদ্বিতীয়ং পরব্রহ্মের কখন অর্চ্চনা হয় নাই। পরে যখন আমার হৃদয়ের ভাবের প্রতিভাব উপনিষদের পত্রে প্রথম প্রত্যক্ষ দেখিলাম, এই ব্রহ্মাণ্ডের যে-কিছু পদার্থ সমুদয়ই ঈশ্বর-দ্বারা ব্যাপ্ত রহিয়াছে; পাপচিন্তা ও বিষয়লালসা পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মানন্দ উপভোগ কর, কাহার ধনে লোভ করিও না। তখনই আমার হৃদয় উৎসাহ ও আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তখন সমুদয় উপনিষদ্‌কে সমুদায় বেদকে আমার মনের শ্রদ্ধা আসিয়া আলিঙ্গন করিল। পূর্ব্বে আমার

ব্যাপ্ত হইল। অসময়ে অনির্দ্দেশ্য বন্ধুর ন্যায় অপরিচিত বেদশাস্ত্র হইতে আমার হৃদয়ের চিরপরিচিত আধ্যাত্মিক ভাবের প্রতিধ্বনি পাইয়া কৃতজ্ঞতা-সহকারে আমার মস্তক তাহার নিকটে অবনত হইল। উপনিষদের এক এক মহাবাক্যে আমার আত্মা জ্ঞান-সোপানে উন্নত হইতে লাগিল। "ব্রহ্ম বা ইদমগ্রআসীৎ তদাত্মানামবাবেৎ অহং ব্রহ্মাস্মীতি।" ইহার পূর্ব্বে কেবল ব্রহ্ম ছিলেন; তিনি আপনাকে জানিলেন, আমি ব্রহ্ম। "সদেব সৌম্যেদমগ্রআসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং"। ইহার পূর্ব্বে হে প্রিয় শিষ্য সৎস্বরূপ পরব্রহ্মই ছিলেন, তিনি একই অদ্বিতীয়। "সতপোতপ্যত সতপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ"। তিনি আলোচনা করিলেন, তিনি আলোচনা করিয়া এই-সমুদায় যাহা কিছু সৃষ্টি করিলেন। "স যশ্চায়ং পুরুষে যশ্চাসাবাদিত্যে স একঃ।" সেই—যে ইনি পুরুষে এবং যে ইনি আদিত্যে—তিনি এক। কিন্তু যখন আবার এই উপনিষদে দেখিলাম 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' 'সোঽহমস্মি' 'তত্ত্বমসি' এই আত্মা ব্রহ্ম, তিনি আমি, তিনি তুমি—তখনই বুঝিলাম যে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের মূলতত্ত্বের সহিত ইহার সকল বাক্যের ঐক্য নাই। আবার তাহাতে যখন দেখিলাম যে "যাহারা গ্রামে থাকিয়া যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম্মকাজের অনুষ্ঠান করে, তাহারা মৃত্যুর পরে ধূমকে প্রাপ্ত হয়, ধূম হইতে রাত্রিকে, রাত্রি হইতে কৃষ্ণপক্ষকে, কৃষ্ণপক্ষ হইতে দক্ষিণায়নের মাস-সকলকে, দক্ষিণায়নের মাস-সকল হইতে পিতৃলোককে, পিতৃলোক হইতে আকাশকে, আকাশ হইতে চন্দ্রলোককে প্রাপ্ত হয়; এবং সেই চন্দ্রলোকে স্বীয় পুণ্যফল ভোগ করিয়া পুনর্ব্বার এই পৃথিবীলোকে জন্মগ্রহণ করিবার নিমিত্ত চন্দ্রলোক হইতে বিচ্যুত হইয়া আকাশকে প্রাপ্ত হয়, আকাশ হইতে বায়ুকে প্রাপ্ত হয়, বায়ু হইতে ধূম হয়, ধূম হইয়া বাষ্প হয়, বাষ্প হইয়া মেঘ হয়, মেঘ

হইয়া বর্ধিত হয়, তাহারা এখানে ব্রীহি, যব, ওষধি বনস্পতি তিল মাষ হইয়া উৎপন্ন হয় ; সেই ব্রীহি, যব, তিল মাষাদি অন্ন যে যে ভক্ষণ করে, সেই সেই স্ত্রীপুরুষ হইতে তাহারা এখানে জীব হইয়া জন্মগ্রহণ করে"— তখনই এই-সকল বাক্যকে অযোগ্য কল্পনা বলিয়া বোধ হইল। আবার যখন তাহাতে দেখিলাম, ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্মপরায়ণ ব্যক্তিদিগের মুক্তি নির্ব্বাণ-মুক্তি, তখন আমার আত্মা তাহাতে ভয় দর্শন করিল। "যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়। তথা বিদ্বান্ নামরূপাদ্-বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যং"। যেমন নদীসকল স্যন্দমান হইয়া নামরূপ পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রেতে লীন হয়, সেইপ্রকার ব্রহ্মজ্ঞব্যক্তি নামরূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরাৎপর পূর্ণপুরুষকে প্রাপ্ত হয়। ইহা তো মুক্তির লক্ষণ নহে, ইহা ভয়ানক প্রলয়ের লক্ষণ। কোথায় ব্রাহ্মধর্ম্মে আত্মার অনন্ত উন্নতি, আর কোথায় বেদান্তে তাহার এই নির্ব্বাণমুক্তি—পরস্পর অন্ধকার ও আলোকের ন্যায় বিভিন্ন। বেদান্তের এই নির্ব্বাণমুক্তি আমার আত্মাতে স্থান পাইল না। তথাপি একথা বলা বাহুল্য যে উপনিষদের যে-সকল বাক্যে যায় শোক, যায় তাপ, যায় হৃদয়ভার, তাহার যে-সকল বাক্যে আমাদের আত্মা 'তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং গুহাগ্রন্থিভ্যো বিমুক্তোঽমৃতো ভবতি' সেই-সকল মহাবাক্য অদ্যাপি বিশ্বস্ত বন্ধুর ন্যায় আমাকে সৎপথে অমৃতপথে লইয়া যাইতেছে। তাহারা কদাপি আমাকে প্রতারণা করে নাই। সেইসকল মহাবাক্যে আমার শ্রদ্ধা আরও দিন দিন গাঢ়তর হইতেছে। অদ্যাপি সময়ে সময়ে তাহার গূঢ় অর্থসকল আমার আলোচনাপথে আসিয়া মাতার ন্যায় আমাকে শান্তি প্রদান করিয়া থাকে। সেই সেই ভূরি ভূরি মহাবাক্য ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থে প্রথম খণ্ডে ষোড়শ অধ্যায়ে বিভক্ত হইয়া দীপ্তি পাইতেছে।

"আমি প্রথম যখন ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া যোগ দিলাম, তখন দেখিতাম—যাঁহারা নিয়মমত প্রতি বুধবারে সমাজে আসিতেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহই ব্রাহ্মসমাজের উপদেশ অনুসারে পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিতে উৎসুক ও উন্মুখ হইতেছেন না এবং তাঁহাদের মধ্যে কেহই প্রণালীমত প্রতিদিন ব্রহ্মোপাসনাও করেন না। আমি অনেক আলোচনা করিয়া তাঁহাদের নিমিত্তে ব্রাহ্মধর্ম্ম-ব্রত প্রতিষ্ঠা করিলাম। তদুদ্দেশে সেই ব্রতে কতকগুলি প্রতিজ্ঞার মধ্যে এই দুই প্রতিজ্ঞা নিবদ্ধ আছে যে, "পরব্রহ্ম জ্ঞান করিয়া সৃষ্ট কোন বস্তুর আরাধনা করিব না। এবং রোগ বা বিপদের দিবস ভিন্ন প্রতিদিবস শ্রদ্ধা ও প্রীতিপূর্ব্বক পরব্রহ্মে আত্মা সমাধান করিব।" কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতেছি যে, তাহাতে আমি আশার অনুযায়ী বড় কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। অতএব আপনারদের প্রদত্ত এই অভিনন্দনপত্র অতিশয় সঙ্কুচিত হইয়া গ্রহণ করিতেছি। যাঁহারা আমার প্রতি অনুকূল হইয়া এই অভিনন্দনপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাঁহারা যদি সকলেই আপনারদের কতিপয় অগ্রসর ব্রাহ্মদিগের দৃষ্টান্ত অনুযায়ী পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিতেন এবং প্রতিদিন পরব্রহ্মের উপাসনাতে নিযুক্ত থাকিতেন, তাহা হইলেই আমি এই অভিনন্দনপত্র হৃদয়ের আনন্দের সহিত গ্রহণ করিতে পারিতাম। এক্ষন আপনাদের উপর আমার এই অনুরোধ যে যাহাতে ব্রাহ্মেরা সকলেই পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়া আধ্যাত্মিক ভাবে দিনান্তে নিশান্তে ঈশ্বরের উপাসনা করেন, দিনে নিশীথে তাঁহার মহিমা গান করেন, এমন প্রকৃষ্ট উপায়-সকল নির্দ্ধারণ করিয়া কায়মনোবাক্যে তাহাতে যত্নশীল থাকুন। আমি যতদূর কৃতকার্য্য হই নাই, যদি দেখিতে পাই আপনারা সেই সূত্র অবলম্বন করিয়া আমার আশানুযায়ী কৃতকার্য্য হইতেছেন, তাহাতে যে আনন্দ

হইবে, তাহার সহিত অদ্যকার এই অভিনন্দনের উপমা হয় না। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ ভারতবর্ষের এক কোণ হইতে সম্প্রতি উঠিতেছে, পরে হয় তো ইহা নামানুযায়ী কার্য্য করিবে, হয়তো এতকাল যাহা হয় নাই, ইহা-দ্বারা তাহা হইবে—এক ঈশ্বরের উপাসনা ভারতবর্ষে ব্যাপ্ত হইবে ; সকলে একবাক্য হইয়া পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিবে ; এই দুইটি আমার কামনা। ঈশ্বর এই মঙ্গল অভিপ্রায় সম্পন্ন করিবার নিমিত্তে আপনাদের হৃদয়ে উৎসাহ বর্দ্ধন করুন এবং আপনাদের সকলের মঙ্গলবিধান করুন। তিনি আপনাদের ধর্ম্মভাব প্রদীপ্ত করুন। তাঁহারই দিকে সকলের লক্ষ্য হউক।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।”

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

ব্রাহ্ম সম্মিলন সভা।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিয়া কেশবচন্দ্রপ্রমুখ নব্য ব্রাহ্মদল নূতন ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিতে উদ্যোগী হইলেন। তাঁহারা একদিন এক বৃহৎ সভা করিয়া স্থির করিলেন যে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিতে হইবে। এ পর্য্যন্ত তাঁহারা উপযুক্ত স্থানাভাবে একত্রে বসিয়া উপাসনা করিতে পারিতেন না। একদিকে যেমন তাঁহারা নূতন ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন অন্যদিকে তেমনি তাঁহারা ভারতবর্ষের নানাস্থানে গমন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। কেশবচন্দ্র কয়েকজন যুবক প্রচারকসহ প্রচার করিতে করিতে পঞ্জাব পর্য্যন্ত গমন করিলেন এবং অনেক স্থানে বক্তৃতা ও উপদেশ প্রদান করিয়া শ্রোতাদিগকে মুগ্ধ করিয়া দীর্ঘকাল প্রচারের পর কলিকাতা প্রত্যাগমন করিলেন। যদিও মহর্ষির সহিত তাঁহাদের বাহিরের যোগ প্রায় একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল, তথাপি কেশবচন্দ্র মহর্ষিকে অনুরোধ করাতে তিনি একত্রে ব্রহ্মবিদ্যালয়ে উপদেশ প্রদান করিতে সম্মত হয়েন। তদনুসারে নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশিত হয়। "বিগত ২৩ বৈশাখ ১৭৮৯ শক রবিবার হইতে সংস্কৃত কলেজের দক্ষিণভাগে ট্রেনিং ইনষ্টিটিউসনের গৃহে কলিকাতা ব্রহ্মবিদ্যালয় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সময়ে সময়ে বাঙ্গলাতে এবং শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন নিয়মিতরূপে ইংরাজীতে উপদেশ দান করিবেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের তত্ত্ব

এবং নীতিবিষয়ে পরম্পরাক্রমে উপদেশ প্রদত্ত হইবে। অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার পর বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ হইয়া থাকে।"

কেশবচন্দ্র জ্বলন্ত উৎসাহের সহিত ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন বটে কিন্তু তাঁহার দলের মধ্যে কাহারও কাহারও মধ্যে অত্যন্ত নিরাশা আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই সময়ের মিরারে নিম্নলিখিত ভাবের লেখা বাহির হইতে লাগিল। "আমাদের বিশ্বাস কমিয়া আসিয়াছে। আমরা ভাবশূন্য হইয়া পড়িয়াছি, এবং যে সাংসারিকতা ও ঔদাসীন্যের আমরা এত নিন্দা করি, তাহাতেই আমরা নিমগ্ন হইতেছি। * * * যেখানে শান্তি নাই, সেখানে শান্তিঃ শান্তিঃ বলিয়া চীৎকার করা নিষ্ফল। আমাদের মনের বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদিগের দেশের যে আমরা কোন উপকার সাধন করিতে পারিব, তাহা অসম্ভব। আমরা এইরূপ অনুভব করিতেছি, এবং হৃদয়ের শূন্যতা বৃথা বাহ্যভাব-দ্বারা আচ্ছাদন করা অথবা উহার ঘোর মালিন্য বলপূর্ব্বক ভাবুকতা উদ্দীপন করিয়া তদ্বর্ণে অনুরঞ্জিত করা, নির্ব্বিঘ্ন মনে করি না। ইত্যাদি।" যখন এইরূপ নিরাশার অন্ধকারে মন আচ্ছন্ন, তখন কেশবচন্দ্র অত্যন্ত চিন্তাকুল হইলেন। তিনি এইভাব দূর করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার বন্ধুগণ ঈশ্বর দর্শন করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। তাঁহারা অনেক সময়ে ঈশ্বর-দর্শন-পিপাসু হইয়া একাকী নির্জ্জনে বাস করিতে লাগিলেন। "একদিন সকলে কেশবচন্দ্রকে ঈশ্বরদর্শনের বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন, ব্রহ্মদর্শন জন্য ধর্ম্মপিতা দেবেন্দ্রনাথ ঋষিআত্মা, তাঁহার নিকটে এ সম্বন্ধে সকলের উপদেশ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।" তৎপরে সকলকে লইয়া একদিন তিনি মহর্ষির নিকট গমন করিলেন। মহর্ষি তাঁহাদিগকে বলিলেন "ব্রহ্মদর্শন বিনা ব্রাহ্ম হয় না। তোমরা ব্রাহ্ম

হইয়া এখনও ব্রহ্মদর্শন কর নাই। আমরা দিবসে নিয়ত সূর্য্যালোকে বাস করিতেছি অথচ সূর্য্য যে আছে তাহা আমরা সর্ব্বদা মনে করি না, ইহা যেমন সত্য, তেমনি ইহাও সত্য যে আমরা নিয়ত ব্রহ্মদর্শন করিতেছি, অথচ তাঁহাকে যে দর্শন করিতেছি তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না।" এইরূপে তিনি যুবকদিগকে নানা-ভাবে ব্রহ্মসত্তার উপলব্ধিবিষয়ে অনেক উপদেশ প্রদান করিলেন। মহর্ষির নিকটে ব্রহ্মদর্শন এমন সহজ ও স্বাভাবিক হইয়াছিল যে তিনি বুঝিতে পারিতেন না কেমন করিয়া লোকে বলে যে তাহার ব্রহ্মদর্শন হয় নাই। একবার বহুদিন পূর্ব্বে প্রসন্নকুমার ঠাকুরকে ঈশ্বরদর্শন সম্বন্ধে এইরূপ কথা বলিয়া তাঁহাকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন, আর আজও তাঁহার এইরূপ স্বাভাবিক ও সহজ ব্রহ্মদর্শনের ভাব দেখিয়া কেশবচন্দ্র ও তাঁহার বন্ধুগণ বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন।

এই বৎসরে যুবকদল ইচ্ছা করিলেন, তাঁহারা ব্রহ্মোপাসনাতে মগ্ন হইয়া সমস্তদিন যাপন করিবেন এবং ব্রহ্ম-সহবাসে সত্য, পুণ্য ও প্রেমান্ন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবেন। যুবকেরা এই সময়ে ব্রাহ্ম-সমাজের উপাসনাতে সংকীর্ত্তন এবং মৃদঙ্গের ব্যবহার প্রচলন করিয়া সংকীর্ত্তনের মধুর আস্বাদন লাভ করিতেছিলেন। বাস্তবিকই ব্রাহ্ম-সমাজে সংকীর্ত্তনের প্রবর্ত্তন ব্রাহ্মদিগের পক্ষে এবং দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পক্ষে এক নবযুগের আরম্ভ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পূর্ব্বে দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ভাবিতেন অশিক্ষিত বৈষ্ণবগণ সংকীর্ত্তন করেন এবং মৃদঙ্গ করতালির ধ্বনির সহিত সংকীর্ত্তন করিয়া মত্ত হওয়া তাঁহাদেরই সাজে, কিন্তু নবযুগে নূতন আলোকপ্রাপ্ত শিক্ষিত ব্যক্তিগণ যে আবার এইপ্রকার সংকীর্ত্তনের ভাবে বিভোর হইয়া উন্মত্তের ন্যায় নৃত্যাদি করিবেন, ইহা তাঁহারা কল্পনাও করিতে পারেন

নাই। কিন্তু কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজে সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া এই মহাভ্রান্তি হইতে দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণকে উদ্ধার করিয়া তাঁহাদিগকে ভক্তিরসের মধুর আস্বাদন দিয়াছিলেন। প্রথমে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় 'পাপে মলিন মোরা চল চল ভাই' এই সংকীর্ত্তনটি রচনা করেন এবং তাহা গান করিয়া অনেক যুবকব্রাহ্মকে মোহিত করেন। ১৭৮৯ শকের ২০ আশ্বিন দিবসে ব্রাহ্মসমাজে প্রথম সংকীর্ত্তন আরম্ভ হয়। প্রথমে বিজয়কৃষ্ণ, পরে সাধু অঘোরনাথ, ক্রমে অন্যান্য যুবক গণও সংকীর্ত্তনের পক্ষপাতী হইয়া পড়িলেন। এই শকে ৯ই অগ্রহায়ণ দিবসে যুবকেরা একত্রিত হইয়া প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি প্রায় দশ-ঘটিকা পর্য্যন্ত ব্রহ্মোৎসবে অতিবাহিত করেন। রাত্রিতে মহর্ষি উপাসনার কার্য্য সম্পন্ন করেন। এই ব্রহ্মোৎসবে ব্রাহ্মেরা এক নূতন ভাব লাভ করিলেন।

যদিও এই সময়ে প্রাচীন ও নব্য ব্রাহ্মগণের মধ্যে মতগত পার্থক্য-নিবন্ধন তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন সমাজভুক্ত হইয়া আপন আপন মতানু-যায়ী কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন, তথাপি তাঁহারা ইহা বুঝিতে পারিলেন যে এই দুইদলের মধ্যে প্রীতি ও সদ্ভাব থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়। তজ্জন্য তাঁহারা ব্রাহ্মসম্মিলন সভা নাম দিয়া এক সমিতি স্থাপন করিলেন এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে প্রথম অধিবেশনে বক্তৃতা করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। মহর্ষি চিরকালই প্রীতির সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনে ঈশ্বরে প্রীতি ও মানবে প্রীতি এই দুই মহৎভাব চিরকাল বর্ত্তমান ছিল। তাঁহার ঈশ্বরোপাসনার অর্থ "তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ।" বলা বাহুল্য যে তিনি এই বিরোধে অত্যন্ত ব্যথা পাইয়াছিলেন। কিন্তু তজ্জন্য তিনি কোন দিনই তাঁহার উচ্চস্থান হইতে নিম্নে অবতরণ করিয়া সাধারণ মানবের

ন্যায় ক্রোধোন্মত্ত হইয়া প্রতিপক্ষের প্রতি বাক্যবাণ বর্ষণ করেন নাই জগতের ইতিহাসে এমন অনেক দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায় যে বিরোধস্থলে সাধুরাও আপনাদের মহৎভাব রক্ষা করিতে সমর্থ হয়েন নাই। কিন্তু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ আপনার দীর্ঘজীবনে কোন প্রকার লঘু-চিত্ততা কখন প্রদর্শন করিয়াছেন কি না সন্দেহ। বিশেষতঃ যে সময়ের কথা হইতেছে, সেই সময়ে সেই বিরোধের ভীষণ ঝটিকার সময়ে তিনি নিজের স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য অক্ষুণ্ণ ও অপ্রতিহত রাখিয়া আপনার ঋষিত্ব প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে যখন সকলের ইচ্ছা যে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে পুনরায় সদ্ভাব ও সম্মিলন স্থাপিত হয়, তখন মহর্ষি যে এই মহৎ কার্য্যে সম্পূর্ণ অন্তঃকরণের সহিত যোগদান করিবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। সুতরাং ব্রাহ্মদিগের ইচ্ছানুসারে তিনি সম্মিলন সভার প্রথম অধিবেশনে "ব্রাহ্মদিগের ঐক্যস্থান" সম্বন্ধে একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতাতে ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্ম-সমাজের লক্ষ্য এবং দেশের সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধবিষয়ে নিজের মত এমন সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে তাহা আমরা যথাযথ উদ্ধৃত করিলাম।

"ব্রাহ্মদিগের ঐক্যস্থান

ব্রাহ্মসম্মিলন সভার আরম্ভসূচক বক্তৃতা।

রবিবার। ১১ কার্ত্তিক ১৭৮৯ শক।

"ব্রাহ্মসম্মিলনসভা সংস্থাপন করিয়া আমার নিকটে ইহার সভ্যেরা প্রার্থনা করিয়াছেন যে অদ্য আমি এখানে প্রারম্ভ বক্তৃতা করি। অতএব এ সভার উদ্দেশ্য কি, কিসে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে সম্মিলন সমাধা হইতে পারে, সভ্যদিগের কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া যথাসাধ্য বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

"ব্রাহ্মসমাজের ও ব্রাহ্মধর্ম্মের যতটুকু উন্নতি হউক না কেন, তাহাতেই আমার আনন্দ। পূর্ব্বে যে সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম-ব্রত অবধারিত হইয়াছিল, তখন চারি পাঁচজন ব্রাহ্মকে একত্র দেখিলেই আমার হৃদয় আহ্লাদে পুলকিত হইত। অদ্য যখন এতগুলি ব্রাহ্মকে সম্মিলিত দেখিতেছি—আবার আমি যখন তাঁহাদিগকে আহ্বান করি নাই, যখন তাঁহারা আমাকে আহ্বান করিয়া ব্রাহ্মসম্মিলনের উপায় আমার নিকটে জানিতে ইচ্ছা করিয়াছেন—তখন আমি যে আহ্লাদিত হইব, তাহাতে আশ্চর্য্য কি ?

"এই সভার উদ্দেশ্য কি তাহা ইহার নামেতেই ব্যক্ত হইতেছে ; কিন্তু এই উদ্দেশ্য সফল হইবার যে-সকল উপায়, তাহা নিবৃত্ত রহিয়াছে। যে যে উপায় অবলম্বন করিলে ইহার উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে, সেই উপায়-বিষয়ক পরামর্শ দিতে উৎসুক হইতেছি। তোমাদের বিবেচনার জন্য তোমারদের আন্দোলন-পথে আনিবার জন্য আমি যাহা কিছু বলিতে উদ্যুক্ত হইয়াছি, হে প্রিয় ব্রাহ্মসকল! ইহার মধ্যে যেগুলি তোমাদের সঙ্গত বোধ হইবে, তদনুসারে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে ; যাহা সঙ্গত বোধ না হইবে তাহা পরিত্যাগ করিবে। বিগত-বিবাদ পরমেশ্বরের ধর্ম্ম লইয়া আবার বিবাদ কি ? আরো চেষ্টা করা উচিত যাহাতে বিবাদ বিনষ্ট হয়, যাহাতে ঐক্য স্থাপন হয়।

"ব্রাহ্মধর্ম্ম আমারদের সকলেরি অবলম্বন, ব্রহ্ম আমাদের মধ্যবিন্দু—আমরা সকলে তাঁহাকে পরিচারণা করিতেছি। ব্রাহ্মদিগের সম্মিলনস্থান, ঐক্যস্থল ব্রহ্ম, ব্রাহ্মদিগের ঐক্যস্থল ব্রহ্মোপাসনা—যে ব্রহ্মোপাসনা সকল শাস্ত্রে ব্যক্ত করিতেছে। সকল শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ব্রহ্মোপাসনা। সকলশাস্ত্রে মুক্তিলাভের জন্য ব্রহ্মোপাসনার উপদেশ করিতেছেন।

হিন্দুস্থানের সকল শাস্ত্রেই এই প্রতিপন্ন করে যে মুক্তিলাভ ব্রহ্মোপাসনাতে, পৌত্তলিকতা দুর্ব্বল বুদ্ধির নিমিত্তে। যে ব্রহ্মের উপাসনাকে সমুদায় শাস্ত্রে একমাত্র উপায় বলিয়া নির্দ্ধারণ করিতেছে, সেই ব্রহ্মের উপাসনার জন্য ব্রাহ্ম হইয়াছি। ব্রহ্মের উপাসনা এই সম্মিলন সভার প্রধান সম্মিলনের উপায়। যদি সম্মিলনসভার প্রত্যেক সভ্য ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া যথাবিধি নিয়মিতরূপে একমেবাদ্বিতীয়মের উপাসনা করেন, তাহা হইলে সম্মিলনের মধ্যবিন্দু প্রধান উপায়, তাঁহারা প্রাপ্ত হইতে পারেন। যে ব্রহ্মকে মধ্যবিন্দু করিয়া গ্রহতারা, নক্ষত্র চরাচর জগৎ সংসার সুশৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া ভ্রাম্যমান হইতেছে, আমরা কি সেই ব্রহ্মের চতুর্দ্দিকে এই কয়েকটি লোক মিলিয়া ভ্রাম্যমান হইতে পারি না? আত্মাকে লক্ষ্যস্থানে রাখিয়া সম্মিলনের যত্নকে সকলে সফল করিবার চেষ্টা কর। আমারদের হিন্দুস্থানে ব্রহ্ম অপরিচিত বস্তু নহেন। প্রথম কালাবধি এখনো পর্য্যন্ত সকলেই ব্রহ্মকে মানিয়া আসিতেছেন, ব্রহ্ম আমারদের পিতৃ-সম্পত্তি। সেই ব্রহ্মের উপাসনার জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম। ব্রাহ্মধর্ম্মের মধ্যবিন্দু ব্রহ্ম। সেই মধ্যবিন্দু পাইলে সম্মিলনের আর অভাব কি! অহরহ তাঁহার উপাসনা কর, আত্মাকে তাঁহাতে যুক্ত কর, দেখিবে সকলের সহিত যুক্ত হইবে—ব্রাহ্মসম্মিলনের এই বিধান। ঈশ্বরের উপাসনা ব্রাহ্মসম্মিলন সভার প্রত্যেক সভ্যের প্রতি বিধান হইল, পরিমিত বস্তু পুত্তলিকার উপাসনা তাঁহাদের প্রতি নিষেধ। ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্রতেতে প্রথম প্রতিজ্ঞা এই, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা ঐহিক-পারত্রিক মঙ্গলদাতা সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বব্যাপী নিরবয়ব একমাত্র অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের প্রতি প্রীতিদ্বারা এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনের দ্বারা তাঁহার উপাসনাতে নিযুক্ত থাকিব—এই বিধি। দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা এই, সর্ব্বশক্তি পরব্রহ্ম [illegible]

কোন বস্তুর আরাধনা করিব না—এই নিষেধ। সর্ব্বস্রষ্টা পরব্রহ্ম মনে করিয়া সৃষ্ট কোন বস্তুর আরাধনা করিব না, কেননা সৃষ্টবস্তু কখনই স্রষ্টা হইতে পারে না। পরিমিত বস্তু কখন অপরিমিত হইতে পারে না—আদ্যন্তবৎ বস্তু কখন অনাদ্যনন্ত হইতে পারে না। ইহারই জন্য সৃষ্ট কোন বস্তুকে ব্রহ্ম বলিয়া আরাধনা করিব না, এই নিষিদ্ধ বাক্যটি ব্রাহ্মধর্ম্মত্রয়ের উচ্চ উপদেশ। এই নিষেধবাক্য স্মরণ করিয়া রাখা এই সম্মিলনসভার প্রতি-সভ্যের কর্ত্তব্য। এখানে যে-সকল প্রিয় ব্রাহ্মেরা উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, এ বিশ্বাস কি কখন তাঁহাদের আছে যে ঈশ্বর স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার করেন? কখনই না। নিরাকার নির্ব্বিকার মহান্ সত্যস্বরূপ অনাদ্যনন্ত, তিনি কি ধর্ম্মোপদেশের জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া ক্ষুদ্রভাবে পরমসত্য প্রচার করিবেন? ইহা কখনই বিশ্বাসের যোগ্য নহে। আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্মে এই আছে, ঈশ্বর স্বয়ং ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক কিসের উদ্দেশ্যে? না সুনির্ম্মল শান্তির উদ্দেশে। কি প্রকারে? তিনি আমারদের অন্তরে থাকিয়া অন্তরতম প্রদেশে উপদেশ দেন—সূর্য্যপ্রকাশের ন্যায় শুভবুদ্ধি প্রদান করিয়া আমাদিগকে ধর্ম্মপথে রক্ষা করেন। পৌত্তলিকতার মূল বিশ্বাস এই, ঈশ্বর স্বয়ং পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্মপ্রচার করেন। সকল পৌত্তলিকতার এই মূল পত্তনভূমি। ব্রাহ্মধর্ম্ম পৌত্তলিকতা হইতে নিষ্কৃতি দিবার জন্য এই বলিতেছেন যে সর্ব্বস্রষ্টা পরব্রহ্মের অবতার মনে করিয়া সৃষ্ট বস্তুর আরাধনা করিবে না, আত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে কোন পুত্তলিকার ব্যবধান স্থাপন করিবে না। ব্রাহ্মধর্ম্মের এই নূতন সত্য। ভারতবর্ষে ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে প্রথম এই সত্য পাইয়াছি। ইহার পূর্ব্বে যদিও ঈশ্বরোপাসনার বিধান শাস্ত্রেতে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তথাপি এ নিষেধ-

বাংকা ভারতবর্ষের কোথাও শুনা যায় না। এ নূতন সত্য ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। ব্রহ্মোপাসনা ভিন্ন অন্য অন্য দেবতাদের উপাসনায় মুক্তি হয় না একথা সকল শাস্ত্রেই আছে ; কিন্তু একেবারে পরিমিত দেবতার উপাসনা পরিত্যাগ করিবার, পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিবার কথা কোন শাস্ত্রেই নাই। পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়া কেবল একমাত্র ঈশ্বরের উপাসনাতে প্রবৃত্ত থাকা ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রসাদে ভারতবর্ষের এ নূতন প্রণালী। পঞ্জাব দেশে যদিও একমেবাদ্বিতীয়মের পূজা প্রচলিত হইয়াছে, তথাপি সেখানে পৌত্তলিকতার নিষেধ নাই। শিখদিগের মধ্যে পৌত্তলিকতার সঙ্গে সঙ্গে এক ঈশ্বরের উপাসনার উপদেশ। শিখদিগের প্রধান দেবী নয়না দেবী। সেই নয়না দেবীর প্রসাদাৎ খড়্গ পাইয়া শিখ বীরেরা মুসলমানদিগকে পরাভূত করিয়াছিলেন। এখনো শিখেরা জগন্নাথক্ষেত্রে জগন্নাথের উপাসনা করে, কালীঘাটে আসিয়া কালীর পূজা করে। পঞ্জাবে শিখদিগের মধ্যেও যখন এ প্রকার পৌত্তলিকতার ভাব, তখন বিচিত্র কি যে নানককে তাহারা অবতার বলিয়া মানিবে এবং তাঁহার দৈবশক্তি কল্পনা করিবে। শিখদের মধ্যে এই প্রসিদ্ধ প্রবাদ আছে যে নানকের শিষ্যেরা নানকের মৃত্যুর একরাত্রি পরে তাঁহার মৃতদেহের আচ্ছাদন-বস্ত্র উঠাইয়া দেখিল যে শব নাই, তাহার স্থানে কেবল পুষ্পরাশি রহিয়াছে। পঞ্জাবে যাহাদের আদিগ্রন্থে বিশ্বাস, তাহারা নানককে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করে : দেখ ! পঞ্জাবে যদিও এক ঈশ্বরের উপাসনা, কিন্তু এ নিগূঢ় সত্যটি তাহারা মনে করিতে পারে নাই যে পরিমিত বস্তু কখন অপরিমিত হইতে পারে না, সৃষ্ট বস্তু কখন স্রষ্টা হইতে পারে না। অতএব পঞ্জাবে পৌত্তলিকতা-কলঙ্ক

তাহারা অদ্যাপি পৌত্তলিক রহিয়াছে। নানক তো মহাত্মা ছিলেন, পৌত্তলিকেরা তাঁহার প্রভাব দেখিয়া তাঁহাকে তো অবতার বলিবেই। কিন্তু এই ভারতবর্ষে গুরু হইলেই অবতার হয়। কবীর কবীর-পন্থী-দিগের অবতার, দাদু দাদুপন্থীদিগের অবতার, আবার এইক্ষণে দশহাজার কুকাপন্থীদিগের নিকটে রামসিংহ অবতার হইয়া বিরাজ করিতেছেন। এদেশে যিনি গুরু হন, তিনিই অবতার হইয়া উঠেন। অতএব সাবধান হইতে হইবে, অবতারভ্রমে পরব্রহ্ম জ্ঞান করিয়া কাষ্ঠ লোষ্ট্র মনুষ্য পশু কোন সৃষ্ট বস্তুর আরাধনা করিবে না। এই উপায় ব্রাহ্মদিগের সম্মিলনের দ্বিতীয় উপায়। ব্রাহ্মধর্ম্মের যে এই দুইটি মূলতত্ত্ব একমেবা-দ্বিতীয়ং সত্যস্বরূপের উপাসনা করা এবং পরব্রহ্ম জ্ঞান করিয়া সৃষ্ট বস্তুর উপাসনা না করা—তাহাই এই ব্রাহ্ম-সম্মিলন সভার প্রথম ও দ্বিতীয় উপায়। ইহা এদেশে কি ইউরোপে, আফ্রিকায় কি আমেরিকায়, সকল স্থানেই সমান। সকল পৃথিবীরই ব্রাহ্মধর্ম্মের এই মূলতত্ত্ব। কি মর্ত্ত্যবাসী কি দিব্যধামবাসী ধর্ম্মজীবী জীব মাত্রেই ব্রাহ্মধর্ম্মের অধিকারী; কিন্তু অদ্য যখন এই হিন্দুস্থানের আদিসমাজ-গৃহে ব্রাহ্ম-সম্মিলন-সভা সংস্থাপিত হইতেছে, তখন ইহার প্রকৃত ও বিশিষ্ট উপায় আর একটি নির্দ্দিষ্ট করিতে হইবে। যে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম পৃথিবীর এবং সমুদায় জগতের, সেই ব্রাহ্মধর্ম্মের সঙ্গে ভারতবর্ষের এই আদি ব্রাহ্মসমাজের ও হিন্দু জাতির কি সম্বন্ধ ব্রাহ্মসম্মিলন সভার এইটি প্রকৃত প্রস্তাব এদেশের ব্রাহ্মদিগের ব্রাহ্ম-সম্মিলনের তৃতীয় উপায়। ভারতবর্ষের আদিব্রাহ্মসমাজ যে ব্রাহ্মধর্ম্মকে হিন্দু-সমাজের মধ্যে আনিয়াছেন, ব্রাহ্ম-সম্মিলন-সভা হইতে তাহাকে প্রাণ-পণে সেই সমাজের মধ্যে রক্ষা করিতে হইবে। আপনাকে তো সজনে কি বিজনে সর্ব্বত্র উন্নত করা যাইতে পারে, কিন্তু আমাদের

প্রতিজ্ঞা সাধারণ হিন্দুসমাজকে উন্নত করিতে হইবে—সাধারণ হিন্দু-সমাজকে আমাদের পক্ষে ব্রাহ্মধর্ম্মের পত্তনভূমি করিতে হইবে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মকে হিন্দুসমাজের নেতা করিতে হইবে। এই কার্য্যটিই স্থির রাখিয়া ব্রাহ্মরা সকলে ঐক্য হইয়া কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিলে তবে আশা করিতে পারি যে, কালে এই প্রশস্ত ও বিচিত্র হিন্দুসমাজ উন্নত ব্রাহ্ম-সমাজে পরিণত হইবে। হিন্দুপ্রথা হিন্দু-রীতি ব্রাহ্মধর্ম্ম-দ্বারা পরিশুদ্ধ করিতে হইবে। হিন্দুসমাজের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন থাকিয়া যাহাতে হিন্দু রীতি নীতি ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুযায়ী হয়, চেষ্টা করিতে হইবে হিমালয় উন্নত মস্তকে যে-সকল পবিত্র তুষাররাশি ধারণ করে, তাহাতে কি সে কেবল আপনার শোভা ও পবিত্রতা সম্পাদন করে, না তাহাকে বিগলিত করিয়া হিন্দুস্থানের মঙ্গল সাধনের জন্য ভূমিতলে নদনদীরূপে সহস্রধারে নিঃস্যন্দিত করে? সেইরূপ ব্রাহ্মেরা যে ব্রাহ্মধর্ম্মকে আপনাদের শিরোভূষণ করিয়া পবিত্র হইয়াছেন, তাহা সকল হিন্দুসমাজে ওতপ্রোত করিয়া তাহার অশেষ কল্যাণ সাধনে প্রাণপণে যত্ন করুন।

"মহাত্মা রামমোহন রায় কি অভিপ্রায়ে এই ভারতবর্ষে এই ব্রাহ্ম-সমাজ সংস্থাপন করেন? ব্রাহ্মধর্ম্ম এই হিন্দুদিগের মধ্যে প্রচার করিবার জন্য? কি চীনদিগের জন্য? একমেবাদ্বিতীয়ং ঈশ্বরের উপা-সনা যাহাতে হিন্দুসমাজে প্রচারিত হয়, তিনি এই উদ্দেশে এই ব্রাহ্ম-সমাজ স্থাপন করিলেন এবং বিদ্যাবাগীশ ও ন্যায়রত্ন মহাশয়দিগকে আচার্য্যের কর্ম্মে নিয়োগ করিলেন। এই উদ্দেশেই তিনি ভাওজি শাস্ত্রীকে বেদ পাঠে নিযুক্ত করিলেন, এবং সুললিত বঙ্গভাষায়, ব্রাহ্ম-সঙ্গীত রচনা করিয়া স্বদেশীয় রাগ রাগিণী দ্বারা হিন্দুদিগের ভক্তিকে আকর্ষণ করিবার জন্য চেষ্টা করিলেন। হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মধর্ম্মভুক্ত করিবার জন্য

ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া ঈশ্বরের উপাসনাতে সকল দেশের সকল জাতির যোগ দিবার অধিকার আছে এই ইহার উদারতা ও মহত্ত্ব। ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতি প্রথমে সকল হিন্দুদিগের মনে একটি দ্বেষ ছিল; কিন্তু যখন তাঁহারা সমাজের প্রসন্ন ও পবিত্র ভাব প্রত্যক্ষ করিলেন, মৈথিলী ব্রাহ্মণের মুখ হইতে বেদ শ্রবণ করিলেন, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট হইতে উপনিষদের অর্থ ও মর্ম্ম অবগত হইলেন, বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের অপূর্ব্ব যুক্তিযুক্ত ব্যাখান-সকল মনে ধারণ করিলেন, তখনি তাঁহাদের হৃদয় ব্রাহ্মসমাজের অনুরাগে আকৃষ্ট হইল। হিন্দুসমাজের অনেকে ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা করিতে আসিতে লাগিলেন। দেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা, মৈথিলী ও মহারাষ্ট্রীয়েরা, দাক্ষিণাত্য দ্রাবিড়ী ও ত্রৈলঙ্গীয়েরা, পঞ্জাববাসী শিখেরা সকলেই এখানে আসিয়া আনন্দলাভ করিতেন। হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রবিষ্ট করা এই সমাজের প্রধান উদ্দেশ্য এবং হিন্দুসমাজে ইহা প্রবিষ্ট হইয়াছে বলিয়াই এই আদি-সমাজ রহিয়াছে এবং আশা হইতেছে যে ইহা এদেশে থাকিবে। আটত্রিশ বৎসরের মধ্যে দেখিতেছি, যেখানে ব্রহ্মোপাসনা হয়, সেখানে হিন্দুসন্তানদিগের মহাসমারোহ হইয়া থাকে। দেখিতেছি ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুসমাজের মধ্যে ভুক্ত হইতেছে। যেমন ব্রাহ্মধর্ম্মকে আত্মাতে আনিতে যত্ন করিতে হইবে, পরিবারের মধ্যে আনিতে যত্ন করিতে হইবে, তেমনি তাহাকে হিন্দুসমাজের মধ্যে আনিতে যত্ন করিতে হইবে। পূর্ব্বে ভারতবর্ষে ব্রহ্মের উপাসনা অরণ্যের মধ্যে ছিল, অরণ্য হইতে ব্রহ্মের উপাসনা আমারদের ব্রাহ্মধর্ম্মের আদেশে গৃহের মধ্যে নগরের মধ্যে সমাজের মধ্যে আনিতে হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্মের বিধানমত গৃহকর্ম্ম সমাধা করিতে হইবে। সমাজকে রক্ষা করিতে হইবে। যদি আমরা এই সংকল্প সিদ্ধ করিতে না পারি, তবে

ব্রাহ্মসম্মিলনের সংকল্প বৃথা হইবে। কিন্তু ইহাতে সময়ের অপেক্ষা করে; ইহাতে শান্তভাব চাই, ভূয়োদর্শন ও ধৈর্য্য চাই; যেহেতু ইহাতে কেবল আপনি উন্নত হইলে হইবে না, কিন্তু সকলকে সঙ্গে করিয়া লইতে হইবে। ক্ষিপ্রকারী হইয়া যদি সময়কে সঙ্কোচ করিতে যাও, সমাজে বিপ্লব উপস্থিত হইবে; বিপ্লবের অনেক দোষ। আপনার লক্ষ্য ঠিক্ রাখিয়া ক্রমে ক্রমে হিন্দুসমাজকে ব্রাহ্মধর্ম্মের উপযোগী করিতে হইবে। ব্রাহ্মদিগের যেমন শান্তভাবে উপাসনা করিতে হইবে, তেমনি শান্তভাবে গৃহকর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। এতদিন কেবল এই প্রকারেই হিন্দুসমাজের সহিত ব্রাহ্মসমাজ মিশ্রিত হইয়া আসিতেছে। অনন্তকাল ঈশ্বরের রাজ্য, অতএব অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া ঈশ্বরের প্রাকৃতিক ঘটনা-সকল অনুকরণ করিয়া ধীরে ধীরে আপনার লক্ষ্য সিদ্ধ করিতে থাক। যে-সকল বিষয়ে ঐক্যস্থাপন করা ব্রাহ্মধর্ম্মের উপযোগী নহে, সেই-সকল বিষয়কে ঐক্য বন্ধনের মূল করিতে গিয়া বৃথা বিবাদ বিসম্বাদকে বৃদ্ধি করা কেবলই অনর্থকর। সেই অনর্থক বিবাদের হেতু-সকল পরিত্যাগ করিয়া, এক ঈশ্বরের উপাসনাকে ঐকাস্থল করিয়া, যে-দেশের যে-প্রকার আচার ব্যবহার তাহা রক্ষা করিয়া, ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করিতে হইবে। দুই পরস্পর কঠিন ব্রত—পৌত্তলিকতা পরিহার করা এবং ব্রাহ্মসমাজকে হিন্দুসমাজে রক্ষা করা। দুয়ের সামঞ্জস্য কি? যদি আমারদের কলিকাতার অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করি, দেখিতে পাই যে পৌত্তলিকতার যে-সকল নিয়ম আছে, তাহা যদি কেহ পালন না করে, তাহারদিগের প্রতি কোন অত্যাচার হয় না। উপনয়নের পর সূর্য্যোপস্থান ও ত্রিসন্ধ্যা-বন্দনাদি না করিলে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব থাকে না; কিন্তু কয়জন সূর্য্যোপস্থান ও বেদ-বিহিত ত্রিসন্ধ্যার অনুষ্ঠান করি।

থাকে ? ব্রাহ্মেরা অকুতোভয়ে ঈশ্বরের উপাসনা করেন, হিন্দুরা তাঁহারদের প্রতি একটি বাক্যও নিঃসৃত করেন না, বরং তাঁহারদের শ্রদ্ধা দেখিয়া তাঁহারদিগকে প্রশংসা করেন। তাঁহারদের মুখে একথা কখন কখন শুনা যায় যে ইংরাজি পড়িয়াও বালকদিগের ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা লুপ্ত হয় নাই, ইহারা ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া থাকে। বিদ্যালয়ে না গেলে পিতা রুষ্ট হন, কিন্তু শিব-পূজা না করিলে পিতা রুষ্ট হন না। দেখ! দুর্গোৎসব মহাড়ম্বরে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে; কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহা পৌত্তলিকতার চরম সময়। যখন প্রদীপ নির্ব্বাণ হইবার সময় হয়, তখন একবার জ্বলিয়া উঠে, তার পরক্ষণে আর থাকে না; তেমনি উৎসব-আনন্দ থামিতে পারে কিন্তু দুর্গাপূজা আর থামিবে না। এই দুর্গোৎসবের সময় বৃদ্ধ পিতামাতাকে কত অত্যাচার সহ্য করিতে হয়। যিনি বাড়ীতে দুর্গা আনয়ন করেন, তিনি বাড়ীর স্বামী; কিন্তু উদ্ধত পুত্রেরা তাঁহার স্থান অধিকার করিয়া লয়। পিতার আলয়ে থাকিয়া পিতামাতার ভক্তি-বৃত্তির উপরে আঘাত করা কি বিনীত সৎপুত্রের কর্ত্তব্য? বৃদ্ধ পিতা বৃদ্ধ মাতার পবিত্র আরাধনা-স্থানে কেহ জুতা পায় দিয়া যান, কেহ দালানে গিয়া গণেশের শুঁড় ভাঙ্গিয়া ফেলেন। এরূপ করিলে কি ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় হইবে? ইহা করিলে গায় পড়িয়া অত্যাচার টানিয়া আনা হয়। ধর্ম্মের ভাব কখনই এরূপ নহে। যদি পৌত্তলিকতার সঙ্গে কোন সংস্রব না রাখ, যদি দুর্গাপূজাতে না যাও, নিমন্ত্রণে না খাও, তথাপি পিতা মাতার এমন সাহস থাকে না যে তাহার জন্য তাঁহার অনুরোধ করেন। বাড়ীতে পূজা হইলেও যিনি চান যে তাহাতে যোগ দিবেন না, তিনি অনায়াসে তাহার সংস্রব ত্যাগ করিয়া তাহাতে উদাসীন থাকিতে পারেন। ইহার পরিবর্ত্তে বাড়ীতে বৃদ্ধ পিতা মাতা যে ধর্ম্ম আচরণ করিতেছেন,

অশান্ত হইয়া তাহার প্রতি হন্তারক হওয়া কেন? আপনার ধর্ম্মকে প্রাণপণে রক্ষা করিতে হইবে, কিন্তু তাহা বলিয়া পূজনীয় পিতামাতার ধর্ম্মের প্রতি নিষ্ঠুর আঘাত করিতে হইবে না—ইহাই সর্ব্ববাদীসম্মত শিষ্টাচার। এইক্ষণে পরিবারের মধ্যে যাঁহারদের বৃদ্ধ পিতা মাতা আছেন, তাঁহারদের প্রতি যাঁহারা অত্যাচার না করেন, তাঁহারদিগকে কোন অত্যাচার সহ্য করিতে হয় না। ব্রাহ্মদিগের ব্রহ্মোপাসনার জন্য ইহা কতদূর পর্য্যন্ত সহজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু গৃহ কর্ম্মের অনুষ্ঠান এখনও এরূপ সহজ হয় নাই। তাহা বলিয়া এখন নিরুদ্যম থাকিতে হইবে না। পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়া অথচ হিন্দু-সমাজের যোগ রক্ষা করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠানে এইক্ষণে প্রবৃত্ত হইতেই হইবে। এমন সময় এখন উপস্থিত হইয়াছে, ইহাতে আর কালবিলম্ব সহ্য হয় না। সন্তান হইলে পৌত্তলিক মতে ষষ্ঠিপূজা হয়, তাহার স্থানে ব্রাহ্মধর্ম্মের মতে ব্রহ্মপূজা হয় ইহাতে হিন্দুসমাজের বড় আপত্তি নাই। ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া পুত্রের নামকরণ ও অন্ন-প্রাশন দিলেও হিন্দুসমাজের তত বিরক্তি নাই। ব্রাহ্মধর্ম্মের মতানুযায়ী উপনয়নের অনুষ্ঠানই হিন্দুসমাজের অতি বিরুদ্ধ। তথাপি উপবীত পরিত্যাগ হিন্দুসমাজের নূতন রীতি নহে। পূর্ব্বেও যখন যাঁহার ব্রহ্ম-জ্ঞান হইয়াছে তিনি জাত্যাভিমানশূন্য হইয়া ব্রাহ্মণের চিহ্ন পরিত্যাগ করিয়াছেন; তাহাতে হিন্দুসমাজে আরো নমস্য ও আদৃত হইয়াছেন। এক্ষণেও যাঁহারা শুদ্ধ-সত্ত্ব ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্ম হইয়া কেবল ধর্ম্মের অনুরোধে উপবীত পরিত্যাগ করিতে বাধিত হইতেছেন, তাঁহারাও হিন্দুসমাজে মান্য থাকিবেন; কিন্তু যথেচ্ছাচার করিলে তাঁহারা তাহাদের নিকট আরো হেয় হইবেন। পৌত্তলিক ভাগ পরিত্যাগ করিয়া প্রাচীন ব্যবস্থানুগত ব্রাহ্ম-বিবাহ-পদ্ধতি প্রচলিত করিলে তাহাতে হিন্দুসমাজের

বড় অমত হইতে পারে না। অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ায় হিন্দুধর্ম্মে দাহের বিধান, ব্রাহ্মধর্ম্মেও দাহের বিধান আছে, বরং পুরাণের মন্ত্র পরিত্যাগ করিয়া বেদের মন্ত্র তাহাতে যুক্ত করিয়া দেওয়াতে সাধারণের আরো মনঃপুত হইয়াছে। এখন শুনা হইয়াছে, কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বলিয়াছেন যে যদিও আর কোন অনুষ্ঠান ব্রাহ্মধর্ম্ম-মতে না হউক, আমার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া যেন ব্রাহ্মধর্ম্ম-মতে হয়। তেমনি শ্রাদ্ধের সময় পিণ্ডদানের পরিবর্ত্তে পিতামাতার আত্মার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করিয়া দেখিয়াছি যে কোন কোন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত সেই প্রার্থনা শুনিয়া অশ্রুপাত করিয়াছেন। ব্রাহ্মেরা এইপ্রকার দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারিলে অপৌত্তলিক ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান হিন্দুসমাজে ক্রমে যুক্ত হইতে পারিবে—তবে কেন তাহা হইতে বিমুক্ত হইব। আমি সংক্ষেপে গৃহকর্ম্মের বিবরণ বলিলাম, বিস্তার করিয়া বলিবার সময় নাই। অপৌত্তলিক ব্রাহ্মধর্ম্মকে হিন্দুসমাজে রক্ষা করিতে যত্ন করিয়া দেখ, ক্রমে অবশ্যই এ যত্ন সিদ্ধ হইবে, ব্রাহ্মধর্ম্মকে হিন্দুসমাজের মধ্যে ভুক্ত করিতে হইবে, হিন্দুসমাজে রক্ষা করিতে হইবে—এই ব্রাহ্মসম্মিলন সভার তৃতীয় উদ্দেশ্য। যে ধর্ম্ম প্রতি-ব্রাহ্মের হৃদয়ের ভূষণ, তাহাকে ক্রমে হিন্দু-সমাজের অধিপতি ও নেতা করিতে হইবে—ইহা ক্রমে হইবেই। কিন্তু পৌত্তলিকতা পরিহারের জন্য ব্রাহ্মধর্ম্মের দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা সর্ব্বদাই সকলের স্মরণ রাখিতে হইবে। ধর্ম্মের অনুরোধ প্রধান অনুরোধ—জাতির অনুরোধ আনুসঙ্গিক মাত্র। আত্মার উন্নতিই প্রধান লক্ষ্য, ইহাতে হিন্দুসমাজের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম রক্ষা করা যদি অসাধ্য হইয়া পড়ে, তবে যায় যাউক হিন্দুসমাজ। যাহা প্রত্যক্ষ অভাব, যে অভাব মোচন না করিলে ধর্ম্মভাবের হানি হয়, তাহাকে অতিক্রম করিতেই হইবে। যদি অপৌত্তলিক ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্রাহ্মদিগের মুক্তির হেতু হয়, তবে এই

অপৌত্তলিক ব্রাহ্মধর্ম্মের জন্য চিরদিন কাহারো দাসত্ব স্বীকার করাও তাহাদের মধ্যে শ্রেয়, তথাপি পৌত্তলিকতা অবলম্বন করা কোন প্রকারেই শ্রেয় নহে . আমাদের মাতৃভূমি হিন্দুস্থান প্রিয়তর, কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রিয়তম। যে ব্রাহ্মধর্ম্ম জানে, সে জানে ব্রাহ্ম যিনি, তিনি "প্রেয়ো পুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়োন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ"। তিনি পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, আর আর সকল হইতে প্রিয়। যদিও হিন্দুসমাজ প্রিয়তর, ব্রহ্ম আমাদের প্রিয়তম। সে অনুরোধ রক্ষা করিয়া যদি ব্রাহ্মসমাজকে প্রকৃত উদ্দেশে হিন্দুসমাজে আনিতে না পারেন, তবে আমি বলিতেছি যে সে চেষ্টা বিফল। কিন্তু এই অষ্টাত্রিংশৎ বৎসরের ভূয়োদর্শন দ্বারা ব্রাহ্মসমাজ যে হিন্দুসমাজে প্রবেশ হইতে পারে, তাহার গতি দেখিতেছি। যে হিন্দুসমাজ রামমোহন রায়ের নাম শুনিবামাত্র খড়্গহস্ত হইত, সেই হিন্দুসমাজের মধ্যে ব্রহ্মোপাসনা প্রচলিত হইয়াছে—ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠানে কেহ কেহ উৎসাহ দিতেছেন, কেহ কেহ অশ্রুপাত করিতেছেন। যখন হিন্দুসমাজ ব্রাহ্মসমাজে ক্রমে ক্রমে প্রবিষ্ট হইতেছে, তবে কি নিরাশার সময়? আরো অধিকরূপে চেষ্টা করিয়া দেখিতে হইবে, প্রিয়তর হিন্দুসমাজে প্রিয়তম ব্রাহ্মধর্ম্ম যাহাতে প্রবেশ করিতে পারে। কিন্তু হে প্রিয় ব্রাহ্মসকল! মনে করিও না যে ইহা অতি সহজ। ব্রাহ্মধর্ম্মকে হিন্দুসমাজে যদিও আনিতে পারা যায়, এমত আশা হইতেছে, কিন্তু ইহা অতি সহজ মনে করিও না। ইহার জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে—অকাতরে ধন দান করিতে হইবে। ক্লেশ অকাতরে সহ্য করিতে হইবে—পদে পদে অপমান স্বীকার করিতে হইবে—তবে ইহাকে হিন্দুসমাজে আনিতে পারিবে। কর্ত্তব্যজ্ঞান রক্ষা করিয়া উপযুক্তমত ত্যাগ স্বীকার করিলে ধর্ম্ম হইতে কদাপি বিচ্যুত হইবে না। কর্ণধারকে যেমন স্রোত

দেখিতে হয়, বায়ু দেখিতে হয়, নদীর গতি দেখিতে হয়. তবে সে যথা-স্থানে নৌকাটি লইয়া যাইতে সমর্থ হয় ; তেমনি সকল দিক্ প্রণিধান করিয়া কর্ম্ম করিলে তবে এই মহান্ লক্ষ্য সিদ্ধ হইবে। কালেতে অবশ্যই হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রবেশ করিবে।

যার জন্য আমার নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছিল—কি কি উপায় দ্বারা ব্রাহ্মসম্মিলন সফল হইতে পারে, তাহা যথাসাধ্য বলিলাম। আলোচনা করিয়া যদি তোমারদের বোধ হয়, এই সকল উপায় দ্বারা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে. তাহা হইলে তাহার সাধনে কখনই পরাঙ্মুখ হইও না—এই আমার অনুরোধ। এই তিন উপায়—প্রথম একমেবা দ্বিতীয়মের উপাসনা করা ; দ্বিতীয়, সর্ব্বস্রষ্টা পরব্রহ্ম জ্ঞান করিয়া সৃষ্ট কোন বস্তুর আরাধনা না করা ; তৃতীয়, অপৌত্তলিক ব্রাহ্মধর্ম্মকে হিন্দুসমাজে প্রবিষ্ট করা। কিন্তু ইহার মধ্যে উদার ভাবের আর এক কথা বলিতে অবশিষ্ট আছে—তাহা এই যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম পৃথিবীর ধর্ম্ম ; সুতরাং যে যে দেশের ব্রাহ্মধর্ম্ম হইবে, তাহা সেই সেই দেশের সমাজভুক্ত হইবে। ঈশ্বরের রাজ্যে বিচিত্র ভাব, এই বিচিত্রতাই ঈশ্বরের রাজ্যের অলঙ্কার, এই বিচিত্রতাকে কেহই উন্মূলন করিতে পারিবেন না। আপন আপন দেশীয় ভাবে প্রতি-দেশের লোককে ব্রাহ্মধর্ম্ম পালন করিতে হইবে। আমাদের আপনাদের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মকে আনিতে হইবে বলিয়া আমাদের পক্ষে ব্রাহ্মধর্ম্মকে হিন্দুসমাজের ধর্ম্ম করিতে হইবে। প্রতিজনকে, প্রতি-পরিবারকে, প্রতি-সমাজকে স্বাধীনতা দিয়া এক ঈশ্বরের উপাসনা প্রচার করিতে হইবে। যিনি যে পরিমাণে এই অপৌত্তলিক ব্রাহ্মধর্ম্ম দ্বারা দেশকে উন্নত করিতে উৎসাহী হইবেন, তিনিই সেই পরিমাণে সকলের শ্রদ্ধাভাজন হইবেন। হে ব্রাহ্মগণ! সম্মুখে নানাপ্রকার শুভকার্য্যের ক্ষেত্র প্রসারিত রহি-

য়াছে, ব্রাহ্মধর্ম্ম দ্বারা কর্ষণ করিয়া শুভফল উৎপন্ন কর—স্বীয় আত্মাকে উন্নত কর, পরিবারকে উন্নত কর, হিন্দুসমাজকে উন্নত কর। আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া, পরিবারকে পরিত্যাগ করিয়া, আপন স্বদেশ ও সমাজকে পরিত্যাগ করিয়া লোকের উদ্বেজনকারী হইও না। হে ঈশ্বর! তোমার ধর্ম্ম যাহাতে পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হয়, তোমার ধর্ম্ম যাহাতে হিন্দুসমাজে রক্ষিত হয়, তোমার ধর্ম্ম যাহাতে প্রত্যেক পরিবারের ধর্ম্ম হয়, তোমার ধর্ম্ম যাহাতে প্রতি আত্মাতে প্রবেশ করে, তুমি এপ্রকার প্রসাদ বিতরণ কর—প্রসন্ন হও। পরমেশ্বর! তুমি একমাত্র আমারদের গতি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।"

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে উপদেশ।

পূর্ব্ব পরিচ্ছদে প্রদত্ত বক্তৃতা চিন্তার সহিত পাঠ করিলে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রকৃতির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ব্রাহ্মধর্ম্ম ঈশ্বরের ধর্ম্ম, সুতরাং সমস্ত পৃথিবীতে এই ধর্ম্ম প্রচারিত হওয়া বাঞ্ছনীয়, কিন্তু তাই বলিয়া প্রত্যেক জাতি, সমাজ অথবা দেশে যে-সমস্ত বৈচিত্র্য বিদ্য-মান আছে, তাহা বিস্মৃত হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। এই-সমস্ত বৈচিত্র্য দূর করা কখনই সম্ভবপর নহে, কারণ প্রাকৃতিক নিয়মের সহিত সংগ্রাম করা এবং তাহাকে পরাস্ত করার কল্পনা বাতুল ভিন্ন কেহ করিতে পারে না। বৈচিত্র্য যখন জগতের নিয়ম, তখন এই বৈচিত্র্যকে রক্ষা করিয়া যাহাতে অপৌত্তলিক ব্রাহ্মধর্ম্ম সকল সমাজের মধ্যে এবং সকল জাতির মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে, তাহার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। একপ্রকার উদ্দাম চিন্তাহীন সংস্কারের চেষ্টা আছে, যাহা স্থান কাল ও অবস্থার কথা চিন্তা করে না। আপনার ক্ষুদ্র বিচারশক্তি ও অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া সমাজের মধ্যে কোনপ্রকার পরিবর্ত্তন আনয়নের চেষ্টা করা বাতুলতামাত্র। বহুশতাব্দীর সঞ্চিত জ্ঞান, কার্য্যপ্রণালী, অভিজ্ঞতা. আচার ব্যবহার ইত্যাদি উপেক্ষা করিয়া কেবল শুভ কামনার বশবর্ত্তী হইয়া যিনি কার্য্য করিতে অগ্রসর হয়েন, তাঁহার হৃদয়ের প্রশংসা করিতে পারা যায়, কিন্তু তাঁহার কার্য্যের প্রশংসা কিছুতেই করা যাইতে পারে না। কোন সমাজকে কুসংস্কারে আচ্ছন্ন বলিয়া প্রমাণ করিয়া তাহার বিরুদ্ধে যুক্তির শাণিত তরবারি

প্রয়োগ করিয়া সেই সমাজকে বিনষ্ট করা সহজ হইলেও হইতে পারে, কিন্তু তাহার স্থানে ভ্রান্তিশূন্য ও সুসংস্কারপূর্ণ সমাজ গঠন করা অত্যন্ত কঠিন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ইহা জানিতেন এবং সেইজন্যই তখনকার যুবক ব্রাহ্মদিগের সকল কার্য্য অনুমোদন না করিয়া তাঁহাদিগের হইতে দূরে থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এপ্রকার রক্ষণশীলতা ও সাবধানতা অবলম্বন করা প্রত্যেক সংস্কারকের কর্ত্তব্য। মানবসমাজে সংস্কার ও রক্ষণশীলতা উভয়েরই স্থান আছে। হিন্দুসমাজকে সংস্কার করিতে হইবে, ইহা মহর্ষি দৃষ্টান্ত ও উপদেশ দ্বারা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাই বলিয়া সময়কে যে অগ্রাহ্য করিয়া চলিতে হইবে, ইহা তিনি স্বীকার করেন নাই। প্রধানতঃ এই স্থানেই তাঁহার ও যুবক ব্রাহ্মদিগের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। যাহা হউক তিনি ঐক্য সম্বন্ধে উক্তরূপ পরামর্শ প্রদান করিয়া আপন কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই সময়ে যুবক ব্রাহ্মদল উৎসাহের সহিত নানাপ্রকারে ব্রাহ্মসমাজের সেবাতে আপনাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। অন্যান্য কার্য্যের মধ্যে ব্রাহ্মবিবাহ যাহাতে আইন-সঙ্গত হয়, তাহার জন্য আলোচনা চলিতে লাগিল; তাঁহারা এই শকে (১৭৮৯) ৪ঠা কার্ত্তিক রবিবারে এক সভা আহ্বান করেন, তাহাতে অন্যান্য প্রস্তাবের সহিত বিবাহ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত দুইটি প্রস্তাব উপস্থিত করা হইয়াছিল। প্রথম, রাজনিয়ম সম্বন্ধে ব্রাহ্মবিবাহের অবৈধতা নিরাকরণের উপায় অবধারণ। দ্বিতীয়, ব্রাহ্মবিবাহ-সকল লিপিবদ্ধ করিবার ভার কোন বিশেষ ব্যক্তির প্রতি অর্পণ। এই সভাতে শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রস্তাব করেন এবং শ্রীযুক্ত যদুনাথ চক্রবর্ত্তী পোষকতা করিলেন "হিন্দুবিবাহ সম্বন্ধে যে-সকল নিয়ম প্রচলিত আছে তাহা ব্রাহ্মবিবাহে বর্ত্তিতে পারে কি না? যদি না পারে তবে ব্রাহ্মবিবাহ বিধিবদ্ধ করিবার

উৎকৃষ্ট উপায় অবধারণ করিবার ভার নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের প্রতি অর্পিত হয়।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
,, কেশবচন্দ্র সেন
,, ব্রজসুন্দর মিত্র
শ্রীযুক্ত রামশঙ্কর সেন
,, দুর্গামোহন দাস
,, গুরুপ্রসাদ সেন
শ্রীযুক্ত দীননাথ সেন।"

এই বিবাহ সম্বন্ধে যে-সমস্ত আলোচনা হইয়াছিল, তাহা এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করার কোন আবশ্যকতা নাই, কিন্তু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের এ সম্বন্ধে অভিমত আমরা যথাস্থানে প্রকাশ করিব।

১৭৮৯ শক ২৩ শে আষাঢ় দিবসে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পঞ্চম পুত্র শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত কলিকাতানিবাসী শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়া কন্যার যথাবিধি ব্রাহ্মধর্ম্মের পদ্ধতি অনুসারে শুভবিবাহ সমারোহপূর্ব্বক সম্পন্ন হইয়াছিল। বিবাহ-সভায় বহুসংখ্যক ব্রাহ্ম এবং এতদ্দেশীয় প্রধান প্রধান অধ্যাপক ব্রাহ্মণসকল উপস্থিত ছিলেন। এখানে ইহা দ্রষ্টব্য যে দেবেন্দ্রনাথ যে-সমস্ত অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন সে-সমস্ত অনুষ্ঠান অপৌত্তলিক হইলেও তাহাতে এদেশের অনেক সম্ভ্রান্ত অধ্যাপক ও পণ্ডিতমণ্ডলী উপস্থিত থাকিতেন এবং আনন্দের সহিত তাহাতে যোগদান করিতেন। ইহা হইতে পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে যে হিন্দুসমাজের মধ্যে যাহাতে এই অপৌত্তলিক ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রবেশলাভ করিয়া ইহাকে সুসংস্কৃত করিয়া হিন্দুজাতিকে উন্নত করিতে পারে, সেই দিকে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। ব্রাহ্মধর্ম্ম সমস্ত পৃথিবীর ধর্ম্ম হইবে, ইহাতে তাঁহার কোন সন্দেহ ছিল না, এইজন্য ইংরাজী ভাষাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশ করিয়া যাহাতে সমস্ত পৃথিবীতে এই ধর্ম্ম প্রচারিত হয়,

তাহার ব্যবস্থা করিতেন। কিন্তু বিশেষভাবে যাহাতে এই অবনত, অধঃপতিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দুজাতিকে এই মহান্ ও উদার ধর্ম্ম সভ্য ও উন্নত করিতে পারে, সেই দিকে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। সেই জন্যই তিনি হিন্দু আচার ও ব্যবহার যথাসম্ভব রক্ষা করিয়া ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম-মতে সমস্ত অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করিতেন। ইহাতে প্রাচীন সমাজের সহিত যোগরক্ষা করিয়া ধীরে ধীরে ইহাকে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে সাহায্য করিতেন। যুবকদলের সহিত তাঁহার এইস্থানে পার্থক্য ছিল এবং এইজন্যই তিনি তাঁহাদের সহিত মিলিয়া কার্য্য করিতে পারিলেন না। সংস্কারকদিগের নিকট চিরকালই এই প্রশ্ন বোধ হয় অমীমাংসিত থাকিবে!

কেশবচন্দ্র ক্রমে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাতে উপাসনাদির কার্য্য সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। যদিও তিনি প্রাচীন আদিসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেন, তথাপি মহর্ষির সহিত তাহার যোগ অক্ষুণ্ণই ছিল। মধ্যে মধ্যে যাহাতে মহর্ষি ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে আসিয়া উপাসনা করেন ও উপদেশ প্রদান করেন, তাহার জন্য তিনি বড় ব্যাকুল হইলেন। তাঁহার অনুরোধে ও একান্ত আগ্রহে একবার মহর্ষি এই মন্দিরে উপাসনা করিতে স্বীকৃত হইলেন। সেই দিন ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির লোকে লোকারণ্য হইল। ১৭৯২ শক ১০ ই মাঘে তিনি বেদী গ্রহণ করিয়া উপাসনান্তে উপদেশ প্রদান করেন। এই উপদেশ শ্রবণ করিয়া নব্যদল তাঁহার প্রতি অতি বিরক্ত ও ক্রোধান্ধ হয়েন। এইপ্রকার শ্রুত হওয়া যায় যে কেহ কেহ এমন অধীর হইয়াছিলেন যে শীঘ্র শীঘ্র মন্দির হইতে তিনি চলিয়া না গেলে তাঁহারা প্রহার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। এই উপদেশের পর

উঠিল। নব্যদল মহর্ষির উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া অযথা তাঁহার উপর নানাপ্রকার কটূক্তি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কাগজে, বক্তৃতাতে তাঁহার উপর আক্রমণ আরম্ভ হইল। যে উপদেশ লইয়া এই-সমস্ত ব্যাপার চলিয়াছিল, তাহা যথাযথরূপ আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। পাঠকেরা মনোযোগের সহিত তাহা পাঠ করিলে তাঁহাদের এইপ্রকার অসহিষ্ণুতা ও নিন্দাবাদের অসারতা বুঝিতে পারিবেন।

উপদেশ।

"প্রেমসূর্য্যো যদি ভাতি ক্ষণমেকং হৃদয়ে সকলং হস্ততলং যাতি মোহান্ধতমঃ প্রেমরবেরভ্যুদয়ে ভাতি তত্ত্বং বিমলং।"

প্রেমসূর্য্য যদি আমাদের হৃদয়ে ক্ষণকালের নিমিত্ত অভ্যুদিত হয়, তবে আমাদের সকল কামনা সিদ্ধ হয়, আমরা সকল ফললাভ করি। আমাদের কামনার পর্য্যবসান কি? ঈশ্বরকে লাভ করা। যখন ঈশ্বরকে আমরা লাভ করি আমরা সমুদায় কামনার বিষয় লাভ করি, তাঁহাকে পাইয়া কিছুরই অভাব থাকে না। তাঁরই মুখদর্শনে—তাঁরই চরণসেবাতে আমাদের আনন্দের উপর আনন্দ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। সেই পরমপুরুষ শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ প্রেমময়—আনন্দময় আমাদের সমুদায় কামনার পর্য্যাপ্তি। আমরা ইহলোকের সুখও চাহি না, পরলোকেরও ভোগ চাহি না, তাঁহাকেই চাহি, যাঁহাকে পাইলে সকল কামনার পর্য্যাপ্তি হয়। তিনি আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই রহিয়াছেন, তিনি আমারদের অন্তরে। "প্রজাপতিশ্চরতি গর্ভে" যখন আমরা গর্ভের মধ্যে ছিলাম, প্রজাপতি সেই গর্ভের মধ্যেই আমাদের সঙ্গে ছিলেন। প্রজাপতি গর্ভের মধ্যে আমাদের অঙ্গসৌষ্ঠব বিধান করিলেন; ভাবীকালের প্রয়োজনীয় ইন্দ্রিয়সকল তাহাতে যোজনা করিলেন। তিনি যেমন

গর্ভের মধ্যে থাকিয়া আমাদিগকে শরীর দিয়াছেন, সেই গর্ভের মধ্যেই মনের সূত্রপাত করিয়াছেন, সেইরূপ আত্মাকেও সৃজন করিয়াছেন। যখন ভূমিষ্ঠ হইলাম, তখনও তিনি আমাদের সঙ্গে আছেন, যৌবনকালেও তিনি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন। তিনি যদি চিরকালই সঙ্গে সঙ্গে, তবে তাঁহাকে দেখিতে পাই না কেন? মোহ-আবরণ আসিয়া আমাদের হইতে তাঁহাকে প্রচ্ছন্ন করিয়া দেয়। পৃথিবীর যত ক্ষুদ্রভাব, তাহাই মোহজালের উপকরণ; সেই-সকল দ্বারাই মোহজাল অনুস্যূত হইয়া থাকে। পৃথিবীর ক্ষুদ্রভাব যে মোহ, তাহা আমাদের চক্ষু হইতে পরমেশ্বরকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। সূর্য্য কি তেজঃপুঞ্জ পদার্থ; ক্ষুদ্র মেঘেও তাহা আচ্ছন্ন হয়। কোথায় একটু ঘনীভূত বাষ্প, আর কোথায় প্রতাপান্বিত সূর্য্য; তথাপি সেই ক্ষুদ্র মেঘ জাজ্বল্যমান সূর্য্যকে আচ্ছন্ন করে। আমরা যখন মোহে আচ্ছন্ন হইয়া তাঁহাকে দেখিতে পাই না, তখন আপনার আপনার ক্ষুদ্রভাব দ্বারাই চলিত হই; ঈশ্বরের ইচ্ছা তখন আর আমাদের নেতা হয় না। কিন্তু যখন প্রেমসূর্য্য হৃদয়ে বিকশিত হয়, তখন আমাদের সমুদায় ক্ষুদ্রকামনা দগ্ধ হইয়া যায়, হৃদয়গ্রন্থিসকল ভগ্ন হইয়া যায়। যখন ঈশ্বরের মহানভাব আসিয়া হৃদয়ের ক্ষুদ্রভাব-সকলকে তিরোহিত করিয়া দেয়, তখন "কো মোহঃ কঃ শোকঃ" কি মোহ কি শোক। প্রেম ও মঙ্গলে কেমন সংযোগ; যেখানে প্রেম, সেইখানেই মঙ্গল; যেখানে প্রণয়, সেইখানেই, সাধুভাব উত্থিত হয়। ঈশ্বর প্রেমময়, প্রেম হইতেই মঙ্গলের উৎপত্তি, প্রেম হইতেই সৃষ্টি হইয়াছে, প্রেমেতেই সৃষ্টি রক্ষা পাইতেছে; প্রেম উঠাইয়া লও, সকলই বিষাদ; জীবনের আর স্বাদ থাকে না, বাঁচিতে

অনন্তকাল আমরা সেই প্রেমে জীবনধারণের আশা করিতেছি। সেই প্রেমবন্ধন শিথিল করিও না। আমাদের প্রতি তাঁহার যে প্রেম, তাহা ভুলিও না। তাঁর সেই প্রেম নিস্তব্ধ বৃক্ষের প্রত্র হইতে নিঃসৃত হইতেছে। বালকেরা সেই প্রেমে নিজানন্দে স্ফূর্ত্তি পাইতেছে। সেই প্রেমময়ের আনন্দে সকলই ক্রীড়া করিতেছে। "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে" সেই প্রেমানন্দ হইতেই এই ভূত-সকল উৎপন্ন হইয়াছে; "আনন্দেন জাতানি জীবন্তি" সেই প্রেমানন্দেতেই জীব-সকল জীবিত রহিয়াছে। সেই ঈশ্বর-প্রেমকে আদর্শ কর। আদর্শকে কখনই ন্যূন করিও না। সেই পূর্ণাদর্শ—সেই পূর্ণ প্রেমের আদর্শ যেন তোমাদের আদর্শ হয়। ক্ষুদ্র আদর্শে আমাদের কোন কাজ হইবে না। সেই প্রেমের ভাব দেখ, সে প্রেম কাহাকেও অবজ্ঞা করে না, সে প্রেম কাহাকেও ঘৃণা করে না, সে প্রেম কাহাকেও ত্যাগ করে না, সে প্রেম নিরবচ্ছিন্ন মঙ্গলের জন্যই সংসারের কার্য্য করিতেছে। যেমন সূর্য্য-কিরণ পৃথিবীর মঙ্গলের জন্যে সকলকে আলোক দিতেছে, সকল বীজকে অঙ্কুরিত করিতেছে, সেইপ্রকার ঈশ্বরের প্রেম পৃথিবীকে উন্নতির পথে কল্যাণের পথে অহরহ লইয়া যাইতেছে। তাঁর প্রেমের উপমা পৃথিবীতে কোথায় দিব? তাঁর মঙ্গল ভাবের উপমা কোথায় পাওয়া যায়? শিশুসন্তান ভূমিপৃষ্ঠে শয়ান আছে, একটি কালসর্প তাহার দিকে যাইতেছে দেখিয়া তাহার মাতা দৌড়িয়া আসিয়া তাহার ব্যবধান হইল। সর্প সেই শিশুকে পরিত্যাগ করিয়া মাতাকে দংশন করিল, সেই মুমূর্ষু কালেও আহ্লাদের সহিত বলিতে লাগিল যে, আহা! আমার বৎস ত বাঁচিল, আমি মরিলামই বা। মাতৃ-স্নেহের সঙ্গে ঈশ্বরের মঙ্গলভাবের এই ক্ষুদ্র উপমা পাওয়া যায়। যখন মাতা আপনাকে ভুলিয়া গেল, তখন পুত্রকে বাঁচাইতে

পারিল ! ঈশ্বর যিনি, তিনি সকলের কেবল মঙ্গলই করিতেছেন। তিনি নিরপেক্ষ হইয়া সাধারণরূপে বিশেষরূপে সকলেরই মঙ্গলসাধন করিতেছেন। জগৎসংসারের কেবল উন্নতিই তিনি চান। সকলে তাঁর পথে যাউক, ধর্ম্মেতে উন্নত হউক, শান্তিলাভ করুক, ইহাতেই তাঁর আনন্দ। তাঁর যা-কিছু সকলই জগতের জন্য, আপনার জন্য কিছুই নাই। তিনি সকলের প্রাণস্বরূপ। সেই প্রাণস্বরূপ পরমেশ্বর ব্রাহ্মধর্ম্মকে রক্ষা করিতেছেন, আবার ব্রাহ্মধর্ম্ম সেই প্রাণস্বরূপ পরমেশ্বরেরই উপদেশ দিতেছেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা জাগ্রত জীবন্ত দেবতা। তিনি সীমাবিশিষ্ট পুত্তলিকা নন। তিনি প্রাণস্বরূপ, তিনি অমৃত। এই ১১ মাঘের উৎসব কিসের জন্য ? ইহারই জন্যে যে এই দিবসে আমরা সকলপ্রকার পরিমিত দেবতার উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া সেই অনন্ত ঈশ্বরের উপাসনায় যোগ দিতে আরম্ভ করিয়াছি। ১১ মাঘ ইহারই জন্য স্মরণীয়, ১১ মাঘ ইহারই জন্য বরণীয় যে সকলপ্রকার পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আনন্দস্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনাতে প্রবৃত্ত হইলাম। আকাশ হইতেও যাঁহার গুরুভাব, সেই অপরিমিত অনন্ত ঈশ্বরের উপাসনার জন্য ১১ মাঘ পবিত্র হইয়াছে। সেই শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ পরমেশ্বরের উপাসনাতেই এই দিনের উৎসব, নতুবা ১১ মাঘের উৎসবে কিসের প্রয়োজন। এ কেমন মনোহর দৃশ্য, এমন মনোহর দৃশ্য আর কোথায় ? কেমন সকলে ব্যগ্র হইয়া পবিত্র হইয়া তাঁহার উপাসনা করিতেছেন। এই ১১ মাঘের পবিত্রতা, এই ১১ মাঘের মহিমা। এখানে কোন পুতুল স্থান পায় না, এখানে কেবল ঈশ্বরের আবির্ভাব, তাঁরই উপাসনার জন্য দেখ সকলে কেমন স্তব্ধ ভাবে অবস্থান করিতেছেন, শান্তভাবে তাঁর উপাসনাতে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন ; একি মনোহর দৃশ্য। ধন্য কেশবচন্দ্রকে যে তিনি এই-সমুদয়

সাধুমণ্ডলী একত্রিত করিয়া ঈশ্বরের মহিমা কীর্ত্তনের জন্য আমাদিগকে অবসর দিয়াছেন। সমুদ্র ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য তাঁহাকে বাধা দিতে পারে নাই। পর্ব্বত তাঁহাকে বাধা দিতে পারে নাই। পৃথিবীময় ব্রাহ্মধর্ম্ম ঘোষণা করা তাঁহার ব্রত। তাঁহার যেমন উৎসাহ, তেমনি উদ্যম। যাহা তিনি কল্যাণ মনে করেন তাহাই তিনি অনুষ্ঠানে পরিণত করেন। দূরদেশ তাঁহার নিকট দুর নয়। ধন্য কেশবচন্দ্রকে যে তিনি প্রণয়সূত্রে এত সাধুলোককে বদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাকে আমি এই অনুনয়পূর্ব্বক বলিতেছি যে তিনি ইহার সঙ্গে সঙ্গে খৃষ্টকে না আনেন, এশিয়া ইউরোপের মধ্যবর্ত্তী খৃষ্টকে না করেন। আত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে খৃষ্ট ব্যবধান না হয়। আমরা কতপ্রকার অবতার অতিক্রম করিয়া ১১ মাঘে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করিয়াছি; অতএব আমরা কোন প্রকার অবতারের নামগন্ধও সহ্য করিতে পারি না। অবতারেরা ক্রমে ক্রমে হৃদয় মন সকলই কাড়িয়া লয়। অতএব সাবধান হইতে হইবে। যদিচ ব্রহ্মমন্দিরের মধ্যে কোন পুত্তলিকা আক্রমণ করিতে পারে নাই. তথাপি তাহার বাহিরে খৃষ্ট-বিভীষিকা সকলকে ভয় প্রদর্শন করিতেছে, কত ব্রাহ্ম এখানে আসিতে পারিত, যদি খৃষ্ট-বিভীষিকা না থাকিত। কোন-প্রকার ভয় না থাকে, কোনপ্রকার উত্তেজনা না থাকে, এইপ্রকারে ব্রাহ্মধর্ম্মের পথ পরিষ্কৃত করিতে হইবে। তাঁর বক্তৃতায়, তাঁর একাগ্র-তায় সকলই সম্ভব পায়। ব্রাহ্মধর্ম্মের মধ্যে খৃষ্টের ছায়া আসিতেছে, এইজন্য আমাদের হৃদয় দুঃখে প্লাবিত হইতেছে। আমরা চাই কেবল ঈশ্বরকে, তাঁর ত্রিসীমায় যেন কোন অবতার দণ্ডায়মান না থাকে। ব্রাহ্মধর্ম্ম—স্বাধীনধর্ম্ম; স্বাধীনতা রক্ষা না করিলে ব্রাহ্মধর্ম্মের জীবন হইবে না। খ্রীষ্ট যেখানে, সেখান হইতে স্বাধীনতা পলায়ন করে। খৃষ্টের

নামেতে বিগতবিবাদ ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতেও বিদ্বেষানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে, সাম্প্রদায়িকভাব সমুত্থিত হইয়াছে। দেখ পূর্ব্বভাব মনে করিয়া দেখ, যখন একমাত্র ব্রহ্মই সকল ব্রাহ্মের মধ্যবিন্দু হইয়াছিলেন, তার ইতস্ততঃ কোন পুত্তলিকার নামও ছিল না, তখন কেমন সকল ব্রাহ্মেরা একস্বরে একহৃদয়ে স্কন্ধে স্কন্ধে মিলিত হইয়া ব্রহ্মনাম ঘোষণা করিতেন; খ্রীষ্টনাম আসিবামাত্র কি যে বিদ্বেষানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, কেহই জানেনা যে, তাহা কি প্রকারে নির্ব্বাণ হইবে। খ্রীষ্টনাম সমুদায় ইউরোপকে রক্তপ্লাবনে প্লাবিত করিয়াছে; সেই খ্রীষ্টনাম আবার এখানে প্রচলিত হইলে বঙ্গভূমির দুর্ব্বল সন্তানগণের অস্থিচর্ম্ম চূর্ণ করিয়া ফেলিবে। খৃষ্টধর্ম্মের মধ্যে পুরাতন ধর্ম্ম পোপের ধর্ম্ম, বহুরক্তপ্লাবনের পর প্রটেষ্ট্যাণ্ট ধর্ম্ম তাহা হইতে মুক্ত হইল। কিন্তু যতটুকু তাহাদের খ্রীষ্টের সঙ্গে যোগ, ততটুকু তাহাদের পরাধীনতা রহিয়াছে। ধর্ম্মবিষয়ে আজ পর্য্যন্ত ইউরোপে কোন দেশ সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয় নাই। যেখানে খৃষ্টের নাম গিয়াছে, সেইখানেই বিদ্বেষানল প্রজ্বলিত হইয়াছে। আমরা ধর্ম্মের নামে বিদ্বেষানল সহ্য করিতে পারি না। এইজন্য কেশবচন্দ্রকে অনুনয় করিয়া বলিতেছি যে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে খ্রীষ্টের নাম ঘোষণা না করেন। যে ব্রাহ্মধর্ম্মের নিকটে তেত্রিশকোটি দেবতা পরাভূত হইয়াছে, সে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা কেবল এক ঈশ্বর।"

এই উপদেশের পর অধিকাংশ যুবক ব্রাহ্ম উত্তেজিত হইয়া পড়িলেন। কাহারও কাহারও ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিয়াছিল। তাঁহাদের এত উত্তেজনা বা ধৈর্য্যচ্যুতির কারণ আমরা বুঝিতে পারি না। মহর্ষির উপরে সকলে এমন বিরক্ত হইলেন যে শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় প্রমুখ ৬২ জন ব্রাহ্ম স্বাক্ষর করিয়া এক প্রতিবাদপত্র তাঁহার

নিকটে প্রেরণ করেন, তাহাতে মহর্ষির প্রতি অযথা দোষারোপ করা হইয়াছে। পাঠকদিগের অবগতির জন্য আমরা তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"প্রতিবাদপত্র।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
প্রধান আচার্য্য মহাশয় সমীপেষু।

"শ্রদ্ধাস্পদেষু,

"অদ্য প্রাতঃকালে আপনি ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে যে বক্তৃতা করিয়াছেন তন্মধ্যে খৃষ্ট ও খৃষ্টসম্প্রদায় সম্বন্ধে যে কয়েকটি কথা বলা হইয়াছিল তাহা উক্ত মন্দিরের মূল নিয়মবিরুদ্ধ, সুতরাং উহা প্রতিবাদ করা আমাদিগের পক্ষে নিতান্ত কর্ত্তব্য। সে নিয়ম এই—

"এখানে যে উপাসনা হইবে তাহাতে কোন সৃষ্ট জীব বা পদার্থ যাহা সম্প্রদায়-বিশেষে পূজিত হইয়াছে বা হইবে তাহার প্রতি বিদ্রূপ বা অবমাননা করা হইবে না। কোন সম্প্রদায়কে নিন্দা উপহাস বা বিদ্বেষ করা হইবে না।"

"আপনি যে জ্ঞাতসারে এই নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করিবেন ইহা আমরা কখন মনে করি নাই; বিশেষতঃ উৎসবের দিনে এরূপ ব্যবহার করাতে আমাদের হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির
১০ই মাঘ ১৭৯২ শক

} শ্রীগৌরগোবিন্দ রায়
(প্রভৃতি ৬২ জনের স্বাক্ষর)"

মহর্ষি যে "জ্ঞাতসারে" তাঁহাদের ট্রষ্টডিড-লিখিত নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন, একথা তাঁহাদের লেখা ভাল কি মন্দ হইয়াছে পাঠকেরা তাহা বিচার করিবেন। বিশেষতঃ তিনি যেপ্রকার শান্তিপ্রিয়

ও নির্বিবাদী ব্যক্তি ছিলেন, তাহা আমরা তাঁহার জীবনে দেখিয়াছি। এপ্রকার ব্যক্তি কেবল নিজের মতের জন্য জানিয়া শুনিয়া যুবকদলের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের একটি প্রধান মূল নিয়মকেঅবমাননা করিয়াছেন, ইহা মনে করা আর মহর্ষিকে তাঁহার উচ্চাসন হইতে টানিয়া আনিয়া সাধারণ মানুষের শ্রেণীতে বসাইয়া দেওয়া, একই কথা। দ্বিতীয়তঃ মহর্ষি যৌবনকালে কোন খৃষ্টানবিশেষের ব্যবহারে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া তাঁহাদের বিরুদ্ধে কলিকাতার মধ্যে ভীষণ আন্দোলন উত্তোলন করিয়াছিলেন। সে কথা আমরা ইতঃপূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। তাহার দ্বারা ইহা প্রমাণ হয় না যে তিনি খৃষ্টান ধর্ম্মকে বা খৃষ্টকে "বিদ্রূপ বা অপমাননা" করিবার জন্য ঐ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার উপদেশের মধ্যে যে খৃষ্টধর্ম্মের উল্লেখ আছে, তাহা ঐ ধর্ম্মকে আক্রমণ করিবার অভিপ্রায়ে তিনি বলেন নাই। অথবা "খৃষ্ট-বিভীষিকা" ঐ অর্থে ব্যবহার করেন নাই। একথা পরিষ্কার-রূপে বুঝিতে হইলে তখনকার যুবক ব্রাহ্মদিগের কার্য্যপ্রণালী আলোচনা করিতে হয়। কেশবচন্দ্র যখন আদিব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসেন, তখন হইতে তাঁহারা যে-সমস্ত কার্য্য করিয়াছিলেন, ব্রহ্মনিষ্ঠ, শান্তমতি, যোগযুক্ত মহর্ষি তাহার মধ্যে কোন কোন কার্য্য অনুমোদন করিতে পারেন নাই, বরং তিনি মনে করিতেন এই-সকল কার্য্যের দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম মলিন হইয়া পড়িবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা দুই একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। যখন কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে মৃদঙ্গ ও করতালির সহিত সংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তন করেন, তখন তাঁহাদের মধ্যে একটি ভাবোচ্ছ্বাস দৃষ্ট হয়। ইহা ক্রমে ক্রমে এতদূর গিয়া পড়িল যে ব্রাহ্মেরা কেহ কেহ তাহার

করিয়া ক্রন্দন এবং চরণের ধূলি লইয়া মস্তকে ধারণ ইত্যাদি ব্যাপার যখন চলিতে লাগিল তখন কোন কোন ব্রাহ্ম "নরপূজা" নাম দিয়া পত্রিকাদিতে ইহার প্রতিবাদ করেন। এই সময়ে মুঙ্গেরে যে ব্যাপার ঘটিয়াছিল, তাহার কথঞ্চিৎ আমরা "আচার্য্য কেশবচন্দ্র" হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। "তাঁহাকে (কেশবচন্দ্রকে) দেখিবামাত্র ভক্তগণ তাঁহাকে আবেষ্টন করিলেন, প্রকাশ্য হুড়াহুড়ি উপস্থিত, কে আগে গিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া পদধারণ করিতে পারে এই জন্য ইহারা ব্যস্ত। * * * * কেশবচন্দ্রকে বেড়িয়া কীর্ত্তনের রোল উঠিল। মৃদুমন্দপদে ভক্তগণ বাজারস্থ উপাসনাগৃহের দিকে চলিলেন। যেখানে যেখানে দাঁড়াইয়া সংকীর্ত্তন হইতে লাগিল, সেখানে কেশব-চন্দ্রের পায়ে পড়িবার জন্য হুড়াহুড়ি। * * * পা লইয়া কাড়াকাড়ির খেলা যেন মুঙ্গেরের একটা নিত্যকৃত্য হইয়া উঠিয়াছিল। সে ব্যাপার যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই অবাক্ হইয়াছেন। এই-সকল ধারাবাহিক ব্যাপার দেখিয়া কাহারও মনে যদি চৈতন্যের দ্বিতীয় অবতরণ মনে হইয়া থাকে, সে আর একটা আশ্চর্য্য কথা কি?"

কেশবচন্দ্র যেমন একদিকে এইরূপ ভাবোন্মত্ততার প্রশ্রয় দিলেন, অন্যদিকে তেমনি আবার যীশু সম্বন্ধে নানাপ্রকার বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। তাহাতেও কাহারও কাহারও মনে ভীতির সঞ্চার হইল। বলা বাহুল্য যে যখনই এইরূপে ব্রাহ্মধর্ম্মের ভাব মলিন হইবার আশঙ্কা হইয়াছে, তখনই আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজের বিশুদ্ধমতকে রক্ষা করিবার চেষ্টা হইয়াছে। ১৭৯২ শকের কার্ত্তিক মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে "যীশুখৃষ্ট ও পাক্ষিক সংবাদ" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে "আমাদের প্রচারক শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন যে খৃষ্টকে লইয়া ঘুরিতেছেন, তাহা

আধ্যাত্মিকার খৃষ্টও নহে, ইতিহাসের খৃষ্টও নহে ; প্রচলিত খৃষ্টীয় ধর্ম্মের উন্মূলক তাঁহার মানসিক খৃষ্ট। তদ্দ্বারাও ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশুদ্ধতা বিনষ্ট হইতেছে। ইহা কেশবচন্দ্র বুঝিতে পারিতেছেন না দেখিয়া আমরা অত্যন্ত দুঃখিত আছি। আদি ব্রাহ্মসমাজ যে সর্ব্বপ্রকার খৃষ্টকেই গ্রহণ করিতে নিষেধ করেন, তাহা কিছুমাত্র অনুচিত নয়, প্রত্যুত অসত্যের সম্পূর্ণ বিপক্ষ ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে তাহা সমুচিত বলিয়াই প্রতীয়মান হয়।"

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে উক্তপ্রকার লেখা যে অকারণ ও অমূলক হয় নাই, তাহার প্রমাণস্বরূপ আমরা সেই সময়ের যুবকব্রাহ্মদিগের কার্য্যাবলীর কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিতেছি। কোন কোন ব্রাহ্ম নব উৎসাহে উন্মত্ত হইয়া খ্রীষ্টকে ত্রাণকর্ত্তা, পাপীর গতি প্রভৃতি বলিতেও কুণ্ঠিত হয়েন নাই। এ সম্বন্ধে মহর্ষি. কেশবচন্দ্রকে পত্র লিখিয়াছিলেন "যথার্থ আধ্যাত্মিক ও মুমূর্ষু ব্রাহ্মেরা খ্রীষ্টকে পাপীর গতি বলিয়া উপাসনা করে তাহা ফ্রেণ্ড্ অব্ ইণ্ডিয়ার সম্পাদকের নিকট সপ্রমাণ করিবার নিমিত্তে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ হইতে শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার দুইটি অব্রাহ্মিক সঙ্গীত যত্নপূর্ব্বক অনুবাদ করিয়া পাঠাইয়াছেন।" সেই দুইটি সঙ্গীত এই ঃ—

(১) CHRISTMAS DAY 1868. A poor man is near his end O (Jesu) Without thy mercy I see no way.— This life which people with (even much) devotion attain, I waste in sin ; O thou moon of righteousness, bring and give me forgiveness seaing (that I am) helpless. O thou art the immaculate incarnation of holiness, behold the wretched condition of this blackened sinner.

In the torment of threefold misery my being is consumed. Thy feet are like the hundred-petalled lily, place them on the heart of this vile man. With thy touch O Lord, the leprosy of sin shall leave me. O (Jesu) thy compassion is excited in the sinner's sorrow. I speak to thee therefore the sorrows of my heart. For the sake of thy love thou didst give thy life, and saved the world. The wounds of a hundred weapons were upon thy person, without any offence thy blood was shed. * * * * * * * *

(২) O thou moon of righteousness ! with clasped hands I call thee. Wilt thou vouchsafe unto me thy manifestation ? Lord ! in sin my body consumes, I hold the lilies of thy feet. My fortune is not good, and so I fear, lest the vices and sorrows of this awful sinner should cause pain to those feet. "Jesu is the sinner's friend," so say all men, therefore I call thee O Lord ! I am a very great sinner, where shall I go but to thee ? Bring, O bring unto me the water of forgiveness that I may bathe, and be soothed. Loosen the bonds of my unrighteousness and take me to the Father's house.

১৭৮৮ শকে কেশবচন্দ্র "যীশুখৃষ্ট, ইউরোপ এবং এসিয়া" নামক যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির মনে এই আশঙ্কা হইয়াছিল তিনি শীঘ্র খৃষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন। বিলাতের কয়েকজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ইহা পাঠ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন। কারণ সেই বক্তৃতাতে তাঁহারা জানিলেন কেশবচন্দ্রের খৃষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে আর বেশী বিলম্ব নাই। কেশব

চন্দ্র যখন ইহা বুঝিতে পারিলেন, তখন পর বৎসর "মহাপুরুষ" নামে এক বক্তৃতা প্রদান করেন। তাহাতে পূর্ব্বের আশঙ্কা কিঞ্চিৎ পরিমাণে দূর হইল বটে কিন্তু একেবারে গেল না। পাঠকদিগকে এই দুইটি প্রধান বক্তৃতা পাঠ করিতে অনুরোধ করি। এই-সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া আদি ব্রাহ্মসমাজ উপরোক্ত প্রবন্ধ পত্রিকাতে প্রকাশ করেন। যদিও মহর্ষি এই সময়ে প্রাচীন হিন্দুপ্রথা অনুসারে আদি-ব্রাহ্মসমাজের কাজ কর্ম্ম কতিপয় কর্ম্মচারীর হস্তে ন্যস্ত করিয়া পর্ব্বতে, প্রান্তরে, নদীগর্ভে ভ্রমণ করিয়া আপনার প্রিয়তম দেবতার সহিত গভীররূপে যুক্ত হইতেছিলেন, তথাপি মধ্যে মধ্যে যখন তিনি কলিকাতাতে ফিরিয়া আসিতেন, তখন এই-সমস্ত সংবাদ লইতেন। বিশেষতঃ যে ব্রাহ্মসমাজের সেবাতে তিনি আজীবন আপনার অর্থ, সামর্থ্য নিয়োগ করিয়াছিলেন, তাহার কাজ কর্ম্ম সম্বন্ধে অতি আগ্রহের সহিত তিনি সংবাদ লইতেন। যখন তিনি কেশবচন্দ্র ও তাঁহার শিষ্যদিগের মধ্যে এইরূপ খৃষ্টান ভাব এবং বৈষ্ণব ভাবোন্মত্ততা দেখিলেন, তখন তাঁহার পক্ষে ব্রাহ্মসমাজের ভবিষ্যৎ চিন্তা না করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। বিশেষতঃ ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের দ্বারে উপস্থিত হইয়া যখন দেখিলেন যে মন্দিরের চূড়া অধিক পরিমাণে খৃষ্টান গির্জ্জার অনুকরণে নির্ম্মিত হইয়াছে, তখন তাঁহার মনে স্বাভাবিক ভাবে নব্যদলের তদানীন্তন খৃষ্টান ভাবের কথা জাগ্রত হইল। সুতরাং তাঁহার উপদেশের মধ্যে আমরা "খৃষ্ট-বিভীষিকা" শব্দ প্রাপ্ত হই। "খৃষ্ট-বিভীষিকা" শব্দ খৃষ্টের প্রতি অশ্রদ্ধা বা খৃষ্টানদিগের ধর্ম্মের প্রতি আক্রমণ প্রকাশ করে না, কিন্তু ঈশ্বর ও মানবাত্মার মধ্যে খৃষ্ট অবতাররূপে স্থান প্রাপ্ত হইবার আশঙ্কা ও উদ্বেগ প্রকাশ করে। মহর্ষির ধর্ম্ম যাহা, তাহা ঈশ্বর ও মানবাত্মার মধ্যে কোন ব্যবধান স্বীকার করিতে পারে না। তাঁহার ধর্ম্ম প্রকৃতই

ব্রাহ্মধর্ম্ম। সুতরাং এই ব্রাহ্মধর্ম্ম কোন প্রকারে মলিন হয়, ইহা তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। সেইজন্যই তিনি ঐ প্রকার উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু নব্যদল তাঁহার মহৎ অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া উপরোক্ত প্রতিবাদপত্র প্রেরণ করেন। মহর্ষি এই পত্রের যে প্রত্যুত্তর প্রদান করেন, তাহা আমরা নিম্নে প্রকাশ করিতেছি। ইহাতে তাঁহার উদ্দেশ্য আরও পরিষ্কাররূপে আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব।

"প্রত্যুত্তর-পত্র।

"স্নেহাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু গৌরগোবিন্দ রায়

প্রভৃতি সমীপেষু।

"স্নেহাস্পদেষু,—

"তোমাদের ১০ই মাঘ তারিখের পত্র কল্য পাইয়াছি। তোমাদের পত্রে উল্লিখিত মূল নিয়ম আমি অবগত ছিলাম না।

"এবং কোন সম্প্রদায়বিশেষের প্রতি অবমাননা কি উপহাস করা আমার অভিপ্রায় ছিল না। যাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের নির্ম্মল ভাবের সহিত অন্য কোন পৌত্তলিক কি সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের ভাব আসিয়া মিশ্রিত না হয় এবং তাহার উচ্চ আদর্শের মধ্যে অন্য কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের পরিমিত আদর্শ আসিয়া না পড়ে, তাহাই আমার একান্ত বাসনা। আমার মনের সেই ভাব তোমাদিগকে বুঝাইয়া দিবার নিমিত্ত এবং যাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে খ্রীষ্টের নাম প্রচার হইয়া না পড়ে তাহাই তোমাদিগকে উপদেশ দেওয়া তোমাদিগের হিত মনে করিয়াছিলাম। আমার সেই উপদেশে যে তোমাদিগের ক্ষোভ জন্মিয়াছে তাহাতে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম।

১৫ই মাঘ
১৭৯২ শক।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ।

যোড়াসাঁকো।"

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়

ভ্রমণ ও কয়েকটি পত্র।

এই ঘটনার দুই এক মাস পরে মহর্ষি কাশ্মীর ভ্রমণের জন্য বহির্গত হয়েন। কাশ্মীর যাইবার পথে তিনি যাহা দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত দেবতার বিচিত্র মহিমাসাগরে মগ্ন হইয়া আত্মা কৃতার্থ হয়। মহর্ষি যে-সমস্ত স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, তাহার সমস্ত বৃত্তান্ত তিনি লিখিয়া রাখেন নাই। লেখাও অসম্ভব। কিন্তু যাহা রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা অতি অপূর্ব্ব। তাঁহার ভাষা যেমন প্রাঞ্জল ও গম্ভীর, ভাবও তেমনি প্রাণস্পর্শী। এই-সমস্ত ভ্রমণবৃত্তান্ত তাঁহার জীবনচরিতে প্রকাশিত হওয়া উচিত, কিন্তু গ্রন্থের আয়তন বৃদ্ধির আশঙ্কা করিয়া আমরা দুঃখের সহিত তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতে বাধ্য হইলাম। বিধাতার যদি ইচ্ছা হয় তাহা হইলে এক সময়ে এই-সমস্ত ভ্রমণকাহিনী প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। তাহাতে বঙ্গভাষা পরিপুষ্ট হইবে, ভাবুকগণ ভাবরসে নিমজ্জিত হইয়া অতুল আনন্দ লাভ করিবেন এবং ভক্তগণ অদ্ভুতকর্ম্মা, লীলারসময় ব্রহ্মের মহিমার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইবেন। মহর্ষি কাশ্মীর হইতে প্রত্যাগমন করিয়া আপনার জামাতা শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়কে সঙ্গে লইয়া চীন ভ্রমণে বহির্গত হয়েন। চীন হইতে ফিরিয়া আসিয়া কিছু দিন কখন কলিকাতা, কখন বোলপুর শান্তিনিকেতন, কখন দার্জ্জিলিং, কখন বা বিন্ধ্যগিরির জনশূন্য বক্ষে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে কয়েক বৎসরের জন্য ভাগীরথীতীরে চুঁচুড়াতে বাস করেন। এই সময়ে তিনি প্রায় সকলপ্রকার কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া-

ছিলেন। বৈষয়িক কার্য্যের ভার কর্ম্মচারীদের উপর ন্যস্ত করিয়া এবং ব্রাহ্মসমাজের ভার আপনার উপযুক্ত পুত্রদিগের উপর এবং শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয়, শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অযোধ্যা-নাথ পাকড়াসী প্রভৃতির উপর অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্তমনে একান্তে ব্রহ্মে সমাহিতচিত্ত হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। সুতরাং এই সময় হইতে তাঁহার বাহিরের কার্য্য, প্রায় শেষ হইয়া আসিতেছিল দীর্ঘজীবন কর্ম্মযজ্ঞে আহুতি দিয়া এক্ষণে দিবাবসানে ভগবানে যোজিতচিত্ত হইয়া বাস করিতেন বলিয়া আর আমরা তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিতে পারি নাই। ১৮০১ শকে শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রীর সহিত তাঁহার মিলন হয়। এই মিলন এ জীবনে ভঙ্গ হয় নাই। মহর্ষি তাঁহার গুরু ছিলেন, সুতরাং শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় সর্ব্বদা বাস করিতেন। তাঁহার লিখিত আত্মজীবনীর পরিশিষ্টে পাঠক মহর্ষিদেবের কিছু কিছু কার্য্যের পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন। ১৭৯২ শক হইতে তাঁহার শেষজীবন পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনাবলীর পরিচয় দিতে আমরা অক্ষম। তবে সমাজসংক্রান্ত দুই একটি কার্য্যের উল্লেখ করিয়া এবং মহর্ষির চরিত্র ও জীবনের কয়েকটি বিশেষ ভাবের উল্লেখ করিয়া আমাদিগকে গ্রন্থ সমাপ্ত করিতে হইবে।

১৮০১ শকের অগ্রহায়ণ মাসে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ নৌকাযোগে ভ্রমণ করিতে করিতে সাহেবগঞ্জে উপস্থিত হয়েন। সেখানে প্রিয়-নাথ শাস্ত্রী মহাশয় বিষয়কর্ম্মোপলক্ষে বাস করিতেন। মহর্ষির সহিত তাঁহার এই স্থানে পরিচয় হয়। প্রথম আলাপে মহর্ষি তাঁহার প্রতি এমনি আকৃষ্ট হয়েন যে চিরদিন তাঁহাকে আপনার প্রিয় শিষ্য ও সহচর করিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রিয়নাথ শাস্ত্রীমহাশয়, মহর্ষি আদেশে

বিষয়কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতা চলিয়া আসেন এবং তৎপরে বোলপুর শান্তিনিকেতনে গমন করেন। সেখানে মহর্ষি নিজে তাঁহাকে উপনিষদাদি শাস্ত্র ও ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার শিক্ষা ও সঙ্গগুণে শাস্ত্রীমহাশয় প্রভূত উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহর্ষি তাঁহার সংসার প্রতিপালনের জন্য যথেষ্ট বৃত্তি প্রদান করিয়া চিরদিন তাঁহাকে আপনার সঙ্গে সঙ্গে রাখিয়াছিলেন। এ জন্য মহর্ষির শেষ জীবনের বৃত্তান্ত আমরা তাঁহার পুস্তক হইতে যাহা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাই লিপিবদ্ধ করিলাম।

"মহর্ষি শান্তিনিকেতনে কিছুদিন বাস করিয়া ফরাসডাঙ্গায় গঙ্গাতীরে কিছুদিন যাপন করেন তৎপরে গ্রীষ্মকাল উপস্থিত হইলে দার্জ্জিলিং গমন করেন। দার্জ্জিলিং হইতে মসুরী পর্ব্বতাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে মুঙ্গের ব্রাহ্মসমাজে একটি উপদেশ প্রদান করেন। ১৮০২ শকের প্রারম্ভে মহর্ষি মুসুরী পর্ব্বতে আরোহণ করেন। কেদার-নারায়ণ পর্ব্বতের ধবল চূড়া যাহার পূর্ব্বোত্তর দিকে আকাশের চক্ষুর ন্যায় ফুটিয়া আছে, যাহার পশ্চিম ও উত্তর পার্শ্বে শ্যামল শিখরশ্রেণী গগন ভেদ করিয়া তির্য্যকভাবে অহঙ্কারে দণ্ডায়মান এবং যাহার অতলস্পর্শ নিম্ন কন্দরে নদী, নির্ঝরিণী অদৃষ্ট, সেই পর্ব্বতশিখরে একখানি গৃহ। তাহার নাম প্রায়ুরী। ইহার প্রশস্ত প্রাঙ্গণে একটি দেবদারু বৃক্ষ। অতি নির্জ্জন, তাপস-মনোরঞ্জন আশ্রমের উপযুক্তই এই স্থান। এই মনানুকূল স্থানে তিনি ব্রহ্মে আত্মার সমাধান করিয়া চারিবৎসর বাস করিয়াছিলেন।" জীবনের প্রথম বয়সে তিনি হিমালয়ে দুই বৎসর-কাল সাধনভজনে অতিবাহিত করিয়াছিলেন এবং সিদ্ধিলাভ করিয়া ভগবানের নাম ও মহিমা প্রচার করিবার জন্য কলিকাতা প্রত্যাগমন করেন। এক্ষণে প্রৌঢ় বয়সে পুনরায় তাঁহার আত্মার চির আনন্দ-

ধাম পরমব্রহ্মে চিত্ত সমাধান করিয়া জীবনলীলা সমাপন করিবেন, এই সঙ্কল্প হৃদয়ে ধারণ করিয়া হিমালয়ে বাস করিতে আরম্ভ করেন। এই সময়ে তিনি কি ভাবে দিনাতিপাত করিতেন তাহার একটু আভাস প্রাপ্ত হইলে পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কোন্ রাজ্যের প্রজা ছিলেন। "তিনি নিশীথ সময়ে নিদ্রা হইতে উঠিয়া শয্যাতে বসিয়া আরাধনা করিতেন। নিদ্রিত আছি, তাঁহার কণ্ঠবিনিঃসৃত হাফেজের সময়োচিত ও ভাবোচিত বএদ কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে যাইয়া আমার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া দিত। মহর্ষি ঐ যে জাগিতেন, আর শয়ন করিতেন না। ভোরে এরূপ স্থানে যাইয়া বাহিরে বসিতেন, যেখান হইতে সূর্য্যের উদয় নিরীক্ষণ করা যায়। কি প্রকারে উষার শুভ্র আলোক ধীরে ধীরে পৃথিবীতে আগমন করিল, কি প্রকারে ব্রহ্মমুহূর্ত্তে রক্তিমবর্ণে সূর্য্য পৃথিবীর বৃক্ষ, লতা, পর্ব্বত ভেদ করিয়া মুক্ত আকাশে দেখা দিল, ইহা দেখিবার জন্য প্রতিদিন তিনি অপেক্ষা করিতেন। হিমালয়ের প্রচণ্ড শীতে বস্ত্র মুড়ি দিয়া বসিয়া চুপে চুপে সেই প্রাতঃসূর্য্য হইতে অমৃত অপহরণ করিতেন। তদনন্তর দৈনিক উপাসনা ব্রাহ্মধর্ম্মের উপাসনাপ্রণালী অনুসারে সম্পন্ন করিতেন। এসময়ে গায়ত্রীমন্ত্র অনেকবার সাধন করিতেন। তৎপরে দুগ্ধপান করিয়া প্রকৃতির মনোহর নির্জ্জন উদ্যানের দিকে বেড়াইতে যাইতেন। বেড়াইয়া আসিয়া প্রাঙ্গণস্থ তাঁহার প্রিয় দেবদারুতলে মন্দ সমীরণে বসিয়া ভাবনা করিতেন। দুইপ্রহরের সময়ে স্নান ও অতি অল্পই আহার করিয়া নির্ব্বাচিত অন্য একটি স্থানে বসিতেন এবং সেইখানে একাসনে শয়নের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত কাটাইয়া দিতেন।"

এই সময়ে একদিন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ভূতপূর্ব্ব প্রচারক এবং

বর্ত্তমান দেবসমাজের প্রবর্ত্তক শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ অগ্নিহোত্রী মহর্ষির সহিত কিছুদিন বাস করেন এবং তাঁহার নিকট হইতে উপদেশাদি গ্রহণ করেন। মহর্ষির উচ্চভাব এবং জীবনের গাম্ভীর্য্য দেখিয়া তাঁহার নিজের পত্রিকাতে 'স্বর্গীয় দৃশ্য' নামে এক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তাহার কিয়দংশ আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। "হে দ্রষ্টা! যদি তুমি সেই স্বর্গীয় দৃশ্যকে দেখিতে চাও, তবে এস, চল, ঐ গুহার মধ্যে সমাধিযুক্ত যে তাপস বসিয়া রহিয়াছেন, তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত কর। কিন্তু কি দেখিবে? শরীরে দুই এক খণ্ড গৈরিক বসন ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইবে না। হাঁ, মূর্ত্তি দেখিতে সুন্দর বটে! আর উহার উপর যে প্রেমের জ্যোতি ও পবিত্রতার জ্যোতি এবং আনন্দের ভাব চমকিত হইতেছে তাহা আপনার পবিত্রতা এবং আনন্দেতে ঐ সম্মুখের ফুলকেও পরাজয় করিয়াছে। কিন্তু ইহা সেই স্বর্গীয় দৃশ্যের দ্বারমাত্র। ইহা স্থূলদ্রষ্টাও দেখিতে পায়। কিন্তু সেই স্বর্গীয় দৃশ্য এখানের অনেক দূরে রহিয়াছে। চল, ভিতরে প্রবেশ কর এবং অন্তশ্চক্ষু দ্বারা নিরীক্ষণ কর। কহ তো এক্ষণে কি দেখিতেছ? ইহাই আধ্যাত্মিক দৃশ্য! ইহাই স্বর্গীয় দৃশ্য! আহা কি মনোহর! তুমি যে বলিতেছিলে হৃদয় মন স্থির হয় না। এখানে দেখ, এখানে দেখ, হৃদয় মন কেমন স্থির, কেমন অচল! চক্ষুর তারা ফিরিতেছে না। চক্ষুর পলক পড়িতেছে না। দেখ, ঐ যোগীশরীর মৃত্তিকায় পড়িয়া রহিয়াছে, কিন্তু তাঁহার মন সেই প্রাণারামের নিকট। দেখ, আত্মা কোথায় গিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সে চাতকের ন্যায় কেমন প্রেমের সহিত সেই আত্মার আত্মাকে অবলোকন করিতেছে। কেমন একসূত্রে উভয়ে আবদ্ধ। কেমন পবিত্রতা ও প্রেমের জ্যোৎস্না বর্ষিত হইতেছে। অন্তরে অন্তরে কেমন প্রেমপ্রবাহ প্রবাহিত হইতেছে। দেখ, ইহাই পবিত্র

প্রেম, ইহাই পবিত্র আনন্দ। এ সকলই শুভভাব। ইহার সমান জগতে আর কিছুই নাই। এই আধ্যাত্মিক আনন্দ কেবল আধ্যাত্মিক যোগের দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়।" * * * *

কেশবচন্দ্র যখন আপনার স্বাধীন ইচ্ছা ও মত অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য মহর্ষিকে পরিত্যাগ করেন, তখন যে-সমস্ত বিবাদ বিসম্বাদ এবং উত্তর প্রত্যুত্তর চলিয়াছিল, তাহার আভাস পাঠকেরা প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু এই বিরোধ সাময়িক মাত্র। মহর্ষি ও কেশবের মধ্যে প্রথমে যে প্রেম-বন্ধন ছিল, মধ্যে তাহা কিঞ্চিৎ শিথিল হইলেও পরে সেই বন্ধন পূর্ব্বের ন্যায় দৃঢ়ই রহিল। ইহার প্রমাণস্বরূপ আমরা নিম্নে তাঁহাদের দুই একটি পত্র উদ্ধৃত করিলাম, ইহার দ্বারা তাঁহাদের হৃদয়ের যোগ-ভূমির প্রতিষ্ঠা-স্থান যেমন একদিকে দেখিতে পাওয়া যাইবে, অন্যদিকে তেমনি তাঁহাদের প্রেমের গভীরতারও আভাস পাওয়া যাইবে।

হিমালয়
দার্জ্জিলিঙ্
৭ জুলাই ১৮৮২

"ভক্তিভাজন মহর্ষি,

হিমালয় হইতে হিমালয়ে ভক্তিপূর্ণ প্রণাম পাঠাইতেছি, গ্রহণে কৃতার্থ করিবেন। আমি আপনার সেই পুরাতন ব্রহ্মানন্দ, সন্তান ও দাস। আপনি আমাকে অতি উচ্চ নাম দিয়াছিলেন। বহুমূল্য রত্ন "ব্রহ্মানন্দ" নাম। যদি ব্রহ্মেতে আনন্দ হয় তদপেক্ষা অধিক ধন মনুষ্যের ভাগ্যে আর কি হইতে পারে? ঐ নাম দিয়া আমাকে আপনি মহাধনে ধনী করিয়াছেন, বিপুল সম্পত্তিশালী করিয়াছেন। আপনার আশীর্ব্বাদে ব্রহ্মের সহবাসে অনেক সুখ এজীবনে সম্ভোগ করিলাম।

আরো আশীর্ব্বাদ করুন যেন আরো অধিক শান্তি ও আনন্দ তাঁহাতে লাভ করিতে পারি। ব্রহ্ম কি আনন্দময়; হরি কি সুধাময় পদার্থ! সে মুখ দেখিলে আর কি দুঃখ থাকে? প্রাণ যে আনন্দে প্লাবিত হয় এবং পৃথিবীতেই স্বর্গসুখ ভোগ করে। ভারতবাসী সকলকে আশীর্ব্বাদ করুন যেন সকলেই ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিতে পারেন। আপনার মন তো ক্রমশঃ স্বর্গের দিকে উঠিতেছে, ভক্তমণ্ডলীকে সঙ্গে রাখিবেন, প্রেমের বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিবেন, যেন সকলে আপনার সঙ্গে উঠিতে পারেন। এখান হইতে কল্যই প্রত্যাগমন করিবার ইচ্ছা।"

আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষী
শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।"

প্রত্যুত্তর।

আমার হৃদয়ের ব্রহ্মানন্দ,

৩০ আষাঢ়ের প্রাতঃকালে এক পত্র আমার হস্তে পড়িল, তাহার শিরনামাতে চিরপরিচিত অক্ষর দেখিয়া তোমার পত্র অনুভব করিলাম, এবং তাড়াতাড়ি সেই বিমল পত্র খুলিয়া দেখি যে সত্যসত্যই তোমারই পত্র। তাহা পড়িতে পড়িতে তোমার সৌম্যমূর্ত্তি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তোমার শরীর দূরে, কি করি, তাহাকেই মনের সহিত প্রেমালিঙ্গন দিলাম এবং আনন্দে প্লাবিত হইলাম।

"আমার কথার সায় যেমন তোমার নিকট হইতে পাইয়া আসিতেছি এমন আর কাহারও কাছে পাই না। হাফেজ আফ্‌শোষ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন 'কাহাকেও এমন পাই না যে আমার কথায় সায় দেয়।' তোমাকে সে পাগলা যদি পাইত, তবে তাহার প্রতি কথায় সায় পেয়ে সে মস্ত্‌ হয়ে উঠত আর খুসি হয়ে বল্‌তে

থাকিত "কি মস্তি জানি না যে, আমার সম্মুখে উপস্থিত হইল।" তোমাকে আমি কবে ব্রহ্মানন্দ নাম দিয়াছি এখনো তোমার নিকট হইতে তাহার সায় পাইতেছি। তোমার নিকটে কোন কথা বৃথা যায় না। কি শুভক্ষণেই তোমার সহিত আমার যোগবন্ধন হইয়াছিল; নানাপ্রকার বিপর্য্যয় ঘটনাও তাহা ছিন্ন করিতে পারে নাই। ভক্তমণ্ডলীকে বন্ধন করিবার ভার ঈশ্বর তোমাকেই দিয়াছেন—সে ভার তুমি আনন্দের সহিত বহন করিতেছ, এই কাজেই তুমি উন্মত্ত, এ ছাড়া তোমার জীবন আর কিছুতেই স্বাদ পায় না। ঈশ্বর তোমার কিছুরই অভাব রাখেন নাই, তুমি ফকীরের বেশে বড় বড় ধনীর কার্য্য করিতেছ। আমি এই হিমালয় হইতে অমৃতালয়ে যাইয়া তোমাদের সাক্ষাতের জন্য প্রত্যাশা করিব। "তত্র পিতা অপিতা ভবতি, মাতা অমাতা'; সেখানে পিতা অপিতা হন, মাতা অমাতা। সেখানে প্রেম সমান—উঁচু নীচুর কোন খিরকিচ্ নাই। ইতি ২রা শ্রাবণ ৫৩ ব্রা সং।

তোমার অনুরাগী

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মা।"

মস্থরী পর্ব্বত।

তারাভিউ

শিমলা ২৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩।

"পিতৃচরণকমলে ভক্তির সহিত প্রণাম।

গতবর্ষে প্রণাম করিয়াছি, এ বর্ষেও হিমালয় হইতে প্রণাম করিতেছি, গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ করিবেন। শুনিলাম আপনার শরীর অসুস্থ। ইচ্ছা হয় নিকটে থাকিয়া এ সময় আপনার চরণসেবা করি। বহুদিন হইতে এই ইচ্ছা, ইহা কি পূর্ণ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই?

হৃদয়ের যোগ আত্মার যোগ ত আছেই, তথাপি মন চায় যে শারীরিক সেবা করিয়া পিতৃভক্তি চরিতার্থ করে। যদি প্রেমময়ের অভিপ্রায় হয় যে, মনের ভাব মনেই থাকিবে তাহাই হউক। ভারতে সুমধুর ব্রহ্মলীলা দর্শনে প্রাণ মোহিত হইতেছে। যত দিন যাইতেছে তত ব্রহ্মসূর্য্যের কিরণ ও ব্রহ্মচন্দ্রের জ্যোৎস্না অন্তরে বাহিরে দেখিয়া অবাক্ হইতেছি। কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! মনে হয় পৃথিবীতে এমন ব্যাপার আর কখন হয় নাই, আমাদের কি সৌভাগ্য, এই-সকল আনন্দলীলা আমরা পৃথিবীতে দর্শন করিতেছি, যাহা দেবতাদের লোভের বস্তু। নিরাকারের এমন খেলা, যিনি ভূমা মহান্ তাঁহার এমন সুন্দর প্রকাশ কেবা জানিত, কেবা ভাবিত? এখন তাঁহারই প্রসাদে এসমুদায় দুঃখী কৃপাপাত্র ভারতবাসীদিগের নয়নগোচর হইতে লাগিল! অনাদ্যনন্ত করতলন্যস্ত! ইহা কি? ছিল কি? হিমালয় আবার জাগিয়া উঠিতেছেন গঙ্গা ভক্তিপ্রবাহ প্রবাহিত করিতেছেন। ভারত নূতন বস্ত্র পরিয়াছে, চারিদিকে নূতন শোভা! কোথাও গম্ভীর নিনাদে, কোথাও মধুর-স্বরে ব্রহ্মনাম ঘোষিত হইতেছে। এ সময়ে আনন্দধ্বনি না করিয়া থাকা যায় না। এ সকল যোগেশ্বরের খেলা, যোগেতেই আনন্দ, যোগেতেই মুক্তি, এখন প্রাণ যোগ ভিন্ন আর কিছু চায় না। আসুন, গভীর যোগে সেই পুরাতন প্রাণসখার প্রেমরস পান করি ও প্রেমময় নাম গান করি।

আশীর্ব্বাদপ্রার্থী

সেবক শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।”

উত্তর।

হিমালয় পর্ব্বত

১৪ আশ্বিন ব্রাঃ সং ৫৪।

"প্রাণাধিক ব্রহ্মানন্দ!

আমি আর অধিক লিখিতে পারি না, আর কিছুদিন পরে কিছুই লিখিতে পারিব না। এ লোক হইতে আমার প্রয়াণের সময় নিকটবর্ত্তী হইতেছে। এই শুভসময়ে প্রেমসহকারে একটি শ্লোক উপহার দিতেছি, তুমি তাহা গ্রহণ কর। "কবিং পুরাণমনুশাসিতারং অণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্যঃ। সর্ব্বস্যধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥ প্রয়াণকালে মনসাচলেন ভক্ত্যাযুক্তযোগবলেনচৈব। ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্ সতং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যং॥'

নিম্নে বসুন্ধরা ঊর্দ্ধে দেবলোক

সর্ব্বত্র ঘোষিত মহিমা তাঁর।

আনন্দময়ের মঙ্গলস্বরূপ

সকল ভুবন করে প্রচার॥

"তাঁহার প্রসাদে তুমি দিব্যচক্ষু লাভ করিয়াছ। তোমার দেখা আশ্চর্য্য! তোমার কথা আশ্চর্য্য! তুমি দীর্ঘজীবী হইয়া মধুর ব্রহ্মনাম সকলের নিকট প্রচার করিতে থাক। রসনা যাও তাঁর নাম প্রচারো— তাঁর আনন্দ-জনন সুন্দর আনন দেখরে নয়ন সদা দেখ রে।

তোমার নিতান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।"

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

আত্মীয়বিয়োগ ও অন্তিমকাল।

মসূরী পর্ব্বতে কিছুকাল অবস্থানের পর তাঁহার শরীর রোগাক্রান্ত হইল। তাঁহার পরিপাকশক্তির হ্রাস ও তজ্জনিত অন্যান্য রোগ প্রকাশ পাইতে লাগিল। বাড়ীর লোকেরা তাঁহার জন্য অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া তাঁহাকে কলিকাতা ফিরিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পত্র প্রেরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু হিমালয়ের সহিত তাঁহার চির-দিনের সম্বন্ধ—গভীর সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধ ভঙ্গ করিয়া তিনি ফিরিয়া আসিতে সম্মত হইলেন না। এসম্বন্ধে তাঁহার লিখিত এক পত্রের কিয়দংশ উদ্ধৃত করা যাইতেছে। "এইক্ষণে আমার জরার অবস্থা। অতএব শরীরের সুস্থতার আর প্রত্যাশা নাই। কালের ধর্ম্ম অনতি-ক্রমণীয়, এজন্য উদ্বিগ্ন হইবে না! এই পুণ্যভূমি হিমালয়েই আমার শেষ দিন অবসান হইবে—এখানেই আমার প্রাণদাতার হস্তে প্রাণ সমর্পণ করিয়া সিদ্ধিলাভ করিব।"

এইস্থানে অবস্থানকালে তাঁহার পদে এক প্রকাণ্ড স্ফোটক দেখা দিল। ইংরাজ ডাক্তার অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন উপকার হইল না। বরং আর একটা স্ফোটক দেখা গেল। ডাক্তার সাহেব অনেক চিকিৎসার পর মহর্ষির জীবন সম্বন্ধে নিরাশ হইলেন। কিন্তু অন্য একজন জর্ম্মান ডাক্তারের চিকিৎসাতে প্রায় দুইমাস পরে তিনি আরোগ্য লাভ করিলেন। তিনি যদিও কলিকাতা ফিরিতে প্রথমে অসম্মত হইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার জামাতা শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের মৃত্যুসংবাদ প্রাপ্ত হইয়া অবশেষে তাঁহাকে কলিকাতা

ফিরিতে হইল। তাঁহার মৃত্যুসংবাদ প্রাপ্ত হইয়া মহর্ষি একটুও বিচলিত না হইয়া বলিলেন "সারদা আমার অগ্রেই চলিয়া গেলেন কেন জান? তিনি আমার জন্য পরলোকে বাড়ী ঠিক্ করিতে গিয়াছেন। বাড়ীর সকলে শোকাচ্ছন্ন হইয়াছেন। তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিবার জন্য একবার বাড়ী যাইব।"

১৮০৫ শকে চুঁচুড়ার গঙ্গাবক্ষে অবস্থিত একটি সুন্দর দ্বিতল বাড়ী ভাড়া করিয়া মহর্ষি তাহাতে বাস করিতে লাগিলেন। এইস্থানে তাঁহার আর একটি পারিবারিক দুর্ঘটনা হইয়াছিল। তাঁহার তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর তখন কলিকাতার মধ্যে একজন প্রসিদ্ধ পালোয়ান এবং কুস্তিগির ছিলেন। তাঁহার নিকটে কলিকাতার অনেক যুবক ব্যায়াম শিক্ষা করিতে আসিত। একদিন সংবাদ আসিল তাঁহার কঠিন পীড়া হইয়াছে। তাঁহার প্রতিদিনের সংবাদ প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয় মহর্ষিকে শুনাইতেন। একদিন সংবাদ আসিল তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। শাস্ত্রীমহাশয় ভাবিতে লাগিলেন এই নিদারুণ সংবাদ তাঁহাকে কেমন করিয়া দিবেন। কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার প্রিয় জামাতার মৃত্যু হইয়াছে, আবার পুত্রের এই মৃত্যুসংবাদ! এইপ্রকার চিন্তা করিতেছেন এমন সময়ে মহর্ষি জিজ্ঞাসা করিলেন "আজিকার খবর কি?" শাস্ত্রী বলিলেন "আজিকার সংবাদ ভাল নয়, সেজোবাবুর মৃত্যু হইয়াছে।" "মৃত্যু হইয়াছে" বলিয়া মহর্ষি একটু দাঁড়াইলেন এবং তৎপরে বেড়াইতে লাগিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ আপনার সাধুতা, পবিত্রতা, নির্ম্মল জ্ঞান ও অসাধারণ কঠোর তপস্যা দ্বারা যে দিব্যচক্ষু লাভ করিয়াছেন, তাহা দ্বারা তিনি দুঃখের মধ্যে সুখ, শোকের মধ্যে শান্তি এবং মৃত্যুর মধ্যে জীবনের সুস্পষ্ট আভাস প্রাপ্ত হইয়া বিধাতার শিবরূপের মধ্যে সর্ব্বদা নিমগ্ন হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। যিনি

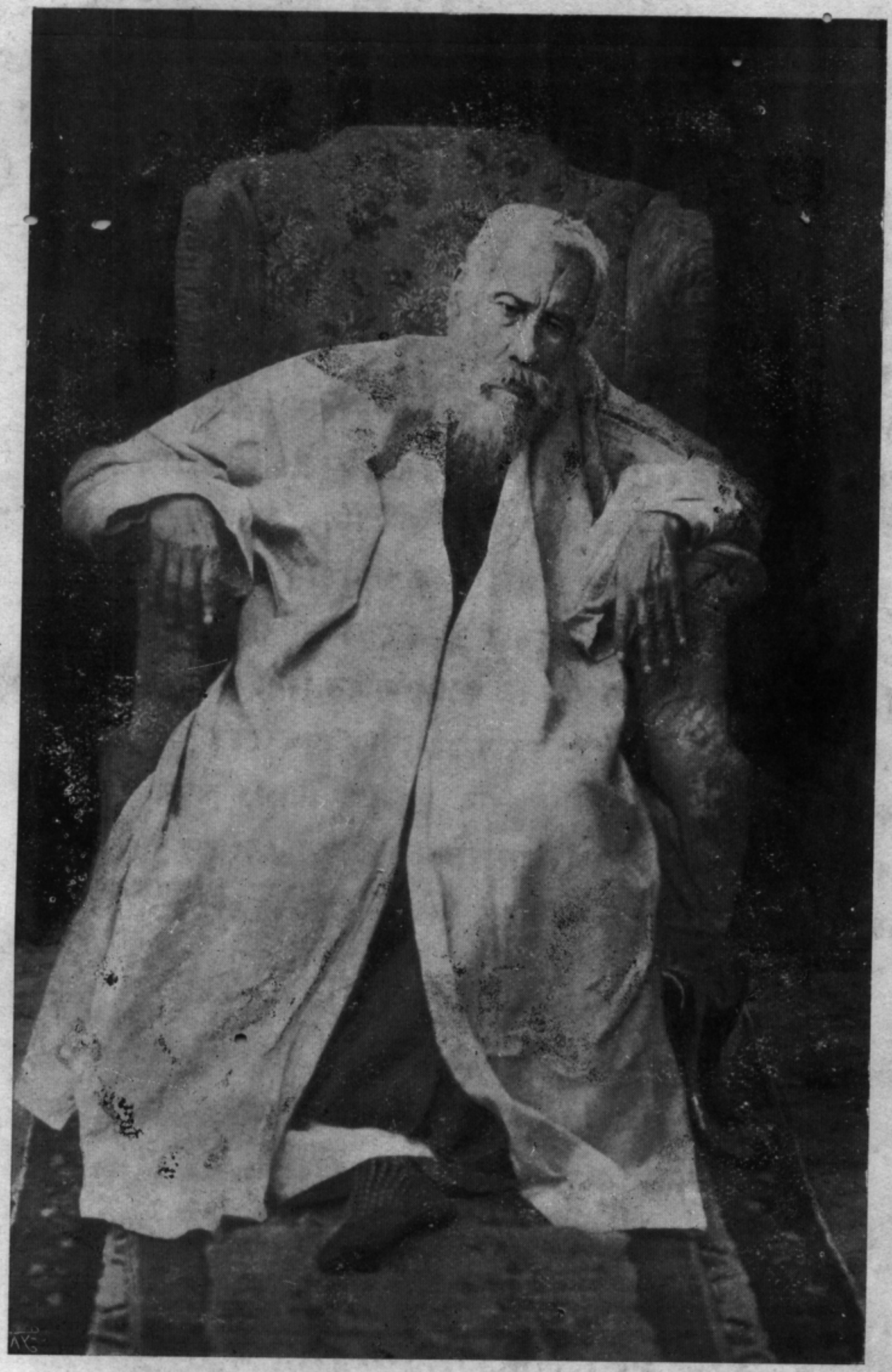
যোবনকালে ধর্ম্মরক্ষার জন্য পথের ভিখারী সাজিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই, যাঁহার সমস্ত জীবন ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মানন্দ-রসপানে যাপিত হইয়াছে, তিনি সমস্ত বস্তুর মধ্যেই গূঢ়রূপে অবস্থিত সেই পরমপুরুষের মঙ্গলভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া অধ্যাত্মযোগ দ্বারা হর্ষ-শোকের অতীত স্থানে গমন করিয়া প্রিয় জামাতা ও পুত্রের মৃত্যুতে যে বিচলিত হইবেন না, ইহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? তিনি বলিলেন "তাঁহার সন্তানদিগের ও আমার মধ্যে তিনি একটা বাঁধ ছিলেন, এখন সে বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল, জল আবার আমাতেই আসিয়া ঠেকিল, আমাকেই এখন তাঁহার সন্তানদিগের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়কে পত্র লিখিয়া জান যে, মৃত-শরীর কি ভাবে শ্মশানে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। হস্তপদাদি সমান-ভাবে রাখিয়া আপাদমস্তক বস্ত্রে আচ্ছাদন করত অভ্রমিশ্রিত ফল্গু ও পুষ্পে সুসজ্জিত করিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছে কি না? আর বিদ্যা-রত্নকে এখানে আসিতে লেখ, কি প্রকারে হেমেন্দ্রের শ্রাদ্ধ করিতে হইবে, তাহার ব্যবস্থা আমি তাঁহাকে বলিয়া দিব। মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণ করা উচিত।"

১৮০৭ শকের অগ্রহায়ণ মাসে মহর্ষি বোম্বাই যাত্রা করেন। আহা-মাদাবাদে পৌঁছিলে তথাকার অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন এবং তাঁহার বাসের জন্য একটি পরম রমণীয় উদ্যানবাটী স্থির করেন। এখানে তিনি যতদিন ছিলেন, ততদিন অনেক ব্যক্তি তাঁহার নিকট আসিয়া সৎপ্রসঙ্গাদি করিতেন এবং তাঁহার নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণ করিতেন। প্রায় একবৎসর কাল বোম্বাই অঞ্চলে অবস্থান করিয়া ১৮০৮ শকের আষাঢ় মাসে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। বঙ্গদেশে আসিয়া চুঁচুড়াতে তাঁহার পুরা-

তন বাটীতে বাস করিতে আরম্ভ করেন। ১৭ই মাঘ দিবসে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রায় সহস্রাধিক ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা এই স্থানে আগমন করিয়া মহর্ষিকে এক অভিনন্দনপত্র প্রদান করেন এবং মহর্ষিও তাঁহার এক প্রত্যুত্তর দেন। তৎপরে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভুক্ত ছাত্রসমাজের সভ্যেরা তাঁহাকে আর এক অভিনন্দনপত্র প্রদান করিলে মহর্ষিও তাহাদিগকে আপনার আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করেন। ইহার কয়েকদিন পরে মহর্ষির জ্বর হইল। তিনি শয্যাশায়ী হইলেন। ব্যাধি ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়াতে তাঁহার চিকিৎসার জন্য কলিকাতার প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ ডাক্তার নীলমাধব হালদার মহাশয়কে লইয়া যাওয়া হইল। তিনি বলিলেন সাতদিন পরে মহর্ষির মৃত্যু হইবে। বাড়ীর কেহ কেহ আসিয়া তাঁহাকে সেবা করিতে লাগিলেন। সকলে অতি ভয়ের সহিত দিন কাটাইতে লাগিলেন। একদিন প্রাতঃকালে মহর্ষি বলিলেন "ভাগবতের প্রথম শ্লোক খুব বড় বড় অক্ষরে ছাপাইয়া এখনি আমাকে দাও, আমি পড়িব।" তখনি প্রিয়নাথ শাস্ত্রী তাহার আয়োজন করিলেন এবং বড় বড় অক্ষরে নিম্নলিখিত শ্লোকটি ছাপাইয়া তাঁহার নিকটে ধরিলেন ঃ—

"জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদি কবয়ে মুহ্যন্তি যৎসূরয়ঃ।
তেজো বারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্ত কুহকং সত্যং পরং ধীমহি।"

ইহার কয়েকদিন পরে তিনি বলিলেন "দোয়াত, কলম, কাগজ দাও।" এই সমস্ত যখন তাঁহাকে দেওয়া হইল তখন তিনি লিখিলেন—



মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ওঁ

* আমার শরীর এখন mechanical force দ্বারা অপর কর্ত্তৃক চালিত হইতেছে। Chemical Laboratory আমার শরীর হইয়াছে, তাহার [এই স্থানের একটি কথা অনেক চেষ্টা করিয়াও পাঠ করিতে পারা গেল না] আমার শরীরে প্রাণ সঞ্চারণ করিতেছে। এ প্রপঞ্চ-মনম শান্ত মঙ্গলস্বরূপর মাত্মার ক্রোড়ে আমার আত্মা নিহিত হইয়া রহিয়াছে। এই কয়ছত্র আমার আত্মা এই শরীরযন্ত্রযোগে বাহিরে প্রকাশ করিল। এখন এই সংসারের কোন যন্ত্রণা নাই। সকলই শান্ত!

চুঁচুড়া, ২৪শে ফাল্গুন, ৫৭

ওঁ

পরমাত্মার অনন্ত মূর্ত্তি জীবাত্মার অনন্তগতি

২৯শে ফাল্গুণ, ৫৭
চুঁচুড়া,

আবার তাঁহার জ্বর বৃদ্ধি হইল। সাহেব ডাক্তার আসিয়া বলিলেন "আজ রাত্রি অবসানের সঙ্গে মহর্ষির জীবনেরও অবসান হইবে।" পরদিন দেখা গেল মহর্ষি শয্যাতে বালিস ঠেস্ দিয়া বসিয়া আছেন। শাস্ত্রীকে বলিলেন

"একি শুনিলাম! ঈশ্বরের আদেশ! ঈশ্বর বলিলেন, হে প্রিয় পুত্র, তুমি এ যাত্রা রক্ষা পাইলে। তুমি এখনো সম্পূর্ণরূপে তোমার গম্যস্থানের উপযুক্ত হও নাই, যখন তুমি সম্পূর্ণরূপে উপযুক্ত হইবে, তখন তোমাকে গম্যস্থানে লইয়া যাইব।"

---

* উক্ত কথাগুলি মহর্ষি রোগশয্যাতে লিখিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার দুর্ব্বল ও কম্পিত হস্তের লেখার কোন কোন অংশ পাঠ করিতে পারা গেল না। আশার পাঠকেরা এ ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

তিনি এযাত্রা রক্ষা পাইলেন। ক্রমে ক্রমে সুস্থ হইতে লাগিলেন। একটু সবল হইলে সার মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয় নিজের ষ্টীমার পাঠাইয়া তাঁহাকে আনিলেন এবং কলিকাতার চৌরঙ্গীস্থ বাটীতে তাঁহার অবস্থানের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। কিছুদিন পরে মহর্ষির বৃহদন্ত্রবৃদ্ধির পীড়া দেখা দিল। এই অবস্থাতে তিনি বলিলেন "আমি কলিকাতার বদ্ধবায়ু ও অমুক্ত আকাশের মধ্যে থাকিতে পারি না। আমাকে দার্জ্জিলিঙ্ লইয়া যাইবার বন্দোবস্ত কর।" অগত্যা এই দুর্ব্বল শরীরেই তাঁহাকে দার্জ্জিলিঙ লইয়া যাওয়া হইল। সেখানে একাকী দিবানিশি যোগযুক্ত হইয়া দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। একদিন তিনি বলিলেন

"এখন নীড়ে মাতার পাখার নীচে শুইয়া রহিয়াছি। শীঘ্রই আমার পাখা উঠিবে। তখন মাতার সঙ্গে অনন্ত আকাশে উড়িয়া বেড়াইব। এ আনন্দ আর আমার মনে ধরে না।"

দার্জ্জিলিঙে তাঁহার শরীর অত্যন্ত খারাপ হইতে লাগিল দেখিয়া ডাক্তারেরা তাঁহাকে বাড়ী আসিবার জন্য পরামর্শ দিলেন। সুতরাং বাধ্য হইয়া তাঁহাকে কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইল। তদবধি তিনি বহুদিন পার্কষ্ট্রীটে একটি বাড়ীতে বাস করেন। এইস্থানে অবস্থানকালে অনেক ব্রাহ্মব্রাহ্মিকা তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইতেন এবং তাঁহার আশীর্ব্বাদলাভ করিয়া কৃতার্থ হইতেন। তাঁহার শেষ জীবনে তিনি মানবাত্মার পরমকল্যাণকর দুইটি পুস্তক প্রকাশ করিয়া ধর্ম্মার্থীদিগের বিশেষ উপকার করিয়া গিয়াছেন। প্রথমটি 'জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি' এবং দ্বিতীয়টি 'পরলোক ও মুক্তি।' মহর্ষি তাঁহার জীবনে যে-সমস্ত উপদেশ বা বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন অথবা যে-সমস্ত

পুস্তক রচনা করিয়াছেন, তাহা যথোপযুক্তরূপে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। তাঁহার মত ও উপদেশের কিঞ্চিৎ আভাস পাঠকেরা এই পুস্তকের মধ্যে পাইয়াছেন। আপাততঃ এই পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে।

মহর্ষি অশীতিবর্ষে পদার্পণ করিলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ও নববিধান সমাজের ব্রাহ্মমণ্ডলী তাঁহাকে দুইটি অভিনন্দনপত্র প্রদান করেন। এই অভিনন্দনপত্রগুলি আত্মজীবনচরিতের পরিশিষ্টে প্রকাশিত হইয়াছে। পাঠকেরা ইহা পাঠ করিলে সন্তুষ্ট হইবেন আশা করি।

এই সময়ের তাঁহার দুই একটি উক্তি আমরা পাঠকদিগকে উপহার প্রদান করিতেছি। ইহাতে তাঁহারা দেখিবেন ধর্ম্মের কত গভীর তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে এবং মহর্ষি তাঁহার প্রাণারাম, চির আবাসভূমি পরমাত্মাতে কেমন গভীর ও একান্ত সত্যভাবে স্থিতিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

১

দর্শনস্য দর্শনেন নো মনো হি নির্ম্মলং। ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্। ঈশ্বর কৃপা করিয়া আমার অন্তরে আসীন হইয়া মৃদুস্বরে বলিয়াছেন যে 'অহং ব্রহ্মাস্মীতি'; অতএব আমি তাঁহার অস্তিত্বের সাক্ষী। কিন্তু আমি তো আর চিরদিন এই সাক্ষ্য দিতে বাঁচিয়া থাকিব না। অতএব শান্তিনিকেতনে একটি মন্দির স্থাপন করিয়া গেলাম। সেই লৌহ-নির্ম্মিত মন্দিরের চূড়ায় লিখিত ওঁকার আমার প্রতিনিধি হইয়া চিরদিন সাক্ষী দিবে 'একং ব্রহ্মাস্তীতি।'

২

এই অকিঞ্চিৎকর দীনহীনের গৃহে তিনি অনেকদিন অতিথি হইয়া রহিয়াছেন এবং কৃপা করিয়া জ্ঞান ও ধর্ম্মের শিক্ষা দিতেছেন। এখন

তাঁর নিজের ঘরে যাইবার জন্য আমাকে নিমন্ত্রণ করিতেছেন। তাঁর এই মধুর আহ্বানে উত্তেজিত হইয়া আমার এই ভাঙ্গা ঘরবাড়ী ছাড়িয়া তাঁর সঙ্গে তাঁর প্রেমাগারে চলিলাম। সেখান হইতে আর ফিরিব না।

৩

আজ আমার হৃদয়ে ঈশ্বরের এই বাণী আসিয়া পঁহুছিয়াছে—

"যতটুকু আমার কথা শুনিয়া চলিয়াছ, যতটুকু আমার আদেশ পালন করিয়াছ, ততটুকু তোমার জয়লাভ হইয়াছে। এখন সম্যক্-রূপে আমার কথা শুনিয়া চল, যে, এই সংসারের পরপারে নির্ব্বিঘ্নে উত্তীর্ণ হইবে এবং সিদ্ধিলাভ করিবে।"

৪

"তোমার দেহ অবসান হইলে আমার প্রেমালিঙ্গনলাভ করিবে এবং নিত্যকাল আমার সহচর অনুচর হইয়া থাকিবে।"

হা ঈশ্বর! তোমার এ কি করুণা!

৫

"ভয় নাই, তোমার এই শরীরের পতন হইলে আমার নিত্য-সহবাস লাভ করিবে।"

পার্কষ্ট্রীটে কয়েকবৎসর বাস করিয়া অবশেষে ১৮২০ শকের ২৭ কার্ত্তিকে জোড়াসাঁকোর বাটীতে আগমন করেন। পূর্ব্বে যে-গৃহে তিনি কেশবচন্দ্র প্রভৃতির সহিত ধর্ম্মালোচনা করিতেন, এক্ষণে সেই-গৃহে যোগযুক্ত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই সময়েও অনেকে তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইতেন। তাঁহার দর্শনে হৃদয় যে কি নির্ম্মল আনন্দলাভ করিত এবং অন্তর যে কিপ্রকার পবিত্র হইত, তাহা

ভাষাতে বর্ণনা করা অসম্ভব। যাঁহারা সৌভাগ্যবশতঃ তাঁহার দর্শন লাভ করিয়াছেন, তাঁহার সেই সৌম্যমূর্ত্তি, স্থির গম্ভীর ও পবিত্র মুখমণ্ডল চিরদিন তাঁহাদের স্মৃতিপটে অঙ্কিত থাকিবে। ক্রমে তাঁহার দেহ-পিঞ্জর জরাজীর্ণ ও দুর্ব্বল হইতে লাগিল বটে কিন্তু আত্মা-পক্ষী নূতন রাজ্যের আভাস পাইয়া, নবতর আনন্দের আস্বাদন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে লাগিল। এই সময়ে একদিন শ্রদ্ধাস্পদ প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। মহর্ষি তাঁহাকে বলিলেন "আমি এক্ষণে অমর ব্রহ্মলোকের যাত্রী। আমি যতই সেই সত্যরাজ্যের নিকটবর্ত্তী হইতেছি, ততই আমার দেহ ক্ষীণ হইতেছে। এখানে আমার কোন কার্য্য বা ইচ্ছা নাই। এক্ষণে আমি নির্জ্জনে ব্রহ্মানন্দ অনুভব করিতেছি এবং ব্রহ্ম নিত্য নূতন সত্যের আলোক আমার অন্তরে প্রকাশ করিতেছেন। যতই তিনি আমার অন্তরে নূতনরূপে আত্মপ্রকাশ করিতেছেন, ততই আমি বিস্ময়ে অভি-ভূত হইয়া অবাক্ হইতেছি।"

এক্ষণে আমরা তাঁহার জীবনের শেষ ঘটনাসমূহ শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের ভাষাতে বর্ণনা করিতেছি। শাস্ত্রীমহাশয় লিখিয়াছেন—

"১৯ ফাল্গুন ১৮২৫ শক বৃহস্পতিবার রাত্রে মহর্ষির কম্পজ্বর হইল। শরীর অবসন্ন—অচেতন, পার্শ্বপরিবর্ত্তনের শক্তি নাই। তিনদিন পরে চৈতন্যলাভ হইল। প্রভাতে যথানিয়মে উপাসনা করিয়া চৌকিতে বসিয়া আছেন, আমি সম্মুখে উপবিষ্ট। বলিলেন—"ঘাত্যেকতোঽস্ত-শিখরং পতিরোষধীনাম্ আবিষ্কৃতোঽরুণপুরঃসর একতোঽর্কঃ।" অশ্রুপূর্ণ-লোচনে বলিলাম, আর কিছুদিন আমাদের জন্য থাকুন। বলিলেন 'বুঝিয়াছ' বলিলাম "আজ্ঞা হাঁ, বুঝিয়াছি।" আপনার শরীর অন্ত

যাইতেছে আর আত্মা মুক্তি-মার্গে উদিত হইতেছে। ইহা শুনিয়া তিনি পুনরায় আবৃত্তি করিলেন—"যাত্যেকতোঽস্তশিখরং পতিরোষধীনাম্ আবিষ্কৃতারুণপুরঃসর একতোঽর্কঃ।"

"দুইদিন পরে বৈকালে তাঁহার জ্যেষ্ঠপৌত্র ও আমি নিকটে আছি। বলিলেন, আহা! এই সময়ে যদি আমি শান্তিনিকেতনের ছাতিম-তলার বেদীতে শয়ন করিয়া সংসার হইতে মুক্ত হইতে পারিতাম তবে আমার বড়ই আনন্দ হইত। শাস্ত্রী, তুমি কি আমাকে শান্তি-নিকেতনে লইয়া যাইতে পার? বলিলাম, মহাশয়ের শরীরে বল হইলে লইয়া যাইতে পারিব। দ্বিপেন্দ্রবাবুর দিকে তাকাইয়া বলিলেন 'দ্বিপু! তুমি সেখান হইতে ছাতিমগাছের একটা চারা আনিয়া আমার এখানে টবে রাখিয়া দিও। যদি শান্তিনিকেতনে না যাওয়া হয় তবে সেই চারা দেখিয়া মনে করিতে পারিব যে সেই শান্তিনিকেতনের ছাতিমতলায় আছি।'

"মহর্ষি দিন দিন ক্ষীণবল হইতে লাগিলেন। ১৮২৬ শকের আশ্বিনমাসে তাঁহার দক্ষিণপার্শ্বে একটি প্রকাণ্ড স্ফোটক দেখা দিল। তাহাতে কোন প্রকার ব্যথা বা উত্তেজনা নাই, কিন্তু আমরা ভীত হইয়া চিকিৎসক ডাকিলাম—চিকিৎসা চলিতে লাগিল।

"একদা রাত্রে নিদ্রাকালে বলিলেন—শাস্ত্রী, এসেছ? বোসো—"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম—সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম—সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম—আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি। শান্তং শিবমদ্বৈতম্।

ক্রমশঃ এক একটি করিয়া দিন চলিয়া গিয়া সেই ১৮২৬ শকের ৬ই মাঘের করাল উষাকাল দেখা দিল। এ উষা সেই বৈদিক ঋষি গোতমবর্ণিত উষা। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের চতুর্দ্দশ অনুবাকে অষ্টম সূক্তে তিনি বলিয়াছেন—

"পুনঃ পুনর্জায়মানা পুরাণীসমানং বর্ণমভিশুম্ভমানা।
শ্বঘ্নীব কৃৎনুর্বিজ আমিনানা মর্ত্তস্য দেবী জরয়ন্ত্যায়ুঃ॥

"অর্থাৎ উষাদেবী চিরন্তনী এবং বার বার জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। ইঁহার রূপ একই প্রকার। কর্ত্তনশীলা ব্যাধস্ত্রী যেমন পক্ষাদি ছেদন দ্বারা পক্ষীদিগকে হিংসা করিয়া থাকে, সেইরূপ ইনি সমস্তপ্রাণীর আয়ু নষ্ট করিয়া থাকেন। প্রভাতের এক ঘণ্টা পূর্ব্বে ডাক্তার ঘোষণা করিলেন মহর্ষির দেহত্যাগের সময় উপস্থিতপ্রায়। তখন আমরা গৃহপূর্ণ করিয়া সকলে তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া আছি। শ্রদ্ধাস্পদ রবীন্দ্রনাথ বাবু ও আমি মহর্ষিদেবকে উচ্চৈঃস্বরে উপনিষদমন্ত্র ও গায়ত্রী শুনাইতে লাগিলাম। তিনি শান্তভাবে স্থিরকর্ণে শুনিতে লাগিলেন। ক্ষণেক পরে আমি বলিতে লাগিলাম—"প্রয়াণকালে মনসাচলেন ভক্ত্যাযুক্তযোগবলেন চৈব"—তিনি ইঙ্গিত দ্বারা আমাকে জানাইলেন, এখনও প্রয়াণকাল উপস্থিত হয় নাই, আমি চুপ করিলাম। আবার একটু একটু করিয়া নাড়ী সবল হইল। আমরা আশ্বস্ত হইয়া উপবেশন করিলাম। তিনি তর্জ্জনী ওষ্ঠে নিক্ষেপ করিলেন। ক্রমে দিন বাড়িতে লাগিল। বেলা ১১ টার সময় তাঁহার হস্ত পদ শিথিল হইতে লাগিল। তিনি তর্জ্জনী ওষ্ঠে নিক্ষেপ করিবার চেষ্টা করিলেন, পারিলেন না। স্থিরভাব ধারণ করিয়া ষষ্ঠাঙ্গে ঊর্দ্ধনেত্রে শয়ান রহিলেন। শ্বাস নাভিতে, তথা হইতে বক্ষে এবং ক্রমশঃ কণ্ঠে আসিয়া উপস্থিত হইল। বেলা একটা পঞ্চান্ন মিনিটের সময়ে শেষ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া তিনি অনন্তধামে চলিয়া গেলেন। এবং তাঁহার দিদিমার দিদিমা যিনি, তাঁহার ক্রোড়ে বসিয়া জগতের লীলা দেখিতে লাগিলেন ও তাঁহার জড়শরীর এখানে পড়িয়া রহিল।"

আজ ভারতাকাশের একটি উজ্জ্বলতম নক্ষত্র অদৃশ্য হইল। ভারতের

তপোবনে ঋষি-উচ্চারিত ওঁকার-নাম সংসারাশ্রমে উচ্চারণ করিবার জন্য যিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, নির্জ্জন অরণ্যে ও পর্ব্বতকন্দরে সাধিত অনন্তপুরুষের পূজা বিষয়-কোলাহলপূর্ণ নগরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যিনি দীর্ঘকাল এই সংসারে অবস্থান করিয়াছিলেন, প্রাচীনকালে ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ীকথিত চিরস্মরণীয়া তেনাহং কিং কুর্য্যাম্ যেনাহং নামৃতাস্যাম্—অমরবাণী হৃদয়ে ধারণ করিয়া যিনি অতুল সম্পদ ও ঐশ্বর্য্যকে পরিহারপূর্ব্বক পথের ভিখারী সাজিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, 'ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাম্‌জগৎ তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্" মন্ত্র সর্ব্বদা জপ করিতে করিতে যিনি সাংসারিক বিষয় সম্পত্তি ভোগ করিতেন, আজ তিনি আপনার জীবনের মহাপবিত্র ব্রত সাধন করিয়া অনন্তজীবনরাজ্যে প্রবেশ করিলেন। এই সেই পবিত্র ব্রহ্মধাম, যেস্থানে জনক, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ভারতের ঋষিরা ব্রহ্মযোগে নিমগ্ন হইয়া ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগ করিতেছেন, যেস্থানে দেবতাগণের পবিত্র বন্দনাধ্বনি অনন্তমহিমাময় পরমপুরুষের চরণস্পর্শ করিয়া সমস্ত বিশ্বের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হইতেছে, যেস্থানে পবিত্র জ্ঞানের স্নিগ্ধ আলোক সকলের অন্তরে প্রকাশিত হইয়া নূতন নূতন আনন্দে প্রাণকে পূর্ণ করিতেছে এবং যেস্থানে পবিত্রতার সুরভিপূর্ণ সুমন্দ মারুতহিল্লোল প্রবাহিত হইয়া অনন্তকালের জন্য সাধকহৃদয়ে অজস্রধারে শান্তিসুধা বর্ষণ করিতেছে। এই দেববাঞ্ছিত পবিত্র স্থানে অনন্তের উপাসক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সুদীর্ঘ কর্ম্মজীবনান্তে চিরবিশ্রামলাভ করিলেন। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরি ওঁ।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়।

পরিবারে তাঁহার শিক্ষা ও প্রভাব।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রহ্মসাধনে চিরজীবন যাপন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তজ্জন্য পরিবারে শিক্ষা দান অথবা অন্যপ্রকার সাংসারিক ব্যবস্থার ত্রুটি কখন করেন নাই। বরং এই-সমস্ত বিষয়ে তাঁহার যে সূক্ষ্মদৃষ্টি ও ব্যবস্থা ছিল তাহা স্মরণ করিলে অতি আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। এ সম্বন্ধে কয়েকটি ঘটনা আমরা নিম্নে উল্লেখ করিতেছি।

সাধারণতঃ ; পুস্তকাদি অধ্যয়ন বা আলোচনা করাই বর্ত্তমান সময়ের শিক্ষার প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। শিক্ষালাভ করিতে হইলে গ্রন্থাদি পাঠ অথবা জ্ঞানবৃদ্ধ ব্যক্তিগণের সহিত আলোচনা করা তো চাই, কিন্তু ইহাই একমাত্র প্রকৃত শিক্ষার পথ বলিতে পারা যায় না। কার্য্যগত জীবনের মধ্য দিয়া যে শিক্ষালাভ করা যায়, তাহাই জীবনে প্রকৃত ফলপ্রদ হইয়া থাকে। মহর্ষি ইহা সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারিয়া এই প্রথা অবলম্বন করিয়া সন্তানদিগের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াই তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতেন না, কিন্তু নিজে তাহা পরীক্ষা করিতেন এবং পুরস্কারাদি প্রদান করিয়া উৎসাহিত করিতেন।

যখন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার সহিত ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন, তখন একদিন মহর্ষি একটি সঙ্গীতের প্রথম ছত্র রচনা করেন। সেই সঙ্গীতের প্রথম ছত্র এই—"সবে মিলে গাও তাঁহার মহিমা।" নিকটে সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন। তাঁহাকে বলিলেন "তুমি পরের ছত্র রচনা কর।" অমনি সত্যেন্দ্রনাথ বলিলেন "আজ কররে জীবনের

ফললাভ।” তখন মহর্ষি বলিলেন “তবে তুমি সমস্ত সঙ্গীতটি রচনা কর। এই সঙ্গীতটি অতি উচ্চ সুর, তাল ও ভাবযুক্ত ভাষাতে রচিত হইল। গানটি এই—

ভৈরব—চৌতাল।

সবে মিলে গাও তাঁহার মহিমা ;
আজ কররে জীবনের ফললাভ।
হৃদয়থালভার ভক্তিপুষ্পহার, প্রভুর চরণে ছাওরে ছাও।
নব নব রাগ-রচিত বন্দনমালা, গাঁথি গাঁথি দেও উপহার ;
বিশ্বাধার প্রভু সেই যশোগীতি তাঁরি প্রচার সকল সংসার।

এইরূপ উৎসাহ পাইয়া সত্যেন্দ্রনাথ অতি অমূল্য সঙ্গীতসমূহ রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। একবার উৎসবের সময়ে মহর্ষি, রবীন্দ্রনাথকে কতকগুলি সঙ্গীত রচনা করিতে আদেশ করেন। সঙ্গীতসমূহ রচিত হইলে তাঁহাকে ও জ্যোতিরিন্দ্রবাবুকে ডাকিয়া ঐ-সমস্ত সঙ্গীত গান করিতে আদেশ করিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রবাবু হারমোনিয়ম বাজাইতে লাগিলেন এবং রবীন্দ্রনাথ সেই সঙ্গে গান করিতে আরম্ভ করিলেন। সমস্ত গান হইয়া গেলে তিনি রবীন্দ্রনাথকে ডাকিয়া বলিলেন “দেখ তোমার গানগুলি অতি সুন্দর হইয়াছে। সকল দেশে এই নিয়ম আছে রাজারা পুরস্কার প্রদান করিয়া প্রজাদিগকে উৎসাহিত করিয়া থাকেন। আমাদের দেশে হিন্দুরাজা তো নাই। অতএব আমি তোমাকে এই পুরস্কার প্রদান করিতেছি।” এই বলিয়া একখানি পাঁচশত টাকার চেক্ প্রদান করিলেন। তাঁহার পুত্রকন্যারা এইরূপে তাঁহার নিকট হইতে উৎসাহলাভ করিতেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বহুদিন পূর্ব্বে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা দেখিয়া তাঁহাকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। আর আজ বহুবৎসর পরে সুইডেনের নরপতি

সেই পুত্রের প্রৌঢ়বয়সে তাঁহার প্রতিভাতে আশ্চর্য্য হইয়া বহু অর্থ ও সম্মান প্রদান করিয়া জগতের নিকটে তাঁহাকে সুপরিচিত করিয়া দিলেন।

স্বনামধন্যা বিদূষী শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী প্রথম বয়সে যখন 'ভারতী' পত্রিকা প্রকাশ করেন, তখন মহর্ষি রীতিমত তাঁহার পত্রিকা পাঠ করিতেন এবং সে সম্বন্ধে তাঁহার মতামত স্বর্ণকুমারীকে জানাইতেন। তাঁহার উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়া এবং তাঁহার মতামতের দ্বারা পরিচালিত হওয়াতে ভারতীপত্রিকাখানি সেই সময়ের একটি অতি উৎকৃষ্ট মাসিকপত্রিকারূপে বঙ্গসাহিত্যে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল।

সকল প্রকার শিক্ষাবিষয়ে মহর্ষির দৃষ্টি ছিল। পুত্রকন্যাদিগের জ্ঞানশিক্ষার জন্য যেমন বন্দোবস্ত করিতেন, তেমনি আবার সঙ্গীত, শিল্পবিদ্যা, চিত্রবিদ্যা শিক্ষার বিষয়ে বন্দোবস্ত করিতেন। তাঁহার অর্থে পরিচালিত হইয়া সাধারণের জন্য একটি সঙ্গীতবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বহুবৎসর পর্য্যন্ত এই বিদ্যালয়ে রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী অক্ষয়কুমার মজুমদার প্রভৃতির ন্যায় ওস্তাদগণ সঙ্গীতশিক্ষা দিতেন। এই পুস্তকের লেখকও কিছুকাল এই বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। আদি ব্রাহ্মসমাজ সঙ্গীতের জন্য সুবিখ্যাত। প্রত্যেক বৎসর উৎসবের সময়ে তান-মান-লয়-সমন্বিত, নূতন রচিত সঙ্গীতসমূহ যখন গীত হইত, তখন শ্রোতৃবর্গ মুগ্ধ হইয়া শ্রবণ করিতেন। কেবল সঙ্গীত শ্রবণ করিবার জন্য ঠাকুর-পরিবারের বিস্তৃত গৃহপ্রাঙ্গণ ঐ সময়ে লোকে পরিপূর্ণ হইয়া যাইত। ইহার কারণ এই যে মহর্ষি যখন যাহা বন্দোবস্ত করিতেন, তখন তাহা যাহাতে পূর্ণাঙ্গ-সুন্দর হয়, তাহার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন।

পরিবারে তাঁহার কিপ্রকার প্রভাব ছিল, তাহা চিন্তা করিলে অতি

আশ্চর্য্য হইতে হয়। তিনি যতদিন পৃথিবীতে জীবিত ছিলেন, ততদিন তাঁহার আদেশের বিরুদ্ধে কেহ কোন কাজ করিতে পারিত না। সকল বিষয়ে তাঁহার আদেশ গ্রহণ করিয়া সকলকে কাজ করিতে হইত। যখন রবীন্দ্রনাথের উপর বিষয়সম্পত্তি পরিদর্শন করিবার ভার অর্পিত হয়, তখন একদিন রবীন্দ্রনাথ ভাবিলেন বাটীর বহির্দ্দেশে একটি জীর্ণ প্রকোষ্ঠ ছিল, তাহা সংস্কার করিয়া নিজের বসিবার ঘর করিয়া লয়েন। এইজন্য তিনি তাহা রীতিমত সংস্কার করিয়া সুন্দরভাবে ঘরটি প্রস্তুত করাইয়া লইলেন এবং সুন্দররূপে সজ্জিত করিয়া রাখিলেন। তখন মহর্ষি কলিকাতাতে ছিলেন না। তিনি আসিয়া দেখিলেন পুরাতন ঘর আর নাই, তাহার স্থানে এক নূতন ঘর দণ্ডায়মান। তিনি রবীন্দ্রনাথকে ডাকিলেন। বঙ্গের ভবিষ্যৎ কবিসম্রাট নবমীপূজার বলির ছাগের ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন। মহর্ষি বলিলেন "এই ঘরে আমার পিতা বসিতেন এবং ভদ্রলোকদিগের সহিত আলাপপরিচয় করিতেন। তাঁহার ঘর তুমি কাহার আদেশে ভগ্ন করিয়া এইরূপ নূতন করিলে? আমার পিতার ঘরের উপর তোমার কোন অধিকার নাই। যে-সমস্ত পুরাতন জানালা বা কপাট চৌকাট ছিল, তাহা তুমি এখনি লইয়া যথাস্থানে বসাও, এবং ঘরটি ঠিক্ যেমন ছিল তেমনি করিয়া দাও। তোমার একটি বসিবার ঘরের প্রয়োজন ছিল আমাকে পূর্ব্বে বলিলে আমি তাহার বন্দোবস্ত করিতাম। তোমার এখন বেশী লোকজনের সহিত পরিচয় হইয়াছে, অনেক লোক তোমার নিকটে আসেন, সুতরাং তোমার একটি ঘরের প্রয়োজন হইয়াছে। একথা আমি বুঝিতে পারি নাই। এই ত্রিশহাজার টাকা লও এবং নিজের মনোমত ঘর প্রস্তুত করাইয়া লও, কিন্তু আমার পিতার ঘরটি ঠিক যেরূপ ছিল, সেইরূপই

করিয়া দাও।” বলা বাহুল্য যে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার আদেশানুযায়ী কার্য্য করিতে বিলম্ব করিলেন না।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় মহর্ষির জ্যেষ্ঠ পুত্র। অতি আদরের সহিত তিনি প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। যখন তাঁহাদের বেলগাছিয়াতে একটি বিস্তৃত উদ্যান ছিল, তখন একদিন সেই বাগানে একটি ভোজ হইয়াছিল। সেই ভোজ হইতে বাটী ফিরিয়া আসিতে দ্বিজেন্দ্রনাথের অনেক রাত্রি হইয়া গেল। বাড়ীর গাড়ী ছিল না, সেইজন্য একটা ভাড়াটিয়া গাড়ীতে তাঁহাকে আসিতে হইল। ভোজে আহার করিয়া দ্বিজেন্দ্রবাবুর উদরের পীড়া হইল। সেই দিন রাত্রিতে তাঁহার অনেক-বার ভেদবমি হইল। সমস্ত রাত্রি তিনি কাহাকেও কিছু বলিলেন না, কারণ একটা গোলমাল হইলে মহর্ষির কানে তাহা যাইবে। পরদিন প্রাতঃকালে মহর্ষি বাটী ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইবেন স্থির ছিল। রাত্রিতে গোলযোগ হইলে পাছে পরদিন তাঁহার যাওয়া না হয়, সেইজন্য তিনি সমস্ত রাত্রি এই পীড়ার যাতনা সহ্য করিলেন, কাহাকেও কিছু বলিলেন না। পরদিন মহর্ষি বাটী হইতে বাহির হইয়া গেলে তিনি এই কথা প্রকাশ করিলেন ও চিকিৎসাদি চলিতে লাগিল এবং তিনি সুস্থ হইলেন।

রবীন্দ্রনাথের অল্পবয়সে মাতৃবিয়োগ হয়। সুতরাং অল্পবয়স হইতে মহর্ষিকে তাঁহার উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইয়াছিল। যখন রবীন্দ্র-নাথের বয়স ১০ কিম্বা ১১ বৎসর, তখন একবার মহর্ষি তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া পাহাড়ে গিয়াছিলেন। প্রতিদিন রাত্রি প্রায় ৩টার ৪টার সময়ে তাঁহাকে উঠাইয়া দিতেন এবং উপক্রমণিকা ব্যাকরণ মুখস্থ করিতে আদেশ করিতেন। প্রাতঃকালে ভ্রমণের সময়ে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া বাহির হইতেন। তাঁহার নিকট কিছু টাকা গচ্ছিত রাখিয়া পথে

দরিদ্রদিগকে দান করিতে আদেশ করিতেন। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য তাহার বিশেষ কিছু হিসাব রাখিতে পারিতেন না, বিশেষতঃ ভ্রমণের সময়ে সামান্য দানের হিসাব কেবা রাখিতে পারে! কিন্তু মহর্ষি সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না! বাড়ী ফিরিয়া প্রত্যেক পয়সার হিসাব দিতে হইত। ইহাতে রবীন্দ্রনাথের যে কি প্রকার আনন্দ হইত পাঠক তাহা বুঝিতে পারিতেছেন! দেবেন্দ্রনাথ যে পয়সার মমতা করিয়া তাঁহার নিকট এইরূপ হিসাব লইতেন, তাহা নয়, কিন্তু অল্পবয়স হইতে যাহাতে তাঁহার পুত্র শৃঙ্খলা ও নিয়মের বাধ্য হইয়া কাজ করিতে শিক্ষা করেন ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল।

তাঁহার বিনা অনুমতিতে কোন কার্য্য হইতে পারিত না। যখন তিনি বাটীর বাহিরে ভ্রমণ করিতেন, তখনও কোন্ বিষয়ে কি প্রকার কার্য্য হইবে, কে কি কাজ করিবেন তাহার ব্যবস্থা তিনি করিয়া পাঠাইতেন। এ সম্বন্ধে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কন্যার বিবাহ উপস্থিত। তখন মহর্ষি হিমালয়ে ভ্রমণ করিতেছিলেন। সেখান হইতে তিনি ব্যবস্থা পাঠাইলেন এবং সেইমত বিবাহ-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইল। যে-পত্রে তিনি এই বিবাহের ব্যবস্থা দিয়াছিলেন, সেই-পত্র পাঠ করিলে পরিষ্কার বুঝা যায় তাঁহার প্রকাণ্ড অট্টালিকার প্রত্যেক স্থান এবং গৃহসজ্জার প্রত্যেক বস্তু তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে কি প্রকার উজ্জ্বলভাবে বর্ত্তমান থাকিত। এই পত্র তিনি বেচারাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে লিখিয়াছিলেন।

১৭৯৮ শক ৮বৈশাখ—বক্রোটাশেখর।

"নববর্ষের প্রেমালিঙ্গনপূর্ব্বক নমস্কার। দ্বিজেন্দ্রের কন্যা সরোজার শুভবিবাহ উপস্থিত। তুমি জ্ঞানচন্দ্র ও গড়গড়িকে লইয়া বেদীতে আসন গ্রহণ করিবে এবং আচার্য্যের কর্ম্ম সমাধা করিয়া এই শুভ-

বিবাহ সম্পন্ন করিয়া দিবে। স্ত্রী-আচার হইয়া বরকন্যা দালানে আইলে তবে ব্রহ্মোপাসনা আরম্ভ হইবে। তোমরা এই সময়ে বেদীতে বসিবে। তাহার পূর্ব্বে তাহাতে বসিবে না। দ্বিজেন্দ্রের সঙ্গে বরযাত্রীদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া দরদালানে বসাইবে। পরে বিবাহের লগ্ন উপস্থিত হইলে বরযাত্রীদিগকে দালানের বেদীর পশ্চিমভাগে আদরপূর্ব্বক বসাইবে। এবং বরকে গদি হইতে উঠাইয়া আনিয়া কর্ম্ম আরম্ভ করিয়া দিবে। গদি খালি হইলে সেই গদি বরের জন্য বাটীর ভিতরে পাঠাইয়া দিবে। এবং তাহার দুই পার্শ্বের বৈঠকীসেজ বেদীর দুই পার্শ্বে বসাইয়া দিবে। তাহা হইলে বেদীতে আলো কম হইবে না। এবং তুমি পুঁথি বেশ দেখিতে পাইবে। সময় আছে বলিয়া এই-সকল তোমাকে বলিয়া দিলাম। নতুবা বাহুল্যমাত্র। যদি গড়গড়ি আসিতে না পারেন তাঁহার কোন ব্যাঘাত হয় তবে তাঁহার স্থানে কোন্নগরের দয়ালচাঁদ ভট্টাচার্য্যকে বসাইয়া দিবে।"

এইরূপ অনেক ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে, কিন্তু পুস্তকের কলেবরের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া আমাদিগকে কার্য্য সমাপ্ত করিতে হইবে। যখন তিনি ব্রাহ্মসমাজের সেবাব্রত গ্রহণ করিলেন, তখন তাঁহার অনেক সহচর এবং শিষ্য আসিয়া তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন। তাঁহাদিগকে তিনি সকল বিষয়ে সাহায্যদান করিয়া ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেন। তাঁহার সময়ে ব্রাহ্মসমাজের যে এত শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল, তাহার প্রধান কারণ তাঁহার দৃষ্টান্ত, সহানুভূতি ও উৎসাহ প্রদান। মানুষকে কিপ্রকারে উৎসাহদান করিয়া সৎকর্ম্মে আহ্বান করিতে হয় তাহা তিনি যেমন জানিতেন এমন আর বর্ত্তমান যুগে আমাদের কঠোর সমালোচনার মর্ম্মঘাতী যন্ত্রণা-

প্রদানকুশল বাঙ্গালীজাতির পক্ষে জানা সম্ভব নয়। এ সম্বন্ধে তাঁহার দুইটি পত্র আমরা এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

আদি ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইল। মহর্ষি তখন পঞ্জাবে ভ্রমণ করিতেছেন। উৎসবের বিবরণ প্রাপ্ত হইয়া বেচারাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে এই পত্র লিখিতেছেন—

১৭৯৫ শক ৯ ফাল্গুন, অমৃতসর।

প্রীতিভাজনেষু—

সাদর নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদনং—

তোমার মধ্যম পুত্রটির পীড়া কোনক্রমেই বেহালাতে সারিল না—তাহার চিকিৎসার জন্য সপরিবারে তুমি কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতেছ। বেহালার অবস্থা অতি মন্দ হইয়াছে। জল তথায় দূষিত হওয়াতে লোকের রোগ বৃদ্ধি হইয়াছে। ভাল জলাভাবে সপরিবারে তোমার অত্যন্ত কষ্ট গিয়াছে। কলিকাতায় আসিয়া জলপান করিয়া বাঁচিলে। তোমার পুত্রটি কলিকাতায় আসিয়া যদিও দিন দিন সুস্থ হইতেছে, তথাপি তাহার ঔষধ সেবন এখনও বন্ধ হয় নাই; তাহার অন্নপথ্যের সংবাদ পাইলে আমি অত্যন্ত আহ্লাদিত ও প্রহৃষ্ট হইব। পুনঃ পুনঃ জ্বরের আক্রমণে তোমার শরীরও ভগ্ন হইয়া যাইতেছে। ১৫ গ্রেন কুইনাইন খাইয়া ১১ মাঘের কার্য্য সমাধা করিয়াছ। কিন্তু সেদিনকার প্রাতঃকালের তোমার বক্তৃতাতে তো কুইনাইনের গন্ধের লেশমাত্রও নাই। শরৎকালের শিশিরসিক্ত শেফালিকা পুষ্পের ন্যায় সেদিনকার প্রাতঃকালে তোমার হৃদয়ের প্রীতিপুষ্পসকল প্রস্ফুটিত হইয়া প্রভুর চরণে বিকীর্ণ হইয়াছিল। জ্বলন্ত প্রেমসূর্য্য সেদিন তোমার অন্তরাত্মার সম্মুখে প্রজ্বলিত হইয়াছিল, সহজেই তোমার প্রাণ-বিহঙ্গ তাঁহার মঙ্গলগীত গানে সেই উৎসব-ভূমি আনন্দপূর্ণ করিয়াছিল।

তাঁহার অতুল শক্তিপ্রভাবে অসীম আকাশে তেজোময় প্রকাণ্ড সূর্য্য গগন-প্রদীপ হইয়া গ্রহ উপগ্রহ সকলকে জীবনজ্যোতিতে মণ্ডিত করুক, অভ্রভেদী পর্ব্বতসকল দেশ দেশান্তরে উন্নত মস্তকে তাঁহার বল বিক্রমের পরিচয় দিউক, নদনদীসকল বসুন্ধরার কণ্ঠহার হইয়া তাঁহার রচনার নৈপুণ্য প্রদর্শন করুক, তরঙ্গপূর্ণ গম্ভীর সমুদ্র মেখলারূপে মেদিনীমণ্ডলকে পরিবেষ্টিত করিয়া তাঁহার মহিমা প্রচারেই নিযুক্ত থাকুক, তাঁহার জ্ঞান-শক্তি-সমুদ্ভূত ওষধি বনস্পতি জীবজন্তু মনুষ্য ধরাপৃষ্ঠে অবস্থান করিয়া তাঁহারই মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করুক ; যেমন ইহারা সকলেই তাঁহার সেই অতুলন প্রেম প্রকাশ করিতেছে, তেমনি সেদিন তোমার প্রত্যেক বাক্যেতেই তাঁহার প্রেম প্রকাশ করিয়াছিল। প্রেমের বন্ধুকে, প্রেমের আধারকে, প্রেমের সৌন্দর্য্যকে সেদিন তোমার রসনা কেমন ব্যক্ত করিয়াছিল! যিনি বিনানুরোধে—বিনা প্রার্থনায় জীবের সুখশান্তি, মঙ্গলোন্নতি সাধন জন্য স্বীয় অপার প্রেম বিস্তার করিয়াছেন —যাঁহার প্রেমের পুত্তলিকা এই সুন্দর ভূলোকের সমস্ত নরনারী, তাঁহার প্রেমপ্রবাহ-তোমার হৃদয়ে নিয়তই প্রবাহিত হইতে থাকিবে, কখনই পরিবর্ত্তিত হইবার নহে। তুমি যখন রোগ, শোক, পাপ তাপের তীব্র যন্ত্রণার মধ্যে ও সেই প্রেমস্বরূপের অটল মাতৃ-গৃহ বিরাজ করিতে দেখিয়াছ তখন তোমার আর ভয় নাই। তাঁহার প্রীতিতেই এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্যেতেই তোমার অনন্তজীবনের কল্যাণ হইবে। তোমার কর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার, এই আমার বাক্য, এই আমার প্রত্যয়, এই আমার বিশ্বাস।”

আর একখানি পত্র।

শ্রীরামপুর।

১৭৮৫ শক ১১ ভাদ্র।

"তুমি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য তোমার সকল সময় দিবার যে মানস করিয়াছ, ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা যে তিনি তোমার সেই মানস পূর্ণ করুন। তুমি প্রচারের কার্য্যে দণ্ডায়মান হইলে দেখিবে যে রাশি রাশি বিঘ্ন-বিপত্তি দূরীভূত হইবে। তোমার যখন জ্ঞান-প্রস্ফুটিত চক্ষু হইতে, তোমার মধুময় রসনা হইতে সত্য জ্যোতি বিকীর্ণ হইবে, তখন এই অন্ধকার আলোকে পূর্ণ হইবে। আমি জানি তোমার নিঃস্বার্থ প্রীতি তোমার আত্মার অবলম্বন। যদি তোমার সেই নিঃস্বার্থভাবে কেহ দোষারোপ করে, সেই ভয়ে তুমি ভীত রহিয়াছ, এও এক প্রকার লৌকিক ভয়। তুমি যখন সেই অভয়ের শরণাপন্ন হইয়াছ, তখন তোমার ভয় কি? 'কি ভয় লোকভয়ে।' সংসারীরা তোমাকে যে যাহা বলুক তুমি নিন্দা স্তুতিতে সমান থাকিয়া, সত্যকে আশ্রয় করিয়া সত্যের পথে চল, তোমাকে বুদ্ধিবলে কেহ নিরস্ত করিতে পারিবে না, তোমাকে নববলে কেহ পরাস্ত করিতে পারিবে না, তুমি তর্কসংগ্রামের, বিষয় কোলাহলের উপরিরাজ্যে অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছ, সেই অধিকার স্বীকার করিয়া তোমার আত্মা, মন প্রাণকে পরিতৃপ্ত কর। শত শত ব্রাহ্মেরা তোমাকে প্রীতি আলিঙ্গন করিতে হস্ত প্রসারিত করিয়া রহিয়াছে। তুমি অন্ধকারাগারে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছ বলিয়া তাহারা বিষন্ন ও ব্যাকুলিত হইয়া রহিয়াছে। আর কতদিন তুমি আমাদের আশা অপূর্ণ রাখিবে। অসুরেরা চতুর্দ্দিকে স্পর্দ্ধা করিয়া বেড়াইতেছে! আমাদের এমত ভারতভূমি রাক্ষসভূমির ন্যায় হইয়া যাইতেছে, আর কতদিনে তুমি অসুরদিগের হইতে এই ভারতভূমিকে

উদ্ধার করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইবে ? আর কালবিলম্ব সহ্য হয় না। উঠ, দণ্ডায়মান হও। তোমার রসনাকে উন্মুক্ত কর, সত্যের জ্যোতিতে চতুর্দ্দিক উজ্জ্বল কর, সত্যের জয়ে তুমি জয়যুক্ত হও। তোমার মনের অভিলাষ নাই, তোমার প্রভুত্বের অভিলাষ নাই, তুমি কেবল এক প্রীতির ভিখারি, তুমি বিষয়ের দুঃখ জানিয়াছ, বিষয়ীর উপাসনা চাও না। কেবল এক সত্যের উপাসনা চাও। তবে কেন সত্যের সহচর অনুচর হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান না হও? .....আর কার্য্য কর্ম্ম তোমার কর্ম্ম নহে, তোমার কর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার। এই আমার বাক্য, এই আমার প্রত্যয়, এই আমার বিশ্বাস।"

ঊনপঞ্চাশৎ অধ্যায়।

জীবনের আর কয়েকটি বিশেষ ভাব।

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ও ব্রাহ্মসমাজের সেবাতে তিনি আপনার শক্তি, সামর্থ্য অর্পণ করিতে কখন কুণ্ঠিত ছিলেন না। সেইজন্য তাঁহার সময়ে ব্রাহ্মসমাজের এত শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। কর্ত্তব্যানুরোধে তিনি সংসারে ছিলেন এবং বিষয় সম্পত্তি রক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রাণ বিষয়াতীত অমৃতপুরুষের পাদপ্রান্তে চিরদিন প্রতিষ্ঠিত ছিল। মৃত্যুময় সংসারে থাকিয়া তিনি অমৃতপুরুষের আস্বাদন প্রাপ্ত হইয়া এই সংবাদ প্রচার করিয়া গিয়াছেন "হে অমৃতের পুত্রগণ তোমরা নিরাশ হইও না, সংসার পরিত্যাগ করিও না, এখানে—এই সংসারের মধ্যে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবে!" বিষয়কে তিনি কিভাবে দর্শন করিতেন এবং সংসারকে তিনি কেমন সম্ভোগ করিতেন, তাহা পাঠকেরা অবশ্য বুঝিতে পারিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আর একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া আমরা এই অধ্যায় শেষ করিতেছি।

তাঁহাকে জীবনের অধিকাংশ কালই নানাপ্রকার বৈষয়িক বিড়ম্বনার মধ্যে যাপন করিতে হইয়াছে। একবার তাঁহার নিকট-সম্পর্কিত কোন আত্মীয়ের সহিত বৈষয়িক বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল। অপর পক্ষের লোকেরা নিজেদের সুবিধার জন্য আইনজ্ঞ ব্যক্তিদিগের সহিত তাঁহার বাড়ীর সমস্ত সম্পত্তি পরিদর্শন করিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। মহর্ষি তখন তেতালার ঘরে বসিয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রুফ সংশোধন করিতেছিলেন। নীচে হইতে সংবাদ গেল অপর পক্ষের লোকেরা আসিয়াছেন। তিনি তাহাতে বিন্দুমাত্র উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ না

করিয়া ধীরভাবে উপর হইতে নীচে আসিলেন এবং তাঁহাদিগকে নিজেদের কার্য্য করিবার অনুমতি প্রদান করিয়া তৎক্ষণাৎ উপরে গিয়া পুনরায় প্রুফ সংশোধন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। বাড়ীর সকল লোকে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন, পাছে তাঁহার অনুপস্থিতিতে অন্য পক্ষের লোকেরা আপনাদের সুবিধামত সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করে। কিন্তু মহর্ষি সেজন্য বিন্দুমাত্রও ভীত হইলেন না। প্রথম যৌবনে সেই অসহায় অবস্থাতে যিনি তাঁহাকে সকল প্রকার বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছেন, তাঁহার কৃপার উপর নির্ভর করিয়া এবং আপনার সাধু সঙ্কল্পের অক্ষয় কবচে আপনাকে সুরক্ষিত জানিয়া তিনি আপনার কর্ত্তব্যকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মহত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা যতই চিন্তা করি, ততই অবাক্ হইয়া যাই। তাঁহার মন ও হৃদয় এত উচ্চ ও উদার ছিল যে ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। এ সম্বন্ধে দুই একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া আমরা পাঠকদিগের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি।

তিনি যখন একবার মসূরিতে বাস করিতেছিলেন, তখন একদিন "এক ডাণ্ডিতে চড়িয়া একটি বাঙ্গালী ভদ্রলোক আমাদের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত সীতানাথ ঘোষ। আসিয়া মহর্ষির পদতলে কাঁদিয়া পড়িলেন এবং বলিলেন আমি যে তাড়িত বিদ্যা দ্বারা চিকিৎসা প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছি এবং তাহার প্রচার ও যন্ত্রাদি নির্ম্মাণার্থ যে ব্যয় হইয়াছে তাহাতে সমধিক ঋণে জড়িত হইয়াছি। এক্ষণে আমার বিষয়সম্পত্তি বিক্রীত হইতে চলিল। যদি আপনি আমাকে এই ঋণ-জাল হইতে উদ্ধার না করেন, তবে আমার সন্তানেরা অন্নাভাবে মারা পড়িবে। তাঁহাকে সানাহার

করিতে অনুমতি করিয়া মহর্ষি আমাকে ডাকিলেন এবং বলিলেন 'শাস্ত্রী! সীতানাথ বড় কষ্টে পড়িয়াছেন। তোমার নিকট যে কাগজ-গুলি আছে তাহা উঁহাকে দিলে ভাল হয়। তুমিই হস্তে করিয়া দিও ইহাতে তোমার পুণ্য হইবে।' বৈকালে সীতানাথকে নিকটে ডাকিলেন এবং কাগজের পৃষ্ঠে এক এক করিয়া দানের অনুমতি লিখিয়া আমার হাতে দিতে লাগিলেন আমি তাহা সীতানাথ বাবুর হস্তে দিতে লাগিলাম। দান শেষ হইলে মহর্ষি বলিলেন যে, 'তুমি ইহা কাহাকেও বলিও না। সীতানাথ তাহা স্বীকার করিয়া আনন্দ ও কৃতজ্ঞভরে পরদিন কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। সীতানাথ পাইলেন আট হাজার টাকা, যেহেতুক এই ছয় হাজার টাকার কাগচের দুই হাজার টাকা সুদ পাওনা ছিল।*"

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মন্দির নির্ম্মাণের সময় তিনি ৭০০০৲ টাকা দান করিয়াছিলেন। একদিন এই সমাজের কোন সভ্য তাঁহাকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। তিনি আনন্দের সহিত হাস্য করিতে করিতে বলিলেন "দেখ, আমাদের সমাজ আদি সমাজ, ইহা কালে আবদ্ধ, কেশবের সমাজ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ, ইহা স্থানেতে আবদ্ধ, আর তোমাদের সমাজ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, ইহা স্থান ও কালের অতীত"। একবার ঢাকার একজন মাননীয় ও গবর্ণমেণ্টের উচ্চ-পদস্থ কর্ম্মচারী কোন প্রকার বিপদে পড়িয়াছিলেন। মহর্ষির সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় ছিল, তিনি তাঁহাকে গুরুভাবে দর্শন করিতেন। মহর্ষি তাঁহার বিপদের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে সাহায্যের জন্য ৬০০০৲ প্রেরণ করিলেন। তিনি তো এত টাকা পাইয়া অবাক্। তিনি মহর্ষিকে লিখিলেন "আমি তো আপনাকে আমার বিপদের

* শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী লিখিত পরিশিষ্ট হইতে উদ্ধৃত।

সংবাদ দিয়াছিলাম মাত্র, কিন্তু সাহায্যের কথা তো কিছু বলি নাই।" মহর্ষি প্রত্যুত্তরে লিখিলেন "আমার কার্য্য আমি করিয়াছি, তোমার যাহা কর্ত্তব্য তাহা করিতে পার।"

মহর্ষির পিতা দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয় মৃত্যুর পূর্ব্বে ডিষ্ট্রীক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটিতে এক লক্ষ টাকা দান করিবার জন্য প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। এই টাকা তিনি দিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্রদিগকে যেরূপ বিপদে পড়িতে হইয়াছিল, তাহা পাঠকেরা অবগত আছেন। যখন দেবেন্দ্রনাথ অতি কষ্টে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিলেন এবং পিতৃ-ঋণ শোধ করিতেছিলেন, তখন সেই সোসাইটির লোক আসিয়া তাঁহাকে তাঁহার পিতার দান সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া তাঁহার প্রতিশ্রুত লক্ষ টাকা প্রার্থনা করিলেন। সেই ভীষণ সংগ্রামে অটলচিত্ত দেবেন্দ্রনাথ, তৎক্ষণাৎ বলিলেন "আপনারা আমাদের অবস্থা সমস্ত জানিতেছেন। এই অবস্থাতে এত টাকা দেওয়া একেবারে অসম্ভব। তবে আমি সময়ে এই টাকা আপনাদিগকে প্রদান করিব এবং এই টাকার দরুণ যত সুদ হইবে তাহাও প্রদান করিব।" সেই লোকটি ইহা শুনিয়া চলিয়া গেল। বলা বাহুল্য দেবেন্দ্রনাথ এই টাকা সুদসমেত তাঁহাদিগকে দিয়াছিলেন। পিতার প্রতিশ্রুত দান যদি সেই ভীষণ অর্থকৃচ্ছ্রতার মধ্যে তিনি দিতে সম্মত না হইতেন, তাহা হইলে বোধ হয় তাঁহাকে কেহ নিন্দা করিত না। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না। তাঁহার অপরাজিত সাধুভাব চিরদিনই তাঁহার সহচর হইয়া বর্ত্তমান ছিল। ইহাতেই তাঁহার জীবনের মহত্ত্ব এত বাড়িয়া গিয়াছে। এই প্রকার শ্রুত হওয়া যায় যে তিনি জীবদ্দশাতে প্রায় বাইশ লক্ষ টাকা নানাপ্রকার সৎকার্য্যে দান করিয়া গিয়াছেন। ধন্য তাঁহার বদান্যতা ও মহত্ত্ব! ইহাকেই বলে

অর্থের সদ্ব্যবহার! অর্থের জন্য তিনি অর্থ উপার্জ্জন বা সঞ্চয় করিতেন না, কিন্তু পরমার্থের জন্য;—মনুষ্যত্বের জন্য তিনি অর্থ উপার্জ্জন করিতেন এবং সঞ্চয় করিতেন।

তিনি সাংসারিক বিষয়ে যেমন ধনী ছিলেন সংসারাতীত বিষয়েও তেমনি ধনী ছিলেন। এই দুই প্রকার ধন সত্ত্বেও অহঙ্কার তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। একবার ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় সশিষ্যে তাঁহাকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। গোস্বামী মহাশয়ের সহিত তাঁহার বহুদিনের আলাপ পরিচয়। তিনি তাঁহাকে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন এবং উপাচার্য্য করিয়া আদি ব্রাহ্মসমাজের উপাসনার ভার তাঁহার উপর অর্পণ করিয়াছিলেন এবং প্রচারক করিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য তাঁহাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। বলিতে গেলে মহর্ষিই তাঁহার প্রথম গুরু ছিলেন। একথা পাঠকেরা অবগত আছেন। মহর্ষির সহিত গোস্বামী মহাশয়ের অনেক কথা-বার্ত্তার পর মহর্ষি বলিলেন "দেখ বিজয় তুমি এখন অনেক উচ্চস্থানে উঠিয়াছ।" বিজয়কৃষ্ণ বলিলেন "সে তো আপনারই উপদেশ ও আশীর্ব্বাদে। প্রথম বয়সে আপনার উপদেশ ও সংসর্গ যদি না পাইতাম তবে আমি এতদিনে কোথায় থাকিতাম বলিতে পারি না।" অমনি মহর্ষি বলিয়া উঠিলেন "সে কেমন জান? যেমন বালক প্রথমে গুরু-মহাশয়ের পাঠশালাতে অধ্যয়ন করে, পরে সেখানকার পাঠ শেষ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উচ্চ উপাধি লাভ করিয়া জ্ঞানী হইতে থাকে। তখন সেই বালক তাহার পূর্ব্ব গুরু অপেক্ষা কত অধিকতর জ্ঞান ও সত্য লাভ করে, এও সেইরূপ।" এই দুই ভক্তের আলাপে পাঠকেরা কেমন অমায়িকতা, বিনয় ও অহঙ্কারশূন্যতার দৃষ্টান্ত দেখিতেছেন। এই অহঙ্কার শূন্যতার মহিমা আমরা ক্ষুদ্র মানব কি

বুঝিতে পারিব? যাহারা ধর্ম্মজগতে ক্ষুদ্র শিশুর ন্যায় অস্ফুট ভাবে বাক্য উচ্চারণ করিতেছে, তাহারাই অন্যের গুরুস্থানে বসিবার জন্য কত চেষ্টা ও যত্ন করিতেছে! যাহারা সৎকর্ম্মের ব্যপদেশে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভের জন্য প্রাণপণ কত পরিশ্রম করিতেছে এবং সেই আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভের পথে অন্য কেহ কোন প্রকারে দণ্ডায়মান হইলে অমনি অন্তরে অন্তরে তীব্রবেদনা অনুভব করিতেছে. তাহারাই আজকাল ধর্ম্মোপদেষ্টার আসন গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মকে কলঙ্কিত করিতেছে এবং ধর্ম্ম-সমাজকে পশুসমাজে পরিণত করিতেছে।

একদিন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় মহর্ষির সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। কথায় কথায় শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন "দেখুন এই জগত কি শোভা ও সৌন্দর্য্যময়! প্রেমের তুলি না ধরিলে কি এমন জগত অঙ্কন করা যায়?" অমনি বৃদ্ধ মহর্ষি আসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া ভাবাবেশে শাস্ত্রী মহাশয়কে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন "কি বল্‌লে আবার বল, যে এমন কথা বলিতে পারে, আমি তার গোলাম, আবার বল, আবার বল।" শাস্ত্রীমহাশয় মহর্ষির পুত্রস্থানীয়; তাঁহার অপেক্ষা বয়স, জ্ঞান, সাধন প্রভৃতি সকল বিষয়ে শাস্ত্রী মহাশয় কত ছোট, কিন্তু ঐ যে কি এক কথা বলিলেন অমনি মহর্ষি আত্মহারা হইয়া গিয়া আপনাকে তাঁহার গোলাম বলিলেন। একেই বলে ধর্ম্মসাধন; একেই বলে ঈশ্বর-প্রেম!

একবার মহর্ষি কেশবচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া পদ্মাতে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। প্রাতঃকালে মহর্ষি নৌকার ছাদের উপর উঠিলেন, আর সেই বিস্তীর্ণ পদ্মার অপার জলরাশির সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে আত্মহারা হইলেন। সূর্য্য মস্তকোপরি উঠিল, তাঁহার চৈতন্য নাই, ভাবে বিভোর। তখন কেশবচন্দ্র একজন ভৃত্যকে তাঁহার মস্তকোপরি

ছত্রধারণ করিতে বলিলেন। এইভাবে সমস্তদিন কাটিয়া গেল। আহার, বিশ্রাম, ক্লান্তির কথা তাঁহার মনে নাই। অবশেষে সন্ধ্যার সময় নৌকার ছাদ হইতে অবতরণ করিলেন। এ কিপ্রকার যোগ!

আর একবার পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও পরলোকগত আনন্দমোহন বসু মহাশয় বোলপুর শান্তিনিকেতনে তাঁহার সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। রাত্রিতে তাঁহাদিগকে আহার করাইয়া মহর্ষি ছাদের উপর উঠিলেন। সেদিন পূর্ণিমার রাত্রি। পূর্ণিমার চন্দ্র সুনীল আকাশে প্রস্ফুটিত হইয়া স্নিগ্ধ রজত কিরণবর্ষণ করিয়া সমস্ত জগৎকে শীতল করিতেছে, আশ্রমতরুগুলি রজনীর গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া সুমন্দ-মলয় সমীরণস্পর্শে আনন্দিত হইয়া পত্রের মর্ম্মর শব্দদ্বারা সেই অনন্ত-পুরুষের মহিমা গান করিতেছে, প্রকৃতিদেবী পবিত্র জ্যোৎস্নাস্নাত হইয়া শ্বেতশুভ্র বসন পরিধান করিয়া অনন্তের মন্দিরদ্বারে আপনার অর্ঘ্য লইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন—এমন সময়ে মহর্ষি সেই ছাদের উপর উঠিলেন, অমনি যোগস্থ হইলেন। যোগস্থ হইয়া ছাদের উপরে পদ-চারণা করিতে লাগিলেন, এবং এইরূপে সমস্ত রজনী সেইস্থানে অতি-বাহিত করিলেন!

সংসারের অনুকূল অবস্থাতে যে তিনি কেবল এইপ্রকার যোগস্থ হইতে পারিতেন, তাহা নহে, "দুঃখ শোক যথা জাগ্রত রহে"—সংসারে সেই মানবচিত্তের অশান্তিকর প্রতিকূল অবস্থাসমূহের মধ্যেও তিনি 'স্থিতধী' মুনির ন্যায় দিনযাপন করিতে পারিতেন। একবার তিনি যখন পশ্চিমপ্রদেশে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ জামাতা শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের মৃত্যুসংবাদ তাঁহার নিকট পৌঁছিল। সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তিনি প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয়কে বলিলেন "সারদা আমার অগ্রেই চলিয়া গেলেন কেন জান। তিনি আমার জন্য

পরলোকে বাড়ী ঠিক্ করিতে গিয়াছেন। এখন পর্ব্বতে যাওয়া হইবে না। বাড়ীর সকলে শোকাচ্ছন্ন হইয়াছেন। তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিবার জন্য একবার বাড়ী যাইব।"

আর একবার যখন তিনি চুঁচুড়াতে বাস করিতেছিলেন, তখন সংবাদ আসিল তাঁহার তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কঠিন পীড়া হইয়াছে। শাস্ত্রীমহাশয় প্রতিদিন তাঁহাকে পীড়ার অবস্থার সংবাদ দিতেন। একদিন সংবাদ আসিল হেমেন্দ্রবাবুর মৃত্যু হইয়াছে। শাস্ত্রীমহাশয় মহর্ষির সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। মহর্ষি বলিলেন "আজি-কার খবর কি ?" তিনি বলিলেন "আজিকার খবর ভাল নহে, সেজো-বাবুর মৃত্যু হইয়াছে" "মৃত্যু হইয়াছে ?" বলিয়া একটু দাঁড়াইয়া আবার বেড়াইতে বেড়াইতে বলিলেন "তাঁহার সন্তানদিগের ও আমার মধ্যে তিনি একটা বাঁধ ছিলেন, এখন সে বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল, জল আবার আমাতেই আসিয়া ঠেকিল, আমাকেই এখন তাঁহার সন্তানদিগের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়কে পত্র লিখিয়া জান যে, মৃতশরীর কি ভাবে শ্মশানে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। হস্ত-পদাদি সমানভাবে রাখিয়া আপাদমস্তক বস্ত্রে আচ্ছাদন করত অভ্র-মিশ্রিত ফল্গু ও পুষ্পে সুসজ্জিত করিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছে কি না ? আর বিদ্যারত্নকে এখানে আসিতে লেখ, কিপ্রকারে হেমেন্দ্রের শ্রাদ্ধ করিতে হইবে, তাহার ব্যবস্থা আমি তাঁহাকে বলিয়া দিব। মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণ করা উচিত।"

এই দুই ঘটনা হইতে পাঠকেরা বুঝিতে পারিলেন, তিনি যদিও শোকদুঃখপূর্ণ এই পৃথিবীতে বাস করিতেন, কিন্তু তাঁহার হৃদয় সর্ব্বদা শোকাতীত মঙ্গলের রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত ছিল। পৃথিবীর কত ঘোর ঝঞ্ঝা-ঝটিকা তাঁহার উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার হৃদয়কে

স্পর্শ করিতে পারে নাই। তিনি সর্ব্বদাই "দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনা, সুখেষু বিগত স্পৃহঃ বীতরাগভয় ক্রোধঃ স্থিতধী" মুনির ন্যায় সংসারে বাস করিতেন! ধন্য সাধনা! ধন্য তপস্যা! ধন্য জীবন! বর্ত্তমানযুগে ভারতের শ্রেষ্ঠ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া ইহাই দেখাইয়া গিয়াছেন যে সংসারে পদ্মপত্রস্থিত জলের ন্যায় বাস করিয়া অনন্ত পরব্রহ্মকে "করতলন্যস্তামলকবৎ" জানিয়া মৃত্যু ও শোকের অতীত হওয়া যায়!

সম্পূর্ণ।



